এ্যারিস্টটল- এর

পলিটিক্স

সরদার ফজলুল করিম

সরদার ফজলুল করিমের 'এ্যারিস্টট্‌ল-এর পলিটিক্‌স' বিশ্ব-জ্ঞান ভাণ্ডারের চিরায়ত এই সৃষ্টির বাংলা রূপান্তর। বাংলাদেশে পলিটিক্‌স-এর এরূপ পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ এই প্রথম। সরদার ফজলুল করিম ছ'বছরের একনিষ্ঠ পরিশ্রম সহকারে 'পলিটিক্‌স'-এর অনুবাদকর্ম সম্পন্ন করেছেন। এই কাজটি দ্বারা তাঁর 'প্লেটোর রিপাবলিক' এবং 'প্লেটোর সংলাপ'-এর মাধ্যমে আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রী এবং সাহিত্যানুরাগী পাঠক সাধারণের নিকট প্রাচীন গ্রীক দর্শন ও রাজনীতির উপর রচিত কালজয়ী সৃষ্টির পরিচয় প্রদান একটি সামগ্রিকতা প্রাপ্ত হয়েছে, একথা বলা যায়। 'পলিটিক্‌স'-এর বর্তমান অনুবাদের যা বৈশিষ্ট্য তা হচ্ছে এর প্রাঞ্জলতা। তদুপরি অনুবাদক গ্রন্থের মর্ম পাঠক সাধারণের নিকট সহজবোধ্য করার জন্য যেমন তাঁর নিজস্ব বিশ্লেষণ সহকারে একটি বিস্তারিত ভূমিকা রচনা করেছেন, তেমনি গ্রন্থের পরিশিষ্টে সমগ্র গ্রন্থের আলোচিত বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণও পেশ করেছেন।

ISBN 984 410 116 6

সরদার ফজলুল করিম : আটিপাড়া, বরিশাল, মে ১৯২৫ জন্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সহযোগী অধ্যাপক। ১৯৪৬ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রে কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এ. ডিগ্রি লাভ করার পর ১৯৪৮ সন অবধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে শিক্ষকতায় তিনি নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর রাজনৈতিক সামাজিক আন্দোলনের জীবনে তিনি একাধিকবার পাকিস্তান সরকার দ্বারা নিগৃহীত হন। ১৯৬৩ সনে তিনি বাংলা একাডেমীতে যোগদান করেন। ১৯৭২ সনে স্বাধীনতা উত্তরকালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। তাঁর অনূদিত 'প্লেটোর সংলাপ', 'প্লেটোর রিপাবলিক এবং এ্যারিস্টট্‌ল'-এর পলিটিক্‌স এঙ্গেলস্‌-এর এন্টিডুরিং ব্যতীত তাঁর 'দর্শনকোষ' একটি আদর্শ জ্ঞানকোষ হিসাবে বাংলাসাহিত্যে সমাদৃত হয়েছে।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

এ্যারিস্টট্‌ল-এর 'পলিটিক্‌স'

[T. A. Sinclair কৃত ইংরেজি অনুবাদের অনুসরণে বাংলা অনুবাদ]

অনুবাদ

সরদার ফজলুল করিম

মাওলা ব্রাদার্স

প্রকাশনার সাত দশকে
মাওলা ব্রাদার্স

ষষ্ঠ মুদ্রণ
জানুয়ারি ২০১৫
প্রথম প্রকাশ
মে ১৯৮৩

প্রকাশক
আহমেদ মাহমুদুল হক
মাওলা ব্রাদার্স
৩৯/১ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৮০৭৭১ ৯৫৬৮৭৭৩
ই-মেইল : mowlabrothers@gmail.com

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
পাণিনি
বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
১৮/২৩ গোপাল সাহা লেন ঢাকা ১১০০

দাম
তিনশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN 984 410 120 4

POLITICS OF ARISTOTLE : Translated by Sardar Fazlul Karim. Published by Ahmed Mahmudul Haque of Mowla Brothers, 39/1 Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Dhrubo Esh. Price : Taka Three Hundred and Fifty only.

এ কালের
এবং
আগামীকালের
জ্ঞানার্থীদের
উদ্দেশে

সূচিপত্র

... কিন্তু এক ব্যক্তি একই সঙ্গে ধনবান এবং দরিদ্র হতে পারে না। এবং এ কারণেই রাষ্ট্রের অধিবাসীদের প্রধান শ্রেণীবিভাগ হচ্ছে সম্পদবান এবং সম্পদহীন–এ দুইএর মধ্যে। (পলিটিক্‌স ৪ : ৪)

আমাদের বরঞ্চ একথা বলাই সঙ্গত যে, দরিদ্রগণ যেখানে সার্বভৌম সেখানকার ব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্র এবং ধনবানগণ যেখানে সার্বভৌম সেখানকার ব্যবস্থা হচ্ছে কতিপয়তন্ত্র। (পলিটিক্‌স ৪ : ৪)

আইন যেখানে শাসন করে না সেখানে কোন শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকে না। (পলিটিক্‌স ৪ : ৪)

পিতামাতার বিবাহের কথাও চিন্তা করতে হবে। (পলিটিক্‌স ৭ : ৬১)

তৃতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

আমার পারিবারিক দেহ থেকে '৯৮ সালের মহাপ্লাবনের দাগ এখনো মুছে যায়নি। তবু তার মধ্যেই আমার এই মুখবন্ধটি রচনার চেষ্টা।

দ্বিতীয় সংস্করণটি একেবারে নিঃশেষিত। আমাকে রাস্তাঘাটে এখনো পাওয়া যায়। থলে কাঁধে খোঁড়া পা নিয়ে জীবনের পথে খুঁড়িয়ে চলছে কৃশদেহ একটি লোক। এপাশের ওপাশের পাঠকবর্গ এবং স্নেহভাজনের দাবী এবং তাগিদ : কই, 'এ্যারিস্টটল-এর পলিটিক্‌স কই? মুখে ম্লান হাসি আসে। কৃতজ্ঞতার হাসি। এই মুহূর্তেও 'বাসি' এ্যারিস্টটল-এর অন্বেষণ! তবে আর হতাশার কী আছে?

দেহের বয়স ৭৩। তবু মনের মধ্যে হতাশার অবকাশ নেই : মানুষ হিসাবে। কিন্তু প্রখ্যাত প্রকাশকগণ আপন আগ্রহে এগিয়ে আসবেন, তার ভরসা পাচ্ছিলাম না। সেখানেও ভরসা যুগিয়েছেন স্নেহভাজন মশিউল আলম এবং প্রীতিভাজন আহমেদ মাহমুদুল হক। একজন এসেছেন ভরসা নিয়ে আমার কাছে এবং টেনে এনেছেন অপর জনকে। তাঁরা বলেছেন : এ বইকে আমরা আবার ছাপব। নিঃশর্ত এমন উদ্যোগ এবং ভরসার প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

আমি বলি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ এবং তার প্রকাশের পেছনে অধিকতর এক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ থাকে কাহিনী থাকে : লেখক বা অনুবাদকের। তা অবশ্যই ব্যক্তিগত। পাঠকসাধারণ তা জানতে পারেন না। লেখক বা অনুবাদক সে কথা জানাতে পারে না। অথচ অপ্রকাশিত এবং অজানিত এ কাহিনীতেও গ্রন্থখানির আন্তরিকতা এবং গুরুত্বের প্রকাশ।

'এ্যারিস্টট্‌ল-এর পলিটিক্‌স'-এর এই নতুন সংস্করণটিও উৎসর্গিত হল তাঁদের উদ্দেশে যাঁরা বিশ্বাস করেন : জ্ঞান অখণ্ড এবং অজানিত। সেই অখণ্ড এবং অজানিত জ্ঞানকে জানার অনিঃশেষ আগ্রহে তাঁরা নিজেরাও উৎসর্গিত।

আমি সকলের মঙ্গল কামনা করি।

বিনীত

সরদার ফজলুল করিম

অক্টোবর, ১৯৯৮

দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

আজকের '৯৬ সাল থেকে তের বছর আগের কথা। ১৯৮৩ সনে 'এ্যারিস্টট্লের পলিটিক্স্' গ্রন্থের বর্তমান বাংলা অনুবাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি প্রকাশনা সংস্থার উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছিল। সে সংস্থাটি বর্তমানে আর ক্রিয়াশীল নেই। ফলে বহুদিন যাবৎ 'এ্যারিস্টট্লের পলিটিক্স্'-এর বর্তমান বাংলা অনুবাদ-গ্রন্থ বাজারে আর পাওয়া যাচ্ছে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষক হিসাবে অবরসর গ্রহণের পরেও আমার স্নেহভাজন ছাত্র সমাজের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটে নি। এটাকে এই বয়সেও বেঁচে থাকার একটা সার্থকতা এবং অনুপ্রেরণার উৎস বলে আমি অনুভব করি। বস্তুতঃ আমার শিক্ষকতা জীবনে আমার সংখ্যাহীন ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে যে-শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা আমি লাভ করেছি তাকে ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষমতা আমার নেই। বর্তমানের তারুণ্যকে আমরা বৃদ্ধরা যতোই সমালোচনা করিনে কেন, বর্তমানের হাতেই আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রের জীবন। তারাই গড়বে। সবযুগের সব বার্ধক্যেরই প্রবণতা থাকে অতীতকে রোমান্টিকভাবে স্মরণ করে বর্তমানের 'অবক্ষয়ে' দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার। অথচ অতীতের 'বর্তমানও' একদিন তার সংকটকে অতিক্রম করে অতীতে পরিণত হয়েছে : নতুন বর্তমান জন্মলাভ করেছে। আজকের বর্তমানও আগামীকাল অতীতে পরিণত হবে। এই হচ্ছে জীবনের অনিরুদ্ধ ধারা। আমাদের খেয়াল থাকে না। তবু অতীত থেকে বর্তমান এবং বর্তমান থেকে অবিষ্যতের এই ধারার মধ্যে মানুষের সৃজনকর্ম, চিন্তা ও জ্ঞানের বিকাশ ও বৃদ্ধির মধ্যে একটি ক্রমপ্রসারমান ঐক্যসূত্র বিদ্যমান। এই বিকাশমান ধারাটিকে সচেতনভাবে স্মরণ না রাখলে ইতিহাস ও মানুষের জীবন পরিক্রমাকে উদ্দেশ্যহীন একটা আবর্ত বলে আমাদের বোধ হতে পারে। এমন বোধ থেকেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমাদের মনে হতাশার সৃষ্টি হয়। আমার স্নেহভাজন ছাত্র-ছাত্রীদের মনে যেন ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এরূপ হতাশাবোধের সৃষ্টি না হয় তারই জন্য আমি আমার সীমাবদ্ধ শক্তি দিয়ে তাদের মনে আশার আলো দীপ্ত করে রাখার চেষ্টা করেছি। তারই জন্য তাদের বলেছি : সক্রেটিস-প্লেটো-এ্যারিস্টট্ল যেমন কোন বিশেষ দেশেরই চিন্তাবিদ ছিলেন না, তেমনি কোন বিশেষ যুগেও তাঁরা সীমাবদ্ধ নন। ব্যক্তি-মানুষের মৃত্যু থাকে। কিন্তু যথার্থ চিন্তাবিদের কোন মৃত্যু থাকে না। আমাদের স্মৃতিতেই তাঁদের জীবন। এবং তাঁদের জ্ঞান ও চিন্তার ভাণ্ডারের বিশ্লেষণ ও অনুধাবনের মধ্যেই যে-কোন বর্তমানের অচিন্ত্যনীয় সমৃদ্ধি। আমি বলি : অন্যান্য সকল মহৎ চিন্তাবিদের ন্যায় সক্রেটিস-প্লেটো-এ্যারিস্টট্ল

দেশ নির্বিশেষে আমাদের জ্ঞানের বর্ণমালা।...কিন্তু এ্যারিস্টট্‌লের 'পলিটিক্‌স্'-এর বাংলা অনুবাদ যদি আমার দেশের গ্রন্থের বাজারে মুদ্রিত আকারে আদৌ পাওয়া না যায়, তবে আমার মতো বৃদ্ধের পক্ষেও একটি তরুণ ছাত্র এবং ছাত্রীকে ধমক দিয়ে বলার অধিকার থাকে না : পড়েছ, এ্যারিস্টট্‌লের 'পলিটিক্‌স্'? সবাই নয়। তবু এদের কেউ যদি আমার ধমকের জবাবে জিজ্ঞেস করে : কোথায় পাব সে বই, তখন আমি কি জবাব দেব, এই তরুণকে?

কিন্তু কোন গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ বা পুনঃপ্রকাশ লেখক বা অনুবাদকের নিজের আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে থাকে না। আমার তো সে ক্ষমতা আদৌ নেই। এ কারণে আমার অপরিসীম কৃতজ্ঞতা বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক বন্ধুবর অধ্যাপক মনসুর মুসার কাছে যে, তিনি এ্যারিস্টট্‌লের 'পলিটিক্‌স' গ্রন্থের চিরায়ত মূল্যকে অনুধাবন করে এর বর্তমান অনুবাদটির পুনঃপ্রকাশের অনুরোধটি প্রত্যাখ্যান করেন নি। আগ্রহের সঙ্গে তিনি অনুবাদটির পুনঃপ্রকাশের প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কৃতজ্ঞ আমি বাংলা একাডেমীর পাঠ্যপুস্তক বিভাগের পরিচালক প্রীতিভাজন গোলাম মঈনউদ্দিনের কাছে এবং তাঁর বিভাগের অপর সহকর্মীবৃন্দ এবং মুদ্রণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রীতিভাজন অনুজপ্রতিমদের কাছে। এ কথা তো বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, কোন গ্রন্থই কারুর একার সৃষ্টি নয় : না লেখকের, না অনুবাদকের। সুন্দরভাবে একখানি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের প্রকাশনা একটি সামগ্রিক এবং যৌথ সৃষ্টি। বস্তুতঃ প্রত্যেক গ্রন্থের প্রকাশের পেছনে এই যৌথ পরিশ্রমের কাহিনী হচ্ছে অলিখিত অপর একখানি অধিকতর আকর্ষণীয় গ্রন্থ।

বর্তমান অনুবাদটির সীমাবদ্ধতা রয়েছেই। তবু এর যা কিছু বৈশিষ্ট্য এবং আন্তরিকতা ও পরিশ্রম তার কথা প্রথম সংস্করণের ভূমিকাটির উপসংহারে আমি উল্লেখ করার চেষ্টা করেছি। তার আর পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নেই। পূর্ব সংস্করণের ভুল-ত্রুটি যথাসাধ্য সংশোধন করে দেবার চেষ্টা করেছি। তথাপি একেবারে প্রমাদশূন্য রয়েছে, এমন কথা বলা যায় না। তার সংশোধন এ্যারিস্টট্‌লের 'পলিটিক্‌স্'-এর আগ্রহী এবং সতর্ক পাঠকরা করে নিতে পারবেন বলেই আমি বিশ্বাস করি।

সরদার ফজলুল করিম

ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬

ভূমিকা

এ্যারিস্টট্‌লের আলোচনা প্রাচীন জ্ঞানের সর্বশাখায় বিস্তারিত ছিল। দর্শন, প্রকৃতিবিদ্যা, যুক্তিশাস্ত্র, জীববিদ্যা, মনোবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, রাষ্ট্রনীতি এবং কাব্যরীতি–সর্বক্ষেত্রে এরিস্টট্‌লের অবদান রয়েছে। প্রাচীন জ্ঞানের ক্ষেত্রে এ্যারিস্টট্‌ল ছিলেন বিশ্বকোষিক।[১] তখন গবেষণা এবং জ্ঞান সাধনার উপায়, অর্থাৎ কলা-কৌশল, যন্ত্রপাতি, দৈহিক যাতায়াত আজকের তুলনায় ছিল অনেক অপরিণত এবং সীমাবদ্ধ। সেদিক থেকে এ্যারিস্টট্‌লের জ্ঞান ও গবেষণার আগ্রহ, উদ্যোগ এবং সাংগঠনিক ক্ষমতা আধুনিকের মনে বিস্ময় সৃষ্টি করে।

এ্যারিস্টট্‌লের জীবনের বিস্তারিত পরিচয় না দিয়েও কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যায়। এ্যারিস্টট্‌ল জন্মেছিলেন মেসিডোনিয়ার নিকটবর্তী স্টাগিরায় ৩৮৪ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দে। তাঁর মৃত্যু ঘটে খ্রি. পূঃ ৩২২ সনে। তাঁর পিতা ছিলেন মেসিডোনিয়ার রাজদরবারে একজন চিকিৎসক। চিকিৎসকের পারিবারিক পরিবেশে তাঁর শৈশব ও কৈশোরকালের অতিক্রমণ। প্লেটোর একাডেমীতে এসে তিনি যোগ দেন ১৭ বৎসর বয়সে, ৩৬৭ অব্দে। তারপর প্লেটোর মৃত্যু, অর্থাৎ ৩৪৭ খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ বিশ বৎসর তিনি শিক্ষালাভ করেন প্লেটোর একাডেমীতে। প্লেটোর মৃত্যুর পরে এথেন্স নগরী ত্যাগ করে তিনি যান এশিয়া মাইনরের নিকটবর্তী দ্বীপ লেসবসে। সেখানে তিনি গবেষণা করেন সামুদ্রিক জীবজন্তু নিয়ে। পরবর্তী পর্যায়ে রাজকুমার আলেকজান্ডারের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। কিন্তু যুবক আলেকজান্ডার সিংহাসনে আরোহণ করে দেশ বিজয়ে বার হলে এ্যারিস্টট্‌ল এথেন্স প্রত্যাবর্তন করে তাঁর নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লাইস্যুম প্রতিষ্ঠা করেন খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৫ সনে। প্লেটোর একাডেমীর সঙ্গে এ্যারিস্টট্‌লের লাইস্যুমের চরিত্রে পার্থক্য ছিল। একাডেমীর জোর যেখানে ছিল প্রধানত দর্শন, সাহিত্য, কল্পনা এবং বিমূর্ত অঙ্কশাস্ত্রের উপর, সেখানে লাইস্যুমের জোর ছিল বাস্তব গবেষণার উপর। ইতিহাসকারগণ বলেন, এ্যারিস্টট্‌ল তাঁর শিষ্য আলেকজান্ডারকে অনুসরণ করে তাঁর দেশজয়ের সঙ্গী না হলেও উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক হৃদ্যতার সম্পর্ক ছিল। এ্যারিস্টট্‌লের গবেষণাকার্যে আলেকজান্ডারের আর্থিক এবং রাজকীয় আনুকূল্য ছিল। সম্রাটের হুকুম ছিল যেন এ্যারিস্টট্‌লের গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার লতা, পাতা, বৃক্ষ, জীবজন্তু সরবরাহ করা হয়।[২] এ কাজে গ্রীস এবং

১. Will Durant, *Story of Philosophy* (Pocket Libry Edn, 1955), P. 56

২. Will Durant প্রাগু., পৃ. ৫৬

এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে প্রায় সহস্র লোক নিযুক্ত ছিল। বস্তুত জ্ঞান ও গবেষণার সংগঠক এ্যারিস্টট্‌ল তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় সেই প্রাচীনকালে দস্তুর মত একটি জীব-গবেষণাগার তৈরি করেছিলেন। এরূপও কাহিনী আছে যে, এ্যারিস্টট্‌লের পরামর্শে আলেকজান্ডার নীলের বন্যার উৎস সন্ধানে একদল গবেষকের অভিযান সংগঠিত করেছিলেন। এ্যারিস্টট্‌লের অভিজ্ঞতা এবং তথ্য সংগ্রহ কেবল প্রকৃতিবিজ্ঞানে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিভিন্ন রাষ্ট্রের শাসন-ব্যবস্থার পরিচয় লাভের জন্য এ্যারিস্টট্‌ল ১৫৮টি রাষ্ট্রের সংবিধান ও শাসন ব্যবস্থার তথ্য সংগ্রহ করে সংবিধানের একটি গ্রন্থাগারও তাঁর লাইস্যুমে গড়ে তুলেছিলেন।

এথেন্স নগরীতে জীবনের অধিকাংশকাল অতিবাহিত করেও এ্যারিস্টট্‌ল যে এথেন্সের রাজনৈতিক জীবনকে একজন সমাজবিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণমূলক এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখতে পেরেছিলেন তার মূলে নিশ্চয়ই এ সত্যটি রয়েছে যে, এ্যারিস্টট্‌ল এথেন্সে জন্মগ্রহণ করেন নি। এথেন্সে তিনি ছিলেন, বলা চলে, বহিরাগত এবং বৈদেশিক। এথেন্সের প্রচলিত নিয়মে এ্যারিস্টট্‌ল এথেন্সের নাগরিক হতে পারেন নি। তিনি এথেন্সের শাসন পরিচালনায় কোনভাবে যুক্ত হয়েছেন বলে জানা যায় না। শিক্ষার্থী হিসাবে তিনি প্লেটোর একাডেমীতে যোগ দিয়েছেন এবং শিক্ষক ও গবেষক হিসাবেই তাঁর সমগ্র জীবন তিনি অতিবাহিত করেছেন।

এ্যারিস্টট্‌লের মৃত্যুর পরে দুহাজার তিনশত বৎসরের অধিক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। জ্ঞানের শাখা তখনকার চাইতে অধিকতরভাবে বিভিন্ন এবং বিশিষ্ট হয়েছে। জীব, জীবন এবং মন—সর্বত্র নতুন নতুন সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। জ্ঞান গবেষণার নব নব উপায় এবং উপকরণ আবিষ্কৃত হয়েছে। বিজ্ঞানের জগতে এ্যারিস্টট্‌লের অনেক অনুমান আজ হয়ত ভিত্তিহীন বলে প্রমাণিত এবং পরিত্যক্ত হয়েছে।

কিন্তু সমাজ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমনটি আজো বলা যায় না। সমাজ ও রাষ্ট্র সংগঠন প্রাচীন গ্রীসীয় নগর রাষ্ট্রের তুলনায় বৃহৎ এবং জটিল হয়েছে, এ কথা সত্য। দেশের সঙ্গে দেশের, মানুষের সঙ্গে মানুষের সংযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে, ঘনিষ্ঠ হয়েছে। গণনার কমপ্যুটার থেকে সাক্ষাৎ যোগাযোগের তার, বেতার, উপগ্রহ এবং দূর-চিত্রের উপকরণ আজ সর্বত্র মানুষের নিত্যদিনের সঙ্গী। তথাপি সমাজ-সমস্যার সমাধান যে খুব সহজতর হয়েছে এবং সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে এ্যারিস্টট্‌লের অভিমতসমূহ সর্বক্ষেত্রে যে ভিত্তিহীন বা তাৎপর্যহীন হয়ে গেছে, এমন বলা যায় না। সেদিক থেকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এ্যারিস্টট্‌ল আজ যতো না ক্রিয়াশীল, রাষ্ট্র এবং সমাজবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অবশ্যই তার চাইতে অধিক পরিমাণে ক্রিয়াশীল।

সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এ্যারিস্টট্‌লের শ্রেষ্ঠ রচনা নীতিশাস্ত্র এবং রাষ্ট্রনীতি : 'এথিকস' এবং 'পলিটিক্‌স্'।

একে রচনা না বলে আলোচনা বলা উত্তম। গবেষকগণ মনে করেন, এ্যারিস্টট্‌লের প্রায় সব গ্রন্থই তাঁর লাইস্যুমে প্রদত্ত আলোচনার সারমর্ম। এদের কোনটিই পুরাদস্তুর কোন গ্রন্থ নয়। হয়ত এ্যারিস্টট্‌লের নিজের হাতে রচিত লাইস্যুমে আলোচনা হিসাবে উপস্থাপনার পরিকল্পনা-সংক্ষেপ। প্রায় ক্ষেত্রে বিস্তারিত ব্যাখ্যা বাদ দিয়ে সিদ্ধান্ত বা অভিমতের

উল্লেখ। কিংবা হয়ত লাইসুম্যের শিষ্যদের হাতে গৃহীত এ্যারিস্টট্‌লের শিক্ষাদানের সার-সংক্ষেপ। এখানেই প্লেটোর রচনার সঙ্গে এ্যারিস্টট্‌লের রচনার পার্থক্য। প্রাচীন হলেও প্লেটোর উদ্ধারকৃত রচনা সুসম্পূর্ণ সাহিত্য। এ্যারিস্টট্‌লের রচনা তাঁর প্রজ্ঞার আভাস মাত্র, পূর্ণ পরিচয় নয়।

'পলিটিক্‌স' গ্রন্থ সম্পর্কে পণ্ডিতগণের নানা মত। এ্যারিস্টট্‌লের মৃত্যুর চারশ বছর পরে পুস্তকাকারে এর প্রকাশ।[১] এতদিন ছিল পাণ্ডুলিপি আকারে। তাঁর অনুসারীগণ এর প্রতিলিপি রক্ষা করেছে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা একে ব্যবহার করেছে। বর্তমানে আটটি প্রস্ত বা পুস্তকে এ গ্রন্থ বিভক্ত হিসাবে পাওয়া যায়। কিন্তু এ প্রস্তুক-বিভাগও এ্যারিস্টট্‌ল-পরবর্তীকালের ঘটনা। এ যে কোন ধারাবাহিক রচনা নয় তা এ থেকেও বুঝা যায় যে, এ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বিষয়ের পুনরুক্তি রয়েছে। অসম্পূর্ণতাও আছে। আলোচনার যে বিষয় একস্থানে উত্থাপিত হয়েছে কিংবা পরবর্তীকালে বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে যে বিষয়ের, তার আলোচনা অসমাপ্ত রয়েছে। তথাপি 'পলিটিক্‌স' গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্র এবং সমাজ সংগঠনের, তার জনমানুষের শ্রেণিবিন্যাসের, তার অর্থনীতির, রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রকারভেদের এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রচিন্তাবিদের যে উল্লেখ এবং তথ্য দেখা যায় এবং মানুষের সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে যে সুচিন্তিত এবং দার্শনিক অভিমত পাওয়া যায়, তা ঐকালের প্রাচীন অন্য রচনাতে দুর্লভ। কেবল সমকালীন শ্রেষ্ঠত্ব এবং তাৎপর্যের বিষয় নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের মৌলিক সমস্যা নির্ধারণে এ্যারিস্টট্‌লের প্রজ্ঞা অনেক ক্ষেত্রে তাঁর সমাজ ও কালকে অতিক্রম করে নৃবিজ্ঞানের সাধারণ, স্বীকৃত, সার্বজনীন সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ কারণে তাঁর 'এথিকস', এবং 'পলিটিক্‌স' অদ্যাবধি সমাজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মাত্রেরই কৌতূহল এবং গবেষণার আকর।

'পলিটিক্‌স' গ্রন্থে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, রাষ্ট্রের উদ্ভব, তার উপাদান, রাষ্ট্রের অধিবাসীদের শ্রেণিবিভাগ, তার শাসনব্যবস্থা, সংবিধান, শাসনব্যবস্থার প্রকারভেদ, শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক, শাসক এবং নাগরিকের সংজ্ঞা, দাসব্যবস্থার পক্ষে যুক্তিপ্রদান, রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় অস্থিরতা, বিদ্রোহ বা বিপ্লবের সম্ভাব্য কারণ, সে কারণ প্রতিরোধের উপায়–এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা আছে।

এ আলোচনার মধ্যে রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে এ্যারিস্টট্‌লের আলোচনাটি বহুমুখী দার্শনিক তাৎপর্যে পূর্ণ। এই আলোচনাটি স্থান পেয়েছে বর্তমানে গ্রন্থখানির যে বিন্যাস পাওয়া যায় তার প্রথম প্রস্ত বা পুস্তকের প্রথম দুটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ে।

এ্যারিস্টট্‌লের 'পলিটিক্‌স্'-এর একটি 'পলেমিকাল' বা প্রতিবাদমূলক ভূমিকা আছে, এটি উল্লেখ করা আবশ্যক। রাষ্ট্র-চিন্তার ক্ষেত্রে এ্যারিস্টট্‌লের সমালোচনার প্রধান লক্ষ্য তাঁর গুরু প্লেটো। প্লেটোর সঙ্গে এ্যারিস্টট্‌লের দর্শনের যে মৌলিক কোন প্রভেদ আছে, তেমন নয়। প্লেটোর নিকট ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র যেমন আদর্শ, এ্যারিস্টট্‌লের নিকটও ক্ষুদ্র নগর-রাষ্ট্র তার সকল সামাজিক রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আদর্শ সংগঠন। প্লেটোর 'রিপাবলিক' গ্রিক নগর-রাষ্ট্রেরই একটি আদর্শ রূপ। প্লেটো 'রিপাবলিক' রচনা করেছিলেন

১. George Sabine, History of Political Theory, (London 1963), P. 89

গ্রিক নগর-রাষ্ট্রকে তার সামাজিক-রাষ্ট্রীয় অন্তর-সংকট থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে। এ্যারিস্টটলও 'পলিটিক্‌স্'-এ যে সমস্ত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন তার সাধারণ সার্বজনীন রাষ্ট্রীয় চরিত্র সত্ত্বেও সে সব সমস্যা গ্রিক-নগর-রাষ্ট্রেরই সমস্যা এবং প্রচলিত নগর-রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে রক্ষা করার জন্যই তিনি বিভিন্ন উপায়ের উল্লেখ করেছেন। প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিকে' সমাধানের ক্ষেত্রে অধিক কল্পনা-প্রবণ হয়েছেন। এ্যারিস্টট্‌ল সমস্যার আলোচনা এবং সমাধানে অভিজ্ঞতা এবং বাস্তবের উপর অধিকতর নির্ভর করেছেন। কিন্তু প্লেটো তাঁর 'লজ' বা 'আইনসমূহ নামক গ্রন্থে কল্পনার চাইতে বাস্তব সম্ভাব্যতার উপর জোর দিয়েছেন। আবার এ্যারিস্টট্‌লও তাঁর সর্বোত্তম-রাষ্ট্রের চিন্তায় বাস্তবে যা অপ্রাপ্য তেমন আদর্শের কল্পনা না করে পারেন নি। তথাপি 'পলিটিক্‌স' গ্রন্থের বিভিন্নস্থানে এ্যারিস্টট্‌ল প্লেটোকে সমালোচনার পাত্র করেছেন। কোথাও প্লেটোর নাম উল্লেখ করেছেন। কোথাও উল্লেখ করেন নি। এ সমালোচনার পেছনে হয়ত প্লেটোর অমিত প্রভাবের বলয় থেকে বেরিয়ে এসে নিজের অস্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাই অধিক ছিল। এ কারণে গুরুর বিরুদ্ধে তাঁর নিজের সমালোচনার যুক্তি কতখানি ক্ষুরধার, ন্যায্য এবং গ্রাহ্য হল তার বিবেচনা এ্যারিস্টট্‌ল করেন নি। অনেক ক্ষেত্রে প্লেটোর বক্তব্যকে বেঠিকভাবে উপস্থিত করতেও তিনি দ্বিধা করেন নি। কাজেই মৌলিক পার্থক্যের কারণে নয়, আপন ব্যক্তিত্ব স্থাপনের কারণেই এ্যারিস্টট্‌ল প্লেটোকে অনেক ক্ষেত্রে সমালোচনা করেছেন—এমন অনুমান করা চলে।

'পলিটিক্‌স'-এর প্রথম পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম বাক্যটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের, বিশেষ করে রাষ্ট্রের সংজ্ঞার ক্ষেত্রে একটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বাক্য। প্রথম বাক্যটিকে রাষ্ট্রের একটি সংজ্ঞারূপে উপস্থিত করা হয়েছে। "আমাদের নিজেদের পর্যবেক্ষণ এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে, প্রত্যেকটি রাষ্ট্র হচ্ছে কোন উত্তম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষের সমবায়ে গঠিত একটি সংস্থা।"

এ বাক্যটিতে জ্ঞানালোচনা এবং গবেষণার এ্যারিস্টট্‌লের সাধারণ এবং উত্তম বৈশিষ্ট্যটি প্রকাশিত হয়েছে। এ্যারিস্টট্‌লের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এ্যারিস্টট্‌ল জ্ঞানের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্তের জন্য অভিজ্ঞতা বা পর্যবেক্ষণকে মূল্য দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ কারণেই কেবল প্রকৃতিবিজ্ঞান নয়, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও ইতিহাস এবং প্রচলিত রাষ্ট্রব্যবস্থার অভিজ্ঞতা থেকে তিনি তথ্য সংগ্রহ করেছেন। তাই রাষ্ট্র নিয়ে আলোচনার প্রথম বাক্যে তিনি 'পর্যবেক্ষণের' কথা উল্লেখ করেছেন। এখানে নামের উল্লেখ না থাকলেও প্লেটোকে সামনে রেখে আমরা বাক্যটির মূল্যায়ন করতে পারি। বস্তুত রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এখানেই প্লেটোর সঙ্গে এ্যারিস্টট্‌লের গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য। প্লেটোর রাষ্ট্র-দর্শনের মূল হচ্ছে, রাষ্ট্র-নির্বিশেষ আদর্শ। প্লেটোর দর্শনে বাস্তব গুরুত্বপূর্ণ নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ভাব বা আদর্শ। তাই 'রিপাবলিকে'র একটি বিখ্যাত বাক্য হচ্ছে : দি আইডিয়াল ইজ মোর রিয়াল দ্যান দি রিয়াল : যা আদর্শ তা বাস্তবের চেয়ে অধিক বাস্তব।[১] প্লেটোর যুক্তি হচ্ছে আমরা

১. 'The ideal is more real than the real', দ্র. সরদার ফজলুল করিম, প্লেটোর রিপাবলিক, ২য় সংস্করণ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮২; ৫ : ৪৭২।

ভাব বা আদর্শ দ্বারা পরিচালিত হই। বাস্তবকে আমরা পরিচালিত করি আদর্শের লক্ষ্যে। ভাব বা আদর্শ হচ্ছে পরিমাপক। পরিমাপক ব্যতীত যেমন কোন বস্তুর মূল্যায়ন সম্ভব নয়, এবং মূল্যায়ন ব্যতীত কোন বস্তুর অস্তিত্ব যেমন মানুষের কাছে নিরর্থক তেমনি আদর্শ রাষ্ট্র হচ্ছে সকল বাস্তব রাষ্ট্রের পরিমাপক। বাস্তব রাষ্ট্র এথেন্স কিংবা স্পার্টা কতখানি ভাল কিংবা মন্দ তা আমরা নির্ধারণ করতে পারি আদর্শ রাষ্ট্রের সঙ্গে তুলনার ভিত্তিতে মাত্র। ভাল রাষ্ট্রের একটি ধারণা বা ভাব আমাদের আছে বলেই একটি বিশেষ রাষ্ট্রকে খারাপ কিংবা তত ভাল নয় কিংবা ভাল—এরূপ বলে অভিহিত করি। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে বস্তুর চাইতে বস্তুর পরিমাপক বড়, অর্থাৎ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ রাষ্ট্রের চাইতে আদর্শ রাষ্ট্রের ভাব বড়। ব্যক্তির চাইতে ব্যক্তির মন বড়। ভাববাদ বনাম বস্তুবাদের লড়াই-এর সূত্রপাত এভাবে প্লেটো থেকেই। তাই রাষ্ট্রের প্রশ্নে 'রিপাবলিক'-এ সক্রেটিসকে যখন প্রশ্ন করা হল : তোমার আদর্শ রাষ্ট্র কি কোথাও বাস্তবায়িত হয়েছে? কিংবা একে বাস্তবায়িত করা কি সম্ভব? তখন সক্রেটিসের জবাব দিতে অসুবিধা হল না : তাতে কিছু আসে যায় না। "তাহলেও আমাদের এই রাষ্ট্র আদর্শ হিসাবে স্বর্গে দীপ্যমান থাকবে।... আমাদের এই রাষ্ট্র কোথাও অস্তিত্বময় থাকুক, কোনদিন সে অস্তিত্বময় হোক কিংবা না হোক–এই হচ্ছে একমাত্র রাষ্ট্র যার রাজনীতিতে যে উত্তম সে অংশগ্রহণ করতে পারে।[১]

মোটকথা, প্লেটোর দর্শনে কোন বাস্তব রাষ্ট্রই যথার্থ অর্থে পরিপূর্ণ রাষ্ট্র নয়। কারণ, পরিপূর্ণ রাষ্ট্র হচ্ছে আদর্শ রাষ্ট্র। যে কোন বাস্তব রাষ্ট্র আদর্শ রাষ্ট্র থেকে নৈকট্য কিংবা দূরত্বের ভিত্তিতে অধিকতর কিংবা অল্পতর অপূর্ণ রাষ্ট্র, পুরো রাষ্ট্র নয়।

এ্যারিস্টট্‌ল যে সর্বক্ষেত্রে প্লেটোর ভাববাদের বলয়কে ভাঙ্গতে পেরেছেন এমন নয়। কিন্তু রাষ্ট্রের আলোচনার এই সূচনায় তিনি যে গুরুত্বপূর্ণভাবেই গুরু প্লেটোর সঙ্গে পৃথক মত পোষণ করেছেন, এ কথা বলা যায়। প্রথম বাক্যে প্রদত্ত সংজ্ঞায় এ্যারিস্টট্‌লের নিকট প্রত্যেকটি বাস্তব রাষ্ট্রই রাষ্ট্র। একটি রাষ্ট্র অপর একটি রাষ্ট্র থেকে শাসনগত এবং লক্ষ্যগতভাবে যতই ভালো কিংবা মন্দ বলে অভিহিত হোক না কেন, প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই হচ্ছে পরিপূর্ণরূপে রাষ্ট্র। এ ক্ষেত্রে কোন রাষ্ট্রই কোন রাষ্ট্রের চাইতে অধিকতর কিংবা অল্পতর রাষ্ট্র নয়। কারণ, পর্যবেক্ষণ থেকে আহৃত তথ্যের সাক্ষ্য হচ্ছে এই যে, প্রত্যেকটি রাষ্ট্রই মানুষের সমবায়ে গঠিত এমন একটি সংস্থা যার সাধন করার মত একটি লক্ষ্য আছে। বলা চলে একটি উত্তম লক্ষ্য সাধনের জন্য সংগঠিত মানব সংস্থাই হচ্ছে রাষ্ট্র। এ্যারিস্টট্‌ল যে কোন লক্ষ্যকে উত্তম বলার কারণ ব্যাখ্যা করে : "আমি উত্তম কথাটি ব্যবহার করেছি। কারণ, মানুষ তাদের কর্মকাণ্ডে বস্তুত তাকেই সাধন করার চেষ্টা করে যাকে তারা উত্তম বলে বিবেচনা করে।" এদিক থেকে যে-রাষ্ট্রকে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে আখ্যায়িত করা হবে তার লক্ষ্যও উত্তম। কারণ, স্বৈরতান্ত্রিক শাসক নিজেকে স্বৈরতান্ত্রিক বিবেচনা করে না এবং সে মনে করে না যে, কোন অধম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সে রাষ্ট্র শাসন করছে।

সকল বাস্তব রাষ্ট্রই পুরোপুরি রাষ্ট্র এবং আমাদের পর্যবেক্ষণের এই হচ্ছে সিদ্ধান্ত–এ কথা দ্বারা এ্যারিস্টট্‌ল আলোচনার ক্ষেত্রে একটি নতুন পথ ফলক স্থাপন করেছেন। তিনি

১. ঐ, ৯ : ৫৯২

রাষ্ট্র আলোচনাকে প্লেটোর বিমূর্ত ভাববাদী দার্শনিক আলোচনা থেকে বার করে এনে বাস্তব অভিজ্ঞতার সম্ভাবনাময় সড়কে দাঁড় করিয়েছেন। এ অবদান তাঁর কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বস্তুত রাষ্ট্রের পর্যবেক্ষণ ও তুলনামূলক এবং ইতিহাসভিত্তিক আলোচনার পথিকৃত হচ্ছেন এ্যারিস্টট্‌ল।

রাষ্ট্র-আলোচনার গোড়ার সংজ্ঞাটিতে প্লেটোর দর্শনকে খণ্ডন করার লক্ষ্যটি স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না হলেও এর কিছু পরে এ্যারিস্টট্‌ল যখন বলেন : "অনেকে এরূপ মনে করেন যে,রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে শাসক এবং শাসিতের মধ্যে, রাজা এবং প্রজার মধ্যে, পরিবারের কর্তা এবং পরিবারের মধ্যে, দাস এবং প্রভুর মধ্যকার সকল সম্পর্ক এক। এদের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্যের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। এদের মধ্যে আকারগত পার্থক্য অবশ্য বিদ্যমান। কিন্তু আকারগত পার্থক্যই একমাত্র পার্থক্য নয়। কিংবা আকারই এখানে বিচারের নিয়ামক নয়।" তখন আর বুঝতে কষ্ট হয় না যে, এ সমালোচনার লক্ষ্য নির্দিষ্টরূপেই প্লেটো।

ব্যক্তি নিয়ে সমাজ। ব্যক্তি নিয়ে রাষ্ট্র। কিন্তু রাষ্ট্র কি ব্যক্তির হুবহু প্রতিরূপ? রাষ্ট্র কি ব্যক্তির বৃহত্তর আকার মাত্র। সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে এটি একটি মৌল প্রশ্ন। প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে রাষ্ট্রের গঠন এবং প্রকৃতি নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। একটি রাষ্ট্রকে তার প্রাথমিক সংগঠন থেকে শুরু করে তার শাসনব্যবস্থা পর্যন্ত তিনি উদ্ঘাটিত করে দেখাবার প্রয়াস পেয়েছেন। রাষ্ট্র সংগঠনের গোড়ার কথা বলতে গিয়ে প্লেটো সঠিক ভাবেই বলেছেন : ব্যক্তির প্রয়োজন থেকেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি। প্রয়োজনের তাগিদে ব্যক্তি ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে রাষ্ট্র তৈরি করে। কিন্তু এই রাষ্ট্রে শাসন ব্যবস্থা কিরূপ হবে? এ প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে প্লেটো বললেন : "আগে আমাদের স্থির করতে হবে শাসনের নীতি কি এবং ন্যায়-শাসন কাকে বলে?" আর এটা স্থির করার জন্যই তিনি ব্যক্তিচরিত্র বিশ্লেষণ করলেন। ব্যক্তিচরিত্র বিশ্লেষণ করে বললেন : ব্যক্তির চরিত্রে তিনটি ভাগ : "প্রজ্ঞা, বিক্রম এবং প্রবৃত্তি। আর ব্যক্তির জীবনে শাসনের নীতি হচ্ছে : প্রজ্ঞা প্রবৃত্তিকে শাসন করে এবং বিক্রম এ ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাকে সহায়তা দান করে।" প্লেটো বললেন, ব্যক্তির চরিত্রে যেমন তিনটি ভাগ, রাষ্ট্রের চরিত্রেও তিনটি ভাগ। রাষ্ট্রের মানুষকেও তিন ভাগে ভাগ করা চলে। এক ভাগের মধ্যে প্রজ্ঞার আধিক্য, এক ভাগের মধ্যে বিক্রমের, আর এক ভাগের মধ্যে প্রবৃত্তির আধিক্য। প্রজ্ঞার আধিক্য জ্ঞানীর মধ্যে, অভিজাতদের মধ্যে। বিক্রমের আধিক্য দৈহিক শক্তির অধিকারীর মধ্যে। প্রবৃত্তির আধিক্য শ্রমজীবী, মানে উৎপাদকদের মধ্যে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রজ্ঞা বা আত্মা যেমন হাত, পা ও উদরের প্রবৃত্তিকে শাসন করে এবং দেহের শক্তি আত্মার এই শাসনকে প্রয়োগ করে, তেমনি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে জ্ঞানীরা শাসক হবে এবং শ্রমজীবী বা উৎপাদকরা শাসিত হবে। বিক্রম বা শক্তিধর অর্থাৎ সৈন্যবাহিনী শাসকের এই শাসন উৎপাদকদের উপর প্রয়োগ করবে। ব্যক্তির চরিত্রকে রাষ্ট্রের উপর এমনি সহজ এবং সরল আরোপে প্লেটোর কোন অসুবিধা হয় নি। কারণ, প্লেটোর যুক্তি হচ্ছে : রাষ্ট্র হচ্ছে ব্যক্তির বৃহৎ আকার। 'স্টেট ইজ ইনডিভিজুয়াল রিট

লার্জ।'[১] প্লেটোর মূল উদ্দেশ্য অবশ্য দাস ও শ্রমজীবী মানুষের উপর জ্ঞানী তথা অভিজাতদের শাসনকে যুক্তি সহকারে দৃঢ় করা। দাস এবং শ্রমজীবী মানুষের সংশয়, প্রশ্ন এবং প্রতিক্রিয়াকে শান্ত করা। এ মূল উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে এ্যারিস্টট্‌লের যুক্তির পার্থক্যের দার্শনিক তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বক্তি দিয়ে রাষ্ট্র গঠিত হলেও, ব্যক্তিই যে রাষ্ট্র নয়, অর্থাৎ রাষ্ট্র যে ব্যক্তির বৃহত্তর আকার মাত্র নয়–এ্যারিস্টট্‌লের এ উক্তি বিশেষ অর্থবহ। এ উক্তির মধ্যে এমন উপলব্ধি স্পষ্ট যে, সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যক্তির সমাহার মাত্র নয়। ব্যক্তি যখন ব্যক্তির সঙ্গে মিলিত হয়, যখন বহু ব্যক্তি পারস্পরিক লেনদেনের, সংযোগ এবং সহযোগিতার, আশা এবং প্রত্যাশার সম্পর্কে জড়িত হয় তখন যে সংস্থার জন্ম ঘটে তার চরিত্র বা প্রকৃতি এ সংস্থার একক বা উপাদান থেকে ভিন্নতর। এ প্রায় যৌগিক রাসায়নিক সংস্থার অনুরূপ। বিজ্ঞানের সাধারণ দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, হাইড্রোজেন অণু এবং অক্সিজেন অণুর সম্মিলনে যে সংস্থা অর্থাৎ পানির সৃষ্টি হয় সেটি চরিত্রগতভাবে না হাইড্রোজেন, না অক্সিজেন। সে উভয় উপাদান থেকে একেবারেই ভিন্ন। একটি জটিল যৌগিক সংস্থার একক এবং সমগ্রের চরিত্রের এই পারস্পরিক পার্থক্য বস্তুজগতের ক্ষেত্রে আমরা যতো সহজে অনুধাবন করতে পারি, আমাদের নিজেদের অর্থাৎ মানুষের সমাজের একক এবং সমগ্রের ক্ষেত্রে সেটি অনুধাবন করা তত সহজ নয়। এ্যারিস্টট্‌লের বৈশিষ্ট্য এবং কৃতিত্ব এই যে, প্লেটোর পক্ষে এই পার্থক্য অনুধাবন করা যেখানে সম্ভব হয় নি, এ্যারিস্টট্‌ল সেখানে এটি নির্দিষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন। এই বোধটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন এ্যারিস্টট্‌ল বলেন : "রাজা প্রজার সম্পর্কটি যথার্থই পৃথক। এটি একটি রাজনৈতিক বা শাসনগত সম্পর্ক। এখানে একটি নাগরিক সংস্থার পার্থক্য বিদ্যমান। একটি গুণগত পার্থক্যের অস্তিত্বকে এখানে আমাদের স্বীকার করতে হয়।"[২]

রাষ্ট্র একটি যৌগিক সংস্থা। এই জটিল যৌগিক সংস্থার চরিত্র সঠিকভাবে বুঝার উপরই নির্ভর করে রাষ্ট্রকে উত্তম রূপে শাসন বা পরিচালনার প্রশ্ন। আদর্শ রাষ্ট্র সংস্থা সকলেরই কাম্য। কিন্তু ন্যায়ের একটি আদর্শ ভাব সামনে রাখাই কি রাষ্ট্রকে উত্তম করার জন্য যথেষ্ট? রাষ্ট্রসংস্থাকে যদি উত্তম করতে হয় তাহলে রাষ্ট্রসংস্থার সঠিক চরিত্রকে নির্দিষ্ট করতে হবে এবং তাকে অনুধাবন করতে হবে। কিন্তু যৌগিক রাষ্ট্র-সংস্থার সঠিক চরিত্র আমরা কেমন করে অনুধাবন করতে পারি? এ্যারিস্টট্‌লের জবাব যেমন স্পষ্ট তেমনি তাঁর সে জবাব সামাজবিজ্ঞান অনুধাবনের নতুন পদ্ধতি নির্দিষ্ট করার দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এ্যারিস্টট্‌লের জবাব হচ্ছে : কোন যৌগিক সংস্থার চরিত্র উপলব্ধি করা যায় যৌগিক অস্তিত্বকে তার গঠনগত উপাদানে বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে। যৌগিককে ভেঙ্গে তার উপাদানে উপনীত হতে হবে। উপাদানের প্রকৃতির এবং শক্তির উপরই উপাদানের সম্মেলনে গঠিত অস্তিত্বের শক্তি। এখানে দুটো প্রক্রিয়া নিহিত। একটি হচ্ছে, উপাদান দিয়ে যৌগিককে গঠন করা। এ্যারিস্টট্‌লের আলোচনায় এই দুটো প্রক্রিয়ারই স্বীকৃতি স্পষ্ট। রাষ্ট্রসংস্থা সাধারণ বস্তুর ন্যায় বিভাজ্য বস্তু নয়। তবু এ্যারিস্টট্‌লের বৈজ্ঞানিক মনোভাবের

১. 'State is Individual writ large' : G, 2 : 364, & William Boyd, An Introduction to the Republic of Plato, (London, 1962), P. 43

২. পলিটিকস : পুস্তক ১, অধ্যায় ১

প্রকৃষ্ট প্রকাশ এখানে যে, তিনি রাষ্ট্রসংস্থার ক্ষেত্রেও এই দুটি প্রক্রিয়াকে যথাসম্ভব প্রয়োগ করা যে আবশ্যক, দ্ব্যর্থহীনভাবে সে কথা তিনি ব্যক্তি করেছেন। এ্যারিস্টট্‌ল বলেছেন : "আমরা সাধারণত কি করি? আমরা একটি যৌগিক বা মিশ্র সংস্থাকে তার অন্তর্গত উপাদানে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। এই বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াটি নিয়ে আমরা অগ্রসর হতে থাকি এবং যতক্ষণ না তার অন্তর্গত উপবিভাগগুলি নিঃশেষ করে তার মূল উপাদানে আমরা পৌঁছতে পারি ততক্ষণ বিশ্লেষণের কাজটি শেষ হল বলে আমরা মনে করিনে। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে যদি আমরা তার অন্তর্গত উপাদানগুলিতে বিভক্ত করি তাহলে অধিকতর উত্তমরূপে আমরা এর অংশগুলির পারস্পরিক পার্থক্য অনুধাবন করতে সক্ষম হব এবং এই উপাদানগুলির মধ্যে ক্রিয়াশীল কোন নিয়মকে স্থির করা যায় কিনা–সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও আমাদের পক্ষে তখন সহজতর হয়ে দাঁড়াবে।"[১]

এ্যারিস্টট্‌লের এ অভিমতের শেষ অংশটিও গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ প্রকৃতির নিয়ম আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছে। মানুষ বিশ্বাস করে প্রকৃতি-জগৎ নিয়মের অধীন। প্রকৃতি-জগতের নিয়মকে জেনেই মানুষ তাকে আয়ত্ত করতে পারবে, তাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে। যত অধিক পরিমাণে বিশ্বজগতের নিয়মকে সে জানতে পারবে তত অধিক পরিমাণে বিশ্ব-প্রকৃতি সম্পর্কে সে নিশ্চিত হতে পারবে, তত অধিক পরিমাণে সে তাকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবে।

কিন্তু মানুষের সমাজ এবং রাষ্ট্র কিরূপ অস্তিত্ব? মানুষই তো সমাজের উপাদান। মানুষ সমাজকে সৃষ্টি করে। সমাজ তার নিজের অস্তিত্বের বাইরের কোন অস্তিত্ব নয়। প্রকৃতি-জগৎ তার বাইরের অস্তিত্ব। প্রকৃতি-জগৎকে মানুষ পর্যবেক্ষণ করতে পারে। তার বস্তুরাজিকে সে ভাঙ্গতে পারে। ভেঙ্গে তার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া দেখতে পারে। সে আকাশকে নিরীক্ষণ করতে পারে। নিরীক্ষণ করতে পারে তার চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারাকে। তাদের উদয়-অস্তের নিয়ম সে আবিষ্কার করতে পারে। কিন্তু মানুষ কি পারে মানুষের সমাজকে নিরীক্ষণ করতে, তাকে পর্যবেক্ষণ করতে এবং তার নিয়ম কানুনকে আবিষ্কার করতে? আসলে মানুষের সমাজের কি কোন স্থির নিয়ম কানুন আছে? প্রকৃতি-জগতের ন্যায়, তার বস্তুর ন্যায়? এ প্রশ্নের অবিসংবাদিত মীমাংসা আজো হয় নি। কিন্তু একথা ঠিক যে, মানুষের সমাজও একটা বিশিষ্ট সত্তাসম্পন্ন অস্তিত্ব, তারও একটা নিজস্ব নিরীক্ষণযাগ্য বিধিবিধান আছে যা কোন ব্যক্তি-মানুষের মনের ব্যাপার নয়, অর্থাৎ যা ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না, এরূপ অভিমত পোষণের পূর্বশর্ত হচ্ছে এই ধারণা যে, সমাজ এবং রাষ্ট্র মানুষের সৃষ্টি হলেও সে মানুষ-নিরপেক্ষ প্রকৃতির মতোই এক অস্তিত্ব। তাকে নিরীক্ষণ করা যায় এবং নিরীক্ষণ করে তার অন্তর্নিহিত নিয়মকে নির্দিষ্ট করা যায়। সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে এরূপ ধারণা আজো যেমন সর্বজনস্বীকৃত নয়, তেমনি এ্যারিস্টট্‌লের যুগে এ ধারণা একেবারেই অচিন্ত্যনীয় ছিল। তাই এ ক্ষেত্রে এ্যারিস্টট্‌লের এরূপ ধারণা সামজবিজ্ঞানে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর উন্মোচনে বিপ্লবী তাৎপর্যপূর্ণ—একথা যথার্থরূপেই আমরা বলতে পারি।

১. পলিটিক্স : পুস্তক ১, অধ্যায় ১

এই অভিমতের অধিকতর দ্ব্যর্থহীন প্রকাশ ঘটেছে যখন এ্যারিস্টট্ল রাষ্ট্রের প্রকৃতি প্রসঙ্গে বলেন :

> "কিন্তু সর্বোচ্চ বা চরম সংস্থা হচ্ছে নগর বা রাষ্ট্র। একাধিক গ্রামের সম্মেলনে গঠিত হয় রাষ্ট্র। বিকাশের যে ধারা আমরা বর্ণনা করেছি তাতে বলা চলে রাষ্ট্রে এই বিকাশের সমাপ্তি ঘটেছে।... আমাদের পূর্বের বক্তব্যের অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্র শ্রেণি বা প্রকারগতভাবে সেই বস্তুরই অন্তর্গত যার একটি প্রাকৃতিক সত্তা রয়েছে এবং প্রকৃতিগতভাবে মানুষ হচ্ছে রাষ্ট্রনৈতিক প্রাণী। মানুষের স্বভাব হচ্ছে রাষ্ট্র সৃষ্টি করা, রাষ্ট্রে বাস করা ।"[১]

'প্রকৃতি' বা 'প্রকৃতিগত বা ন্যাচারাল' শব্দের ব্যবহার এ্যারিস্টট্ল তাঁর 'পলিটিক্স' আলোচনার একাধিক জায়গাতে করেছেন। সর্বত্র যে একই অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, এমনও নয়। কোথাও যা অপরিণত কিংবা আদিম তাকে প্রাকৃতিক বা প্রকৃতিগত বলেছেন। আবার কোথাও যা মানুষের জন্য অনিবার্য এবং মানুষ-নিরপেক্ষভাবে যার অস্তিত্ব রয়েছে 'প্রকৃতি' বলতে তিনি তাকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু প্রথম পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রাষ্ট্রের মূল চরিত্র নির্ধারণে 'প্রাকৃতিক' শব্দের ব্যবহার দ্ব্যর্থহীন এবং দার্শনিক তাৎপর্যে পূর্ণ। মানুষ রাষ্ট্র গঠন করে। কিন্তু তাই বলে আমরা কি বলতে পারি, মানুষ ইচ্ছা করলে সমাজ বা রাষ্ট্র গঠন নাও করতে পারে? এ্যারিস্টট্ল বলেন, না, মানুষের পক্ষে তা সম্ভব নয়। "মানুষের স্বভাব হচ্ছে রাষ্ট্র সৃষ্টি করা।... এমন মানুষ যদি পাওয়া যায় যে রাষ্ট্রহীন... তাহলে আমরা সে মানুষকে হয় অধমের অধম, নয়ত উত্তমের উত্তম, অমানুষ কিংবা অতিমানুষ বলে গণ্য করব।"

সমাজ বা রাষ্ট্র হচ্ছে মানুষের জীবনে অনিবার্য। রাষ্ট্র হচ্ছে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক। কারণ, এর ব্যক্তিনিরপেক্ষ অস্তিত্ব আছে। একটা পর্বত বা সমুদ্র প্রাকৃতিক। কারণ, পর্বত বা সমুদ্রের অস্তিত্ব ব্যক্তির উপর নির্ভর করে না। ব্যাখ্যা হিসাবে আমরা বলতে পারি, এ্যারিস্টট্ল এখানে স্বাভাবিক বা ন্যাচারাল বলতে কৃত্রিমের বিপরীত অর্থ বুঝাতে চেয়েছেন ভাস্করের হাতে তৈরি মূর্তি একদিক থেকে কৃত্রিম বা অপ্রাকৃতিক। কারণ, ভাস্করের মূর্তির অস্তিত্ব ভাস্কর-নিরপেক্ষ নয়। ভাস্কর ইচ্ছা করলে মূর্তিটি তৈরি করতে পারে; ইচ্ছা করলে নাও করতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র বা সমাজকে মানুষ তৈরি করে বটে। তবু রাষ্ট্র বা সমাজ এমন অস্তিত্ব নয় যাকে মানুষ ইচ্ছা করলে তৈরি নাও করতে পারে। কারণ, এ হচ্ছে মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। "কোন বস্তু বা সত্তার স্বভাব বা প্রকৃতি বলতে আমরা কি বুঝি? কোন কিছুর স্বভাব বা প্রকৃতি বলতে আমরা তার চরম পরিণাম বা বিকাশকে বুঝি। মানুষ কিংবা পরিবার কিংবা অপর যা কিছুই হোক না কেন, এদের চরম বিকাশই হচ্ছে এদের স্বভাব।" এ্যারিস্টট্লের এরূপ উক্তি বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না। বীজের স্বভাব বৃক্ষ হওয়া। শিশুর স্বভাব মানুষ হওয়া। কিন্তু এমন স্বভাবেরও দুটো দিক আছে। উপযুক্ত আলো-হাওয়া-মাটিতে বীজ বৃক্ষ হতে বাধ্য। উপযুক্ত পরিচর্যায় শিশুও প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ হতে বাধ্য। উপযুক্ত অবস্থায় মানুষও রাষ্ট্রগঠনে বাধ্য। কিন্তু বীজের বৃক্ষে পরিণত হওয়ার

১. পলিটিক্স : পুস্তক ১, অধ্যায় ২

অনিবার্যতা এবং মানুষের রাষ্ট্রগঠনের অনিবার্যতা কি এক? এক্ষেত্রে এ্যারিস্টট্লের চিন্তা অস্পষ্ট নয়। এ দুটি অনিবার্যতা এক নয়। বীজের স্বভাব আছে। পশুর স্বভাব আছে। মানুষেরও স্বভাব আছে। কিন্তু পশু ও মানুষের স্বভাবের পার্থক্য এখানে যে, মানুষের যুক্তিবোধ আছে। আর এ যুক্তিবোধের কারণে তার প্রকৃতিদত্ত স্বভাবের বিকাশে তার নিজেরও একটি সক্রিয় ভূমিকা আছে। তার স্বভাবের অনিবার্য বিকাশ বটে। তবু এ বিকাশকে তার বুদ্ধি এবং যুক্তি দ্বারা সে পূর্ণতর বা সহজতর করতে পারে। সমাজ ও রাষ্ট্রের অনিবার্য বিকাশে সমাজ বা রাষ্ট্রের উপাদান তথা মানুষের যে একটি সক্রিয় ভূমিকাও বিদ্যমান এই উপলব্ধির সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটিয়ে এ্যারিস্টট্ল বলেছেন : "আমরা বলব, সমস্ত মানুষের মধ্যেই রাষ্ট্রের এই অংশীদারিত্বের একটি স্বাভাবিক আবেগ বিদ্যমান। এবং যে ব্যক্তি প্রথম রাষ্ট্রকে গঠন করেছে সে অবশ্যই মানব জাতির প্রভূত উপকার সাধন করেছে এবং এজন্য সে কৃতিত্বের দাবীদার।"[১]

মানুষের এই ভূমিকার ক্ষেত্রেই এসেছে এ্যারিস্টট্লের এরূপ উক্তি : "তাছাড়া রাষ্ট্র যে কেবল পরিণাম, তা নয়। পরিবার এবং ব্যক্তির পূর্বগামীও হচ্ছে রাষ্ট্র। কারণ সমগ্র হচ্ছে অংশের পুরোগামী। সমগ্রের মধ্যেই অংশের অস্তিত্ব।"[২] এ্যারিস্টট্লের এরূপ উক্তির তাৎপর্য এই যে, এ্যারিস্টট্ল সমাজ বা রাষ্ট্রকে কবেল ব্যক্তি-নিরপেক্ষ প্রাকৃতিক অস্তিত্ব বলে থামেন নি। তেমন হলে রাষ্ট্র উদ্দেশ্যহীন হয়ে যায়। তাহলে প্রাকৃতিক পর্বতের সঙ্গে 'প্রাকৃতিক' রাষ্ট্রের কোন পার্থক্য থাকে না। কিন্তু রাষ্ট্র হচ্ছে মানুষের সমবায়ে সংগঠিত সংস্থা। এবং যেহেতু মানুষই রাষ্ট্র গঠন করে সে কারণে রাষ্ট্রের ভাব যদি সূচনাতেই তার মনে না থাকে তাহলে মানুষের পক্ষে রাষ্ট্র গঠন সম্ভব হতে পারে না। ভাস্কর মূর্তি তৈরি করে। পরিপূর্ণ মূর্তিটি তার কাজের শেষ পরিণতি। কিন্তু মূর্তিটির ধারণা যদি সূচনাতে তার মনে না থাকে তাহলে মূর্তি হিসাবে প্রস্তর খণ্ডের পরিণামও অসম্ভব হয়ে পড়ে। এদিক থেকে রাষ্ট্র যেমন শেষ, তেমনি সূচনাও বটে। তাছাড়া রাষ্ট্র হচ্ছে একটি সমগ্র সত্তা। ব্যক্তি হচ্ছে তার উপাদান। সমাজের মধ্যেই ব্যক্তির অস্তিত্ব। সমাজের বাইরে ব্যক্তির কোন যথার্থ অস্তিত্ব অকল্পনীয়। এ কারণে বলা চলে সমাজ বা রাষ্ট্র ব্যক্তির পূর্বগামী।

উপরের আলোচনাতে একটি কথা প্রকাশের চেষ্টা করা হয়েছে যে, 'পলিটিক্স' গ্রন্থের প্রথম দুটি অধ্যায়ের কয়েকটি উক্তি বিশেষ দার্শনিক তাৎপর্যে পূর্ণ।

এ্যারিস্টট্ল সমাজ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে এই দুটি অধ্যায়ে (কিংবা সমগ্র 'পলিটিক্স' গ্রন্থে) কোন সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্দিষ্ট করেন নি। শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাজই রাষ্ট্র। আর তাই রাষ্ট্রের বাইরে তিনি মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করতে পারেন নি।

সমাজবিজ্ঞানের আধুনিক বিকাশের বৈশিষ্ট্য এই যে, সমাজ এবং রাষ্ট্র এক নয়। মানুষের জীবনের বিকাশের এক পর্যায়ে রাষ্ট্র-সংগঠনের উৎপত্তি। রাষ্ট্র মানুষের স্বভাবের প্রকাশ বটে, কিন্তু রাষ্ট্রের বাইরে মানুষের অস্তিত্ব অকল্পনীয় নয়। রাষ্ট্র বলতে আধুনিককালে প্রধানতঃ দণ্ড প্রয়োগের ক্ষমতা-সম্পন্ন শাসনকে বুঝায়। এরূপ সংগঠন ছাড়াও সামাজিক

১. পলিটিক্স : পুস্তক ১, অধ্যায় ২
২. পলিটিক্স : পুস্তক ১, অধ্যায় ২

জীবন মানুষ হয়ত এক সময়ে যাপন করেছে। কারণ রাষ্ট্র বলতে বিভিন্ন বিভাগে সংগঠিত যে শাসন-ব্যবস্থা বুঝায় সেরূপ জটিল সংগঠন প্রকৃতির উপর এককালে একান্তভাবে নির্ভরশীল অসহায় মানুষের বিকাশ প্রক্রিয়ার আদিতে ছিল, এরূপ কল্পনা করা চলে না। তাছাড়া রাষ্ট্র বলতে যেরূপ জবরদস্তিসূচক একটি ব্যবস্থা বুঝায়, অন্তত যে কোন রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দু যেখানে জবরদস্তি, সেখানে বিকাশমান মানুষ তার জীবনের ভবিষ্যতে কোন পর্যায়ে জবরদস্তি ব্যতিরেকে যুক্তির ভিত্তিতে পরস্পরের সঙ্গে যৌথ সামাজিক জীবন যাপন করতে পারবে না, এমনও কল্পনা করার কারণ নেই।

কিন্তু বড় কথা এই নয় যে, এ্যারিস্টট্‌ল সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দিষ্ট করেন নি। বড় কথা এই যে, এ্যারিস্টট্‌ল সঠিকভাবে চিহ্নিত করেছেন যে, সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক হচ্ছে একটি দ্বৈত সম্পর্ক যেখানে সমাজ যেমন অনিবার্য, তেমনি সে মানুষের সক্রিয় উদ্যোগেরও সৃষ্টি। সে যেমন প্রাকৃতিক, তেমনি সে মানবিক। প্রকৃতি যেমন তাকে তৈরি করে, সেও প্রকৃতিকে তেমনি তৈরি করে।

সমাজ এবং রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে এরূপ সামগ্রিক চেতনার আভাস দানে এ্যারিস্টট্‌ল প্রাচীন ইতিহাসের এক অনন্য সমাজবিজ্ঞানী।

এ্যারিস্টট্‌লের 'পলিটিকস্' পাঠে আমরা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা অনুধাবনে তাঁর আর একটি অন্তর্ভেদী দৃষ্টির পরিচয় পাই। মানুষের সামাজিক জীবনের মূল যে তার জীবনধারণের চেষ্টা তথা তার অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, এ কথা এ্যারিস্টট্‌ল স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। 'পলিটিক্স'-এর প্রথম পুস্তকের নবম অধ্যায়ে এ্যারিস্টট্‌ল অর্থনৈতিক বিকাশের মূল সূত্রকে অনবদ্য সরলতায় বর্ণনা করেছেন। কেবল তাই নয়। মানুষের তৈরি জটিল রাষ্ট্র সংগঠনের শাসনব্যবস্থা তথা তার অদল-বদল, তার উত্থান পতন, তার ভিতরের বিদ্রোহ-বিপ্লব যে নিগূঢ়ভাবে রাষ্ট্রের মানুষের মধ্যে আর্থিক সম্পদের ভিত্তিতে বিভক্ত বিভিন্ন শ্রেণির আর্থিক অবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত, এ সত্যও এ্যারিস্টট্‌ল তাঁর আলোচনায় বিভিন্ন সময়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে অস্থিরতা এবং পরিবর্তনের মূল কারণ নির্দিষ্ট করে এ্যারিস্টট্‌ল বলেছেন : বিপ্লবের মূল কারণ হচ্ছে সাম্য এবং অসাম্যবোধ তথা অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং সাম্য অবস্থা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। শাসনব্যবস্থার প্রকারভেদ সম্পর্কে সুবিস্তারিত আলোচনা আছে 'পলিটিক্স'-এ। 'রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং পলিটি'—এ্যারিস্টট্‌ল-এর এমন শ্রেণিবিভাগ প্রাচীনকালের প্রচলিত শাসনব্যবস্থার শ্রেণিবিভাগের স্বীকৃতি হলেও শাসনব্যবস্থার এমন বিস্তারিত আলোচনা অপর কোন চিন্তাবিদের মধ্যে দুর্লভ। এবং শাসনব্যবস্থার এই শ্রেণিবিভাগের ক্ষেত্রেও এ্যারিস্টট্‌ল গুরুত্ব দিয়েছেন শাসকের সংখ্যার স্বল্পতা কিংবা আধিক্যের উপর নয়। এ্যারিস্টট্‌ল গুরুত্ব দিয়েছেন শাসকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। তাই গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এ্যারিস্টট্‌ল বলেছেন : 'গণ' তথা 'ডিমস' (Demos) সংখ্যায় যেমন অধিক, তেমনি তারা দরিদ্র। তাই 'গণতন্ত্র' বললে 'দরিদ্রদের শাসন' বুঝাই সঙ্গত। এমন যদি হয় যে একটি রাষ্ট্রে দরিদ্রের সংখ্যা কম, কিন্তু তারাই তার শাসক, তাহলে এ শাসনকে শাসকের সংখ্যাল্পতার কারণে 'কতিপয়তন্ত্র' বলে আখ্যায়িত যদিচ করা হয়, কিন্তু একে শাসকদের অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে যথার্থই 'গণতন্ত্র' বলে আখ্যায়িত করা উচিত। এবং অনুরূপভাবে

অর্থবানরা যদি সংখ্যায় অধিক হয় এবং তারাই শাসক হয় তাহলে এমন শাসনকে সংখ্যার কারণে গণতন্ত্র না বলে ধনতন্ত্র বলাই সঙ্গত। এ্যারিস্টট্‌লের নিজের কথায় :

> "মনে করা যাক একটি নগরীতে এক হাজার তিনশত নাগরিক আছে। এদের মধ্যে এক হাজার জন ধনবান। এবং শাসনের ক্ষেত্রে অপর তিনশত জন দরিদ্রের কোন অংশ নাই। এ তিনশত জনও স্বাধীন নাগরিক। অপরদের সঙ্গে ধনের ক্ষেত্র ব্যতীত তারা সমান। এমন ক্ষেত্রে কারুর বলা উচিত নয় যে তেরশতের এই নগরীর ব্যবস্থা হচ্ছে গণতান্ত্রিক। অপরদিকে মনে করা যাক, যারা দরিদ্র তারা সংখ্যায় অল্প। তথাপি তারা শাসনক্ষমতা দখল করেছে এবং সংখ্যায় অধিক যে ধনবান তাদের উপর শাসন করছে। এমন ক্ষেত্রেও ধনবানদের যদি শাসনে আদৌ কোন অংশ দেওয়া না হয়, তাহলে এ ব্যবস্থাকেও কতিপয়তন্ত্র বলা সঙ্গত হবে না। আমাদের বরঞ্চ এ কথা বলাই সঙ্গত যে, দরিদ্রগণ যেখানে সার্বভৌম সেখানকার ব্যবস্থা হচ্ছে, গণতন্ত্র এবং ধনবানগণ যেখানে সার্বভৌম সেখানকার ব্যবস্থা হচ্ছে 'কতিপয়তন্ত্র'। অবশ্য বাস্তবে যে বিষয়টিকে আমরা দেখি, সে হচ্ছে এই যে, দরিদ্রগণ সংখ্যায় অধিক এবং ধনিকগণ সংখ্যায় অল্প। অধিক হচ্ছে দরিদ্র, অল্প হচ্ছে ধনিক।[১]... কাজেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হবে সেটি যেখানে স্বাধীন নাগরিকদের মধ্যে যারা দরিদ্র তারা তাদের সংখ্যার আধিক্যের শক্তিতে নগরীর সরকার পরিচালনা করে এবং কতিপয়তন্ত্র হচ্ছে সেই ব্যবস্থা যেখানে সংখ্যাল্প ধনিক এবং অভিজাতদের হাতে সরকার পরিচালনা ন্যস্ত থাকে।[২]

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এ্যারিস্টট্‌লের কালজয়ী অবদানের মধ্যে আইনের শাসনের উপর তাঁর গুরুত্ব প্রদানকে অন্যতম অবদান বলে বিবেচনা করেন। এ মূল্যায়নটি যথার্থ। কোন্ শাসন উত্তম, এ আলোচনাও 'পলিটিক্‌স'-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। একের শাসন, কতিপয়ের শাসন, না বহুর শাসন? প্রথমে এ্যারিস্টট্‌ল এরূপ বিভিন্ন প্রকার শাসনের গুণাগুণের আলোচনা করেছেন। কিন্তু অন্তিমে তিনি বলেছেন যে, এক, কতিপয় কিংবা বহুজন–এরা জ্ঞানী, গুণী, মহানুভব যাই হোক না কেন, এরা ব্যক্তি। এবং এক, কতিপয় কিংবা বহুকে যদি রাষ্ট্রে সার্বভৌম বলা হয়, তাহলে তা হবে ব্যক্তির সার্বভৌমত্ব। কিন্তু রাষ্ট্রে সার্বভৌম শক্তি হওয়া উচিত আইনের, ব্যক্তির নয়। কারণ, ব্যক্তির মধ্যে আবেগ, ইচ্ছা, অনিচ্ছা আছে। ব্যক্তির শাসন হচ্ছে আবেগের তথা প্রবৃত্তির শাসন। কিন্তু আইনের শাসন মানে যুক্তির শাসন। এ্যারিস্টট্‌লের এই যুক্তি মানুষের রাষ্ট্রবদ্ধ জীবনের এক চিরন্তন লক্ষ্যকে নির্দিষ্ট করেছে। রাষ্ট্র নির্বিশেষে আধুনিক মানুষের নিত্যদিনের সংগ্রাম হচ্ছে ব্যক্তি বনাম আইনের শাসনের সংগ্রাম। মানুষের রাষ্ট্রীয় জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে ক্রমাধিক পরিমাণে ব্যক্তির শাসনের স্থলে আইনের শাসনের প্রতিষ্ঠা।

> "...ন্যায়ের দাবী হচ্ছে, শাসিত হওয়ার পরিমাণের চেয়ে অধিকতর শাসক কেউ হবে না। শাসনের ক্ষেত্রে পালাক্রমে সকলেরই সুযোগ থাকতে হবে।... পালাক্রমে শাসনের কথা হচ্ছে আইনের কথা। এ থেকে আমরা বলতে পারি : আইনের শাসনই অধিকতর কাম্য, কোন একজন নাগরিকের শাসন নয়।...কাজেই যিনি বলেন,

....

১. পলিটিক্‌স : পুস্তক ৪, অধ্যায় ৪

২. পলিটিক্‌স : পুস্তক ৪, অধ্যায় ৪

> আইনের শাসন করা উচিত, তিনি দেবতা এবং যুক্তিকেই শাসক হতে বলেন, অপর কাউকে নয়। কিন্তু যিনি কোন মানুষকে শাসক বানাতে চান, তিনি তার দ্বারা একটি বন্য জন্তুকেই আমন্ত্রণ করে আনেন। কারণ মানুষের প্রকৃতি বন্য জন্তুর মত। প্রবল আবেগ শাসক এবং মানুষের মধ্যে সর্বোত্তমকে পর্যন্ত ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। কিন্তু আইনের মধ্যে আবেগশূন্য যুক্তির অধিষ্ঠান।[১]...
>
> ...আইন যেখানে শাসন করে না সেখানে কোন শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকে না। সকলের উপরই আইনের শাসন থাকা আবশ্যক।[২]

এ্যারিস্টট্‌ল যে একটি বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে রাষ্ট্রের সকল রোগব্যাধি তথা সমস্যাকে পর্যবেক্ষণ করার প্রয়াস পেয়েছেন এ সত্য তাঁর বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্ব এবং পরিবর্তনের আলোচনাতে সমধিক প্রকাশিত হয়েছে। সংবিধান বা শাসনব্যবস্থার প্রকারভেদ আছে। কিন্তু যে কোন শাসনব্যবস্থারই তো ইচ্ছা হচ্ছে টিকে থাকার। সেদিক থেকে যে কোন শাসনব্যবস্থা কি প্রকারে অধিকতর দীর্ঘ জীবন লাভ করতে পারে, তাই হচ্ছে প্রকার নির্বিশেষে সকল শাসনব্যবস্থা এবং তার শাসকদের উদ্বেগের বিষয়। চিকিৎসকের সন্তান এ্যারিস্টট্‌ল এক্ষেত্রে চিকিৎসকের একটি নিরাবেগ এবং নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে প্রত্যেক প্রকার শাসনব্যবস্থার মধ্যকার বিকার তথা অস্থিরতা এবং বিদ্রোহ-বিপ্লব-পরিবর্তনের মূল কারণ চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছেন। এবং চিকিৎসক যেমন রোগের 'ভাল-মন্দ' বিচার না করে তাঁর সহজ-কঠিন প্রত্যেক প্রকার রুগীর রোগের নিরাময়পত্র দান করেন, একেবারে অনুরূপভাবে এ্যারিস্টট্‌ল রাজতন্ত্র, কতিপয়তন্ত্র কিংবা গণতন্ত্র, প্রত্যেক প্রকার শাসনব্যবস্থার অস্থিরতা ও বিপ্লবের কারণ নির্দেশ করেছেন। তাঁর নির্দিষ্ট কারণসমূহ কেবল প্রাচীন গ্রীসের রাষ্ট্রসমূহের বিশিষ্টতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। সে সকল কারণ আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনের বিদ্রোহ-বিপ্লবেও প্রকৃষ্টভাবে কার্যরত।

এ্যারিস্টট্‌লের পলিটিক্‌স-এর পঞ্চম পুস্তকের পুরো আলোচনাটি ব্যয়িত হয়েছে রাষ্ট্রে অস্থিরতা তথা বিপ্লবের বিশ্লেষণের উপর। এটিকে যথার্থভাবে এ্যারিস্টট্‌লের 'বিপ্লবতত্ত্ব' বলে অভিহিত করা চলে। রাষ্ট্রে যে কোন-প্রকার পরিবর্তন এবং অস্থিরতার এমন সূক্ষ্ম এবং বিস্তারিত আলোচনা কেবল প্রাচীনকালের ক্ষেত্রে নয়, আধুনিককালেও বিরল।

এ সমস্যার আলোচনা শুরু করতে গিয়ে এ্যারিস্টট্‌ল কাল নির্বিশেষে মানুষের জীবনে প্রবহমান বোধের প্রকাশ করে বলেন :

> "রাষ্ট্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের মূলে সাধারণ কারণ হচ্ছে অসাম্য। কারণ, মানুষ যাকে ন্যায়সঙ্গত এবং সমান বলে বিবেচনা করে তার ভিত্তিতে তারা বিভক্ত হয়ে পড়ে। দুই রকম সমতা আছে। এর একটি হচ্ছে সংখ্যাগত সমতা। অপরটি হচ্ছে মান তথা গুণগত সমতা।[৩]...

কেবল যে শ্রেণিগত বা রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অসাম্য বিপ্লবের উৎস হিসাবে কাজ করে, তাই নয়। স্থায়ীভাবে একই রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে

১. পলিটিক্‌স : পুস্তক ৩, অধ্যায় ১৬
২. পলিটিক্‌স : পুস্তক ৪, অধ্যায় ৫
৩. পলিটিক্‌স : পুস্তক ৫, অধ্যায় ১

যদি উন্নতির বৈষম্য ঘটে তবে সে বৈষম্যও যে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণ হতে পারে তারও অতি স্পষ্ট আভাস দিয়ে এ্যারিস্টটল বলেন :

> "অনেক সময়ে ভৌগোলিক কারণেও অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। রাষ্ট্রের ভৌগোলিক বিন্যাস রাষ্ট্রের ঐক্যের অনুকূল না হতে পারে।... এ কথা আমরা জানি, যুদ্ধের মধ্যে অনেক সময়ে নদী কিংবা অপর কোন জলস্রোত পারাপারের কারণে সৈন্যরা বিভক্ত হয়ে পড়ে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও সেরূপ বিভিন্নতা থেকে বিভাগের সৃষ্টি হয়।[১]...

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে বিষম গঠনে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং তার ঐতিহাসিক পরিণাম যে এ্যারিস্টট্‌লের এই বিশ্লেষণের একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কোন সমাজের মানুষের মধ্যকার অসাম্য যে কিরূপ বিসদৃশ হতে পারে তার অনবদ্য প্রকাশ দেখা যায় এ্যারিস্টট্‌লের নিম্নোক্ত ব্যাখ্যাটিতে :

> "... সমাজের অপর অংশের তুলনায় বিষম বিকাশ কিভাবে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের কারণ হতে পারে তার দৃষ্টান্ত আমাদের দেহের সঙ্গে তুলনাক্রমে দেওয়া চলে। দেহ বিভিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত এবং যাতে সমগ্রের উপযুক্ত ভারসাম্য বিনষ্ট হতে না পারে এবং দেহ বিকল হয়ে না যেতে পারে সেজন্য সকল অংশের বৃদ্ধিকেই আনুপাতিক হতে হয়। বিষম অবস্থা দাঁড়ায় তখন, যখন একফুট উঁচু দেহতে এক গজ লম্বা পা গজিয়ে যায় কিংবা দেহের কোন অংশে মানুষের পশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উদ্ভূত হতে থাকে।[২]

এ্যারিস্টট্‌ল রাষ্ট্রীয় জীবনের পরিবর্তনকে অস্বীকার করেন নি। বরঞ্চ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বিকাশ এবং পরিবর্তন যে প্রকৃতির মতোই প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক তা 'পলিটিক্স'-এর আলোচনাতে স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু শাসক বা শাসনব্যবস্থার মানবিক অপর এক স্বভাবও যে পরিবর্তনকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করার, তাও তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী তথা 'রাষ্ট্র-চিকিৎসক' সিহাবে স্বীকার করেছেন। এবং প্রত্যেক ব্যবস্থার বিকারের নিরাময়ের জন্য তিনি নিরাময়পত্র প্রদান করেছেন। কোন চিকিৎসকই মনে করেন না, তাঁর রোগী অমর কিংবা তাঁর নিরাময়পত্র তাঁর রোগীর রোগকে চিরতরে নির্মূল করবে। এ কেবল রোগীর বেঁচে থাকার প্রয়াসে সাহায্য করা। একই কথা এ্যারিস্টট্‌লের ক্ষেত্রে সত্য। এমন যে স্বৈরতন্ত্র, যে-শাসনব্যবস্থা সবচাইতে বেশি রোগগ্রস্ত, ব্যক্তি-কেন্দ্রিক, আইনবিহীন এবং অনিবার্যভাবে স্বল্পায়ু তার ক্ষেত্রেও এ্যারিস্টট্‌ল নিরাময়পত্র প্রদান করেছেন। তাঁর সে নিরাময়পত্র পাঠে পাঠকমাত্রের মনে যেমন কৌতুক রসের সৃষ্টি হয়, তেমনি তা রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এ্যারিস্টট্‌লের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির পরিচয় প্রকাশ করে। স্বৈরশাসক জ্ঞানীগুণীকে বরদাস্ত করে না। তাদের সকলকে সে নির্বাসিত করে; ঘরে ঘরে সে গুপ্তচর বপন করে; সভা-সম্মেলন অর্থাৎ নাগরিকদের মধ্যে চিন্তার আদান-প্রদানকে নিষিদ্ধ করে এবং নাগরিকদের সর্বদা সে এমন আর্থিক দৈন্যে এবং সর্বগ্রাসী পরিশ্রমে আবদ্ধ রাখে যেন তারা নিজেদের ক্ষুন্নিবৃত্তির বাইরে শাসন এবং শাসকের বিষয়ে কোন চিন্তা করতে এবং তাঁর প্রকাশ ঘটাতে সক্ষম না হয়।

---

২. পলিটিক্স : পুস্তক ৫, অধ্যায় ৪

৩. পলিটিক্স : পুস্তক ৫, অধ্যায় ৩

"স্বৈরশাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার দুটি উপায় বা নীতির কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। উপায় দুটি বিভিন্ন। আমি বরঞ্চ প্রথমে সনাতন উপায়টি নিয়েই আলোচনা করব। কারণ, শাসনের এই নীতিটি অধিক সংখ্যক স্বৈরশাসকই অনুসরণ করেছে। করিন্থ-এর পেরিয়ানডার নাকি এর প্রয়োগের বেশ কিছু কৌশল প্রবর্তন করেছিলেন। তবে পারস্য-সরকারের নিকট থেকেও এর অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এখানেই আমরা স্বৈরশাসনকে রক্ষা করার পুরাতন সকল কৌশলের ইঙ্গিত পাই। এদের অন্তর্গত নীতিমালাগুলো হচ্ছে এরূপ : 'মাথাগুলোকে ছেঁটে ফেল এবং স্বাধীনচেতাদের সরিয়ে দাও' এবং সামাজিক বা সাংস্কৃতিক কোন উপলক্ষে সম্মেলন বা সমিতিতে জনতাকে মিলিত হতে দিও না। কারণ এই স্থানগুলো স্বাধীনচিত্ততা এবং আত্মবিশ্বাসের জন্মকেন্দ্র এবং এ দুটি ব্যাপারেই স্বৈরশাসককে সতর্ক থাকতে হবে। বিদ্যালয় বা শিক্ষালাভের প্রতিষ্ঠানও তৈরি হতে দিও না এবং এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করো যেন প্রজাবৃন্দ পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে জ্ঞাত হতে না পারে। কারণ, পরিচয়ের ভিত্তিতেই তারা আত্মবিশ্বাস তৈরি করে। স্বৈরশাসকের জন্য আর একটি সনাতন উপদেশের কথাও শোনা যায়। এর দ্বারা স্বৈরশাসককে বলা হয় যেন সে নগরবাসীদের সর্বদা নিজদের নজরের মধ্যে রাখে এবং তাদের সময়ের সিংহভাগ যেন তারা স্বৈরশাসকের প্রাসাদের দ্বারে অতিবাহিত করে। ...অনুরূপভাবে স্বৈরশাসকের উচিত হবে তার প্রজাবৃন্দ কি বলছে কিংবা করছে তার প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার চেষ্টা করা।...আর একটি সনাতন উপায় হচ্ছে স্বৈরশাসনের সম্ভাব্য সকল বিরোধীদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দেওয়া। এমন কলহ সৃষ্টির উপায় হচ্ছে বন্ধুর বিরুদ্ধে বন্ধুকে লাগিয়ে দেওয়া, শ্রেনির বিরুদ্ধে শ্রেনিকে এবং এক অর্থবানকে অপর অর্থবানের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা।...স্বৈরশাসকের আর একটি প্রবণতা হচ্ছে যুদ্ধ করার প্রবণতা। যুদ্ধ করার জন্য সর্বদাই সে প্রস্তুত। এর কারণ, যুদ্ধ হলে প্রজাবৃন্দ যুদ্ধের মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং তাদের একজন নেতা আবশ্যক, এই বোধ তাদের আচ্ছন্ন করে রাখে।...স্বৈরশাসকের নীতির একটি অংশ হচ্ছে অপর সকলের চাইতে সুহৃদদের অধিকতর বিপজ্জনক মনে করে তাদের অবিশ্বাস করা।...এগুলি হচ্ছে স্বৈরশাসনের লক্ষণ এবং এভাবেই স্বৈরশাসন বহাল থাকার চেষ্টা করে। এর বাইরেও নানা উপায় আছে এবং সেগুলিও একইভাবে নিন্দনীয়"।[১]...

এ্যারিস্টট্‌লের এমন বিশ্লেষণ আধুনিক কালের ক্ষুদ্রবৃহৎ কোন রাষ্ট্রের নাগরিকের কাছে কি ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে? কিন্তু বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতার দিক এই যে, এমন রোগীর উদ্দেশে এ্যারিস্টট্‌লের অভিমত হচ্ছে : তোমার অনুসৃত নীতিতে তোমার জীবনকাল অধিকতর হ্রাস বৈ দীর্ঘ হবে না। তার চাইতে বরঞ্চ তুমি কিছুটা মহানুভব হওয়ার চেষ্টা কর; নাগরিকদের সহায়-সম্পত্তিকে এবং মেয়েদের সম্মানকে নিরাপদ করার প্রতিশ্রুতি দাও এবং জীবনযাত্রায় মিতাচারী হওয়ার উদ্যম নাও। তাতে তোমার জীবন-আয়ু কিছুটা দীর্ঘতর হতে পারবে।

....

১. পলিটিক্স : পুস্তক ৫, অধ্যায় ১১

স্বৈরতন্ত্রের অনুসৃত নীতিসমূহের যে বিস্তারিত উল্লেখ এ্যারিস্টট্‌ল করেছেন তা তার প্রায় সমকালীন ভারতীয় কুটনীতিজ্ঞ রাষ্ট্রশাসক কৌটিল্যের[১] কথা সহজেই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'র মধ্যেও শাসকের করণীয় সম্পর্কে সুবিস্তারিত নির্দেশ পাওয়া যায়।

যথার্থভাবেই এ্যারিস্টট্‌লের মত কালজয়ী চিন্তাবিদগণ অমর। আমরা যদিচ তাঁদের দৈহিক মৃত্যুর তারিখ উল্লেখ করি, কিন্তু তাঁদের চিন্তার মৃত্যু ঘটে না। এবং সে কারণে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে এ্যারিস্টট্‌লের শাশ্বত সত্যের উল্লেখকালে আমরা বলিনে, 'এ্যারিস্টট্‌ল এ কথা বলেছিলেন।' আমরা বলি, 'এ্যারিস্টট্‌ল এ কথা বলেন।' আমাদের এরূপ উল্লেখ স্বাভাবিক।

কিন্তু কালজয়ী চরিত্রের আর এক বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা কেবল যে কাল থেকে কাল অতিক্রম করে অগ্রসর হন, তাই নয়। তাঁরা কেবল যে প্রত্যেককালের মানুষকে প্রভাবিত করেন তাই নয়। প্রত্যেক কাল দ্বারা তাঁরা নিজেরাও প্রভাবিত হন। সমাজ-জীবনে সক্রিয় মানুষদের দ্বারা তাঁরা নিজেরাও প্রভাবিত হন। সমাজ-জীবনে সক্রিয় মানুষদের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। তারা পরস্পরের উপর ক্রিয়াশীল হয়। তারা পরস্পরকে প্রভাবিত করে। এ্যারিস্টট্‌লের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। প্রাচীন গ্রীসে এ্যারিস্টট্‌ল একভাবে গৃহীত হয়েছেন। যে-এথেন্সে তিনি নিজের শিক্ষালাভ এবং শিক্ষাদানের জীবন অতিবাহিত করেছেন, নিজের জীবনের আশঙ্কায় সেই এথেন্সকে মৃত্যুর একবছর পূর্বে তাঁকে পরিত্যাগ করে যেতে হয়। ইউরোপের নিরঙ্কুশ ধর্মান্ধতার যুগে বিস্মৃতির হাত থেকে সৃজনশীলভাবে এবং সযত্নে এ্যারিস্টট্‌লকে রক্ষা করেন আরবীয় পণ্ডিতগণ। পরবর্তীকালে ইউরোপের খ্রিস্টীয় গোঁড়া পাদ্রীকুল যে-এ্যারিস্টট্‌লকে এককালে পরিত্যাজ্য, অপাঠ্য বলে ঘোষণা করেছেন, আর এক যুগে ধর্মীয় সেই পণ্ডিতবর্গ সেই এ্যারিস্টট্‌লের উচ্চারিত সত্যসমূহকে তাঁদের দেয় ব্যাখ্যা সহকারে অলঙ্ঘনীয় বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের ব্যাখ্যাত এ্যারিস্টট্‌লকে কেউ অমান্য এবং অস্বীকার করলে তাকে তাঁরা পাপী বলে অভিযুক্ত এবং বিচার করেছেন। আবার পুনর্জাগরিত ইউরোপের জ্ঞানান্বেষী ব্যক্তিবর্গের নিকট এ্যারিস্টট্‌ল জ্ঞানের নতুনতর প্রেরণার উৎস বলে বিবেচিত হয়েছেন। এমনিভাবে এ্যারিস্টট্‌ল কাল থেকে কালকে এবং দেশ থেকে দেশকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়ে আমাদের কালে এবং আমাদের দেশে এসে পৌঁছেছেন। সেদিক থেকে দেখলে, এ্যারিস্টট্‌লকে অনিঃশেষ বিস্ময়ের এক আকর বলে বোধ হয়। এবং এ কারণেই আজ থেকে প্রায় চব্বিশ শত বছর পূর্বে রচিত এ্যারিস্টট্‌লের 'পলিটিক্‌স' আধুনিক জগতের সকল দেশের জ্ঞানান্বেষীর চিন্তার ক্ষেত্রে নিত্যসঙ্গী হিসাবে বিরাজ করছে।

এ্যারিস্টট্‌ল একদিকে যেমন কালজয়ী তেমনি অপরদিকে তিনি তাঁর দেশ ও কাল দ্বারা সীমাবদ্ধ। তাঁর চিন্তার ক্ষেত্রে এমন উপাদানের সাক্ষাৎ পাওয়া কষ্টকর নয় যে উপাদান তাঁর এই কাল ও দেশ-সম্পর্কের পরিচয়ের চিহ্নে চিহ্নিত। এ্যারিস্টট্‌লের জীবনকাল হচ্ছে মানুষের

---

১. কৌটিল্য বা চানক্য প্রাচীনকালের ভারত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজসভার অন্যতম রাজনীতিক ও মন্ত্রজ্ঞ ছিলেন। সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল নির্দিষ্ট হয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ৩২২-২৯৮ অব্দ অবধি। 'অর্থশাস্ত্র' প্রণয়নের তারিখ সুনিশ্চিতভাবে নিরূপণ করা যায় নি।

ঐতিহাসিক জীবনের সেই দেশের সেই কাল যখন তার সমাজের বিকাশ দাসযুগকে পুরোপুরি অতিক্রম করে তার পরবর্তী এবং অধিকতর উন্নতকালে প্রবেশ করে নি। তারই স্বাক্ষর পাওয়া যায় এ্যারিস্টট্লের দাসত্বের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শনে। এ্যারিস্টট্লের সময়ে যে দাসত্বের বিরুদ্ধে অগ্রসর চিন্তাবিদদের সমালোচনামূলক বক্তব্য উপস্থিত হতে শুরু করে নি, তা নয়। কিন্তু এ্যারিস্টট্ল তাঁর আর্থিক এবং সমাজগত অবস্থানে ছিলেন প্রচলিত সমাজের সমাজপতিদের অন্তর্গত। চিকিৎসকের সন্তান হলেও এ্যারিস্টট্ল ছিলেন রাজার চিকিৎসকের সন্তান। পণ্ডিত হলেও এ্যারিস্টট্ল ছিলেন প্রধানত দাসদের শ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত এথেন্সের শাসন ও সভ্যতারই পণ্ডিত এবং চিন্তাবিদ। তাই এ্যারিস্টট্লের নিজের তত্ত্বমতেই প্রতিষ্ঠিত সেই সমাজ ও শাসনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা হচ্ছে তার শাসক ও প্রধানদের পক্ষে স্বাভাবিক। এ্যারিস্টট্লের মত পণ্ডিতের পক্ষে দাসত্বের সমর্থনে যুক্তি প্রদানকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমাদের দেখা আবশ্যক। দেখা আবশ্যক দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে। এবং এদিক থেকে দেখলে এই দুর্বলতাকে আর অস্বাভাবিক ভাবার কারণ থাকে না। কালজয়ী চিন্তাবিদ মানে এই নয় যে, কালজয়ী চিন্তাবিদ তাঁর জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তাঁর কালকে জয় করেছেন, তাকে অতিক্রম করেছেন। সর্বক্ষেত্রেই যিনি এরূপ জয় করতে পারেন, তিনি আর মানবিক থাকেন না। মানুষ সেই মানুষকে নিয়েই গর্ববোধ করতে চায় যে-মানুষ নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কোন কোন ক্ষেত্রে নিজের সচেতন চেষ্টায় তাঁর দেশ ও কালের সীমাকে অতিক্রম করে মানুষের অসীম দিগন্ত বিস্তারি বিকাশমান জীবনকে দূরের দৃষ্টি দিয়ে দেখার চেষ্টা করেন। তাঁর এই দৃষ্টিই তাঁর উত্তরপুরুষকে নিজের কালকে অতিক্রম করার চেষ্টায় অনুপ্রাণিত করে।

এ্যারিস্টট্লের 'পলিটিক্স'-এর সবিস্তার ব্যাখ্যা দেওয়া এই স্বল্প পরিসর ভূমিকার উদ্দেশ্য নয়। এ্যারিস্টট্লের 'পলিটিক্স'-কে সহজভাবে পাঠ্য হিসাবে বাংলাভাষার পাঠকদের সামনে উপস্থিত করাই বর্তমান অনুবাদ প্রয়াসের লক্ষ্য। বর্তমান অনুবাদকে অনুবাদক যথাসাধ্য প্রাঞ্জল করার চেষ্টা করেছেন। অনুবাদের মূল ভিত্তি পেঙ্গুইন প্রকাশনার মাধ্যমে ১৯৬২ সনে প্রকাশিত এ. এ. সিনক্লেয়ার-কৃত এ্যারিস্টট্লের 'পলিটিক্স'-এর ইংরেজি অনুবাদ। 'পলিটিক্স'-এ আলোচিত বিষয়ের সহজ অনুধাবনের জন্য অনুবাদের শেষে পরিশিষ্ট হিসেবে 'পলিটিক্স'-এর একটি সারসংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া অনুবাদের মাঝে প্রয়োজনবোধে ব্যাখ্যামূলক দু'একটি বক্তব্য তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে। তৃতীয় বন্ধনীর এমন বক্তব্যেরও প্রধান নির্ভর টি. এ. নিসক্লেয়ারের বক্তব্য। অনুবাদে যে 'পুস্তক এবং অধ্যায় ক্রম' উল্লেখ এবং অনুসরণ করা হয়েছে তা সুপরিচিত সকল ইংরেজি অনুবাদেই দেখা যায়। ফলে বর্তমান বাংলা অনুবাদের কোন অংশকে 'পলিটিক্স'-এর যে কোন ইংরেজি অনুবাদের মধ্যে নির্দিষ্ট করতে কোন অসুবিধা হবে না।

এ্যারিস্টট্লের 'পলিটিক্স'-এর র্বতমান বাংলা অনুবাদ বেশ কয়েক বছরের ধারাবাহিক চেষ্টার মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় পশ্চিমবঙ্গে ইতিপূর্বে 'পলিটিক্স'-এর আর দু'খানি বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান অনুবাদক তা জ্ঞাত আছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এমন অনুবাদ বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রী ও পাঠক সমাজের বুদ্ধিগত চাহিদার যথার্থ যোগান দিতে পারে না, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাছাড়া প্লেটোর

'রিপাবলিক' বা এ্যারিস্টট্‌লের 'পলিটিক্‌স'-এর ন্যায় চিরায়ত সৃষ্টির অনুবাদ ও ভাষান্তর যত অধিক হাতে সাধিত হয় ততই সেই ভাষার সমৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটে। প্রত্যেকটি অনুবাদই অনুবাদকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বহন করে। এ দিক থেকে চিরায়ত সৃষ্টির কোন একটি অনুবাদই অপর অনুবাদের স্থান দখল করতে পারে না। কোন অনুবাদই বাহুল্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। কোন দুটি অনুবাদই এক নয়। একই গুণ ও বৈশিষ্ট্যে তারা মণ্ডিত নয়।

এ্যারিস্টট্‌লের 'পলিটিক্‌স'-এর বাংলা অনুবাদের পেছনে আমার স্নেহভাজন জানা-অজানা, চেনা-অচেনা তরুণ ছাত্র-ছাত্রীদের আগ্রহ এবং দাবী যেমন প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে, তেমনি সহকর্মী শিক্ষক এবং সাহিত্যানুরাগীদের উৎসাহ দানও অব্যাহত রয়েছে। তাঁদের সকলের নিকট আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থ সংস্থা এবং সুহৃদবর অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীসহ এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত শিক্ষাবিদ এবং কর্মীবৃন্দের সাগ্রহ সহযোগিতা ব্যতিরেকে এ্যারিস্টট্‌লের 'পলিটিক্‌স'-এর বর্তমান বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হতে অনির্দিষ্টকালের বিলম্ব ঘটত। এ কথারও উল্লেখ আবশ্যক। আমি তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা এবং তার সকল কর্মীদের কাছে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ডানা প্রিন্টার্স-এর কর্মীবৃন্দ যত্ন সহকারে আমার পাণ্ডুলিপি মুদ্রণ করেছেন। তাঁরাও আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন।

বর্তমান অনুবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে ছাত্রছাত্রী এবং অন্যান্য পাঠকবৃন্দ তাঁদের মতামত জানালে সে মতামতকে অনুবাদক যেমন সাদরে গ্রহণ করবেন তেমনি তা পরবর্তী সংস্করণের অধিকতর উন্নতিতে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।...

সরদার ফজলুল করিম

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১ মে, ১৯৮৩

প্রথম পুস্তক

সূচনা

[এ্যারিস্টট্ল তাঁর এথিকস বা নীকিকথা থেকে রাষ্ট্রকথায় গমনের জন্য নিম্নোক্ত বক্তব্যটি 'এথিকস'-এর আলোচনা শেষে পেশ করেছেন।[১]]

আমাদের পূর্বগামীগণ আইন প্রণয়নের বিষয়টির উপর কোন অনুসন্ধান পরিচালিত করেন নি। এ কারণে এ কাজটি আমাদের নিজেদেরই করা আবশ্যক। বস্তুত পলিটিয়া বা সংবিধানের সমগ্র বিষয়টি নিয়েই আমাদের আলোচনা করা প্রয়োজন। তাহলেই মানুষ সংক্রান্ত আমাদের আলোচনা পূর্ণ হতে পারবে। অবশ্য আংশিকভাবে এ ক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের কেউ কেউ কিছু উত্তম কথা বলেছেন। আমাদের উচিত প্রথমে তাদের মূল্যায়ন করা। এর পরে আমার সংগৃহীত সংবিধানসমূহ নিয়ে আলোচনা করা যাবে। এর মাধ্যমে আমরা দেখতে পাব, কোন্ প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্র এবং সংবিধান ক্রিয়াশীল থাকে; কোন্ কোন্ কারণেই বা এগুলির জীবন প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া কোন রাষ্ট্র যে উত্তমরূপে শাসিত হয় এবং কোন রাষ্ট্রে যে উত্তম শাসনের অভাব ঘটে তার কারণ কি, তাও আমরা এ আলোচনায় দেখতে পাব। এ সমস্ত বিষয়ের আলোচনা যখন শেষ হবে তখন হয়ত আমরা অধিকতর সঠিকতার সঙ্গে বলতে পারব, কোন্ সংবিধান বা রাষ্ট্র সর্বোত্তম? সকল প্রকার রাষ্ট্রব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য কি? এদের প্রতিষ্ঠিত আইন এবং নীতিসমূহই বা কি?

---

১. T. A. Sinclair : Aristotle, The Politics, Penguin Books, 1969, P. 24

প্রথম অধ্যায়

রাষ্ট্রের সংজ্ঞা

আমাদের নিজেদের পর্যবেক্ষণ এরূপ সাক্ষ্য দেয় যে প্রত্যেকটি রাষ্ট্র হচ্ছে কোন উত্তম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষের সমবায়ে গঠিত একটি সংস্থা। আমি 'উত্তম' কথাটি ব্যবহার করেছি। কারণ মানুষ তাদের কর্মকাণ্ডে বস্তুত তাকেই সাধন করার চেষ্টা করে যাকে তারা উত্তম বলে বিবেচনা করে। এ থেকে এটা পরিষ্কার যে, সংস্থা মাত্রেরই লক্ষ্য যেখানে কোন উত্তমকে সাধন করা সেখানে যে সংস্থা সকল সংস্থার সেরা এবং অপর সকল সংস্থা যে সংস্থার অন্তর্ভুক্ত সে সংস্থার লক্ষ্যও হচ্ছে চরম উত্তমের সাধন। এরূপ সংস্থাকেই আমরা রাষ্ট্র বলে অভিহিত করি এবং এরূপ সংস্থাকেই আমরা রাজনৈতিক বলে বিবেচনা করি। অনেকে এরূপ মনে করেন যে, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে শাসক এবং শাসিতের মধ্যে, রাজা এবং প্রজার মধ্যে, পরিবারের কর্তা এবং পরিবারের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্যের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এরূপ ধারণা ভ্রান্ত। এদের মধ্যে আকারগত পার্থক্য অবশ্য বিদ্যমান। কিন্তু আকারগত পার্থক্যই একমাত্র পার্থক্য নয়। কিংবা আকারই এখানে বিচারের নিয়ামক নয়। কারণ, এরূপ আমরা বলতে পারিনে যে, লোকের সংখ্যা কয়েকটি হলে দাস-প্রভুর সম্পর্কটি তৈরি হয় এবং তার চেয়ে অধিক হলে পরিবারের সৃষ্টি হয় এবং তার চেয়েও অধিকে রাজা-প্রজার সম্পর্ক কিংবা বলা চলে একটি রাষ্ট্র-সংস্থার সৃষ্টি হয়ে যায়। এ থেকে ধারণাটি এই হয় যেন একটি বৃহৎ পরিবার এবং একটি ক্ষুদ্র নগর (রাষ্ট্র)—এ দু'এর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অথচ রাজা-প্রজার সম্পর্কটি যথার্থই পৃথক। এটি একটি রাজনৈতিক বা শাসনগত সম্পর্ক। এখানে একটি নাগরিক-সংস্থার পার্থক্য বিদ্যমান। একটি গুণগত পার্থক্যের অস্তিত্বকে এখানে আমাদের স্বীকার করতে হয়। এবং রাজকীয় বলতে একথা বলাই যথেষ্ট নয় যে, একের শাসন হলেই সম্পর্কটি রাজকীয় হয়ে যাবে। কিংবা এও যথেষ্ট নয় যে, আমাদের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নীতির ভিত্তিতে নাগরিকগণ পালাক্রমে সকলে শাসক এবং শাসিত হলেই সম্পর্কটির চরিত্র রাষ্ট্রনীতিক হয়ে দাঁড়াবে। আমার বক্তব্য এখনো স্পষ্ট নয়। কিন্তু বিশ্লেষণের যে পদ্ধতি আমরা নির্দিষ্ট করেছি তার ভিত্তিতে আমাদের আলোচ্য বিষয়টি পরীক্ষা করে দেখলে আমার বক্তব্যটি অবশ্যই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। আমরা সাধারণত কি করি? আমরা একটি যৌগিক বা মিশ্র বস্তুকে তার অন্তর্গত উপাদানে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করি। এই বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াটি নিয়ে আমরা অগ্রসর হতে থাকি এবং যতক্ষণ না তার অন্তর্গত উপবিভাগুলি নিঃশেষ করে তার মূল উপাদানে আমরা পৌঁছতে পারি ততক্ষণ বিশ্লেষণের কাজটি শেষ হল বলে আমরা মনে করিনে। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে যদি আমরা তার অন্তর্ভুক্ত উপাদানগুলিতে বিশ্লেষণ করি তাহলে অধিকতর উত্তমরূপে আমরা এর অংশগুলির পারস্পরিক পার্থক্য অনুধাবন করতে সক্ষম হব এবং এই উপাদানগুলির মধ্যে ক্রিয়াশীল কোন নিয়মকে স্থির করা যায় কিনা—সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও আমাদের পক্ষে তখন সহজতর হয়ে দাঁড়াবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপাদানের বিশ্লেষণ : পরিবারের প্রকৃতি

আমার মনে হয়, অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন তেমনি বর্তমান ক্ষেত্রেও আমরা যদি সূচনা থেকে কোন কিছুর বৃদ্ধিকে লক্ষ্য করার পদ্ধতি অনুসরণ করি তাহলে সর্বোত্তম ফল লাভ করতে পারব। বিষয়টির সর্বোত্তম উপলব্ধি তখন আমাদের পক্ষে সম্ভব হবে। এখানে প্রথম কথা হচ্ছে : এক যেখানে অপর ব্যতিরেকে নিষ্ফল, সেখানে উভয়কে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে হবে। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা বলতে পারি, জীবন সৃষ্টির জন্য স্ত্রী এবং পুরুষের মিলন অত্যাবশ্যক। কারণ জীবন সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই দুই-এর এক অপর ব্যতিরেকে নিষ্ফল। এবং এ মিলন যে কেবল অত্যাবশ্যক তাই নয়। এ মিলন অনিবার্য। এখানে কোন গত্যন্তর নেই। এটা প্রকৃতির বিধান। প্রজাতি সৃষ্টির জন্য মানুষ, পশু এবং উদ্ভিদ : সকলের মধ্যে প্রকৃতি মিলনের এই অনিবার্য কামনা বপন করে দিয়েছে। ঠিক অনুরূপভাবে শাসক এবং শাসিতের মিলনেরও আবশ্যকতা রয়েছে। শাসক-শাসিতের মিলনের লক্ষ্য হচ্ছে উভয়ের মঙ্গল সাধন। কারণ, শাসক এবং প্রভু কে? শাসক এবং প্রভু হচ্ছে সে, যে তার বুদ্ধির শক্তিতে প্রয়োজনীয়কে পূর্ব থেকে অনুমান করতে পারে। আবার শাসিত এবং দাস বলব আমরা তাকে যে তার দেহের শক্তিতে সেই প্রয়োজনকে নিষ্পন্ন করতে পারে। কাজেই শাসক এবং শাসিত, প্রভু এবং দাস—এ দুয়ের মধ্যে স্বার্থের সাযুজ্য যে বিদ্যমান, তা বুঝতে আমাদের কষ্ট হয় না।

প্রকৃতি স্ত্রী এবং দাস—এ দুয়ের মধ্যেও পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। কারণ, কর্ম থেকে কর্মের পার্থক্য প্রকৃতির স্বীকৃত পার্থক্য। ডেলফি দেবীর ছুরিকা বহুমুখী হতে পারে। কিন্তু প্রকৃতি মানুষকে বহুমুখী ডেলফি-ছুরিকা করে তৈরি করে নি। প্রতিটি কার্যের জন্য উপযুক্ত হাতিয়ার প্রকৃতি নির্মাণ করেছে। এবং এক্ষেত্রে প্রকৃতি অকৃপণভাবে হাতিয়ারের প্রকার সৃষ্টি করেছে। এবং এ কারণে প্রকৃতির বিধানে যার কর্ম যা, সেই মাত্র তাকে সর্বোত্তমরূপে সাধন করতে পারে। কাজেই কোন হাতিয়ারকে একাধিক কর্মে নয়, তার উপযুক্ত কর্ম সম্পাদনে নিযুক্ত করা শ্রেয়। নারী এবং দাস—এদেরও কর্মের বিভিন্নতা আছে। কিন্তু এমন সব অ-গ্রীসীয় সম্প্রদায় দৃষ্ট হয় যারা এ দুয়ের কর্মের ভিন্নতা উপলব্ধি করতে অক্ষম। তারা নারী এবং দাস—উভয়কে এক স্তরে নির্দিষ্ট করে। এর কারণ, এদের মধ্যে এমন কোন অংশকে আমরা পাইনে প্রকৃতি যাদেরকে শাসনের কিংবা আদেশ দানের ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছে। আসলে এদের সমাজ কেবল দাসের সমাজ : পুরুষ এবং নারী দাসের সমাজ। আর এ কারণেই আমাদের কবিরা বলেছেন : ' হেলেনীয়গণ বর্বরদের উপর প্রভুত্ব করবে, এটাই স্বাভাবিক'। কবিরা এখানে দাস এবং বর্বর—উভয়ের প্রকৃতিকে এক বলে গণ্য করেছেন।

এবার পরিবারের গঠনের কথায় আসা যাক। নারী এবং দাসদের কথা আমরা বলেছি।

নারী, এবং দাস, এবং পুরুষ—এই তিনের সমন্বয় বা মিলন যখন সংঘটিত হল, প্রথম পরিবার তখন সৃষ্ট হল। এবং এ কারণে কবি হিসিয়ড যখন বলেন : 'প্রথমে প্রয়োজনে একটি গৃহের এবং স্ত্রীর এবং লাঙ্গলটাকে টানার জন্য একটা বলদের' তখন তিনি সত্য কথাই বলেন। এখানে বলদই হচ্ছে দরিদ্র কৃষকের দাস। প্রকৃতির বিধানের ভিত্তিতে মানুষের এই সম্মিলন যখন কালের বুকে স্থায়িত্ব পেতে থাকে তখন পরিবারের উদ্ভব ঘটে। আইনদাতা চারোন্দাজ এই গৃহ কিংবা পরিবারের সদস্যদের 'আহারের সঙ্গী' বলে অভিহিত করেছেন। ক্রিটের এপিমিনাইডিস এদের বলেছেন, নির্ভরযোগ্য সঙ্গী। এর পরবর্তী স্তর হচ্ছে গ্রামের স্তর। প্রতিদিনকার প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে একাধিক পরিবারের যখন সম্মিলন ঘটল তখন সৃষ্টি হল গ্রামের। প্রকৃতির নিয়মেই এই বিকাশ সাধিত হয়। পরিবারের পুত্র পৌত্রগণ যখন সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে তাদের মূল পরিবারকে অতিক্রম করে নতুন পরিবারের পত্তন করে তখন এরূপ গ্রামের উদ্ভব ঘটে। এরূপ গ্রামের সদস্যদের এজন্য অনেকে একই স্তন্যের সন্তান বলে অভিহিত করেন। গঠনের এই বৈশিষ্ট্যের কারণে অতীতে গ্রামের শাসনব্যবস্থা অনিবার্যরূপে ছিল রাজকীয়। নগররাষ্ট্রগুলিও গোড়ার দিকে রাজকীয় শাসনের অধীন ছিল। কারণ পরিবারের শাসক হচ্ছে পরিবারের প্রধান। পরিবারের প্রধান রাজার মতোই পরিবারকে শাসন করে। আবার পরিবারের শাখা-প্রশাখাগুলিও রক্তের সম্পর্কের কারণে একইরূপে শাসিত হয়। হোমারের মধ্যে এই পিতৃতান্ত্রিক শাসনের উল্লেখ পাওয়া যায়। হোমার বলেছেন : 'সন্তান এবং স্ত্রীর উপর কর্তৃত্ব হচ্ছে পুরুষের।' কিন্তু হোমার এখানে পরস্পর বিচ্ছিন্ন পরিবারের উল্লেখ করেছেন। একাধিক পরিবার-সমন্বিত গ্রামের নয়। কারণ, আদিম অবস্থায় মানুষের সংগঠনের প্রধান রূপ ছিল বিচ্ছিন্ন জনবসতির রূপ। এই কারণে দেবতাদের রাজ্যেও রাজকীয় শাসনের কথাই মানুষ কল্পনা করেছে। রাজার শাসন মানুষের মধ্যে এখনো যে অবশিষ্ট নেই, তা নয়। এখনো অনেক মানুষ রাজার শাসনে শাসিত। মানুষ মনে করে দেবতাদের আকার মানুষের মত। সুতরাং তাদের জীবন-প্রণালীও মানুষের মত।

কিন্তু সর্বোচ্চ বা চরম সংস্থা হচ্ছে নগর বা রাষ্ট্র। একাধিক গ্রামের সম্মিলনে গঠিত হয় রাষ্ট্র। বিকাশের যে ধারার আমরা বর্ণনা করেছি তাতে বলা চলে, রাষ্ট্রে এই বিকাশের সমাপ্তি ঘটেছে। স্বয়ংসম্পূর্ণতার বৈশিষ্ট্য এবার অর্জিত হয়েছে। এর সূচনা ঘটেছিল জীবনধারণের উপায় হিসাবে। কিন্তু কেবল জীবন-ধারণ নয়, মানুষ এবার রাষ্ট্র-মধ্যে উত্তম জীবন-যাপন করার ক্ষমতা অর্জন করেছে। কাজেই আমরা বলতে পারি, প্রকৃতিগতভাবে যে সকল সংস্থা থেকে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটেছে, রাষ্ট্র তাদের মতোই প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক। পূর্ববর্তী সকল সংগঠনের পরিণতি হচ্ছে রাষ্ট্র এবং তাদের স্বভাব হচ্ছে রাষ্ট্রের রূপ গ্রহণ করা। এদের লক্ষ্যে হচ্ছে রাষ্ট্রের পরিণতি লাভ করা। এদের লক্ষ্যই হচ্ছে এদের স্বভাব। কারণ, কোন কিছুর স্বভাব বলতে আমরা কি বুঝি? কোন কিছুর স্বভাব বা প্রকৃতি বলতে আমরা তার চরম পরিণাম বা বিকাশ বুঝি। মানুষ কিংবা পরিবার কিংবা অপর যা কিছুই হোক না কেন, এদের চরম বিকাশই হচ্ছে এদের স্বভাব। এবং চরম বিকাশ বা লক্ষ্য অবশ্যই চরম উত্তম। সেদিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণতা মানুষের স্বভাবের যেমন লক্ষ্য, তেমনি তা চরম উত্তম।

আমাদের পূর্বের বক্তব্যের অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্র শ্রেণী বা প্রকারগতভাবে সেই বস্তুরই অন্তর্গত যার প্রাকৃতিক সত্তা রয়েছে এবং মানুষ প্রকৃতিগতভাবে রাষ্ট্রনৈতিক প্রাণী। মানুষের স্বভাব হচ্ছে রাষ্ট্রে বাস করা। এমন মানুষ যদি পাওয়া যায়, যে কোন দুর্ভাগ্যের কারণে নয়, বরঞ্চ স্বভাবগতভাবে রাষ্ট্রহীন, অর্থাৎ তার বাস করার জন্য কোন রাষ্ট্র নাই,

তাহলে আমরা সে মানুষকে হয় অধমের অধম, নয়ত উত্তমের উত্তম, অমানুষ কিংবা অতিমানুষ বলে গণ্য করব। মানুষের অধম হলে সে হবে হোমারের ভাষায় পরিবারহীন, নীতিহীন এবং গৃহহীন যুদ্ধোন্মাদ এবং অভিশপ্ত। কারণ, এমন মানুষ স্বভাবগতভাবে রণোন্মাদ। দাবার ছকে সে হচ্ছে বিচ্ছিন্ন এক ঘুঁটি। কারুর সঙ্গে তার সহযোগিতার কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে মানুষ যে কেবল সহযোগিতার প্রাণী, তা নয়। মানুষ রাজনৈতিক প্রাণী। কারণ, মানুষ এর অধিক অর্থে রাষ্ট্রনৈতিক প্রাণী। আমরা জানি, প্রকৃতির কোন কাজ নিরর্থক নয়। এবং প্রকৃতি সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষকেই মাত্র যুক্তির শক্তিতে সমৃদ্ধ করেছে তাকে রাষ্ট্রনৈতিক প্রাণী হিসাবে বিশিষ্ট করার জন্য। মানুষের যুক্তি আছে এবং ভাষা আছে। ভাষা এবং বাক্স্ফূর্তির মধ্যে পার্থক্য আছে। বাক্স্ফূর্তি সকল পশুরই আছে। তাদের আনন্দ এবং বেদনা প্রকাশের জন্য তারা তাদের বাক্শক্তি ব্যবহার করে। বস্তুত এমন অনেক পশু আছে যারা কেবল যে বাক্শক্তির মারফত আনন্দ এবং বেদনাকে প্রকাশ করতে পারে, তাই নয়। তারা তাদের এ বোধ পরস্পরের মধ্যে বিনিময় করতেও সক্ষম। কিন্তু ভাষার ক্ষমতা ভিন্নতর এবং অধিকতর। মানুষের ভাষা বুঝাতে পারে কি মঙ্গলকর এবং কি অমঙ্গলকর। ভাষা বুঝাতে পারে, কোন্টা ন্যায়, কোন্টা অন্যায়। মানুষ এবং পশুর যথার্থ পার্থক্য এখানে। মানুষেরই মাত্র খারাপ এবং ভাল, ঠিক এবং বেঠিক, ন্যায় এবং অন্যায়ের বোধ আছে। এবং এই বোধের পারস্পরিক বিনিময়ই সৃষ্টি করে পরিবার এবং রাষ্ট্র।

তাছাড়া রাষ্ট্র যে কেবল পরিণাম, তা নয়। পরিবার এবং ব্যক্তির পূর্বগামীও হচ্ছে রাষ্ট্র। কারণ, সমগ্র হচ্ছে অংশের পুরোগামী। সমগ্রের মধ্যেই অংশের অস্তিত্ব। দেহ থেকে হাত কিংবা পা বিচ্ছিন্ন করলে যথার্থভাবে সে আর হাত কিংবা পা থাকে না। তখন সে নামে মাত্র হাত কিংবা পা। যেমন পাথর কেটেও আমরা হাত কিংবা পা তৈরি করতে পারি। কিন্তু যে কর্মের ভিত্তিতে হাত এবং পা, হাত এবং পা বলে স্বীকৃত, দেহবিচ্ছিন্ন কিংবা পাথুরে হাতের সে কর্মক্ষমতা নাই। কাজেই এমন অবস্থায় একই শব্দের ব্যবহার করলেও আমরা বলতে পারিনে যে, আমরা একই বস্তু সম্পর্কে কথা বলছি। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, রাষ্ট্র যেমন স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক তেমনি সে ব্যক্তির পুরোগামী। কারণ, রাষ্ট্রের বাইরে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যক্তির স্বয়ংসম্পূর্ণতা যখন আর রক্ষিত হতে পারে না তখন সমগ্রের সঙ্গে অংশের যে সম্পর্ক বিদ্যমান, রাষ্ট্রের সঙ্গেও অংশরূপে ব্যক্তির সেই সম্পর্ক বিদ্যমান। আর এ কারণে যে সংস্থাকে আমরা রাষ্ট্র বলেছি তার গঠনে মূলত পশুর ন্যায় যে অংশগ্রহণে অক্ষম কিংবা দেবতার মতো যার রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই, যে পরিপূর্ণরূপে স্বয়ম্ভর, সে রাষ্ট্রের আদৌ অংশ নয়। আমরা বলব, সকল মানুষের মধ্যেই রাষ্ট্রের এই অংশীদারিত্বের একটি স্বাভাবিক আবেগ বিদ্যমান। এবং যে ব্যক্তি প্রথম রাষ্ট্রকে গঠন করেছে সে অবশ্যই মানবজাতির প্রভূত উপকার সাধন করেছে এবং এজন্য সে কৃতিত্বের দাবীদার। কারণ, প্রাণী হিসাবে বিকাশের চরমে মানুষ যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ, তেমনি আইন ও নীতিহীন অবস্থাতে সে সবচাইতে অধম। সশস্ত্র বর্বরতার মোকাবেলা করা সবচাইতে কঠিন। জন্ম থেকে মানুষ বুদ্ধিমান। বুদ্ধি তার অস্ত্র। কিন্তু একে যেমন সে ন্যায়ের পক্ষে ব্যবহার করতে পারে, তেমনি তাকে ব্যবহার করতে পারে সর্বাধিক অন্যায় সাধন করার জন্য। ন্যায় এং উত্তমের বোধশূন্য মানুষ দানবের অধিক। সে বর্বরের অধম। সে চরম অন্যায়কারী, সে যৌন আচরণে বল্গাহীন। সে ভোজনে উদরসর্বস্ব। কাজেই রাষ্ট্রে ন্যায় আবশ্যক। কারণ, রাষ্ট্রনৈতিক সহযোগিতা ন্যায়ের ভিত্তিতেই মাত্র সম্ভব। ন্যায়ের ভিত্তিতে আমরা করণীয় এবং অকরণীয় নির্দিষ্ট করতে পারি।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রভু এবং দাসের সম্পর্ক : দাসত্বের সংজ্ঞা

রাষ্ট্রের উপাদানসমূহ কি, তা আমরা ব্যাখ্যা করেছি। এবং পরিবার এই উপাদানেরই অন্তর্গত। এবার তাহলে পরিবারের অর্থনীতি নিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু করা আবশ্যক। এ বিষয়টিকে অবশ্য আমরা এর অংশের মধ্যে বিভক্ত করতে পারি। একথা বলা যায়, একটি সম্পূর্ণ পরিবার দুটি অংশ দিয়ে তৈরি। একটি হচ্ছে পরিবারের স্বাধীন সদস্য এবং অপরটি দাস। কিন্তু যে বিশ্লেষণী পদ্ধতি আমরা অনুসরণ করছি, সে পদ্ধতি অনুযায়ী একটি সমগ্রের ক্ষুদ্রতম অংশকেও আমাদের পরীক্ষা করা কর্তব্য। একটি পরিবারের ক্ষুদ্রতম উপাদান হিসাবে তিনটি সম্পর্কের আমরা সাক্ষাৎ পাই। এদের একটি হচ্ছে প্রভু এবং দাসের সম্পর্ক; অপরটি স্বামী এবং স্ত্রীর সম্পর্ক। তৃতীয়টি পিতা এবং সন্তানের সম্পর্ক। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, এই তিনটি সম্পর্কের কোন্‌টির বৈশিষ্ট্য কি? এক্ষেত্রে আমরা দেখি, প্রথম সম্পর্কটিকে স্বৈরতান্ত্রিক বলে অভিহিত করা হয়। বাকি দুটির একটিকে আমরা বলতে পারি 'বৈবাহিক' এবং অপরটিকে 'পিতৃগত'। এর অধিক নির্দিষ্ট কোন শব্দ আমাদের হাতে নেই, যা দিয়ে এই সম্পর্ক আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি। পরিবারের এই তিনটি উপাদান, অর্থাৎ প্রভু-দাস, স্বামী-স্ত্রী এবং পিতা-সন্তান, অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু চতুর্থ অপর একটি উপাদানকেও আমরা অস্বীকার করতে পারি নে। কারণ, এটি যে কেবল গুরুত্বপূর্ণ তাই নয়। এটিকেই অনেকে পরিবারের প্রধান উপাদান বলে গণ্য করেন। আমি পরিবারের অর্থনীতিক কার্যক্রমের উল্লেখ করতে চাচ্ছি। এই উপাদানটিকে সাধারণত : এই নামেই অভিহিত করা হয়।

প্রথমে প্রভু এবং দাসের সম্পর্কটি বিচার করে দেখা যাক, পরিবারের ক্ষেত্রে এ সম্পর্ক কোন্ অপরিহার্য প্রয়োজন সাধন করে। যে সমস্ত ধারণার ভিত্তিতে বিষয়টি সাধারণত : আলোচিত হয়, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে বিষয়টির সম্যক উপলব্ধির জন্য তার চেয়ে উত্তম কোন উপায়কে নির্দিষ্ট করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, অনেকে আছেন যাঁরা মনে করেন, প্রভু হওয়ার জন্য একটা বিশেষ গুণ বা দক্ষতা আবশ্যক। তাঁদের মতে এ দক্ষতা হচ্ছে পরিবার পরিচালনার অনুরূপ দক্ষতা। কিংবা বলা চলে, এ গুণ হচ্ছে রাজনীতিক অথবা রাজা হওয়ার গুণ। কিন্তু এটি একটি ভুল ধারণা। এ বিষয়ে আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি। আবার অনেকে আছেন যাঁরা মনে করেন, দাসের উপর প্রভুর ন্যায় শাসন করা প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। তাঁদের মতে, দাস এবং প্রভুর পার্থক্য একটি কৃত্রিম পার্থক্য। কারণ, প্রকৃতির মধ্যে এরূপ কোন পার্থক্যের অস্তিত্ব নেই। এরূপ শাসনের ভিত্তি হচ্ছে জবরদস্তি। এবং এ কারণে এ শাসন অন্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

সম্পদ সম্পর্কে : সম্পদের প্রকার

এবার সম্পদের কথাতে আসা যাক। সম্পদ পরিবার বা গৃহের একটি অংশ। এবং সম্পদের সংগ্রহ পারিবারিক অর্থনীতির একটি অংশ। কারণ জীবন ধারণ বলি কিংবা উত্তম জীবন যাপন বলি, এর কোনটি ন্যূনতম পরিমণ সম্পদ বা অর্থের যোগান ব্যতীত সম্ভব নয়। তাছাড়া যে কোন কার্য সাধনের জন্য উপযুক্ত যন্ত্র বা উপায়ের আবশ্যক। যন্ত্র অবশ্য দু-রকমের হতে পারে : সজীব যন্ত্র এবং অ-জীব যন্ত্র। একটি নৌযানের নাবিক যেমন একটি অ-জীব হালকে ব্যবহার করে, তেমনি তাকে ব্যবহার করতে হয় দিক-নিরীক্ষণকারী সজীব মানুষকে। এ ক্ষেত্রে মানুষও যন্ত্র। কারণ, কোন কিছু উৎপাদনের ক্ষেত্রে একজন মজুরও একটি যন্ত্র বা হাতিয়ার, উৎপাদনের হাতিয়ার। কাজেই সম্পদ বা অর্থের যে কোন উপাদানকেই জীবন যাপনের দিক থেকে যন্ত্র বলা চলে। কারণ, এর মধ্যেমে আমরা জীবন ধারণ করি। আর এদিক থেকে সম্পদ বলতে আমরা জীবন-যাপনের উপায়ের সমষ্টিকে বুঝাব। জীবন-যাপনের উপায়ের সমষ্টির মধ্যে দাসও অন্তর্ভুক্ত। এবং দাস যেহেতু যে কোন ভৃত্যের ন্যায় একজন মানুষ, সে কারণে সে একটি নয়, বরঞ্চ একাধিক যন্ত্রেরই সমান। কারণ, যদি এমন হোত যে, আমাদের যন্ত্রগুলি আমাদের নির্দেশে কিংবা আপন বোধের ভিত্তিতে নিজ নিজ কার্য সম্পাদনে সক্ষম, যেমন সক্ষম ছিল ডিডালাসের[১] তৈরি প্রস্তরমূর্তিগুলি কিংবা হিপাসটাসের সেই ত্রিপদ সরঞ্জাম যে গুলি স্বয়ং চালিত হয়ে সম্মেলন ক্ষেত্রে উপস্থিত হতে সক্ষম ছিল, অথবা এমন যদি হোত যে আমাদের বস্ত্রবয়নের তাঁতের মাকুগুলি নিজের ইচ্ছাতেই এদিক থেকে ওদিক দৌড়ে যেয়ে কাপড় বোনার কাজটি সমাধা করতে পারত এবং আমাদের বীণার তারগুলির সঞ্চালক নিজে থেকে সঞ্চালিত হয়ে বীণায় ঝঙ্কার তুলতে পারত তাহলে অবশ্যই বস্ত্রবয়নের জন্য আমাদের কোন মজুরের আবশ্যক হোত না এবং প্রভুর কোন দাসেরও প্রয়োজন হোত না।

সাধারণ অর্থে একটি যন্ত্র বা হাতিয়ারকে আমরা বলতে পারি উৎপাদনী হাতিয়ার। অন্য কথায় উৎপাদনের হাতিয়ার। হাতিয়ারের আবশ্যক দ্রব্য উৎপাদনের জন্যে। কিন্তু যাকে আমরা বলি সম্পত্তি বা সম্পদ সে উৎপাদিত। অর্থাৎ সে নিজেই প্রয়োজনীয়। কথাটির ব্যাখ্যা আবশ্যক। আমি বলতে চাচ্ছি : একটি মাকু তার নিজের অস্তিত্বের বাইরে অপর একটি বস্তুকে তৈরি করে। কিন্তু একটি তক্তপোষ কিংবা একটি পরিচ্ছদ নিজের অস্তিত্বের বাইরে অপর কোন বস্তু উৎপাদন করে না। আবার উৎপাদন এবং কর্মসম্পাদন—এ দু'য়েরই হাতিয়ার আবশ্যক বটে, তবু এদের মধ্যে যেহেতু একটা চারিত্র্যগত পার্থক্য বিদ্যমান সে কারণে এদের প্রয়োজনীয় হাতিয়ারের মধ্যেও চারিত্র্যগত পার্থক্য রয়েছে। উৎপাদনের

১. ডিডালাস —গ্রীক উপাখ্যানে বর্ণিত বিখ্যাত শিল্পী

উৎপাদনী হাতিয়ার এবং সম্পদের সম্পাদনী হাতিয়ার। এদিক থেকে আমরা জীবনকে কার্য-সম্পাদক বলে বিবেচনা করব, উৎপাদক হিসাবে নয়। এবং দাস আমাদের সম্পদ এই হিসাবে যে, সে কর্মসম্পাদনী হাতিয়ার, উৎপাদনী নয়। আমাদের গৃহের আসবাবপত্রকে আমরা গৃহের অংশ বলে অভিহিত করি। কারণ, যে অংশ সে কেবল কোন কিছুর অংশমাত্র নয়। সে পরিপূর্ণরূপে অপরের অঙ্গীভূত। কাজেই একজন দাস যে কেবল তার প্রভুর দাস, তাই নয়। যে দাস সে পরিপূর্ণরূপেই তার প্রভুর সম্পত্তি। অপর দিকে যে প্রভু সে তার দাসের প্রভু বটে, কিন্তু তাই বলে সে তার দাসের অংশ নয়। অর্থাৎ দাস প্রভুর বটে, কিন্তু প্রভু দাসের নয়।

এ বিবেচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি, দাসের প্রকৃতি কি এবং কি কর্মসম্পাদনের জন্য সে নির্দিষ্ট হয়েছে। আমরা বলতে পারি : যে-মানুষ প্রকৃতিগতভাবে নিজের প্রভু নয়, অপরে যার প্রভু—অর্থাৎ অপরের মধ্যে যার অস্তিত্ব নিহিত, সে-মানুষ প্রকৃতিগতভাবে একজন দাস। এবং একজন মানুষ যখন অপর একজন মানুষের অস্তিত্বে নিহিত তখন সে গৃহের দ্রব্যসামগ্রীর অন্তর্গত। অন্য কথায় সে একটি যন্ত্র কিংবা হাতিয়ার। হাতিয়ারটির অস্তিত্ব আছে, এ কথা ঠিক। কিন্তু সে অস্তিত্ব জীবন ধারণের উপায় হিসাবে মাত্র।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রকৃতিগতভাবে কে দাস, কে প্রভু

কিন্তু যথার্থই প্রকৃতিগতভাবে কোন মানুষ এরূপ কিনা এবং একজন মানুষ অপর একজন মানুষের দাস, এটি উত্তম এবং ন্যায়সঙ্গত কিনা কিংবা সমস্ত রকম দাসত্বকে প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলে আমাদের বিবেচনা করা উচিত—এ প্রশ্নগুলির অবশ্যই আলোচনা আবশ্যক।

এক্ষেত্রে তত্ত্বগত আলোচনা কিংবা বাস্তব অবস্থার পর্যবেক্ষণে তেমন কোন অসুবিধা নেই। নীতিগতভাবে কেবল এ বক্তব্যে কোন আপত্তি হতে পারে না যে, কারুর আদেশ দান করা উচিত এবং অপর কারুর আদেশ মান্য করা উচিত। এটা যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি সুবিধাজনকও। বস্তুত কতগুলি সৃষ্টি জন্ম থেকেই এভাবে বিভক্ত : এদের এক অংশ শাসনের জন্য, অপর অংশ শাসিত হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট। শাসক শাসিতের এই সম্পর্কটি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে।[১] এ ঘটনার সাক্ষাৎ আমরা সর্বত্রই পেতে পারি। যেমন, যেখানেই একাধিকের সংযোগ ঘটে এবং এ সংযোগ ক্রমিক কিংবা ক্রমহীন যাই হোক না কেন এবং যে সংযোগের মাধ্যমে একটি ঐক্যসূত্রের সৃষ্টি হয় সেখানেই শাসক শাসিতের সম্পর্কটির প্রকাশ দেখা যায়। জীবনের প্রকৃতির কারণেই এর উদ্ভব। সজীব প্রাণীর প্রথম সংগঠন হচ্ছে মন এবং দেহের ভিত্তিতে। এখানে প্রথমটি হচ্ছে শাসক, দ্বিতীয়টি শাসিত। যে বিষয় নির্ভর করে তার প্রকৃতিগত বুদ্ধির উপর সে বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তি হবে প্রকৃতির স্বভাবের দৃষ্টান্ত, তার ব্যতিক্রম কিংবা বিকারের দৃষ্টান্ত নয়। সুতরাং মন শাসক এবং দেহ শাসিত, একথা বলতেও আমরা নির্ভর করব মানসিক এবং দৈহিকভাবে একজন সুস্থ মানুষের উপর অর্থাৎ যে মানুষের মধ্যে দেহের উপর মনের শাসন সুস্পষ্ট। এর বিপরীত, অর্থাৎ মনের উপর দেহের শাসন সংঘটিত হয় অধম মানুষ কিংবা অধম অবস্থার মানুষের মধ্যে। সে যাই হোক, আমার বক্তব্য হচ্ছে, জীবিত প্রাণীর মধ্যেই শাসনের এই নীতির প্রথম কার্যকারিতার সাক্ষাৎ পাই। বস্তুত দাসের উপর প্রভুর নিরঙ্কুশ শাসন এবং নিয়মগত শাসন—এই উভয় প্রকার শাসনের সাক্ষাৎই জীবিত প্রাণীর মধ্যে পাওয়া যায়। দেহের উপর মনের শাসন হচ্ছে নিরঙ্কুশ বা একচ্ছত্র শাসন এবং প্রবৃত্তির উপর প্রজ্ঞার শাসন হচ্ছে নিয়ম বা বিধানগত শাসন। এ সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে এটি পরিষ্কার যে, দেহের উপর মনের শাসন কিংবা আমাদের স্বভাবের যে অংশে আবেগের প্রাবল্য তার উপর যে অংশে যুক্তির প্রাবল্য তার—অর্থাৎ বুদ্ধির শাসন যেমন স্বাভাবিক তেমনি কল্যাণকর।

১. অবশ্য শাসনের চরিত্র প্রধানত : নির্ভর করে শাসিতের চরিত্রের উপর। মানুষের উপর শাসন পশুর উপর যে শাসন তার চেয়ে উন্নততর। কারণ, উত্তম মানুষ যা উৎপন্ন করে, কিংবা উত্তম মানুষ থেকে যা উৎপাদিত হয় তা একটি উত্তম সৃষ্টি। আর এক্ষেত্রে বলা যায়, শাসক-শাসিতের সম্পর্কটি এই সম্পর্কের মধ্যে বিজড়িত মানুষ থেকেই সৃষ্টি।—এ্যারিস্টট্‌ল, দ্র. টি. এ. সিনক্লেয়ার প্রাগু.

এর বিপরীত কিংবা দুইয়ের মধ্যে কোন সম অবস্থা বিরজ করলে সর্বোতভাবেই মারাত্মক হত। মানুষ এবং পশুর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য। কারণ, দেখা যায় বাধ্য পশু চরিত্রগতভাবে বন্য পশুর চেয়ে উত্তম। এবং তাদের পক্ষে মানুষ দ্বরা শাসিত হওয়াই মঙ্গলকর। কারণ, এ শাসন তাদের নিরাপত্তা প্রদান করে। আবার পুরুষ এবং মেয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত প্রকৃতিগতভাবে উত্তম এবং শাসক, দ্বিতীয়োক্ত প্রকৃতিগতভাবে অধম এবং শাসিত। সমগ্র মানবজাতির ক্ষেত্রেই এ কথা সত্য। সুতরাং আমরা বলতে পারি : দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যেখানেই মন এবং দেহ কিংবা মানুষ এবং পশুর মধ্যকার ব্যবধানের ন্যায় বিরাট ব্যবধান বিদ্যমান সেখানে দুইয়ের মধ্যে যে অধম অর্থাৎ যাদের সব করণীয় তাদের দেহ ব্যবহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং এর চেয়ে অধিকতর উত্তম যাদের কাছ থেকে আশা করা যায় না তারাই হচ্ছে প্রকৃতিগতভাবে দাস। এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আমরা যেরূপ বলেছি তেমনি এদের ক্ষেত্রেও শাসিত হওয়াই উত্তম।

কাজেই 'প্রকৃতিগত দাস' হচ্ছে সে, অপরে যার মালিক হতে পারে এবং যার মালিক অপরে এবং যার বুদ্ধি বোধের অধিক নয়। তাদের সেবা বোধশূন্য নিরুদ্যোগ সেবা। ব্যবহৃত হওয়ার ক্ষেত্রেও দাস এবং গৃহপালিত পশুর মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। কারণ, উভয়ের দ্বারাই আমরা আমাদের দৈহিক প্রয়োজন পূরণ করি। এ কারণেই প্রকৃতি স্বাধীন নাগরিকের দেহ দাসের দেহ থেকে পৃথকভাবে গঠন করেছে। এই শেষোক্তর দেহ যেখানে দৈহিক পরিশ্রমের উপযোগীভাবে শক্ত, প্রথমোক্ত সেখানে সেরূপ কাজের অনুপযুক্ত এবং তার দেহ ঋজু। কিন্তু এর দেহ একজন নাগরিকের কাজের জন্য উত্তমরূপেই গঠিত, যুদ্ধ এবং শান্তির মধ্যে যার জীবন বিভক্ত। তবে প্রকৃতির মধ্যে এর ব্যতিক্রম যে নেই, তা নয়। কারণ, অনেক সময় এর বিপরীতেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এমন মানুষও দেখা যায়, যার দেহ স্বাধীন মানুষের উপযোগী, কিন্তু তার বুদ্ধি নেই। অপরদিকে আছে, যাদের উপযুক্ত বুদ্ধি আছে কিন্তু দেহ নেই। মোট কথা এটা স্পষ্ট যে, দেহের দিক থেকে যদি কারুর দেবতাদের মতো অতি-মানবিক বিরাট বিপুল দেহ থাকতো তাহলে সাধারণ আকারের অবশিষ্ট মানবজাতি নিশ্চয়ই তার দাস হোত এবং দেহের ক্ষেত্রে যদি একথা সত্য হয়, তাহলে মনের ক্ষেত্রে এ কথাটি অবশ্যই অধিকতর সত্য হবে। অবশ্য দেহের আধিক্যের চেয়ে মনের আধিক্য অধিকতর দুর্লভ। এটা তাহলে পরিষ্কার হল : প্রকৃতিগতভাবে কিছু মানুষ স্বাধীন ও কিছু মানুষ দাস। এবং যারা দাস তাদের জন্য দাসত্ব যেমন ন্যায়সঙ্গত তেমনি কল্যাণকর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দাস সংগ্রহের উপায়

অপরদিকে এটিকে অস্বীকার করা যায় না, যাঁরা এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন তাঁদের অভিমতেও কিছুটা সত্যতা আছে। 'দাসত্ব' এবং 'দাস', এই শব্দ দুটির মধ্যে আমরা দুটো অর্থ দেখতে পাই। আমি প্রকৃতিগত দাসত্বের কথা বলেছি। কিন্তু এর বাইরে আইনগত বা প্রথাগত দাসত্বের অস্তিত্বও বিদ্যমান। এর উদ্ভব এরূপ প্রথার মধ্যে যে, যুদ্ধে যা কিছু দখল করা হয় তা সবই দখলকারীর। কিন্তু যারা আইনজ্ঞ তাঁরা এরূপ অধিকারের প্রতিবাদে বলেন : এরূপ অধিকার আইনবিরুদ্ধ। আইন জবরদস্তিকে বাধা দানেরই চেষ্টা করে। তাঁরা বলেন, জবরদস্তির নিকট পরাভূত দুর্বল শক্তিমানের সম্পত্তিতে পর্যবসিত হবে, এরূপ অভিমত গ্রহণের অযোগ্য। আবার অনেকে আছেন যাঁরা বিষয়টিতে কোন অন্যায় আছে বলে মনে করেন না। এ দুটো অভিমতই আইন-বিশেষজ্ঞদের অভিমত। মতামতের এই পার্থক্য এবং পরিবর্তমানতার মূল হচ্ছে উৎকর্ষ বা আধিক্য শব্দটি। এক অর্থে এটা অবশ্য সত্য যে, উত্তমতা কিংবা দক্ষতা যখন আদেশ দানের অবস্থা প্রাপ্ত হয় তখন সেইই সর্বোতভাবে শক্তি প্রয়োগে সক্ষম। এবং যে বিজয়ী সে নিশ্চয়ই তার কোন গুণের উত্তমতার কারণে বিজয়ী। কাজেই শক্তির কোন উত্তমতা নেই, একথা ঠিক নয়। আসলে মূল তর্কটি হচ্ছে, ন্যায় কি, তার ওপর। অর্থাৎ এখানে এক পক্ষ বলছেন : ন্যায়ের অর্থ হচ্ছে মানবতাবোধ। অপর পক্ষ বলছেন : যে অধিকতর শক্তিমান সে শাসন করবে, এটাই হচ্ছে ন্যায়। এখানে কোন আপোস সম্ভব বলে আমি মনে করিনে। এক পক্ষের যুক্তি অপরপক্ষের নিকট বিশ্বাসযোগ্য এবং গ্রহণযোগ্য বলে বোধ হবে না। ফলে 'উত্তমেরই শাসনের অধিকার' বলে আমরা যে নীতিটি গ্রহণ করেছি সেটি আমাদের অস্বীকার করতে হয়।

অনেকে বলেন, যুদ্ধে বন্দী করার যেহেতু আইন রয়েছে সে কারণে যুদ্ধে দাস করার মধ্যে ন্যায়সঙ্গতাও রয়েছে। অবশ্য এঁরা এ কথাটি যে সব সময়ে বলেন, এমন নয়। কারণ, সূচনাতে যুদ্ধটা তো অন্যায় হতে পারে। আবার যে দাস হবার উপযোগী নয় তার ওপর আমরা 'দাস' শব্দটি ব্যবহার করতে পারিনে। তেমন হলে যুদ্ধে বন্দী এবং বিক্রিত অতি উত্তম বংশজাত কোন ব্যক্তি এবং তার সন্তানবর্গকেও আমাদের দাস বলে গণ্য করতে হবে। এ কারণে যুদ্ধের যুক্তির যাঁরা বিরোধী তাঁরা এরূপ লোককে দাস বলে অভিহিত করতে চান না। 'দাস' শব্দটি তাঁরা কেবল বর্বরদের উপর প্রয়োগযোগ্য বলে মনে করেন। কিন্তু তাঁদের এরূপ যুক্তির অর্থ হচ্ছে, তাঁরা আসলে প্রথাগত নয়, প্রকৃতিগত দাসত্বেরই একটি সংজ্ঞাদানের চেষ্টা করছেন। আমরাও এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের আলোচনা শুরু করেছিলাম। আমাদের প্রধান বক্তব্য ছিল : মানুষের মধ্যে কিছু আছে যারা সর্বত্রই দাস এবং কিছু আছে যারা কোথাও দাস নয়। উত্তম জন্ম বা বংশের ক্ষেত্রেও আমরা

একথা বলতে পারি। যারা অভিজাত তারা কেবল স্বগোত্রীয়দের মধ্যে নিজেদেরকে অভিজাত বলে বিবেচনা করে না। সর্বত্রই তারা নিজেদেরকে অভিজাত বলে দাবী করে। কিন্তু অ-গ্রীসীয়দের ক্ষেত্রে এরূপ দাবীর সার্বজনীনতা তারা স্বীকার করে না। অ-গ্রীসীয়গণ কেবল অ-গ্রীসীয়দের মধ্যে অভিজাত হতে পারে। এর ফলে স্বাধীনতা এবং উত্তম জন্ম—উভয়েরই দুটি প্রকার আমাদের নির্দিষ্ট করতে হয় : একটি শর্তহীন, অপরটি শর্তাধীন।[১] কিন্তু এই শর্ত আরোপের মাধ্যমে এরা আসলে স্বাধীন ব্যক্তি এবং দাস, অভিজাত এবং অনভিজাত—এদের পার্থক্যের ভিত্তি হিসাবে উত্তমতা এবং অধমতাকেই নির্দিষ্ট করতে চান। এঁদের যুক্তি হচ্ছে, মানুষ যেমন মানুষ থেকেই জাত হয়, পশু জাত হয় পশু থেকে, তেমনি উত্তম উত্তম থেকেই জাত হয়। কিন্তু এ সত্যকে প্রকৃতির প্রবণতা বলে যদি আমরা স্বীকার করি তবু একথাও সত্য যে, প্রকৃতির এমন উদ্দেশ্য সব সময়ে বাস্তবায়িত না হতে পারে। তাহলে এটা পরিষ্কার যে, এখানে মতামতের পার্থক্যের অবকাশ আছে। একদিকে যেমন একথা বলা চলে না, কিছু লোক প্রকৃতিগতভাবে দাস এবং কিছু লোক প্রকৃতিগতভাবে স্বাধীন, তেমনি এমন ক্ষেত্র আছে সেখানে দাস এবং স্বাধীন মানুষের মধ্যে যথার্থই পার্থক্য করা হয়, যেখানে কারুর পক্ষে দাস এবং কারুর পক্ষে প্রভু হওয়া যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি ন্যায়সঙ্গত। কারণ, শাসক ও শাসিত হওয়া যেমন প্রকৃতিগত গুণের উপর নির্ভর করে, তেমনি প্রভু এবং দাস হওয়াও প্রকৃতিগত গুণের উপর নির্ভর করে। প্রভু যদি প্রভুর ভূমিকা যথার্থভাবে পালনে অক্ষম হয় তাহলে প্রভু এবং দাস উভয়েরই তাতে ক্ষতি সাধিত হয়। কারণ অংশ এবং সমগ্র, আত্মা এবং দেহ এদের স্বার্থ অভিন্ন। এদিক থেকে দাস প্রভুরই অংশ : দাস প্রভুর দেহের একটি সজীব এবং বিশিষ্ট অংশ। আর এ কারণে, যেখানে প্রকৃতি একজনকে দাস এবং অপরকে প্রভু হিসাবে নির্দিষ্ট করেছে সেখানে উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক হৃদ্যতার সম্পর্ক থাকা উত্তম ফলদায়ক। কিন্তু শক্তি এবং প্রথার মাধ্যমে কাউকে দাস করার যে প্রশ্নটি নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেখানে এ সম্পর্কটি যে থাকতে পারে না, সেটি আমাদের স্বীকার করতে হবে।

---

১. থিওডাকটিস রচিত একটি নাটকে চরিত্র হেলেন বলছে : 'পিতা এবং মাতা উভয়ত : যার বংশধারা দেবতার, সেই আমাকে দাস বলে, এমন স্পর্ধা কার?'—এ্যারিস্টটল

সপ্তম অধ্যায়

দাসের উপর প্রভুর শাসন

তাহলে এ আলোচনা থেকে এ কথাটি পরিষ্কার হচ্ছে, দাসের উপর প্রভুর শাসন এবং রাজনৈতিক শাসন—এ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। সকল শাসন এক নয়। প্রকৃতিগতভাবেই দাসের শাসন থেকে স্বাধীন নাগরিকের উপর শাসন ভিন্নতর। গৃহের শাসনকে আমরা বলতে পারি রাজকীয় শাসন। কারণ গৃহের শাসনকর্তা একজন। রাষ্ট্রের শাসন হচ্ছে স্বাধীন এবং সমর্যাদাসম্পন্ন নাগরিকদের উপর শাসন। আমরা কাউকে প্রভু বলি সে জ্ঞানী বলে নয়। সে প্রভু বলেই তাকে আমরা প্রভু বলে অভিহিত করি। এ কথা দাস এবং স্বাধীন মানুষের ক্ষেত্রেও সত্য। এ কথা বলার অর্থ এই নয় যে, প্রভুর জ্ঞান বা দাসের জ্ঞান বলে কিছু নেই। এ কথা আমরা সাইরাকুসের এক অধিবাসীর দৃষ্টান্ত দিয়েও বুঝাতে পারি। এ ব্যক্তি অর্থের বিনিময়ে গৃহভৃত্যকে তাদের কর্তব্য সম্পর্কে শিক্ষা দান করত। এরূপ শিক্ষাদানের কথা আমরা রন্ধন প্রণালী এবং গৃহের অন্যান্য কার্যের ক্ষেত্রেও চিন্তা করতে পারি। কারণ গৃহের প্রয়োজনীয় কাজ অনেক। এর মধ্যে কোন কাজ কেবল দৈহিক। আবার কোন কাজের মর্যাদা এর অধিক। প্রবাদেও বলে, ভৃত্যকে ভৃত্য হতে হবে, প্রভুকে প্রভু। কথাটির অর্থ হচ্ছে : দক্ষতার ক্ষেত্রে ভৃত্য যেমন ভৃত্য থেকে পৃথক হতে পারে, প্রভুও প্রভু থেকে পৃথক হতে পারে। ভৃত্য বা দাসের জ্ঞানের কথা ছেড়ে দিয়ে আমরা যদি প্রভুর জ্ঞানের কথা বলি তাহলে দেখব, প্রভু হিসাবে প্রভুর জ্ঞান নির্ভর করে তার দাসকে ব্যবহার করার দক্ষতার উপর। সে দাসের প্রভু কেবল দাস সংগ্রহ করার কারণে নয়, সে দাসের প্রভু দাসকে ব্যবহারের কারণে। তবে দাসকে ব্যবহার করার জ্ঞান যে খুব গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান, এমন আমরা মনে করিনে। এ জ্ঞানের যে বড় রকমের কোন মর্যাদা আছে এমনও নয়। কারণ, দাস পরিচালনার জ্ঞানের অর্থ হচ্ছে দাসের যা করণীয় সে করণীয়ের ক্ষেত্রে দাসের উপর নির্দেশ দান। আর তাই যে প্রভু সঙ্গতিসম্পন্ন সে দাসের এরূপ পরিচালনার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করে নিজে রাষ্ট্রনীতি বা দর্শনের বিষয়ে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। অবশ্য দাস সংগ্রহ করার ব্যাপার এ থেকে ভিন্ন। দাস সংগ্রহের আদি এবং যথার্থ পদ্ধতি ছিল লুণ্ঠন এবং শিকার।

অষ্টম অধ্যায়

সম্পদ সংগ্রহের উপায়

দাস হচ্ছে গৃহের সম্পদ বা সম্পত্তির অংশ। তাই যদি হয় তাহলে দাসের আলোচনা শেষ করে আমরা এই সম্পত্তি সংগ্রহ এবং অর্থ উপার্জনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে পারি। এ আলোচনাতেও আমরা আমাদের নির্ধারিত বিশ্লেষণের পদ্ধতি অনুসরণ করব। এ ক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে : অর্থোপার্জনকে আমরা কি বলব? অর্থোপার্জন কি গৃহ ব্যবস্থাপনার সমতুল্য, অথবা অর্থোপার্জন গৃহব্যবস্থাপনার একটি অংশ এবং গৃহের একটি আনুষঙ্গিক মাত্র। অর্থাৎ গৃহ বা পরিবারের দিক থেকে এ মুখ্য কিংবা গৌণ? এবং যদি গৌণ হয় তাহলে এর গৌণতা কি বস্ত্রবয়নের ক্ষেত্রে মাকু তৈরি কিংবা ভাস্করের মূর্তি তৈরির ক্ষেত্রে ধাতব খণ্ডের যে গৌনতা তার সমতুল্য? কারণ, এ উভয় গৌণতাকে আমরা এক বলতে পারিনে। একটি যেখানে উৎপাদনের যন্ত্র, অপরটি সেখানে উপকরণ। উপকরণ, কারণ পশম থেকে যেমন বয়নকারী বস্ত্রবয়ন করে, ধাতব খণ্ড থেকে তেমনি ভাস্কর মূর্তি গঠন করে। এখানে এটা পরিষ্কার যে গৃহের ব্যবস্থাপনা এবং অর্থোপার্জন এক নয়। কারণ একটির কাজ যেখানে উপকরণের সরবরাহ, অপরটির কাজ সেখানে উপকরণের ব্যবহার। গৃহ ব্যবস্থাপনা মানে হচ্ছে গৃহের অন্তর্গত উপকরণের ব্যবহার। কিন্তু অর্থোপার্জনকে আমরা গৃহব্যবস্থাপনার অংশ বলব, না তাকে একটি ভিন্নতর কর্ম, অর্থাৎ কোন্ উপায়ে সম্পদ এবং অর্থ সংগৃহীত হতে পারে তা অনুসন্ধান করে দেখার ন্যায় কর্ম বলে অভিহিত করব—এ প্রশ্ন তর্ক সাপেক্ষ।

এখানে অসুবিধা হচ্ছে এই যে, সম্পদ এবং অর্থ—এই পদগুলি সাধারণত খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ কারণে এখানে প্রথম প্রশ্ন এই হতে পারে, কৃষিকার্যকে কি বলা হবে? কৃষিকার্য কি সম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি অংশ, অথবা এ ভিন্নপ্রকৃতির এমন একটি কাজ যে কাজে কৃষি বলতে শস্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ, উভয়ই অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু সে ক্ষেত্রেও প্রশ্ন থাকে, শস্য সংগ্রহের উপায় তো বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। আর এ উপায়ের সঙ্গে জড়িত আছে বিভিন্ন প্রকার জীবন ধারণ। মানুষের জীবন ধারণ এবং পশুর জীবন ধারণ। আর খাদ্য ব্যতীত যেখানে জীবন সম্ভব নয়, সেখানে খাদ্যের প্রকারের ভিত্তিতে জীবনেরও প্রকার নির্দিষ্ট হয়। খাদ্যের রকমভেদের কারণে কোন জাতীয় পশু দলবদ্ধভাবে বাস করে। কোন জাতীয় পশু বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করে। কোন পশু মাংসাশী। কোন পশু তৃণভোজী। আবার কতগুলো আছে যারা সর্বভূক। আর তাই এরা সকলেই যার যে খাদ্য তা যেন পেতে পারে সে উদ্দেশ্যে প্রকৃতি এদের জীবনধারণ প্রণালীতে বিভিন্নতা প্রদান করেছে। আবার পশুদের মধ্যে খাদ্যের রুচিতেও ভিন্নতা আছে। এ কারণে মাংসাশীদের মধ্যে যেমন, তৃণভোজীদের মধ্যেও তেমন জীবনপ্রণালীর ভিন্নতা দেখা যায়। মানুষের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। মানুষের মধ্যেও বিভিন্নপ্রকার জীবন প্রণালী আছে। প্রথমে

যাযাবরদের কথা ধরা যাক। এদের প্রায় কোন কাজ করার আবশ্যক হয় না। কারণ পোষণ করা পশুদের কাছ থেকে খুব সহজে এবং খুব কম পরিশ্রমে এরা জীবন ধারণের খাদ্য লাভ করতে পারে। কিন্তু পশুদের যখন নতুন চারণভূমিতে নিয়ে যেতে হয় তখন মানুষকেও তাদের সঙ্গে যেতে হয়। ফলে এটা একটা চলন্ত চারণভূমির আকার ধারণ করে। এর পরে শিকারী কিংবা যারা জীবন ধারণ করে কোন কিছু ধরে খাওয়ার উপর, তাদের কথা বলা যায়। এদের মধ্যে কেউ ডাকাত বা লুণ্ঠনকারী, কেউ মৎস্য শিকারী। মৎস্যজীবীদের বাস করতে হয় কোন হ্রদ, জলখণ্ড, নদী বা মৎস্যধারী সমুদ্রভাগে। আবার কেউ আছে যারা বনের পাখী বা পশুর উপর জীবন নির্বাহ করে। মানুষের মধ্যে তৃতীয় দলই বৃহত্তম। এরা মাটিতে শস্যের চাষ করে জীবন ধারণ করে।

জীবন ধারণের এগুলিই হচ্ছে প্রধান উপায়। এগুলি হচ্ছে সয়ম্ভর বা স্বনির্ভর উপায়। এরা ব্যবসায় বা বিনিময় পদ্ধতি নয়। কাজেই এদের মধ্যে আমরা পাই যাযাবর, কৃষিজীবী, লুণ্ঠনজীবী, মৎস্যজীবী, এবং শিকারী। অনেকে এ সমস্ত উপায়ের একাধিককে যুক্ত করে একটির অপূর্ণতা অপরটির দ্বারা পূরণ করে বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করে। যেমন যাযাবরগণ অনেক সময়ে জলদস্যু বা লুণ্ঠনকারী হয় এবং কৃষিজীবীরা শিকারী হয়। এদের জীবন ধারণ কেবল প্রয়োজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এরূপ স্বয়ম্ভরভাবে জীবন ধারণের উপায় প্রকৃতি সকল প্রাণীকেই দিয়েছে। যেমন অনেক পশু দেখা যায় যারা সন্তান সৃষ্টির সময়েই সন্তানের জন্য এমন খাদ্যের ব্যবস্থা করে, যাতে সন্তান বড় হয়ে নিজের খাদ্য সংগ্রহ না করা পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। গুটি বা ডিম্ব আকারে যে সমস্ত প্রাণীর সৃষ্টি তাদের দৃষ্টান্ত এখানে উল্লেখ করা যায়। এমন কি জীবন্ত সন্তান যারা জন্ম দেয় তাদের মধ্যেও বেশ কিছুকাল জীবন ধারণের উপযোগী খাদ্যের ব্যবস্থা থাকে। জননীর দুগ্ধ এরূপ খাদ্য। আবার সন্তান বড় হলেও তার খাদ্যের ব্যবস্থা রয়েছে। এদিক থেকেই আমরা বলতে পারি, তৃণের অস্তিত্ব যেমন পশুর জন্য, পশুর অস্তিত্ব তেমনি মানুষের জন্যে। পোষমানা পশুকে যেমন মানুষ খাদ্য হিসাবে, তেমনি অপরাপর উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করতে পারে। বন্য পশুর সবগুলি না হলেও অনেকগুলিকে মানুষ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে পারে। এদের অন্য ব্যবহারও আছে। কারণ মানুষ এদের দেহ থেকে নিজের পরিচ্ছদ এবং প্রয়োজনীয় হাতিয়ার তৈয়ার করতে পারে। সুতরাং আমাদের এ কথা যদি ঠিক হয় যে, প্রকৃতির কোন সৃষ্টিই উদ্দেশ্যহীন নয়, কারণশূন্য নয়, তাহলে এ কথা আমরা বলতে পারি, প্রকৃতি যা কিছু তৈরি করেছে তা সে নির্দিষ্টরূপে মানুষের জন্যই করেছে। এ কথার অর্থ, যুদ্ধ এবং শিকার, জীবনের সম্পদ সংগ্রহেরই প্রকৃতি নির্ধারিত একটি উপায়। আর এ কারণে, এ উপায় যেমন ব্যবহৃত হবে পশুর উপর, তেমনি সে ধরনের মানুষেরও উপর, যারা প্রকৃতি দ্বারা শাসিত হওয়ার জন্য সৃষ্ট হলেও শাসিত হতে অস্বীকার করে। প্রকৃতি নির্দিষ্ট ন্যায্য যুদ্ধ আমরা একেই বলব।

[জীবন ধারণের একটি উপায় হিসেবে লুণ্ঠন এবং যুদ্ধের মাধ্যমে দাস সংগ্রহকে এ্যারিস্টট্‌ল এভাবে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক বলে যুক্তি দেওয়ার প্রয়াস পাচ্ছেন।]

সম্পদ সংগ্রহ তথা জীবিকা অর্জনের এ উপায়কে তাই আমরা প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিময় বলে বিবেচনা করব। এবং এ কারণে একে আমরা আর্থিক ব্যবস্থাপনার অংশ বলে গণ্য করব। জীবন ধারণের জন্য দ্রব্য সামগ্রীর আবশ্যক। এ জন্য শুরুতেই এর কিছু সঞ্চয় থাকতে হবে কিংবা সংগ্রহের এই উপায়গুলির মাধ্যমে আমাদের তা লাভ করতে হবে। এ

দ্রব্যগুলিকে যেমন সংরক্ষণযোগ্য হতে হবে, তেমনি জীবন ধারণের জন্য এগুলির উপযোগিতা থাকতে হবে। এ কথা একটি পরিবার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যেমন সত্য, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তেমনি সত্য। এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যথার্থ অর্থে সম্পদ আমরা একেই বলব। কারণ একটি উত্তম জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক স্বাচ্ছল্য যে পরিমাণ সম্পদ আমাদের দিতে পারে তার পরিমাণ নিশ্চয়ই সীমাহীন নয়। সালোন[১] অবশ্য তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন, সম্পদের কোন সীমা নেই। কিন্তু নিশ্চয়ই তার একটি সীমা আছে। কারণ, অর্থ বা সম্পদ একটি উপায় বা মাধ্যম। যে কোন কার্যের একটি হাতিয়ার বা মাধ্যমের আকার ও সংখ্যার ক্ষেত্রে একটা সীমা থাকে। এই সীমার বাইরে তার উপযোগিতা বিনষ্ট হয়। অর্থ বা সম্পদও একটি পরিবার বা রাষ্ট্রব্যবস্থার হাতিয়ার বা মাধ্যম। কাজেই আমরা বলতে পারি, এক প্রকার সম্পদ সংগ্রহ আছে যার ব্যবস্থা করা একটি পরিবার বা একটি রাষ্ট্রের দায়িত্ব-প্রাপ্ত-ব্যক্তির স্বাভাবিক কর্তব্য। এবং এর কারণ কি তাও এখন আমাদের নিকট পরিষ্কার।

[এ্যারিস্টট্‌লের অভিমত : অর্থের জন্য অর্থ নয়। অর্থ বা সম্পদ আমরা সংগ্রহ করব জীবন ধারণের জন্য। এ্যারিস্টট্‌ল এর পর 'অর্থ-সংগ্রহ' কথাটিই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু এই 'অর্থ' দ্বারা তিনি সীমাহীন সম্পদ সংগ্রহের সেই প্রবণতাকে বুঝাচ্ছেন যাকে তিনি উত্তম বা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেন না। অবশ্য আমাদের খেয়াল রাখতে হবে, 'অর্থ' শব্দের এরূপ অভিধাও সর্বদা রক্ষিত হয় নি। এ্যারিস্টট্‌লের মতে সীমাহীন অর্থকে আমরা গৃহ কিংবা রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান বলে গণ্য করতে পারিনে।]

১. সলোন (৬৫০-৫৫৯ খ্রি. পূ.) : প্রাচীন এথেন্সের রাষ্ট্রনেতা এবং আইনদাতা। অভিজাত এবং সাধারণ নাগরিকদের বিরোধ নিরসনে এবং এথেন্সের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিধানের প্রগতিমূলক সংস্কার সাধনে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেন।

নবম অধ্যায়

অর্থনীতির বিবর্তন : বিনিময় থেকে মুদ্রা

কিন্তু সম্পদ সংগ্রহের আর একটি ধরন আছে যাকে সাধারণত এবং যথার্থভাবেই অর্থসংগ্রহ বা অর্থোপার্জন বলে অভিহিত করা হয়। সম্পদ সংগ্রহের এই ক্ষেত্রের যুক্তিতেই মনে করা হয়, অর্থোপার্জনের কোন সীমা নেই। সম্পদ সংগ্রহের যে ধরন নিয়ে আমরা এইমাত্র আলোচনা করেছি তার সঙ্গে অর্থোপার্জনের নিকট-সাদৃশ্যের কারণে অনেকে মনে করেন যে, সম্পদ সংগ্রহ এবং অর্থ সংগ্রহ এক এবং অভিন্ন। অথচ এরা অভিন্ন নয়। অবশ্য একথা সত্য, এরা খুব ভিন্ন নয়। কিন্তু এদের একটি যেখানে স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক, অপরটি সেখানে স্বাভাবিক নয়। এই দ্বিতীয় ধরনের সম্পদ সংগ্রহ মানুষের জন্য প্রকৃতিদত্ত নয়। এটা মানুষের অর্জন করতে হয় ক্রম প্রচেষ্টার দ্বারা। এর আলোচনাটি আমরা এভাবে শুরু করতে পারি : প্রত্যেকটি দ্রব্য বা সম্পদের দু'রকমের ব্যবহার আছে। দুটো ব্যবহারই দ্রব্যটির ব্যবহার বটে। কিন্তু ব্যবহার দুটি এক রকম নয়। কেননা এর একটি ব্যবহার যেখানে যথার্থ ব্যবহার, অপরটি সেখানে যথার্থ ব্যবহার নয়। দৃষ্টান্ত হিসাবে এক জোড়া পাদুকার কথা ধরা যাক। এক জোড়া পাদুকা বিনিময় হিসাবে ব্যবহার করে অপর কোন দ্রব্য আমরা সংগ্রহ করতে পারি। এখানে উভয় ব্যবহারই পাদুকার ব্যবহার। কারণ, যে এক জোড়া পাদুকা অপর কাউকে, যার প্রয়োজন,—তাকে প্রদান করে বিনিময়ে নগদ টাকা কিংবা খাদ্য সংগ্রহ করে, সেও পাদুকাকে পাদুকা হিসাবে ব্যবহার করছে। তবু পাদুকার এই ব্যবহারটি যথার্থ নয়। কারণ, পাদুকা আমরা তৈরি করি স্পষ্টত পরিধানের জন্য, বিনিময়ের জন্য নয়। অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর ক্ষেত্রেও একথা সত্য। বিনিময়ের প্রক্রিয়াটি যে কোন দ্রব্যের উপরই প্রয়োগ করা চলে। আর এর সূচনা ঘটেছে বাস্তব সেই অবস্থার মধ্যে যেখানে একের নিকট যখন দ্রব্য সামগ্রী রয়েছে তার প্রয়োজনের অধিক, অপরের তখন সেগুলি প্রয়োজনীয় পরিমাণে নেই। কিন্তু এখানে স্বাভাবিক হচ্ছে, বিনিময়ের ব্যবহার প্রয়োজনকে অতিক্রম করবে না। দ্রব্যের অভাব পূরণের জন্যই বিনিময়কে ব্যবহার করা হবে। এটা পরিষ্কার থাকা উচিত, বিনিময় এবং ক্রয়-বিক্রয় এক ব্যাপার নয়। ক্রয়-বিক্রয় বিনিময় থেকে ভিন্ন এবং ক্রয়-বিক্রয় প্রকৃতির ব্যাপার নয়। কারণ, সংগঠনের আদিরূপ হচ্ছে পরিবার। পরিবারের মধ্যে দ্রব্যের বিনিময়ের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। বিনিময়ের উদ্ভব ঘটেছে কেবল মাত্র তখন যখন মানুষের সংগঠন বৃহত্তর আকার ধারণ করেছে। একটি পরিবারের সদস্যবর্গ পরিবারের সমগ্র দ্রব্যসামগ্রী যৌথভাবে ভোগ করত। কিন্তু বিভিন্ন পরিবারের সদস্যদের মধ্যে অনেক জিনিসের আদান প্রদান হত। পারস্পরিক প্রয়োজনই এই আদান প্রদানের ভিত্তি ছিল। আর এ কারণেই এখনো আমরা অনেক বিদেশী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিনিময়ের ব্যবহার দেখতে পাই। বিনিময়ের মানে হচ্ছে প্রয়োজনের ভিত্তিতে এক জিনিষের সঙ্গে অপর জিনিষের আদান প্রদান। যেমন এরা মদ্য

এবং শস্য আদান-প্রদান করে। কিন্তু এই সমস্ত বৈদেশিক মানুষ এই প্রক্রিয়াটিকে বিনিময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। বিনিময়ের সীমা তারা অতিক্রম করে না।

জিনিষপত্রের এরূপ আদান প্রদান প্রকৃতিবিরুদ্ধ নয়। এবং এটাকে আমরা টাকা বানানোর কৌশল বলতে পারিনে। প্রকৃতির মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য থেকেই এর উদ্ভব। কিন্তু আবার এই বিনিময় থেকেই টাকা বানানোর প্রক্রিয়ার বিকাশ ঘটেছে। এ বিষয়টি বেশ বোধগম্য। কারণ উদ্বৃত্ত জিনিষপত্রের রপ্তানী এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির আমদানি যখন কোন একটি জনগোষ্ঠির মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়তে শুরু করল তখন একটি সাধারণভাবে গ্রাহ্য বিনিময় মাধ্যমেরও আবশ্যকতা দেখা দিল। কারণ বিনিময়ের ব্যাপারেও যে সমস্ত দ্রব্য সামগ্রী আমাদের স্বাভাবিকভাবে প্রয়োজন তার সবগুলিকে সহজে বহন করে চলা যায় না। এ কারণে বিনিময়ের জন্যও মানুষ লৌহ, রৌপ্য কিংবা অনুরূপ অন্য কোন প্রয়োজনীয় এবং ব্যবহারযোগ্য দ্রব্য একে অপরকে দিতে এবং অপরের নিকট হতে গ্রহণ করতে সম্মত হল। এই বিশেষ দ্রব্যের পরিমাণও গোড়াতে তার ওজন এবং আকার দ্বারা নির্দিষ্ট হত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দৈহিক আকারের পরিবর্তে দ্রব্যের গায়ে পরিমাণের নির্দেশক চিহ্ন থাকলেই চলত। এর ফলে এই নির্দিষ্ট মাধ্যমকেও আর প্রতিবার ওজন করে দেখার আবশ্যক হত না, এর পরিমাণ কত। কারণ পরিমাণের চিহ্ন দ্রব্যটির গায়ে উৎকীর্ণ থাকতো। এই চিহ্নিত মাধ্যমই হচ্ছে মুদ্রা। এবং একবার মুদ্রার প্রচলন যখন শুরু হল তখন এর বিকাশ ঘটল দ্রুত। এবং যে ব্যাপারের শুরু হয়েছিল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিনিময় হিসাবে সেটাই এখন ব্যবসায় তথা টাকা তৈরির চরিত্র গ্রহণ করল। গোড়ার দিকে ব্যাপারটি হয়ত খুব সরল ছিল। কিন্তু ব্যবসায়গত বিনিময়ের মাধ্যমে কোথায় এবং কি প্রকারে সর্বাধিক লাভ সংগ্রহ করা যায় এ কৌশলে মানুষ যত অভিজ্ঞ এবং দক্ষ হয়ে উঠল, মুদ্রাব্যবস্থাও তত জটিল হতে লাগল। এ কারণেই সম্পদ বা অর্থ সংগ্রহ বলতে এখন আর সাক্ষাৎভাবে দ্রব্য সংগ্রহকে বুঝায় না। এখন অর্থ বা সম্পদ সংগ্রহ মানে হচ্ছে শুধু মুদ্রা সংগ্রহ। আর যারা এ ব্যবসায়ে লিপ্ত তাদেরও আজ লক্ষ্য কেবল এই সন্ধানেই নিবদ্ধ, মূল হচ্ছে টাকা। বস্তুত এখন সম্পদ বলতে টাকার পাহাড়কে বুঝানো হয়। কারণ, অর্থসংগ্রহ এবং ব্যবসায়ের লক্ষ্যই হচ্ছে টাকা সংগ্রহ করে স্তূপ করা।

অনেক সময় আবার অপরাপর মাধ্যমের সঙ্গে মুদ্রাকেও প্রকৃতির সঙ্গে সূত্রহীন, কৃত্রিম এবং মূল্যহীন বস্তু বলে মনে করা হয়। কারণ, এক-প্রকার মুদ্রা যারা ব্যবহার করছে তারা যদি ইচ্ছা করে তাহলে সে মুদ্রাকে তারা বাতিল করে দিতে পারে। এবং তখন সেই বাতিল করা মুদ্রার মাধ্যমে জীবনের প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্যকেই আর সংগ্রহ করা যাবে না। এবং তখন দেখা যাবে যে, কারুর হাতে হয়ত প্রচুর পরিমাণ মুদ্রা রয়েছে, কিন্তু একমুঠো খাদ্য সংগ্রহ করার তার উপায় নাই। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে মুদ্রাকে আমরা কিভাবে সম্পদ বলে গণ্য করতে পারি? কারণ, যে-সম্পদের প্রাচুর্যও মানুষকে অনাহারে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করতে পারে না, সে সম্পদকে অদ্ভুত সম্পদ ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে! এ অবস্থা আমাদের মিডাসের কাহিনীকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আমরা জানি মিডাসের প্রার্থনার সীমাহীন লোভের কারণে তার সম্মুখে ধরে দেওয়া সবকিছুই তার স্পর্শে স্বর্ণে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এ কারণেই সম্পদ এবং টাকা উপার্জনের সংজ্ঞা আমরা আলাদাভাবে প্রদানের চেষ্টা করেছি। এরূপ করা আমাদের ঠিকই হয়েছে। কারণ, সম্পদ সংগ্রহ এবং টাকা উপার্জন দুটো আলাদা বিষয়। যথার্থ সম্পদ একদিকে যেমন প্রকৃতির

নিয়মেই পারিবারিক ব্যবস্থাপনার সঙ্গে যুক্ত এবং সে কারণে উৎপাদনক্ষম, সেখানে মুদ্রা বা টাকা উপার্জন কৃত্রিম বলে প্রকৃতির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। এর সম্পর্ক ব্যবসায়ের সঙ্গে এবং যথার্থভাবে দ্রব্যের উৎপাদক বলতে যা বুঝায় টাকা বা মুদ্রা তেমনভাবে উৎপাদক নয়। মুদ্রা অনুৎপাদক। এরূপভাবে টাকা সংগ্রহ বা টাকা বানানোর ক্ষেত্রে টাকা একদিকে যেমন লক্ষ্য, অপরদিকে তেমনি সে তার মাধ্যম। মানুষ টাকার মাধ্যমেই টাকা বানাতে থাকে এবং এরূপ সম্পদের তখন আর কোন সীমা নির্দিষ্ট থাকে না।

[এ্যারিস্টট্‌ল এখানে লক্ষ্য এবং উপায় কিংবা যন্ত্র এবং তার কর্মের মধ্যকার প্রভেদ সম্পর্কে অবহিত না থাকার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছেন।]

রোগ নিরাময়ের কথা ধরা যাক। নিরাময়ের লক্ষ্য সুস্বাস্থ্য অর্জন। এর অবশ্য কোন সীমা নেই। প্রত্যেকটি কর্মের ক্ষেত্রেই একথা সত্য। কর্ম তার লক্ষ্যকে অর্জন করতে চায়। এর কোন সীমা নেই। সীমা নেই এই অর্থে যে, লক্ষ্যকে সর্বোত্তমভাবেই সে সাধন করতে চায়। কিন্তু তাই বলে যে উপায়ের মাধ্যমে এই লক্ষ্যের সাধন, সে উপায় সীমাহীন নয়। প্রত্যেকটি কর্মের ক্ষেত্রে লক্ষ্যই তার উপায়ের সীমা নির্দিষ্ট করে দেয়। কিন্তু টাকা বানাবার যে কর্মের কথা আমরা উল্লেখ করেছি সে কর্মের লক্ষ্য, উপায়ের কোন সীমাকে নির্দিষ্ট করে না। কারণ, এখানে টাকা বানানো বা অর্থোপার্জনটাই লক্ষ্য। কিন্তু আমাদের গৃহ সংরক্ষণ বা পরিবারের ব্যবস্থাপনার অর্থ টাকা বানানো নয়। এ কারণে এর একটা সীমা আছে। পরিবার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে টাকা সংগ্রহ লক্ষ্য নয়, পরিবার প্রতিপালনের সে একটি উপায় মাত্র। কাজেই যেখানে আমরা মনে করি প্রত্যেক ধরনের অর্থেরই একটা সীমা থাকবে সেখানে বাস্তবে আমরা এর বিপরীতই দেখতে পাই। কারণ, যারা টাকাকেই সম্পদ মনে করছে তারা মুদ্রা হিসাবে সীমাহীনভাবে তার ভাণ্ডার বৃদ্ধি করে চলেছে। এরা প্রকৃত সম্পদের সঙ্গে মুদ্রার কোন পার্থক্য স্বীকার করে না। সম্পদ এবং মুদ্রা বা অর্থ—এদের সদৃশ্যতা থেকে এরা এ দুইকে অভিন্ন মনে করে। এ দুইএর সাদৃশ্য এ কারণে যে, এ দুইএর মাধ্যমে দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু সংগ্রহের পদ্ধতির ক্ষেত্রে এরা বিভিন্ন। একটা হচ্ছে কেবল বৃদ্ধি করা। বৃদ্ধিই তার লক্ষ্য। অন্যটি তা নয়। এ কারণে, অনেকে মনে করে পরিবার প্রতিপালনের অর্থও হচ্ছে কেবল অর্থকে বৃদ্ধি করা এবং এ অর্থবৃদ্ধির কোন সীমার কথা তারা চিন্তা করতে পারে না। অনেকে যে এরূপ আচরণ করে এর মূল কারণ বোধ হয় এই যে, এরা জীবন এবং উত্তম জীবনের মধ্যকার পার্থক্য বুঝে না। এরা কেবল জীবন ধারণ করতে চায়, উত্তম জীবন নয়। শুধু বেঁচে থাকা বা জীবন ধারণ যেখানে লক্ষ্য সেখানে সেই জীবনের আরামদায়ক বস্তুরাজি সংগ্রহের লক্ষ্যও তাদের সীমাহীন। আবার অনেকে আছে যাদের লক্ষ্য উত্তম জীবন হলেও তারা দৈহিক সুখেরই কেবল অন্বেষণ করে। এবং দৈহিক সুখ যখন দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহের উপরই নির্ভর করে তখন সেই দ্রব্যসামগ্রীর সংগ্রহই তাদের কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় ধরনের যে অর্থোপার্জনের কথা আমরা উল্লেখ করেছি তার মূল এখানে। কারণ, মানুষ যেখানে আধিক্যকেই উপভোগ মনে করে সেখানে সে কেবল আধিক্যকেই অন্বেষণ করে। আর তা যদি মুদ্রা বা অর্থোপার্জনের মাধ্যমে সাধিত না হয় তাহলে ভিন্নতর কোন উপায়ে হলেও সে উপায়ে তাদের সকল কর্মক্ষমতাকে নিয়োজিত করে তাকে সংগ্রহ করার চেষ্টা করে। কিন্তু আমাদের কর্মক্ষমতাকে এরূপে ব্যবহার করা প্রকৃতির বিরুদ্ধ। যেমন, সাহসের কর্ম হচ্ছে আত্মবিশ্বাস তৈরি করা, টাকা উপার্জন করা নয়। সামরিক নেতৃত্ব বা ঔষধাদির করণীয়

হচ্ছে বিজয় অর্জন এবং স্বাস্থ্য রক্ষা, অর্থোপার্জন নয়। কিন্তু যারা অর্থগৃধনু তারা তাদের দেহমনের সকল ক্ষমতা একমাত্র টাকার উপার্জনে নিয়োজিত করে। যেন এটাই তাদের পরম লক্ষ্য এবং অপর সব কিছুকে এই লক্ষ্য সাধনের উপায় হতে হবে।

অর্থোপার্জনের বিষয়টির আলোচনা আমরা এভাবে শেষ করতে পারি : এর প্রয়োজনীয়, অপ্রয়োজনীয় দুটো দিক আছে। যেটা অপ্রয়োজনীয় সেটা কি এবং বাস্তবে কেনই বা আমরা তাকে ব্যবহার করি, সে কথা আমরা বলেছি। কিন্তু যে অর্থোপার্জন প্রয়োজনীয় সে প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে পরিবারের ব্যবস্থাপনা এবং তার প্রতিপালনের সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থোপার্জন যে সীমাহীন এবং সীমাবদ্ধ হতে পারে সে কথারও আমরা উল্লেখ করেছি।

[অষ্টম অধ্যায়ের বক্তব্য ছিল : অর্থোপার্জন এবং পরিবার প্রতিপালন এক নয়। কারণ ব্যবহারকারী এবং উৎপাদনকারী—এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। কিন্তু এর পরে বলা হয়েছে যে, অর্থোপার্জন পরিবার প্রতিপালনের অংশ বলেও বিবেচিত হতে পারে যদি অর্থোপার্জন মানে পরিবারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর সংগ্রহকে বুঝায় এবং অর্থোপার্জন যদি সাধারণভাবে ব্যবসায়ে পর্যবসিত না হয়। কিন্তু বর্তমানে আমরা দেখি যে, দশম অধ্যায়ের গোড়ার দিকে তার সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। এখনে বলা হচ্ছে : আমাদের প্রতিপালনের ব্যবস্থা প্রকৃতিতেই রয়েছে। কাজেই প্রকৃতি তার কর্ম সম্পন্ন করলে সম্পদ সংগ্রহের কোন আবশ্যকতা থাকে না। অবশ্য এমন বক্তব্যটি যে চরমভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে তাও নয়। অধ্যায়ের শেষের দিকে একটি আপোষ ব্যবস্থারও উল্লেখ দেখা যায়।]

দশম অধ্যায়
অর্থোপার্জনের সীমা

এ থেকে গোড়াতে আমরা যে প্রশ্ন তুলেছিলাম, তার জবাবও পরিষ্কার হয়। আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম, পারিবারিক বা রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে অর্থোপার্জন বা সম্পদের বৃদ্ধি আবশ্যক কি না। আমাদের জবাব হচ্ছে, এটা অপরিহার্য নয়। উপার্জন বা বৃদ্ধি নয়, ব্যবহারের জন্য গোড়াতেই দ্রব্যসামগ্রী থাকা আবশ্যক। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অর্থ যেমন মানুষ তৈরি করা নয়, পরিবার প্রতিপালনের অর্থও তেমনি টাকার উপার্জন নয়। রাষ্ট্র মানুষকে তৈরি করে না। প্রকৃতির কাছ থেকেই রাষ্ট্র মানুষকে পায়। রাষ্ট্র সেই উপাদানকেই গ্রহণ করে এবং ব্যবহার করে। খাদ্যের ক্ষেত্রেও কথাটা সত্য। জল কিংবা স্থল থেকে কিংবা অপর কোন উপায়ে প্রকৃতিই মানুষের খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা করে। অর্থনীতিবিদ প্রকৃতিদত্ত এই দ্রব্যসামগ্রী বণ্টনের দায়িত্ব পালন করে। এ কারণে বস্ত্রবয়নে যদি প্রয়োজনের বিভিন্নতার ভিত্তিতে তন্তুর প্রকারভেদ করার আবশ্যক হয় এবং কোন্ সুতাটা মন্দ এবং কোন্টা ভাল তা নির্দিষ্ট করার দক্ষতারও সেখানে দরকার, তবু বয়নশিল্পের কাজ নিশ্চয়ই পশমের উৎপাদন নয়। অপরদিকে অর্থোপার্জনকে যদি আমরা পরিবার প্রতিপালনের অঙ্গীভূত করি তাহলে সঙ্গতভাবে প্রশ্ন উঠতে পারে, নিরাময় কর্ম পরিবার প্রতিপালনের অঙ্গীভূত হবে না কেন? কারণ, পরিবারের সদ্যদের জীবন ধারণের জন্য এবং দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের জন্য যেমন আবশ্যক খাদ্যসামগ্রীর, তেমনি আবশ্যক সুস্থ থাকা। এরও জবাব হচ্ছে : একটি সীমা পর্যন্ত পরিবারের প্রতিপালক বা শাসককে স্বাস্থ্যের বিষয়টা অবশ্যই দেখতে হয়। কিন্তু এই সীমা পর্যন্তই। এই সীমার বাইরে দায়িত্ব চিকিৎসকের। টাকা পয়সা এবং সম্পদ সংগ্রহের ক্ষেত্রেও একই কথা। গৃহের প্রধানের জন্য এ ব্যাপারটা কিছু পরিমাণে অবশ্যই উদ্বেগের বিষয়। কিন্তু তার বাইরে ব্যাপারটা ভিন্নতর দক্ষতারই অন্তর্গত। তবে একথা আমরা পূর্বেই বলেছি, সর্বোত্তম হচ্ছে গোড়াতেই আমাদের প্রয়োজনীয় সম্পদকে প্রকৃতির কাছ থেকে লাভ করা। কারণ, প্রকৃতিরই দায়িত্ব হচ্ছে যা কিছু সে সৃষ্টি করে তার জন্য খাদ্যেরও সংস্থান করা। এবং প্রকৃতি তাই করে। কারণ, যা থেকে জীবের সৃষ্টি তার মধ্যে এমন উদ্বৃত্তের সংস্থান থাকে সে উদ্বৃত্ত তার খাদ্যের প্রয়োজন পূরণ করে।

কাজেই আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, যে-অর্থোপার্জন শস্য সংগ্রহ এবং পশু প্রতিপালনে সীমাবদ্ধ সে অর্থোপার্জন প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, অর্থোপার্জনকে আমরা দুইশ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। এর একটি হচ্ছে প্রয়োজনীয় এবং আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য। একে আমরা ব্যবস্থাপনাগত বলে অভিহিত করতে পারি। অপরটি হচ্ছে ব্যবসায়গত। এর উৎস হচ্ছে বিনিময়। এটিকে

আমরা যথার্থই অসঙ্গত বলে বিবেচনা করি। কারণ, এর উদ্ভব প্রকৃতি থেকে নয়। এর উদ্ভব ঘটে মানুষের পারস্পরিক আদান প্রদান থেকে। তাছাড়া সুদ আরোপের প্রথাটিও মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। সুদ আরোপকে নাকচ করা পরিপূর্ণরূপেই যুক্তি-সঙ্গত। কারণ, সুদের উৎস টাকা। যার জন্য টাকা প্রদত্ত হয় সে দ্রব্য নয়। টাকার মূল উদ্দেশ্য ছিল বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া। সুদের অর্থ হচ্ছে সেই টাকার বৃদ্ধি। সুদ সম্পর্কে আমরা এমনভাবে কথা বলি যেন সুদ হচ্ছে একটা উপার্জন বা ফসল, যেন এ উৎপাদিত কোন শস্য, কিংবা উৎপাদিত কোন শাবক। প্রাণীজগৎ যেমন নিজের সদৃশ সন্ততির জন্মদান করে, আমরা মনে করি সুদও হচ্ছে তেমনি টাকা থেকে উৎপাদিত টাকা। একারণেই সকল প্রকার সম্পদ অর্জনের মধ্যে টাকা উপার্জনই হচ্ছে সর্বাধিক পরিমাণে প্রকৃতি-বিরুদ্ধ।

[এ্যারিস্টট্লের বক্তব্য হচ্ছে : মানুষ বাস্তব জীবনে নানাভাবে জীবিকা অর্জন করতে পারে। এর মধ্যে যেগুলি প্রাকৃতিক অর্থাৎ প্রকৃতিদত্ত সেগুলিকে এ্যারিস্টট্ল গ্রহণীয় বলে সমর্থন করেন। অপরগুলিকে তিনি অবাঞ্ছনীয় বলে বিবেচনা করছেন। অবশ্য এ আলোচনায় এ্যারিস্টট্লের আগ্রহ প্রধানত প্রশ্নটির তত্ত্বগত দিকে নিবদ্ধ। তবে বাস্তবকে যে তিনি অগ্রাহ্য করতে পারছেন না, তা এ থেকে বুঝা যায় যে, এ্যারিস্টট্ল অর্থোপার্জন নিয়ে বিস্তারিতভাবেই আলাচনা করেছেন। এমন কি টাকার ব্যবসায় যে, রাষ্ট্রের সমৃদ্ধি সাধনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বলে বোধ হতে পারে এবং প্রকৃতি যে কাউকে এমন উদ্বৃত্ত সম্পদের অধিকারী করতে পারে যে উদ্বৃত্ত রপ্তানি এবং বিনিময়ের জন্য ব্যবহৃত হতে পারে, সে সত্যকেও এ্যারিস্টট্ল স্বীকার করেছেন।]

একাদশ অধ্যায়

জীবন ধারণের জন্য প্রকৃতির দান

অর্থোপার্জনের তত্ত্বটি নিয়ে আমরা যথেষ্ট আলোচনা করেছি। এবার বাস্তবে এর প্রয়োগের দিকটি দেখা যাক। এ রকম বিষয়ের ক্ষেত্রে তত্ত্বগত আলোচনা অবাধ হতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি বাস্তব অবস্থা এবং প্রয়োজনের সীমায় কঠিনভাবে আবদ্ধ। আমরা এখানে স্বাভাবিক ধরনের অর্থোপার্জন এবং তার প্রত্যেকটির জন্য আবশ্যকীয় বাস্তব জ্ঞানের কথা উল্লেখ করব। এদের মধ্যে প্রথম হচ্ছে : পশুপালন। এখানে পশুর প্রজনন এবং কোন্ প্রকারের পশুপালন লাভজনক তার জ্ঞান আবশ্যক। তাছাড়া কখন কোথা থেকে অশ্ব, গবাদি, মেষ কিংবা অপরাপর পশু সংগ্রহ করা যায় তার জ্ঞানও আবশ্যক। দ্বিতীয়ত, প্রয়োজন কৃষিকার্যের জ্ঞান। কেমন করে মাটি চাষ করতে হবে এবং শস্য এবং ফলাদির জন্য বীজ বপন করতে হবে তার জ্ঞানও প্রয়োজন। তৃতীয়ত, মৌমাছি কিংবা অন্যান্য পাখী এবং মাছের যে চাষ প্রয়োজন তার জ্ঞানও আবশ্যক। উপযুক্তভাবে জীবন ধারণের জন্য এই তিনটিকে আমরা প্রধান উপায় বলে অভিহিত করতে পারি। অপর যে ধরনের উপায়ের কথা আমরা বলেছি তার প্রধান ভাগ হচ্ছে ১. ব্যবসায়। একে নিম্নোক্ত তিনটি উপবিভাগে আমরা বিভক্ত করতে পারি। ক. নৌযান, খ. দ্রব্যাদি বহন এবং গ. এগুলির বিক্রয় ব্যবস্থা। ২. টাকা ধার প্রদান এবং ৩. মজুরীর বিনিময়ে ক. দক্ষ কিংবা খ. অদক্ষ মজুর হিসাবে কাজ করা। টাকা পয়সা বা অর্থোপার্জনের স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক যে দুটি উপায়ের কথা আমরা উল্লেখ করেছি তার মাঝামাঝি একটি তৃতীয় উপায়েরও আমরা উল্লেখ করতে পারি। এটি উভয়ের মাঝামাঝি এ কারণে যে, এর মধ্যে প্রকৃতি এবং বিনিময় : এ দুইএর বৈশিষ্ট্যই মিশ্রিত হয়ে আছে। তৃতীয় উপায় বলতে কৃষিকার্য ব্যতিরেকেই আমাদের প্রয়োজন পূরণকারী যে সমস্ত দ্রব্যাদি আমরা মাটি কাছ থেকে লাভ করি তার কথা আমি বুঝাচ্ছি। এর অন্তর্গত হবে কাষ্ঠ খণ্ডন এবং সব রকমের খনিজ কাজ। এগুলিরও অবশ্য নানা উপবিভাগ হতে পারে। কারণ এভাবে মাটির কাছ থেকে আমরা নানা প্রকার দ্রব্য লাভ করে থাকি।

জীবন ধারণের এই উপায়গুলি সম্পর্কে আমি এখানে সাধারণভাবে আলোচনা করে থাকলেও বর্তমানের জন্য এ আলোচনা যথেষ্ট। কারণ, বাস্তব জীবনে যারা এ সকল জীবিকার সঙ্গে যুক্ত তাদের কাছে এগুলির বিস্তারিত আলোচনার সার্থকতা থাকলেও এই মুহূর্তে এদের উপর অধিক সময় ব্যয় করা সঙ্গত হবে না। (এখানে শুধু এই কথা যোগ করা যায় : দক্ষতার আবশ্যক সেখানেই সবচেয়ে বেশি যেখানে ভাগ্যের উপর আমরা নির্ভর করতে পারি সবচেয়ে কম। সবচেয়ে যান্ত্রিক কাজ হচ্ছে সেই কাজ যাতে মজুরদের

দেহের ক্ষতি সাধন করে সবচেয়ে অধিক; যে কাজে দেহের পরিশ্রম সর্বাধিক সেখানে আসে দাস সুলভ আচরণ এবং উত্তম আচরণের প্রয়োজন যে কাজে একেবারেই অনুভূত হয় না সে কাজ হচ্ছে একেবারে অধম।)

তাছাড়া এ সমস্ত বিষয়ের উপর রচিত গ্রন্থাদিও আছে। পারোস-এর চারিস এবং লেমনস-এর এ্যাপোলোডোরাস কৃষির ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন এবং ফল আহরণের বিষয়ে নীতিমালা রচনা করেছেন। অন্যান্য বিষয়েও অপর লেখকগণ লিখেছেন। সুতরাং এ সমস্ত বিষয়ে যাঁদের আগ্রহ রয়েছে তাঁরা এই লেখকদের রচনা পাঠ করতে পারবেন। জীবিকার এই বিষয়গুলি বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। এ কারণে অর্থোপার্জনের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতিতে মানুষ সাফল্য অর্জন করেছে সেগুলির তথ্য প্রথমে সংগ্রহ করা আবশ্যক। দার্শনিক থেলিস[1] এর ন্যায় যাঁরা অর্থোপার্জনের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন তাঁদের জন্য এ কার্য খুবই ফলপ্রদ হবে। থেলিসের দক্ষতার প্রশংসা করে বলা হয় যে, থেলিস অর্থোপার্জনের একটি বিশিষ্ট উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন। অবশ্য উপায়টি যে কেউই অবলম্বন করতে পারে। থেলিস সম্পর্কে কাহিনীটি এরূপ : দার্শনিক থেলিসের দারিদ্র্য দেখে লোকে বলতে লাগল, দর্শনের সার্থকতা কি? দর্শন থেলিসকে দরিদ্র করেছে। কিন্তু থেলিস কার্যক্ষেত্রে এর বিপরীতটি প্রমাণ করলেন। জ্যোতির্বিদ্যায় তাঁর ব্যুৎপত্তির ভিত্তিতে শীতের মরশুমেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, জলপাইয়ের ফলন এবার ভাল হবে। আর সে অনুমান থেকে কিছু পুঁজি সংগ্রহ করে মিলেটাস আর চিয়স-এর সব ঘানিগুলিতেই তিনি দাদন দিয়ে রাখলেন। এর ফলে জলপাইয়ের মরশুমে ঘানিগুলি ব্যবহারের একচেটিয়া এক্তিয়ার তিনি অর্জন করেছিলেন। এতে তাঁর খরচও তেমন কিছু হল না। কারণ, তখন তাঁর প্রতিযোগীও ছিল না। এর ফলে জলপাইয়ের মরশুম যখন এল এবং ঘানি ভাড়া করার চাহিদা যখন তীব্র হয়ে দাঁড়াল তখন থেলিস নিজের ইচ্ছামত মূল্যে দাদন দেওয়া ঘানিগুলোকে ভাড়া খাটাতে লাগলেন। এর দ্বারা তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন এবং তাঁর এই দাবীও প্রমাণ করেছিলেন যে, ইচ্ছে করলে দার্শনিকরাও অর্থবান হতে পারে, যদিচ দার্শনিকদের লক্ষ্য অর্থবান হওয়া নয়। থেলিস সম্পর্কে এ কাহিনীতে দেখা যাচ্ছে, থেলিস এভাবে তাঁর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে আমরা আগেও বলেছি, কৌশলটি খুব অসাধারণ নয়। সাধারণভাবে যে কেউ এটা প্রয়োগ করতে পারে। এর মূল কথা হচ্ছে, ব্যবসায়ে অর্থোপার্জনের পথ হচ্ছে, তোমার যদি সাধ্য থাকে তাহলে তুমি নিজের জন্য একচেটিয়া অধিকার সংগ্রহ কর। সিসিলিতে একটি লোকের কথা জানা যায় যে-লোকটিও তার নিকট গচ্ছিত টাকা দিয়ে লোহা ঢালাইকার থেকে সকল লোহা কিনে নিয়েছিল। আর তারপরে বিভিন্ন কারখানা থেকে লোহার ক্রেতারা যখন এসে উপস্থিত হল তখন এই লোকটি ছিল একমাত্র বিক্রেতা। আর বিক্রয় মূল্য অধিক বৃদ্ধি না করেও সহজেই সে নিজের পঞ্চাশ ট্যালেন্টের[2] পুঁজিকে এক শতে পরিণত করতে সক্ষম হল। সিসিলির শাসক ডায়োনিসিয়াস যখন ব্যাপারটি অবগত হলেন তখন তিনি একে দেশের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর বলে বিবেচনা করলেন। তিনি অবিলম্বে ঐ লোকটিকে সাইরাক্যুজ (সিসিলি) পরিত্যাগ করার আদেশ দিলেন। অবশ্য তার অর্জিত টাকাকে সঙ্গে নেওয়ার অনুমতি তাকে দেওয়া হয়েছিল।

১. থেলিস (৬২৪-৫৪৭ খ্রি. পূ.) : প্রাচীন গ্রিসের অন্যতম প্রকৃতিবাদী দার্শনিক।
২. ট্যালেন্ট : প্রাচীনকালে গ্রিসে প্রচলিত মুদ্রা। ১ ট্যালেন্টের পরিমাণ ২০০ স্টারলিং মুদ্রা বলা যায়।

থেলিস এবং এই লোকিটর দৃষ্টান্ত মূলত এক। উভয়েই নিজেদের জন্য একটি একচেটিয়া শক্তি সৃষ্টি করেছিল। পণ্যের সরবরাহ এবং চাহিদার এরূপ জ্ঞান রাজনীতিকের জন্যও আবশ্যক। কারণ, অনেক নগরী আছে যাদের গৃহাদির চেয়ে অর্থ এবং অর্থোপার্জনের উপায় হিসাবে এই দ্রব্যগুলিরই প্রয়োজন অধিক। আর এ কারণেই আমরা কোন কোন সময়ে দেখতে পাই যে, রাষ্ট্রের পরিচালকগণ অর্থোপার্জনকেই তাদের সমগ্র নীতির কেন্দ্র করে তোলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

পরিবারের মধ্যে সম্পর্কের প্রকার

আমরা পূর্বে দেখেছি, পরিবারের মধ্যে তিনটি সম্পর্কের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তিন প্রকার শাসনের এরা প্রকাশ। এদের একটি হচ্ছে প্রভুর শাসন। এ শাসন স্বৈরতামূলক। এটার আলোচনা আমরা করেছি। অপর শাসন হচ্ছে পিতার শাসন। এবং তৃতীয়টির উদ্ভব ঘটে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে। এটাও আলোচনার অন্তর্গত এ কারণে যে, একদিকে স্ত্রীর এবং সন্তানদের উপর যে শাসন সে শাসন স্বাধীন নাগরিকের উপর শাসন। অপরদিকে স্ত্রী এবং সন্তান উভয়ের ক্ষেত্রে শাসন এক নয়। স্ত্রীর উপর স্বামীর শাসন হচ্ছে রাজনৈতিক শাসন, রাষ্ট্রপ্রাজ্ঞের শাসন। কিন্তু সন্তানের উপর পিতার শাসন রাজার শাসন। রাজকীয় শাসন। এরও কারণ হচ্ছে, অবস্থা যদি একেবারে ভিন্নতর না হয় তাহলে আমাদের বলতে হবে, শাসনের ক্ষেত্রে মেয়েদের চেয়ে পুরুষ এবং অল্প বয়স্ক এবং অপরিপক্কের চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং পরিপক্করাই অধিকতর উপযুক্ত। এটা অবশ্য সত্য যে, যে-সকল রাষ্ট্রের শাসন যথার্থই রাজনৈতিক সে সব রাষ্ট্রের অধিকাংশেই শাসক এবং শাসিতের মধ্যে ভূমিকার পারস্পরিক পরিবর্তন ঘটে থাকে। এরূপ পরিবর্তনের লক্ষ্য হচ্ছে উভয়ের মধ্যে একটা সাম্য এবং পার্থক্যহীনতার অবস্থা তৈরি করা। কিন্তু এক্ষেত্রেও যতক্ষণ একজন শাসক এবং অপরজন শাসিত ততক্ষণ শাসকের প্রবণতা হবে মর্যাদার বাহ্যিক প্রকাশে, সম্বোধনের রীতিতে এবং সম্মান প্রদর্শনের পদ্ধতিতে নিজেকে শাসিত থেকে বিশিষ্ট বলে চিহ্নিত করার। (কোন নাগরিক যখন রাষ্ট্রের কোন উর্ধতন অফিসার হিসাবে নিযুক্ত হন তখন সম্মান তার প্রাপ্য হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রায় স্নানঘরের পাথর দিয়ে তৈরি করা দেবতা আমাসিসের মত। স্নানঘরের পাথর দিয়ে তৈরি আমাসিসের মূর্তিকেও আমাদের সম্মানের পাত্র বলে আমরা মনে করি।) পুরুষ এবং মেয়েদের মধ্যে উত্তম এবং অধমের যে সম্পর্কের কথা বলেছি, তার পরিবর্তনের কথা চিন্তা করা যায় না। সন্তানদের উপর পিতার শাসন রাজকীয়। বয়স এবং স্নেহের কারণেই সে শাসক। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে রাজার শাসনেরও মূল হচ্ছে এই অবস্থা। এ কারণেই হোমার[১] যখন মহাদেব জিউসকে দেবতাকুল এবং মানুষ—উভয়ের পিতা বলে উল্লেখ করেন তখন তিনি ঠিক কাজই করেন। কারণ জিউস সকলের রাজা। রাজা প্রজাদের কাছ থেকে জন্মগভাবে পৃথক নয় বটে, কিন্তু গুণের ক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই উচ্চতর হতে হবে। বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বয়োকনিষ্ঠ এবং পিতা ও সন্তানের ক্ষেত্রেও এই কথা সত্য।

---

১. হোমার : প্রাচীন গ্রিসের প্রখ্যাত কবি, আনুমানিক ৮৫০ খ্রি. পূ. কালের। মহাকাব্য 'ইলিয়াড' এবং 'ওডিসি'র রচয়িতা বলে পরিচিত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

শাসক এবং শাসিত : দুইএর গুণ কি এক কিংবা ভিন্ন?

তাহলে এটা পরিষ্কার যে পরিবারের ক্ষেত্রে দ্রব্য সামগ্রী অর্থাৎ যা দিয়ে সম্পদ তৈরি হয় তার চেয়ে মানুষ এবং তাদের গুণাগুণ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। এবং দাসদের ব্যাপারেও বলব, দাসদের চেয়ে স্বাধীন নাগরিকের গুরুত্ব অধিক। দাসদের ক্ষেত্রে প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, গৃহের হাতিয়ার এবং ভৃত্য হিসাবে তাদের যে গুণ রয়েছে আমরা কি তার অতিরিক্ত অপর কোন গুণের কথা বলতে পারি যে গুণ দাসদের রয়েছে? যেমন আত্মসম্মান, সাহস, ন্যায়বোধ এবং এ রকম অন্যান্য গুণের অধিকারী কি দাসরা হতে পারে? প্রশ্নটা অন্যভাবেও করা যায়। নিজেদের দেহ দিয়ে সেবা করা ব্যতীত দাসদের কি আর কোন গুণ নেই?

প্রশ্নটির দু'রকমের জবাব হতে পারে। অবশ্য দুটো জবাবেরই একটা অসুবিধার দিক রয়েছে। আমরা যদি বলি, যে গুণগুলোর উল্লেখ আমরা করেছি দাসদের সে সকল গুণ আছে, সেক্ষেত্রে প্রশ্ন দাঁড়াবে, তাহলে স্বাধীন নাগরিক থেকে দাসদের পার্থক্য কোথায়? আবার আমরা যদি বলি, দাসদের এ সকল গুণ নাই, তাহলেও ব্যাপারটাতে অসঙ্গতি দেখা দিবে। কারণ, দাসরা তো মানুষ এবং তাদের চিন্তার ক্ষমতা আছে। কথাটা কিন্তু সাধারণভাবে স্ত্রী এবং সন্তানের ক্ষেত্রেও বলা চলে। এদের কি এসব গুণ নাই? স্ত্রীলোক কি আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন, সাহসী এবং ন্যায়পরায়ণ হয় না? শিশুদেরও কি আমরা কখনো দুষ্ট এবং কখনো বা ভাল হতে দেখি না?

শাসক এবং শাসিতের সম্পর্কের বিষয়ে আমাদের যে প্রশ্ন, বৃহত্তর সেই প্রশ্নের অংশ হিসাবেই এই প্রশ্নগুলোকেও দেখা যায়। বিশেষ করে কথা হচ্ছে, শাসক ও শাসিত—এ দুইয়ের গুণ কি এক, না ভিন্ন? ধরা যাক, আমরা বললাম, দু'য়েরই গুণ এক এবং উভয়ের ক্ষেত্রেই এগুণের সর্বোত্তমই অবশ্যক, তখন প্রশ্ন দাঁড়াবে, তাহলে শাসক কেবল শাসন করবে এবং শাসিত কেবল মান্য করবে, এর যুক্তি কি? ('পরিমাণগত পার্থক্য' কথাটি এখানে ঠিক হবেনা। শাসন করা এবং মান্য করার পার্থক্য গুণগত পার্থক্য। পরিমাণগত পার্থক্য এখানে প্রয়োজন নয়।) অপরদিকে এদের এক পক্ষকে যদি আমরা গুণের অধিকারী বলি এবং অপর পক্ষকে গুণহীন বলি তাহলেও একটি অদ্ভুত অবস্থার উদ্ভব ঘটে। কারণ, একথা যেমন সত্য, যে-শাসক তার যদি ন্যায় এবং আত্মসংযমের গুণ না থাকে তাহলে সে উত্তমরূপে শাসন করতে সক্ষম হয় না; তেমনি সত্য, যে-শাসিত তারও যদি গুণের অভাব ঘটে তাহলে সে উত্তমরূপে শাসিত হতে পারে না। কারণ, যে শাসিত তার চরিত্রে যদি শিথিলতা থাকে, যদি অবাধ্যতা থাকে তাহলে সে তার কর্তব্য পালন করবে না। কাজেই এটা পরিষ্কার যে, উত্তম গুণের প্রশ্নে শাসক এবং শাসিত—এদের উভয়েরই উত্তম গুণের আবশ্যক। অবশ্য গুণের প্রকৃতির ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকতে পারে : উভয়েরই ভিন্ন ভিন্ন উত্তম গুণের প্রয়োজন হতে পারে।

উত্তম গুণের এই উল্লেখ থেকে আমাদের সরাসরি আত্মার আলোচনাটিতে যেতে হয়। কারণ, প্রকৃতিগতভাবে শাসক এবং প্রকৃতিগতভাবে শাসিত বলে গুণের যে পার্থক্য আমাদের বিবেচনার বিষয়, তার সাক্ষাৎ আমরা আত্মার মধ্যেই দেখতে পাব। আত্মার ক্ষেত্রে শাসক শাসিতের পার্থক্য হচ্ছে যুক্তিএবং অযুক্তির পার্থক্য। কাজেই এটা পরিষ্কার যে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও স্বাভাবিকভাবেই পার্থক্যের উদ্ভব হবে। এবং শাসক এবং শাসিতের ক্ষেত্রে কথাটি সত্য। অবশ্য তার অর্থ এই নয় যে, উভয়ের ক্ষেত্রে পার্থক্যটা এক হবে। কারণ, দাসের উপর প্রভুর শাসন, স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের শাসন এবং ছোটর উপর বড়র শাসনের কথা যদি আমরা বলি তাহলে দেখব যে এদের প্রত্যেকটি স্বাভাবিক, কিন্তু সকলে এক নয়। কারণ, এদের প্রত্যেকের মধ্যে আত্মার অংশ আছে বটে, কিন্তু তার বণ্টন বিভিন্ন। কারণ, একজন দাসের মধ্যে আত্মার যুক্তির অংশটি যেখানে আদৌ নেই, সেখানে স্ত্রীলোকদের মধ্যে তা নিষ্ক্রিয় এবং শিশুদের মধ্যে অবিকশিত। আমাদের তাই সিদ্ধান্ত হবে যে, নৈতিক গুণের ক্ষেত্রেও এ কথাটি সত্য। অর্থাৎ এ গুণ সকলের ক্ষেত্রে থাকতে হবে বটে, কিন্তু তার পরিমাণ সর্বত্র সমান হবে না। উত্তমরূপে দায়িত্ব-পালনের প্রয়োজনীয় পরিমাণ গুণই থাকবে, অধিক নয়। এবার তাহলে আমরা বলতে পারি, শাসকের নৈতিক গুণ হবে সামগ্রিক। কারণ, শাসক হচ্ছে প্রধান নির্মাতা। কিন্তু সমাজের অন্যান্য সদস্যদের ক্ষেত্রে এর পরিমাণ হবে তাদের কার্য অনুযায়ী। যা হোক, এটা এবার স্পষ্ট, শ্রেণী হিসাবে যাদের কথা আমরা উল্লেখ করেছি তাদের সকলেরই নৈতিক গুণ থাকতে হবে। এবং এটাও স্পষ্ট যে, পরিমাণের ক্ষেত্রে এর পার্থক্য ঘটবে। পুরুষের আত্মসম্মান এবং স্ত্রীলোকের আত্মসম্মান কিংবা তাদের ন্যায়বোধ বা সাহস, সক্রেটিস যেরূপ মনে করেছেন, সেরূপ এক নয়। যেমন একের ক্ষেত্রে সাহস হচ্ছে শাসকের সাহস, অপর ক্ষেত্রে সাহস হচ্ছে ভৃত্যের সাহস। এ দুটো এক নয়। অপরাপর গুণের ব্যাপারেও এই কথাটিকে আমরা সত্য বলব।

বিষয়টির প্রতি আর একটু বিস্তারিত দৃষ্টি দিলে কথাটি অধিকতর পরিষ্কার হবে। কারণ, সাধারণভাবে যাঁরা বলেন যে, উত্তম গুণ হচ্ছে আত্মার অবস্থার শর্তবিশেষ, অথবা উত্তম গুণ হচ্ছে সঠিক আচরণ, কিংবা অনুরূপ অন্য কোন উক্তি যাঁরা করেন তাঁরা নিজেদেরকে ভ্রান্তির মধ্যে আবদ্ধ করেন। যাঁরা এসব ক্ষেত্রে সাধারণ সংজ্ঞার চেষ্টা করেন তাঁদের চয়ে গরজিয়াস[১]-এর ন্যায় উত্তম হচ্ছেন তাঁরা যাঁরা বিভিন্ন গুণের একটা বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এ কারণে কবি সফোক্লিস[২] 'নীরবতাকে' মেয়েদের একটি গুণ বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে নীরবতা কোন গুণ নয়। কার্যের দ্বারা কোন গুণের বিচার করার এই পদ্ধতিটি উত্তম। সর্বদা এটিই আমাদের অনুসরণ করা উচিত। ধরা যাক একটি শিশুর কথা। 'শিশু'র অর্থ হচ্ছে সে এখনো পূর্ণভাবে বিকশিত হয় নি। তার ধর্ম হচ্ছে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া। সে-কারণে তার এই গুণটিকে আমরা কেবল তার মধ্যে আবদ্ধ বলতে পারি নে। এই গুণটিকে যেমন বুঝতে হবে তার বিকাশের অগ্রগতির ভিত্তিতে, তেমনি তার পরিচর্যায় নিযুক্ত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতেও। দাস এবং প্রভুর ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য। আমরা নির্দিষ্ট করে বলেছি, দাসের কাজ হচ্ছে দৈহিক কার্য সাধন করা। এ কারণে তার প্রয়োজনীয়

১. গরজিয়াস (খ্রি. পূ. ৪৮৩-৩৭৫) : প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক। জন্ম সিসিলিতে। সফিস্ট সম্প্রদায়ভুক্ত অজ্ঞেয়বাদী দার্শনিক হিসাবে ইনি দর্শনের ইতিহাসে পরিচিত।

২. সফোক্লিস (খ্রি. পূ. ৪৯৬-৪০৬) প্রাচীন গ্রিক কবি এবং নাট্যকারদের অন্যতম।

গুণের পরিমাণ অধিক হওয়ার কথা নয়। শিথিল জীবনযাপন কিংবা অসতর্কতার জন্য তার এই কার্য যেন অবহেলিত না হয় তার নিশ্চয়তার জন্য যে পরিমাণ গুণের আবশ্যক, দাসের গুণের পরিমাণ নিশ্চয়ই ততটুকু হবে। এর অধিক নয়।

একজন দাস-শ্রমিক সম্পর্কে এ কথা সত্য হলে প্রশ্ন উঠবে, স্বাধীন শ্রমিকও যেন উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের মাধ্যমে তার দায়িত্ব অবহেলা না করে সেজন্য তারও কি গুণের আবশ্যক হবে না? এর জবাব হবে : হাঁ, গুণের আবশ্যক হবে। কিন্তু দুটো দৃষ্টান্তকে একই সমান্তরালে দেখা চলে না। দুজনের কাজ একই প্রকারের হতে পারে। কিন্তু দুজনের জীবনপ্রণালী ভিন্ন প্রকারের। যে দাস সে তো প্রভুর পরিবারেই বাস করে। কিন্তু যে স্বাধীন শ্রমিক সে তার নিয়োগকারী থেকে আলাদা বাসস্থানে বাস করে। তাকে দাসের সমান এভাবে বলা চলে যে, তার কাজে সে যে পরিমাণ আবদ্ধ সেই পরিমাণে তারও দাসোচিত গুণের আবশ্যক। কারণ, দৈহিক শ্রমে আবদ্ধ যে-কেউই সীমাবদ্ধ অর্থে দাসত্বের অবস্থায় অবস্থিত। তবে দাস-শ্রমিক এবং স্বাধীন-শ্রমিকের পার্থক্য এখানে যে, দাস প্রকৃতিগতভাবে দাস। কিন্তু একজন হস্তশিল্পী বা পাদুকা-নির্মাণকারীকে আমরা প্রকৃতিগতভাবে দাস বলতে পারিনে। এ থেকে এটা পরিষ্কার যে, দাসের যে গুণের আবশ্যক প্রভুকেই তার উৎস হতে হবে। (আমি অবশ্য নৈতিক গুণের কথাই বলছি। প্রভু তার দাসদের উত্তম হতে শিক্ষা দিতে পারে। প্রভুর এরূপ শিক্ষা দেওয়ার গুণের কথা নয়।) কাজেই যারা বলবে যে, দাসদের আদৌ কোন বুদ্ধি নেই এবং প্রভুরও কেবল হুকুম দেওয়া বাদে অপর কোন গুণের আবশ্যকতা নেই, তাদের কথা ঠিক নয়। উপদেশ এবং পরামর্শ বরঞ্চ সন্তানদের চাইতে দাসদেরই অধিকতর উপযুক্তভাবে দেওয়া যায়।

এ সমস্ত বিষয়ে আমাদের আলোচনা এ পর্যন্তই থাক। কিন্তু পরিবারের মধ্যে স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক, সন্তানবর্গ এবং পিতার মধ্যকার সম্পর্ক—এবং এই সম্পর্কের প্রত্যেকটির নিজস্ব গুণাগুণ কিংবা এদের মধ্যকার পারস্পরিক আচরণ, এর মধ্যে কোন্‌টি সঠিক এবং কোন্‌টি সঠিক নয়, পরিবারের মধ্যে উত্তম সাধনের চেষ্টা এবং অধমকে পরিহারের চেষ্টা—এ সকল বিষয়ের আলোচনা শাসনব্যবস্থার প্রকারসমূহের আলোচনা প্রসঙ্গে করাই উত্তম হবে। কারণ, উপরোক্ত বিষয়গুলো পরিবারেরই অঙ্গীভূত এবং প্রত্যেকটি পরিবারই আবার রাষ্ট্রের অংশ। সেদিক থেকে অংশের গুণাগুণ সমগ্রের গুণাগুণের ভিত্তিতেই আলোচনা করা সঙ্গত। এ কথার অর্থ, সন্তানবর্গ এবং স্ত্রীলোক—তাদের সকলের শিক্ষাই পরিচালিত হওয়া উচিত রাষ্ট্রের স্বার্থের ভিত্তিতে। অন্ততঃপক্ষে আমরা যদি স্বীকার করি যে, শিশুরা এবং মেয়েরা উত্তম কিংবা উত্তম নয়—এ বিষয়টি রাষ্ট্রের ভালমন্দের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে এদের শিক্ষার বিষয়ে আমাদের বক্তব্যকে সঠিক বলতে হবে। এদের উত্তম হওয়া, না-হওয়া রাষ্ট্রের ভালমন্দের ক্ষেত্রে অবশ্যই একটি পার্থক্য সৃষ্টি করে। কারণ, বয়ঃপ্রাপ্ত স্বাধীন অধিবাসীদের অর্ধেক স্ত্রীলোক। এবং শিশুদের মধ্য থেকেই ভবিষ্যতে যারা নাগরিক হবে এবং রাষ্ট্র পরিচালনে অংশগ্রহণ করবে তাদের আগমন ঘটবে।

যাহোক, কতগুলো ব্যাপারের আলোচনা যখন আমরা সমাপ্ত করেছি এবং স্থির করেছি অবশিষ্টগুলির আলোচনা অন্যত্র করা যাবে, তখন পরিবার-সংক্রান্ত আলোচনার এখানে ইতি টেনে একটা নতুন আলোচনা আমরা শুরু করতে পারি। এবং এই নতুন বিষয়ের মধ্যে প্রথম আলোচ্য হিসাবে আমরা সর্বোত্তম প্রকারের শাসন সম্পর্কে যাঁরা অভিমত প্রকাশ করেছেন তাঁদের অভিমতসমূহই আমাদের সামনে রাখব।

দ্বিতীয় পুস্তক

প্রথম অধ্যায়

আদর্শ রাষ্ট্রের প্রশ্ন : উত্তম রাষ্ট্র প্রকল্পের আলোচনা

[প্রথম পুস্তকের শেষ বাক্যটিতেই দ্বিতীয় পুস্তকের মূল আলোচ্যের আভাস পাওয়া যায়। অর্থাৎ দ্বিতীয় পুস্তকের বিষয় হচ্ছে আদর্শ রাষ্ট্র ব্যবস্থা সম্পর্কে প্লেটো এবং অন্যান্য চিন্তাবিদদের ধারণার আলোচনা। তাছাড়া বাস্তব কয়েকটি রাষ্ট্র যাদের শাসন ব্যবস্থাকে এ্যারিস্টট্‌ল উত্তম বলে বিবেচনা করেন তার বর্ণনাও এ পুস্তকে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পুস্তকের তাই একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এ আলোচনাকে আমরা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক আলোচনার ইতিহাসে পথিকৃৎ বলে বিবেচনা করতে পারি।]

রাষ্ট্রকে আমরা আখ্যায়িত করেছি সমিতি বা অংশীদারীত্বমূলক সংস্থা হিসাবে। এই সংস্থার প্রকারভেদ হচ্ছে আমাদের বর্তমানের আলোচনার বিষয়। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, ধরা যাক আমাদের ইচ্ছামত আমরা রাষ্ট্র তৈরি করতে পারি, তাহলে এমন অংশীদারী সংস্থার সবচেয়ে উত্তম বা আদর্শ রূপটি কি? এ জবাবের পূর্বে আমাদের রাষ্ট্রীয় সংবিধানের কিছু নমুনা নিয়ে আলোচনা করা উচিত। আমাদের উচিত, যে সমস্ত রাষ্ট্রের সুশাসিত বলে খ্যাতি আছে কিংবা লেখকরা যে সমস্ত সংবিধান রচনা করেছেন এবং যেগুলি উত্তম বলে বোধ হয় তাদের সম্পর্কে আমাদের বিবেচনাটি আগে নিষ্পন্ন করা। এ ক্ষেত্রে আমাদের উদ্দেশ্য অংশত এই যে, এর দ্বারা আমরা দেখব, এদের মধ্যে, উত্তম এবং উপকারী বৈশিষ্ট্য কি আছে এবং এমন বৈশিষ্ট্য কি আছে যেগুলিকে উত্তম বলা চলে না। তবে এখানে একটা বিষয় পরিষ্কার থাকা উচিত। যে সকল নমুনা নিয়ে আমরা আলোচনা করব তাদের থেকে ভিন্নতর কোন আদর্শের যদি আমরা অন্বেষণ করি সে আমাদের খেয়াল বা বুদ্ধিমত্তা দেখাবার ইচ্ছার কারণে নয়। এই পদ্ধতিটি, আমরা গ্রহণ করেছি কেবল এই কারণেই যে সংবিধানের কল্পনা কিংবা বাস্তবে কার্যরত নমুনা—এদের কোনটিই পরিপূর্ণরূপে সন্তোষজনক নয়।

[আলোচনা কিছুটা অগ্রসর হতেই দেখা যায়, এ্যারিস্টট্‌ল প্লেটোর 'রিপাবলিক' এর দুর্বলমত জায়গাগুলি, বিশেষ করে রাষ্ট্রের সংহতি এবং ঐক্য এবং সম্পত্তি ও সম্পদের উপর শাসকদের যৌথ স্বামিত্বের উপর প্লেটোর প্রস্তাবগুলির সমালোচনা করছেন। সে কারণে পুস্তকের সূচনার বক্তব্যটিকে তাঁর এ ব্যপারে কৈফিয়ৎ বলে বিবেচনা করা চলে।]

আমাদের আলোচনার বিষয় যখন অংশীদারীত্বের প্রকারভেদ তখন স্বাভাবিকভাবে আমাদের শুরু করতে হয় এই প্রশ্ন থেকে : 'কি বিষয়ের অংশীদারীত্ব এবং কারা অংশীদার?' একটা রাষ্ট্রে এ প্রশ্নে ব্যাপারটা এ রকম হতে পারে : ১. রাষ্ট্রের সকল নাগরিক

সকল দ্রব্যের অংশীদার; অথবা ২, তারা কোন কিছুর অংশীদার নয়; কিংবা ৩. তারা কোন কোন ক্ষেত্রে অংশীদার—কিন্তু বাকি বিষয়ে অংশীদার নয়। এখানে জবাব পরিষ্কার। রাষ্ট্রের নাগরিকদের অংশীদারীত্ব বা যৌথ মালিকানা কোন কিছুতে থাকবে না, এমনটি হতে পারে না। কারণ রাষ্ট্রের যেটি এলাকা বা ভূখণ্ড রাষ্ট্রের সদস্য সকলেই তার অংশীদার বা যৌথ মালিক। একটি এলাকা নিয়ে একটি রাষ্ট্র এবং একটি রাষ্ট্রের সকলে সদস্য। তাহলে প্রশ্ন অবশিষ্ট থাকে দুটি। প্রশ্ন হচ্ছে : ১. একটি নগর তথা রাষ্ট্রকে যদি সুশাসিত হতে হয় তাহলে উত্তম কি? উত্তম কি এই এই যে, রাষ্ট্রের যে সকল দ্রব্যসামগ্রীর উপর অংশীদারীত্ব বা যৌথমালিকানা স্থাপন করা সম্ভব তাদের উপর সকল নাগরিকেরই যৌথমালিকানা স্থাপিত হবে? অথবা এদের কোন কোনটির উপর অংশীদারীত্ব স্থাপিত হলেও বাকিগুলির উপর তা হবে না? এ কথা ঠিক, প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এ যেমন বলা হয়েছে তেমনভাবে রাষ্ট্রে স্ত্রী-পুত্র এবং সম্পত্তিকে যৌথ বা অংশীদারীত্বের ভিত্তিতে ভোগ করা সম্ভব। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, এ সবক্ষেত্রে আমাদের প্রচলিত ব্যবস্থাকে আমরা সমর্থন করব কিংবা 'রিপাকলিক' এর প্রস্তাবকে আমরা গ্রহণ করব?

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্লেটোর প্রস্তাবিত সাম্যবাদের সমালোচনা

স্ত্রীদের উপর যৌথ মালিকানার প্রস্তাবটির মধ্যে নানা অসুবিধা বিদ্যমান। এদের মধ্যে তিনটি হচ্ছে প্রধান : ১. সক্রেটিস এ প্রশ্নে যা বলেছেন তাতে এটা স্পষ্ট হয় না, কি কারণে এই প্রথাকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করা উচিত; ২. এই সংলাপে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের যে লক্ষ্যের কথা বলা হয়েছে সে লক্ষ্য সাধনের উপায় হিসাবেও যদি এই প্রস্তাবকে দেখা হয় তাহলেও প্রস্তাবটিকে প্রয়োগযোগ্য বলে মনে করা যায় না; এবং ৩. সংলাপে কোথাও বলা হয়নি, প্রস্তাবটিকে কিভাবে বাস্তবায়িত করা হবে। আমি এখানে সক্রেটিসের একটি নীতির উল্লেখ করব। সক্রেটিস বলেছেন, 'রাষ্ট্রের মধ্যে যত অধিক ঐক্য সাধিত হয় তত উত্তম।' কিন্তু এ কথাটি নিশ্চয়ই যথার্থ নয়। যে রাষ্ট্রে ক্রমাধিক পরিমাণ ঐক্য সাধিত হয় সে রাষ্ট্র পরিশেষে আর রাষ্ট্ররূপেই অস্তিত্বমান থাকে না। বৈচিত্র্য হচ্ছে রাষ্ট্রের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। এবং এই বৈচিত্র্য থেকে একটি রাষ্ট্র যত দূরত্বের দিকে অগ্রসর হবে, তার রাষ্ট্রত্বও ততবেশি হ্রাস পাবে। সে রাষ্ট্র থেকে ক্রমান্বয়ে পরিবারে এবং পরিবার থেকে ব্যক্তিতে পর্যবসিত হবে। এ কথা আমি বলছি কারণ, রাষ্ট্রের চেয়ে পরিবারের মধ্যেই নিশ্চয়ই ঐক্য অধিক এবং পরিবারের চেয়েও ঐক্য অধিক ব্যক্তিতে। কাজেই, এমন ঐক্য সাধন করা যদি সম্ভব হয় তাহলেও এমন ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা আমাদের উচিত নয়। তাহলে রাষ্ট্রই ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ, রাষ্ট্র কেবল মানুষ নিয়ে গঠিত নয়, রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রকারের মানুষ নিয়ে গঠিত। কেবল এক প্রকারের মানুষ নিয়ে আমরা কোন রাষ্ট্র গঠন করতে পারিনে।

এখানে একটি রাষ্ট্র এবং কোন একটি জোট-এর মধ্যকার পার্থক্যের বিষয়টি বিবেচনা করা যায়। একটি জোটের লক্ষ্য হচ্ছে সামরিক সাহায্য প্রদান। এবং সামরিক সাহায্যের সার্থকতা নির্ভর করে তার পরিমাণের উপর, তার ভিতরের প্রকারের উপর নয়। এখানে পরিমাণ যত বেশি হবে, শক্তি তত বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বিষয়টি আলাদা। রাষ্ট্র তৈরি করতে বিভিন্নপ্রকার মানুষেরই আবশ্যক। আমার 'নীতিশাস্ত্রে' এই কথাটি আমি বলেছি। একটি নগর তথা রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে উত্তম ভারসাম্য যত বজায় রাখা সম্ভব তত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব রক্ষিত হবে। এই ভারসাম্য রাষ্ট্রের যারা স্বাধীন এবং সমান নাগরিক তাদের মধ্যেও আবশ্যক। কারণ তাদের সকলে একই সঙ্গে শাসনের পদে যেতে পারে না। এক বছরের জন্য যদি কেউ শাসনের পদে অধিষ্ঠিত হয়, তবে বৎসরান্তে অপরের জন্য সে পদকে ছেড়ে দিতে হবে। এতে এটি নিশ্চিত হয় যে, পালাক্রমে সকলেই শাসন করতে পারবে। ব্যাপারটি প্রায় এ রকম যে, পাদুকা প্রস্তুতকারক এবং সূত্রধর—এরা একই রকম কাজে সর্বদা নিযুক্ত থাকার বদলে একে অপরের স্থানটি পালাক্রমে বদল করে নিল। এই উপমার ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, তার চেয়ে পাদুকা

প্রস্তুতকারক বা সূত্রধরের ন্যায় রাজনীতিক শাসকেরও কোন পালাবদল হওয়া উচিত নয়। যারা শাসক তাদের সর্বদাই শাসক থাকা উত্তম। কিন্তু প্রকৃতিগতভাবে সকলেই যেখানে সমান সেখানে এই ব্যবস্থা সম্ভব নয়। কারণ সমানের ক্ষেত্রে সকলেরই শাসনের অধিকার জন্মায়। কেউ কারুর চেয়ে ভাল কিংবা মন্দ শাসন করল সেটি বড় কথা নয়। এতে দুটো নীতির প্রতিফল ঘটে : ১. সমান সমানকে পথ ছেড়ে দেয়; ২. শাসনের বাইরে সকলে সমান। শাসনের সময়ে কেউ শাসন করে এবং কেউ শাসিত হয়। এবং শাসক-শাসিতের পালাবদলের মাধ্যমে সকলেরই স্থানান্তর ঘটে। শাসকদের মধ্যেও কর্মান্তরের প্রয়োজন আছে। কেউ এখন যদি একটি কর্মে রত থাকে, অপর সময়ে সে অপর কর্মে রত হতে পারে। বিভিন্নতার এই প্রয়োজন থেকে একথা পরিষ্কার যে, রাষ্ট্রকে অনেকে যেভাবে মনে করে প্রকৃতিগতভাবে রাষ্ট্রের ঐক্য সেরূপ নয়। এবং অনেক সময়ে সর্বাধিক যে ঐক্যকে সর্বাধিক পরিমাণে উপকারী মনে করা হয় সে ঐক্য রাষ্ট্র লোপেরই কারণ হয়। কোন কিছুর যা উপকারী তা তাকে রক্ষা করে, তাকে বিলুপ্ত করে না। আর একটি ক্ষেত্রেও দেখা যাবে যে, ঐক্যের আধিক্য রাষ্ট্রের জন্যে উপকারী নয়। পরিবার ব্যক্তির চেয়ে অধিকতর স্বয়ংসম্পূর্ণ সত্তা। আবার রাষ্ট্র পরিবারের চেয়ে অধিকতর স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং এর পরে যখন জনসমষ্টির ভিত্তিতে এমন একটি সংস্থা গঠিত হয় যেটি পরিপূর্ণরূপে স্বয়ংসম্পূর্ণ তখনি আমরা নগর বা রাষ্ট্রে উপনীত হই। কাজেই অল্পতরের চেয়ে অধিকতর স্বয়ংসম্পূর্ণতা যেখানে কাম্য সেখানে অধিকতরের চেয়ে অল্পতর ঐক্যই বাঞ্ছনীয়।

তৃতীয় অধ্যায়

যৌথ মালিকানার অসুবিধাসমূহ

তাছাড়া একটি রাজনৈতিক সংস্থার মধ্যে ঐক্যের উপর যত গুরুত্বই আমরা আরোপ করিনা কেন, যৌথ মালিকানার যুক্তি ঐক্যের সে নীতিকে সমর্থন করে না। সক্রেটিসের অভিমত হচ্ছে, নগরের মধ্যে কোন একটি বিষয়কে সকলেই যদি 'আমার' এবং 'আমার নয়' বলে বোধ করে তাহলেই রাষ্ট্রের মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্য সূচিত হবে। কিন্তু এটি ঠিক নয়। 'সকল" কথাটিও দু'ভাবে ব্যবহার করা চলে : 'ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সকল' এবং মিলিতভাবে সকল।' 'ভিন্ন ভিন্নভাবে' ব্যবহৃত হলে সক্রেটিসের লক্ষ্য অধিকতর উত্তমরূপে হয়ত সাধিত হতে পারে। কারণ সে ক্ষেত্রে প্রত্যেকে বিশেষ পুত্রকে সর্বদা নিজের পুত্র বলে বিবেচনা করবে এবং নির্দিষ্ট স্ত্রীকে সর্বদা নিজের স্ত্রী বলে মনে করবে। অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রীর ক্ষেত্রেও সে এভাবে চিন্তা করবে। কিন্তু এজমালী বা যৌথভাবে স্ত্রী ও সন্তানদের মালিক হলে লোকে এরূপে চিন্তা করতে পারে না। তারা তখন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে নয়, সকলে মিলিতভাবে একটি বিষয়ের মালিকানার দাবী করবে। স্ত্রী পুত্রদের ব্যাপারে যেমন, অন্যান্য বিষয়েও এমনি হবে। কাজেই 'সকল' শব্দটির ব্যবহার এখানে বিভ্রান্তিকর। 'উভয়' 'বেজোড়' 'জোড়' প্রভৃতি দ্ব্যর্থক শব্দের ন্যায় 'সকল' শব্দও যুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ রকমের বিতর্কমূলক সিদ্ধান্তের উদ্ভব ঘটায়। কাজেই 'সকলে' এক কথা বলছে—এ অবস্থাটি চিন্তা করতে মনোহর বোধ হলেও, এক অর্থে এ রকম অবস্থা অচিন্তনীয় ; অপর অর্থে এর দ্বারা রাষ্ট্রে সংহতির ভাব বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না।

তাছাড়া যৌথ স্বামিত্বের আর একটি অসুবিধা রয়েছে। অসুবিধাটি হচ্ছে এই যে, মালিকের সংখ্যা যত বৃহৎ হবে, সম্পদের ওপর যত্ন তত হ্রাস পাবে। মানুষের স্বভাব হচ্ছে এরূপ যে, যৌথভাবে সে যার মালিক তার প্রতি যত্নের চাইতে ব্যক্তিগতভাবে সে যার মালিক তার প্রতি অধিকতর যত্ন সে প্রদান করে। যৌথ বা জনসম্পদের প্রতি আগ্রহ তার মাত্র ততটুকু যতটুকু তার নিজের স্বার্থ সেখানে জড়িত আছে বলে সে মনে করে। আমাদের পরিবারে গৃহভৃত্যদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি এরূপই ঘটে। সংসারে গৃহভৃত্যের সংখ্যা যত অধিক হয়, কাজ তত কম হয়। পরিবারের উপর যৌথ স্বামিত্বের যে কথা উঠে সে ক্ষেত্রে এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করে আমরা বলতে পারি, প্রত্যেক নাগরিকের তাহলে হাজারটি সন্তান থাকবে বটে কিন্তু এরা কোন একজনের সন্তান হবে না। এদের যে কেউ যে কারুর সন্তান বলে গণ্য হবে। এর ফলে কোন পিতাই এদের কারুর পরিচর্যাতেই তেমন যত্নবান হবে না। তাছাড়া এভাবে কোন নাগরিক যখন অপর কোন নাগরিকের প্রসঙ্গে 'আমার' শব্দটি ব্যবহার করবে তখন সে তার নিজের মালিকানাকে একটি বড় সংখ্যার ভগ্নাংশ হিসাবেই দেখবে। যখন কথা উঠবে 'আমার পুত্র' কিংবা 'অমুকের পুত্র' বেশ 'ভাল করছে' অথবা 'ভাল করছে না' তখন বক্তা নিজেকে হাজার পিতার (অথবা

সংখ্যাটা যাই হোক না কেন) একজন হিসাবে মাত্র চিন্তা করতে পারবে। সে চিন্তাতেও তার নিশ্চয়তা কোথায়? সে কেমন করে জানবে যে, তার জাত সন্তানটি এই হাজার সন্তানের মধ্যে জীবিত আছে, কিংবা সে আদৌ এর কোন একটির পিতা? একটি দ্রব্য বা বিষয়কে নিয়ে দু'হাজার বা দশ হাজার লোকের একই সঙ্গে 'আমার' বলার চাইতে সাধারণভাবে আমরা যেরূপ 'আমার' কথাটি ব্যবহার করি সেটিই কি অধিকতর উত্তম নয়? সাধারণ অর্থে আমরা কি করি? সাধারণভাবে এক ব্যক্তি তার নিজের সন্তানকে যখন 'পুত্র' বলে, অপরেও তাকে 'আমার পুত্র' না বলে 'আমার ভাই' বলে সম্বোধন করে ; তৃতীয় কেউ হয়ত তাকে 'আমার মামাত কিংবা ফুফাত ভাই' বলে কিংবা রক্ত বা বিবাহগত অপর কোন সাক্ষাৎ কিংবা দূরগত আত্মীয়তার কথা দিয়ে সম্বোধন করে। কেবল আত্মীয়তা নয়। অপর কেউ হয়ত তাকে তার সংঘ বা গোত্রের সভ্য হিসাবে অভিহিত করবে। আসলে, ভাগে পুত্র লাভ করার চেয়ে যে কেউ একজন আস্ত ভাই পেতেই বেশি আগ্রহ বোধ করবে। তাছাড়া কে কার বাবা, মা, বা ভাই হতে পারে তা নিয়ে অনুমান করার ইচ্ছা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করা যাবে কি প্রকারে : পিতামাতা ও সন্তানের মধ্যে নানা প্রকারেরই সাদৃশ্য থাকে। সে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে তারা পরস্পরকে চিনে ফেলবে। বস্তুত সর্বত্র এমনটিই হয়। পর্যটকদের কাছ থেকে আমরা এই বিবরণী পেয়ে থাকি। পর্যটকরা এমন বলেছেন, যে, উত্তর লিবিয়ার অনেক সমাজে যৌথ স্ত্রীর প্রথা চালু আছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন্‌টি কার সন্তান তা তাদের পারস্পারিক সাদৃশ্য থেকে তারা বলে দিতে পারে। মানুষেতর প্রাণী অশ্ব কিংবা গবাদি পশু—তাদের ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য। ফারসালাস-এর এক জাতীয় ঘোটকীর ন্যায় এমন পশু আছে যাদের সন্তানের সঙ্গে জনক-জনকীর আশ্চর্য রকম মিল থাকে।

চতুর্থ অধ্যায়

যৌথ মালিকানায় অপরাধের বৃদ্ধি

[এ্যারিস্টটল আলোচনাটি শুরু করেছিলেন প্লেটোর প্রস্তাবের এরূপ সমালোচনা করে যে, প্লেটো যেভাবে চিন্তা করেছেন, সম্পদের ওপর যৌথ মালিকানা সেভাবে রাষ্ট্রের সংহতি সাধন করে না। সেখানে থেকে এ্যারিস্টটল প্লেটোর স্ত্রী এবং সন্তানের উপর যৌথ স্বামিত্বের বিষয়টির আলোচনার দিকে অগ্রসর হয়েছেন। তাঁর মতে এর ফলে মালিকানার বোধটা হ্রাস পাবে এবং তার কারণে নাগরিকদের মধ্যে সংহতিবোধও হ্রাসপ্রাপ্ত হবে। এই আলোচনার মধ্যেই এ্যারিস্টটল এ ব্যাপারে আরও কিছু আপত্তির কথা এখানে উল্লেখ করছেন।]

এছাড়া আরো কতগুলি কুফল আছে যেগুলিকে এমন সমাজ যারা তৈরি করতে চান তাদের পক্ষে পরিহার করা অসম্ভব হবে। এগুলি হচ্ছে ইচ্ছা এবং অনিচ্ছাকৃত আঘাত, হত্যা, বিবাদ এবং অপবাদ। এগুলি কেবল যে আইনবিরুদ্ধ তা নয়।

কেউ যদি পিতামাতার বিরুদ্ধে এরূপ অপরাধ করে তবে তা অপবিত্র বলে বিবেচিত হয়। এবং যার বিরুদ্ধে এরূপ অপরাধ করা হবে সে যত অধিক নিকট-আত্মীয় হবে অপরাধ তত অধিক ঘৃণ্য হবে। কিন্তু কে কার কিরূপ আত্মীয়, একথা, যখন জানার উপায় থাকেনা তখন এরূপ অপরাধ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা অধিকতর বৃদ্ধি পাবে। যেক্ষেত্রে আত্মীয়তার কথা জানা থাকে সেক্ষেত্রে এরূপ অপরাধের অপরাধী অন্তত ধর্মীয় প্রথানুযায়ী তার প্রায়শ্চিত্ত করে থাকে। কিন্তু আত্মীয়তা অজ্ঞাত থাকলে তাও সম্ভব হবে না। তাছাড়া আর একটি আপত্তির দিক রয়েছে। প্লেটো ভাগের ভিত্তিতে সন্তানের পিতা হওয়ার যখন প্রস্তাব করেন তখন তিনি প্রেমিকদের মধ্যে যৌন সম্পর্কের বিরোধিতা করলেও ভ্রাতার মধ্যে কিংবা পিতা এবং সন্তানের মধ্যে যৌন সম্পর্ক নিষিদ্ধ করার কথা বলেন না। অথচ প্রবৃত্তির তাড়নায় এরূপ কার্যে রত হওয়াকে নিষিদ্ধ করা আবশ্যক। তাছাড়া প্রেমের ভিত্তিতে সঙ্গত মিলনকে আনন্দের তীব্রতার কারণে নিষিদ্ধ করে ভ্রাতাদের মধ্যে কিংবা পিতা এবং সন্তানের মিলনকে নিষিদ্ধ না করার কোন যুক্তি থাকতে পারে না। আর একটা বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। 'রিপাবলিক'-এ স্ত্রী এবং সন্তানদের উপর যৌথ স্বামিত্বের প্রস্তাব করা হয়েছে অভিভাবক বা শাসকশ্রেণীর জন্য। এর চেয়ে রাষ্ট্রের কৃষক বা উৎপাদকশ্রেণীর উপর এরূপ প্রস্তাবের প্রয়োগ করা অধিকতর ফলদায়ক হত। কারণ স্ত্রী এবং সন্তানদের উপর যেখানে যৌথ স্বামিত্ব সেখানে সন্তানদের প্রতি পিতামাতার স্নেহ-মমতার পরিমাণ কম হতে বাধ্য। সেক্ষেত্রে শাসিতের মধ্যে স্নেহমমতার পরিমাণ কম থাকলে তাদের মধ্যে বিদ্রোহের মনোভাব কম এবং বাধ্যতার মনোভাব বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে।

[এ্যারিস্টটল একথা স্বীকার করেন যে, স্নেহ-মমতার বন্ধন রাষ্ট্রকে সংহত রাখার জন্য আবশ্যক। তাঁর আপত্তি প্লেটো 'সিম্পোজিয়াম'-এ চরম ঐক্যের উদ্দেশ্যে যেরূপ প্রেম বা মমতার প্রস্তাব দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধে।]

কাজেই সামগ্রিকভাবে দেখলে এ সকল নিয়মের প্রয়োগ উত্তম আইনের লক্ষ্য সাধনে সাহায্যের পরিবর্তে তার বিপরীত ফল সাধন করবে। অর্থাৎ সক্রেটিস 'রিপাবলিক'-এ স্ত্রী এবং সন্তানদের ক্ষেত্রে হুকুম প্রদানের মাধ্যমে যে উত্তম ফল আশা করেছেন তা এই নিয়ম দ্বারা অর্জিত হতে পারেনা। আমরা বরঞ্চ বিশ্বাস করি যে, নগরীসমূহের মধ্যে সৌহার্দ এবং মমতার যে বোধ বর্তমানে বিরাজ করছে তা নগরগুলির জন্য বিশেষ সুফলদায়ক। সামাজিক বিরোধ নিরোধের ক্ষেত্রে এ মনোভাব বিশেষভাবে সহায়ক। সক্রেটিস রাষ্ট্রের ঐক্যের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। সক্রেটিসও স্পষ্টভাবে বলেছেন, ঐক্য মৈত্রীবোধেরই সৃষ্টি। প্লেটোর আর একটি সংলাপের কথা ধরা যাক। এই সংলাপে তিনি প্রেমের বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সেই সংলাপে এ্যারিসটোফেনিস-এর উক্তিতে দেখা যায় প্রেমিক যুগল তাদের প্রেমের উষ্ণতায় পরস্পর ভিন্ন থাকার বদলে একে অপরের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কামনা পোষণ করে। এরূপ ক্ষেত্রে উভয় বিলুপ্ত না হলেও যে কোন একজনকে অবশ্যই বিলুপ্ত হতে হয়। কিন্তু যে রাষ্ট্রে স্ত্রী এবং সন্তানগণকে ভাগের ভিত্তিতে ভালবাসতে হয় সেখানে ভালবাসার তীব্রতা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কারণ এমন রাষ্ট্রে পিতা কাউকে 'আমার পুত্র' বলে যেমন সম্বোধন করতে পারেনা' পুত্রও তেমনি কাউকে 'আমার পিতা' বলে সম্বোধন করতে পারেনা। পরিমাণে অধিক জলের মধ্যে বিন্দু পরিমাণ মিষ্টি দ্রব্য যেমন মিষ্টত্ব তৈরি করতে পারেনা, যৌথস্বামিত্বের বেলাতেও স্নেহ-প্রেমের পরিমাণ নামমাত্র হওয়াতে পরস্পরের মধ্যে কোন সংহতিবোধ সৃষ্টি করতে পারেনা। এরূপ নগরীতে এমন কোনো বিধান নাই যে বিধানের কারণে পিতা সন্তানের প্রতি যত্নবান হতে কিংবা পিতার প্রতি সন্তানকে অনুরক্ত হতে কিংবা ভাই-এর প্রতি ভাই ভালবাসা বোধ করতে বাধ্য থাকবে। কারণ, অপর কোন কিছুর চাইতে মানুষের চরিত্রের দু'টি আবেগ পরস্পরের প্রতি অনুরাগ এবং আকর্ষণ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। আবেগ দুটি হচ্ছে : 'এটি আমার নিজের' এবং 'এটিকে আমি ভালবাসি'। প্লেটোর 'রিপাবলিক' অনুযায়ী গঠিত রাষ্ট্রে কারুর মধ্যে এই আবেগের কোনটি থাকার কোন উপায় থাকবে না।

আরো একটি বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক। 'রিপাবলিক'-এ কৃষিজীবী বা কারিগর শ্রেণীর সন্তানদের অভিভাবক শ্রেণীতে উন্নীতকরণ এবং বিপরীতভাবে অভিভাবকশ্রেণীর সন্তানদের উৎপাদক শ্রেণীতে স্থানান্তরের একটি কথা আছে। কিন্তু এ রকম স্থানান্তর কোন্ উপায়ে সাধিত হবে সে সম্পর্কে স্পষ্টভাবে একেবারেই কিছু বলা হয়নি। যারা তাদের নবজাত সন্তানকে এভাবে পরিত্যাগ করবে এবং যারা এসব সন্তানকে হস্তান্তর করে দিবে তারা তো অবশ্য জানতে পারবে, কার সন্তান কার নিকট হস্তান্তর করে দেওয়া হল। এমন হস্তান্তর হত্যা, আঘাত, অবৈধ আবেগ—ইত্যকার যে সকল সামাজিক অপরাধের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি তার সম্ভাবনাকে আরো বৃদ্ধি করে দিবে। কারণ যারা উচ্চ শ্রেণী থেকে নিম্নতর দুটি শ্রেণীতে স্থানান্তরিত হবে তারা অভিভাবকশ্রেণীর কাউকে আর পিতা মাতা, ভ্রাতা বলে সম্বোধন করবে না। কিংবা উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত যারা হবে তারাও বাকি নাগরিকদের কাউকে নিকট আত্মীয় বলে গণ্য করবে না। অথচ আত্মীয়তা বোধ এই সকল অপরাধের বিরুদ্ধে একটা রক্ষা কবচ হিসাবে কাজ করতে পারত।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যক্তি মালিকানার পক্ষে যুক্তি

[এর পরে এ্যারিস্টট্ল সম্পত্তির মালিকানা এবং উৎপাদিত ফসলের উপর অধিকারের প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করছেন। এ আলোচনাটি সাধারণ সুত্রাকারে হলেও 'রিপাবলিক'-এর চেয়ে বৃহত্তর পরিধিতে করা হয়েছে। এ্যারিস্টট্ল উৎপাদনের উপায়ের উপর যেমন ব্যক্তিগত মালিকানার নীতিকে সমর্থন করেছেন, তেমনি তার সঙ্গে তিনি উৎপন্ন ফসল বা দ্রব্যসামগ্রীর ন্যায়সঙ্গত বন্টনের নীতিকেও যুক্ত করেছেন।]

পূর্বে যা আলোচনা করা হয়েছে তার সঙ্গে সম্পত্তির প্রশ্নটিও জড়িত। একটি রাষ্ট্রকে যদি আমাদের সাধ্যমত সুগঠিত করতে হয় তাহলে সম্পত্তির সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা কিরূপ হবে। সম্পত্তিও কি যৌথ মালিকানায় থাকবে? কিংবা যৌথ মালিকানায় থাকবে না? এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। সন্তান এবং স্ত্রীর প্রশ্নে আমরা যে জবাব দিয়েছি, বর্তমান প্রশ্নের জবাব তার চেয়ে ভিন্ন হতে পারে। এর একটি সম্ভব জবাব এই হতে পারে যে, ঘরবাড়ি প্রচলিত সার্বজনীন প্রথায় ভিন্ন ভিন্ন থাকবে, কিন্তু মালিকানা এবং ব্যবহারের ক্ষেত্রে তারা হবে যৌথ। অথবা এমন হতে পারে সম্পত্তির মালিকানা এবং ব্যবহার—এ দুটিকে আমরা আলাদা করে দিলাম। তেমন ক্ষেত্রে জমি যৌথ মালিকানায় থাকতে পারে এবং তার উৎপাদিত ফসল যৌথভাবে ভোগ করা যেতে পারে। এ রকম দৃষ্টান্ত কোথাও কোথাও আছে। কিংবা জমির মালিক সমগ্র সমাজ এবং তার কর্ষণাদিও সমাজগতভাবে সম্পাদিত হয়। কিন্তু জমির ফসলকে ব্যাক্তির প্রয়োজনের ভিত্তিতে নাগরিকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। সামাজিক এরূপ মালিকানার ব্যবস্থা কোন কোন অ-গ্রীক জনসমাজে প্রচলিত রয়েছে বলে শোনা যায়। এ বিকল্পের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি : জমি এবং ফসল উভয়ের মালিকানা যৌথ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে জমি কর্ষণের ব্যাপারে নাগরিকদের বদলে উৎপাদকগণ জমি কর্ষণ করলে কাজ সুসম্পাদিত হবে। এটি যে কোন সামাজিক মালিকানার ক্ষেত্রেই সত্য। কারণ যৌথ মালিকগণ নিজেরা যৌথ মালিকানাধীন সম্পত্তির নিজ নিজ উপকার সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করলে মালিকানা সম্পর্কে তাদের মধ্যে শত্রুতাবোধের সৃষ্টি হবে। কারণ, তখন কাজের পরিমাণ এবং প্রাপ্ত লাভের পরিমাণের প্রশ্ন উঠবে। কাজ এবং তার ফল যদি সমান হয় তাহলে অবশ্য কোন সমস্যা ঘটবে না। তা না হলে যারা তেমন পরিমাণে কাজ না করে ভাল ফল লাভ করবে তাদের সঙ্গে যারা অধিকতর পরিশ্রম করেও কাজ অনুপাতে অধিকতর ফল লাভ করবে না, তাদের মনোমালিন্য সৃষ্ট হবে। কোন সুসময়েতেও যৌথ জীবন এবং যৌথ মালিকানা কার্যকর করা খুবই শক্ত ব্যাপার। সংকটের সময়ে এমন ব্যবস্থার অসুবিধা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পায়। এমন কি কয়েকজনে মিলিতভাবে কোথাও ভ্রমণে গেলেও এমনি অসুবিধার উদ্ভব হয়। কত

সময়ে গুরুত্বহীন এবং সামান্য ব্যাপার থেকে সৃষ্ট ঝগড়ার কারণে এমন বন্ধুত্বকেও আমরা ভেঙ্গে পড়তে দেখি। পরিবারের মধ্যেও যে ভৃত্যকে আমরা দৈনন্দিন কাজের জন্য নিয়োগ করি তাকে নিয়েও আমাদের অসুবিধার অন্ত থাকে না।

সম্পত্তির যৌথ মালিকানার ক্ষেত্রে যে সমস্ত অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে তার কয়েকটিকে আমরা উপরে উল্লেখ করলাম। যদি উত্তম আইন এবং নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে প্রচলিত ব্যক্তিগত মালিকানার ব্যবস্থা এর চেয়ে অনেক ভাল। তেমন হলে যৌথ এবং ব্যক্তিগত মালিকানা—এই উভয় ব্যবস্থার সুবিধাই আমরা লাভ করতে পারব। কারণ, একদিকে যেমন এ কথা সত্য, যে, কিছুটা পর্যন্ত সম্পত্তির মালিকানা যৌথ হওয়া আবশ্যক, তেমনি এটিও সত্য যে, মালিকানার সাধারণ নীতি ব্যক্তিগত হওয়া বাঞ্ছনীয়। সম্পত্তির পরিচর্যার কাজটি যদি বহু ব্যক্তির মধ্যে বণ্টিত হয় তাহলে পারস্পরিক কোন বিরোধ এতে সৃষ্টি হবে না। অপরদিকে যেহেতু সকলেই কর্মব্যস্ত থাকবে সে কারণে উৎপাদনেরও সামগ্রিক বৃদ্ধি ঘটবে। 'সুহৃদদের সকল জিনিষই সকলের'—এরূপ কথা অবশ্য প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু সুহৃদদের সম্পত্তির সদ্ব্যবহারও নির্ভর করে ব্যক্তির গুণাগুণের উপর। রাজনৈতিকভাবে এরূপ ব্যবস্থাকে অসম্ভব ভাবার কোন কারণ নাই। অনেক দেশেই, সাধারণ ছকে হলেও এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সুশাসিত রাষ্ট্রেও এ রকম ব্যবস্থাকে কার্যকর দেখা যায়। কোথাও একে গ্রহণ করা হয়েছে, কোথাও গ্রহণ করা হবে—এরূপ অবস্থা দৃষ্ট হয়। ব্যবস্থাটির কার্যপ্রণালী, সংক্ষেপে বললে, হবে এরূপ : নাগরিকদের প্রত্যেকেরই সম্পত্তি থাকবে। এর কিছু অংশকে সে তার নিজের ঘনিষ্ঠদের মধ্যে রাখবে, কিছু অংশ অপরের সঙ্গে মিলিতভাবে ব্যবহার করবে। যেমন স্পারটার কথা বলা যায়। স্পারটার সকল নাগরিক তাদের একের দাসকে অপরে এরূপভাবে ব্যবহার করে যেন এ দাসরা তাদের নিজেদের। তাদের গৃহপালিত পশু, যেমন অশ্ব এবং কুকুর—এদের ব্যাপারেও কথাটি সত্য। কোন ভ্রমণ পথে কারু যদি খাদ্যের আবশ্যক হয় তাহলে যে কোন জায়গাতেই তারা তাদের খাদ্য পাবে। কাজেই এটা পরিষ্কার যে সম্পত্তি ব্যক্তিগত হাতে থাকাই উত্তম। তবে তাকে ব্যবহার করার অধিকার হওয়া উচিত সামাজিক। রাষ্ট্রের যে বিধান দাতা, তার কর্তব্য হবে নাগরিকদের মনে এই সামাজিকবোধের সৃষ্টি করা। তাছাড়া মালিকানাবোধ থেকে মানুষের মনে আনন্দ হয় আপরিসীম। মানুষ মাত্রই তার নিজত্বকে ভালবাসে। প্রকৃতির বিধানই এরূপ। স্বার্থপরতা অবশ্যই নিন্দনীয়। কিন্তু নিজের স্বার্থ দেখাই স্বার্থপরতা নয়। নিজের স্বার্থকে অত্যধিক পরিমাণে দেখাই হচ্ছে স্বার্থপরতা। তেমনি সম্পত্তির জন্য অত্যধিক লোভও নিন্দনীয়। কিন্তু এ কথা সত্য যে, প্রত্যেক মানুষই চায় যেন তার নিজের কিছু সম্পত্তি থাকে। তাছাড়া আর একটি বিষয় আছে। দানে মানুষ বিশেষ আনন্দ লাভ করে। বন্ধু এবং সঙ্গীদের সাহায্য করা, যে বিদেশি তার কিছু উপকার সাধন করা—এগুলিতে মানুষ আনন্দ লাভ করে। এবং কারুর নিজের সম্পদ থাকলে পরেই এরূপ বদান্যতা দেখানো তার পক্ষে সম্ভব।

যারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ দ্বারা রাষ্ট্রের চরম ঐক্য সাধন করতে চান তাদের পক্ষে এই সুবিধাসমূহের কোনটি লাভ করা সম্ভব নয়। তদুপরি তাদের ব্যবস্থায় মানুষের চরিত্রের দুটি মূল্যবান গুণ, যেমন যৌন জীবনে আত্মসংযম এবং ব্যক্তিগত বদান্যতা বিসর্জিত হয়ে যায়। অপরের স্ত্রীকে ভোগ না করার যে আত্মসংযম মানুষ প্রদর্শন করে সেটি অবশ্যই একটি মূল্যবান গুণ। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বিলোপের ফল এই হবে যে, কোন মানুষ

আর দানকার্যে উদার হবে না এবং কোন দানকার্য সে কখনো সম্পাদন করবে না। কারণ অর্থ সম্পদ ব্যবহারের মধ্যেই মাত্র মানুষের দানকার্য বাস্তবভাবে সম্পাদিত হতে পারে।

[কাজেই এ্যারিস্টটলের কথা হচ্ছে, ঐক্যের আধিক্য মানে নিয়ন্ত্রণের আধিক্য। রাষ্ট্র যদি আমাদের অর্থনীতি এবং যৌনাচারকে নিয়ন্ত্রিত করে তাহলে এসব ক্ষেত্রে নৈতিক গুণের পরিচর্যার কোন অবকাশ থাকবে না। কিন্তু এর পরের আলোচনাটিতে একদিকে সামাজিক ও ব্যক্তিগত মালিকানা, অপরদিকে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং যৌথ মালিকানার মধ্যে বিভ্রাটের সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যাই হোক, এ্যারিস্টট্‌ল এই আলোচনাটি শেষ করছেন অত্যধিক ঐক্যের বিরুদ্ধে তার সমালোচনার পুনরুল্লেখের মাধ্যমে।]

সাম্যবাদ হিসাবে প্লেটোর প্রস্তাবের একটি আকর্ষণ আছে। শোনা মাত্রই একে বেশ সঙ্গত বলে বোধ হয়। এমন প্রস্তাবে নাগরিকদের মধ্যে বিশেষ রকমের ভ্রাতৃত্ববোধের সৃষ্টি হবে বলে মনে হয়। এ কারণে যৌথ মালিকানা না থাকাকেই যারা সমাজের সংকটের মূল বলে মনে করেন তাদের কাছে এ প্রস্তাবের একটি বিশেষ আকর্ষণ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে চুক্তিভঙ্গের যে পারস্পরিক অভিযোগ আমরা শুনতে পাই, এবং মিথ্যা সাক্ষ্যদানের এবং সম্পদবানদের উপর এর অহেতুক প্রভাবের যে কথা বলা হয় তার উল্লেখ করছি। কিন্তু এ সকলের কারণ যৌথ স্বামিত্বের অভাব নয়। এগুলির উদ্ভব ঘটে মানুষের চরিত্র থেকে। আসলে সম্পত্তির ভিন্নভিন্ন মালিকানার চেয়ে যৌথ মালিকানা এবং তার ব্যবহারে অংশীদারীর ক্ষেত্রেই আমরা বাদ-বিসম্বাদের অধিক সাক্ষাৎ পাই। তবে ব্যক্তিগত মালিকানার ক্ষেত্রে মালিকদের সংখ্যা অধিক বলে তার তুলনাতে যৌথ মালিকানায় ঝগড়ার সংখ্যা কম দেখা যায়।

তাছাড়া ভাগে সম্পত্তি ভোগ করার প্রস্তাব যে সব অসুবিধা দূর করবে, কেবল সেগুলিই আমাদের হিসাব করা উচিত নয়। সম্পত্তির যৌথ মালিকানা যে সকল সুবিধা থেকে আমাদের বঞ্চিত কববে, সে গুলির হিসাবও আমাদের গ্রহণ করা আবশ্যক। এগুলির হিসাব নিলে আমরা দেখব যে, যৌথ সম্পত্তির প্রস্তাব মতো জীবন ধারণ করা সত্যই অসম্ভব। সক্রেটিসের ভুলের মূল হচ্ছে রাষ্ট্রের ঐক্য সম্পর্কে তাঁর ধারণা। এটা অবশ্য ঠিক যে, গৃহে যেমন আমাদের ঐক্য আবশ্যক, তেমনি রাষ্ট্রের মধ্যেও কিছু পরিমাণে ঐক্য প্রয়োজন, কিন্তু চরমভাবে সর্বত্মক ঐক্য নয়। ঐক্য বৃদ্ধিতে একটা পর্যায় আসে যখন ঐক্যের ফলে রাষ্ট্রের একেবারে বিলোপ না ঘটলেও রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় চরিত্র অনেকখানি বিনষ্ট হয়ে যাবে। এটা সুরের ক্ষেত্রে সঙ্গতিকে কেবল মাত্র একটি শব্দে পর্যবসিত করার সমান। একথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, নগর বা রাষ্ট্রের মধ্যে বৈচিত্র্যের আবশ্যক। এই বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের জন্য শিক্ষার উপর আমাদের নির্ভর করতে হবে। এটা বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় যে, প্লেটোর যেখানে উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্রে এমন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যা নগরকে উত্তম করবে, সেখানে তিনি সাম্যবাদী ব্যবস্থাকে উত্তম ফলের উৎপাদক বলে ভাবতে পারলেন। এটা ভ্রান্ত পথে অগ্রসর হওয়ার নামান্তর। সম্পত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চরিত্র গঠনের এবং বুদ্ধি বিকাশের কোন বিকল্প নয়। কিংবা সে উদ্দেশ্যে সমাজের আইন এবং প্রথাকে ব্যবহারেরও বিকল্প বলা যায় না একে।

এছাড়াও একটি বিষয় আছে যেটিকে উপেক্ষা করা উচিত নয়। বিষয়টি হচ্ছে, যে দীর্ঘকাল যাবৎ এমন ব্যবস্থাটি অনাবিষ্কৃত রইল, সেই কালের বিষয়। ব্যবস্থাটি যথার্থই

উত্তম হলে এত দীর্ঘকাল নিশ্চয়ই এটি অজ্ঞাত থাকত না। সম্ভব সকল প্রকার সংগঠন ব্যবস্থাই তো ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। অবশ্য সবগুলিকে আমরা এখনো সংগ্রহ করতে সক্ষম হই নি। অনেকগুলিকে আমরা কেবল তত্ত্বগতভাবে জেনেছি। প্রয়োগের ভিত্তিতে তাদের কোন পরীক্ষা হয় নি। প্লেটোর কল্পিত নগরকে আমরা যদি কোথাও বাস্তবায়িত হতে দেখতাম তাহলে ঐক্য সম্পর্কে আমাদের যুক্তিগুলি অধিকতর স্পষ্ট হতে পারত। তখন আমরা দেখতাম অংশসমূহকে পরস্পর থেকে ভিন্ন না রেখে কিংবা স্পারটার ন্যায় যৌথ-খাদ্যগ্রহণ ব্যবস্থা দ্বারা কিংবা এথেন্সের ন্যায় গোত্রবদ্ধতার দ্বারা এমন নগরী সংগঠিত করা অসম্ভব। প্লেটোর প্রস্তাবের যে বৈশিষ্ট্যটি নতুন এবং তাৎপর্যপূর্ণ তা হচ্ছে এই যে, তার শাসক বা অভিভাবকবৃন্দ কৃষিকার্যে নিয়োজিত হয় না। এবং ল্যাসিডিমনিয়ার অধিবাসীগণ ঠিক এই ব্যবস্থাটি বর্তমানে প্রবর্তনের চেষ্টা করছে।

[এ্যারিস্টট্ল মনে করেন প্লেটো নগরবাসীদের আর্থিক এবং সাংবিধানিক অবস্থার বিষয়েও পরিষ্কারভাবে কিছু বলেন নি। এ্যারিস্টট্লের মতে এ গুলির মধ্যেই রাষ্ট্রের অনৈক্যের কারণ নিহিত থাকে।]

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে রাষ্ট্রের অধিক সংখ্যক অধিবাসীদের ব্যাপারে কি হবে? রাষ্ট্রের সদস্য হিসাবে তারা কি পরিমাণে পরিগণিত হবে? গ্রন্থের মধ্যে এর কোন নির্দিষ্ট উল্লেখ না থাকাতে বিষয়টি পরিষ্কার নয়। সাধারণ অধিবাসীদের সংখ্যাই অধিক হবে। কিন্তু এরূপ কোন উল্লেখ নাই যে, কৃষকবর্গের সম্পত্তি বা স্ত্রী-পুত্রদের ক্ষেত্রে যৌথ স্বামীত্ব থাকবে কিংবা ব্যক্তিগত স্বামীত্ব? এমন যদি হয় যে, এ সকল ব্যাপারে তাদেরও যৌথ স্বামীত্ব থাকবে, তাহলে অভিভাবক বা শাসক শ্রেণী থেকে এদেরকে ভিন্নভাবে চিহ্নিত করা হবে কি প্রকারে? তাছাড়া শাসনের প্রতি তাদের আনুগত্য সৃষ্টির উপাদান কি হবে? (অবশ্য ক্রিটবাসীদের ন্যায় এ ব্যাপারে এমন ব্যবস্থা হতে পারে যে, নিম্নতর শ্রেণীসমূহ শারীরিক শিক্ষা এবং অস্ত্র বহনের অধিকার ব্যতীত অপর সকল রকম সুবিধা ভোগ করবে) অপরপক্ষে আমরা যদি মনে করি যে, অন্যত্র যেমন ঠিক তেমনি তাদেরও সাম্যবাদ নয়, ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে, তাহলে তারা রাষ্ট্রের শাসনে আদৌ অংশগ্রহণ করবে কি প্রকারে? এর অনিবার্য ফল হবে এই যে, একটি রাষ্ট্রের মধ্যে দু'টি রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটবে এবং এরা অনেকখানি একে অপরের বিরোধী হয়ে দাঁড়াবে। কারণ প্লেটো একদিকে অভিভাবকদের স্থাপন করেছেন। তাদের অবস্থা দখলদার কোন বাহিনীর ন্যায়। অপরদিকে থাকছে কৃষকবর্গ, কারিগর এবং অন্যান্য নাগরিকবৃন্দ। এর একমাত্র ফল হবে যে, যে-মামলা-মোকদ্দমা এবং বিরোধের কুফল সম্পর্কে প্লেটো বলেছেন তার বৃদ্ধি। অথচ সক্রেটিস অভিভাবকদের শিক্ষাদান প্রসঙ্গে বলেছেন যে, শাসনের জন্য কিংবা ব্যবসায়ের জন্য যে বিস্তারিত নিয়মাদির আবশ্যক হয় নাগরিকদের সুশিক্ষা দেওয়া হলে তার কোন প্রয়োজন হবে না। আবার এও দেখা যায় যে, কৃষকবর্গকে তাদের উৎপাদনের মালিক বলে স্বীকার করার পরে তাদের কাছ থেকে খাজনা দাবী করা হচ্ছে। কিন্তু তেমন ক্ষেত্রে দাস, হেলট, ভূদাস—প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর যে মানুষদের কথা আমরা জানি তাদের মতোই কৃষকশ্রেণী বিক্ষুব্ধ এবং বিঘ্ন সৃষ্টিকারী হবে।

মোটকথা এ সমস্ত ব্যবস্থার প্রয়োজনের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হতে দেখা যায় না। তাছাড়া এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে প্রশ্নসমূহ রয়েছে, যেমন সংবিধানের প্রকারভেদ, শিক্ষার প্রকৃতি এবং প্রয়োজনীয় আইনসমূহ—তাদের ক্ষেত্রেও কোন সিদ্ধান্ত

আমরা পাইনে। এগুলি স্থির করা সহজ নয়, একথা ঠিক। তথাপি অভিভাবকদের সাম্যবাদ বহাল থাকা কিংবা না থাকা এদের উপরই নির্ভর করে। সক্রেটিসের অবস্থা যদি এমন হয় যে, স্ত্রীদের উপর যৌথ স্বামীত্ব, কিন্তু সম্পত্তির উপর ব্যক্তিগত স্বামীত্ব থাকবে তাহলে পুরুষেরা জমি কর্ষণে গেলে গৃহের পরিচর্যার দায়িত্ব কে পালন করবে? কিংবা স্ত্রী এবং সম্পত্তি উভয় ক্ষেত্রে কৃষকবর্গের যদি যৌথ স্বামিত্ব থাকে তখনই বা এর সমাধান কি হবে? বন্য পশুদের উপমা দিয়ে যদি বলা হয়, পশুদের ন্যায় পুরুষ এবং স্ত্রী-উভয়ই একই রকম কার্য সম্পাদন করবে, তাহলে সেটা কোন কাজের কথা হবে না। পুরুষেরা তো গৃহচর্যার কাজ সম্পাদন করে না। তাছাড়া সক্রেটিস যেভাবে শাসকদের নিযুক্ত করছেন তারও বিপদ আছে। তাঁর ব্যবস্থা অনুযায়ী শাসকবর্গ সবসময় একই শ্রেণীর থাকছে। এটা অসন্তোষের একটি নিশ্চিত উৎস হিসাবে কাজ করবে। কারণ, যারা যুদ্ধবাজ এবং উগ্র তাদের কথা ছাড়াও অনেকের মনে এমন ভাবের উদয় হবে যে, তাদের গুণের স্বীকৃতি তারা পাচ্ছে না। অথচ সক্রেটিসের নীতিতে এটি অপরিহার্য যে, সকল সময়ে একই শাসক শাসন করছে। কারণ ঐশ্বরিক কিংবা স্বর্ণসূচক আত্মার যে উপাদানের ভিত্তিতে শাসক নির্দিষ্ট হচ্ছে সে উপাদানের কোন অধিষ্ঠান-বৈচিত্র্য নাই। একই রকম লোকের মধ্যে সে সর্বদা বিদ্যমান। সক্রেটিসের নিজের কথাতেই আমরা দেখি, শিশুর জন্মগ্রহণ মুহূর্তেই এই মিশ্রণটি সংঘটিত হয়; কারুর মধ্যে স্বর্ণের উপাদান, অপর কারুর মধ্যে রৌপ্যের এবং যারা কৃষক বা কারিগর হবে তাদের মধ্যে পিতল এবং লৌহের মিশ্রণ ঘটে। এবং অভিভাবকদেরকে সকল সুখ থেকে বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে সক্রেটিস বলেন, বিধায়কদের দায়িত্ব হচ্ছে সমগ্র নগরীকে সুখী করা। কিন্তু সকলে না হোক অধিক সংখ্যক, অন্ততঃপক্ষে বেশ কিছু অংশের সুখ ব্যতীত সমগ্রের পক্ষে সুখী হওয়া অসম্ভব। সমান সংখ্যার সাম্য একটি নগরীর সুখ থেকে খুবই ভিন্ন ব্যাপার। দুটো বেজোড়কে যোগ করে একটি জোড়ের সৃষ্টি করা যায়, কিন্তু রাষ্ট্রের দুটি অসুখী অংশ যোগ করে একটি সুখী রাষ্ট্র তৈরি করা চলে না। এবং অভিভাবক বা শাসকবর্গ যদি সুখী না হয়, তাহলে কারা সুখী হবে? নিশ্চয়ই কারিগর বা দৈহিক শ্রমে নিযুক্তদের সুখটা বড় প্রশ্ন নয়।

এগুলিই যে সব তা নয়। তবু প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এ সক্রেটিস যে প্রকার রাষ্ট্রের বর্ণনা করেছেন তার চরিত্রগত ত্রুটির মধ্যে এগুলির উল্লেখ করা হল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্লেটোর 'লজ'-এর উল্লেখ এবং আলোচনা

[নিম্নের অধ্যায়ে এ্যারিস্টট্‌ল প্লেটোর 'আইন' শিরোনামে গ্রন্থের আলোচনা খুবই সংক্ষেপে সমাপ্ত করেছেন। 'রিপাবলিক' এবং এই গ্রন্থের মধ্যে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান তার অনেকগুলিকেই এ্যারিস্টট্‌ল উপক্ষো করেছেন। অপরদিকে প্লেটোর 'দ্বিতীয় সর্বোত্তম' রাষ্ট্রও যে অর্থনৈতিকভাবে অসম্ভব-এ কথা এ্যারিস্টট্‌ল বেশ স্পষ্টভাবেই উল্লেখ করেছেন। আর একটি কথা উল্লেখ করা যায়। এ্যারিস্টট্‌ল-এর আলোচনা থেকে মনে হয় 'লজ'-এ চরিত্র হিসাবে সক্রেটিস উপস্থিত আছেন। কিন্তু তা যথার্থ নয়। এ্যারিস্টট্‌ল এটি খেয়াল করেননি।]

প্লেটোর 'লজ' বা 'আইন' তাঁর 'রিপাবলিক'-এর পরে রচিত হয়েছে। কিন্তু 'লজ'-এর ব্যাপারটিও প্রায় একরূপ। কাজেই 'লজ'-এ রাষ্ট্রের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে তাও আমাদের বিবেচনা করা প্রয়োজন। আমরা দেখেছি 'রিপাবলিক'-এ সক্রেটিস কয়েকটিমাত্র বিষয়ে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। এ বিষয়গুলি হচ্ছে স্ত্রী, পুত্রকন্যা এবং সম্পত্তির উপর যৌথ স্বামীত্ব এবং রাষ্ট্রের অধিবাসীদের শ্রেণীকরণ (অধিবাসীদের প্রধান অংশ দুটো ভাগে বিভক্ত হবে : এর একটি উৎপাদক শ্রেণী, অপরটি যোদ্ধাশ্রেণী। এই যোদ্ধাশ্রেণী থেকেই আর একটি শ্রেণীর উদ্ভব যারা নগরীকে শাসন করছে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব পালন করছে।) কিন্তু অনেকগুলি প্রশ্নে সক্রেটিস কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছেননি। যেমন প্রশ্ন হচ্ছে, কৃষক এবং কারিগর : সরকার পরিচালনাতে এদের কোন অংশ থাকবে কি থাকবে না? এদের অস্ত্রবহনের এবং অপর সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে দেশ রক্ষার অধিকার থাকবে কি থাকবে না? সক্রেটিসের কাছ থেকে এমন অভিমত আমরা অবশ্য পাচ্ছি যে, অভিভাবকদের সঙ্গে স্ত্রীলোকরাও অভিন্ন শিক্ষা লাভ করবে এবং তাদেরও যুদ্ধে যোগদান করা সঙ্গত। কিন্তু অপরাপর বিষয়ে, বিশেষ করে অভিভাবকদের প্রশিক্ষণের বিষয়ে সক্রেটিস যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে বিষয় বহির্ভূত কথাই অধিক অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'লজ' গ্রন্থের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখব এখানে পরিচালনগত 'আইনের' কথাই অধিক ব্যক্ত হয়েছে, সংবিধানের কথা নয়। এখানে এমন একটি সমাজ বিবৃত করা হচ্ছে যেটি আমাদের নগরীগুলির জন্য 'রিপাবলিক'-এর চেয়ে অধিক গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু এ বর্ণনাতে আমরা ক্রমান্বয়ে আবার পূর্বকার গঠনেই তাঁর প্রত্যাবর্তনকেও দেখতে পাই। কারণ স্ত্রী এবং সম্পত্তির যৌথ স্বামীত্ব ব্যতীত অন্যান্যক্ষেত্রে প্লেটো দুটো নগরীকে একই রূপে গঠিত করছেন। উভয়ক্ষেত্রে একই রকম শিক্ষা, দৈহিক কাজ থেকে অব্যাহতি এবং যৌথভাবে খাদ্য গ্রহণের ব্যবস্থা রয়েছে। ব্যতিক্রম এই মাত্র যে, এই গ্রন্থে যৌথভাবে খাদ্যগ্রহণের মধ্যে স্ত্রী লোকরাও অন্তর্ভুক্ত এবং অস্ত্রবহনকারীদের সংখ্যা এক সহস্র নয়, পাঁচ সহস্র।

এখানে একটা কথা উল্লেখযোগ্য। আমরা দেখি যে, সক্রেটিসের সকল সংলাপের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সংলাপগুলির মধ্যে একটা অতিশয়োক্তি এবং হাল্কা সুরের ভাব বিদ্যমান। এগুলিতে একটা জিজ্ঞাসার চরিত্র এবং অভিনবত্বের প্রবণতাও পাওয়া যায়। কিন্তু এগুলি সর্বদা সঠিক হবে, এমনটি আদৌ আশা করা যায় না। যেমন ধরা যাক পাঁচ হাজার অস্ত্রধারী নাগরিকদের কথা। এদের অনুষঙ্গ হিসাবে স্ত্রীলোক এবং ভৃত্যদের কথা বাদ দিলেও এটা পরিষ্কার যে, উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্ক শূন্য এরূপ একটি বিরাট বাহিনী পোষণ করার জন্য বেবিলন কিংবা অপর কোন বৃহৎ আয়তনের রাজ্যের আবশ্যক হবে। অবশ্য কল্পনায় আমরা যে কোন অবস্থাই অঙ্কিত করতে পারি। কিন্তু তা সম্ভাব্যতার সীমার মধ্যে থাকাই শ্রেয়। তদুপরি একথা বলা হয়েছে, ভূখণ্ড এবং জনসংখ্যা—এই উভয়দিকে দৃষ্টি রেখে আইন প্রণয়নকারীর উচিত হবে আইন প্রণয়ন করা। আইন প্রণয়নকারীকে আবার পার্শ্ববর্তী রাজ্যসমূহ সম্পর্কেও ভাবতে হবে। রাষ্ট্র হিসাবে অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে এবং অপর সকল থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে না চাইলে স্পষ্টত এদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এবং তেমন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রেরও ব্যবস্থা করতে হবে। এর প্রয়োজন কেবল আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য নয়, সীমান্ত বহির্ভূত শক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্যও এর প্রয়োজন। অপরদিকে রাষ্ট্র বা ব্যক্তি হিসাবে প্রতিবেশীদের সঙ্গে যোগাযোগের কথা বাদ দিলেও বাস্তবভাবে আক্রমণ আসুক কিংবা না আসুক রাষ্ট্র যেন সম্ভাব্য শত্রুর নিকট শক্তশালী বলে দৃষ্ট হয়, সে কারণেও অস্ত্রশস্ত্রের আবশ্যক।

তাছাড়া প্রত্যেক মানুষের সম্পদের পরিমাণের প্রশ্ন রয়েছে। এক্ষেত্রে প্লেটো যেমন প্রস্তাব করেছেন তাকে অধিকতর স্পষ্ট করা যায় কিনা, সে বিষয়টি দেখতে হবে। প্লেটোর অভিমত, ন্যায়সঙ্গত জীবন যাপনের উপযুক্ত সম্পদ একজন মানুষের থাকা আবশ্যক। কিন্তু এখানে দুটো আপত্তি উঠতে পারে : 'ন্যায়সঙ্গত জীবন যাপন' বলতে 'উত্তম জীবন যাপন' হলে কথাটি ব্যাপকতর হয়ে দাঁড়াবে। তা না হলে একজন দরিদ্র ব্যক্তিও 'ন্যায়সঙ্গত জীবন' যাপন করতে পারে। আমার মনে হয়, এর চেয়ে ভাল হবে 'ন্যায়সঙ্গত এবং সচ্ছল' কথাটি ব্যবহার করা। দুএরই আমাদের আবশ্যক। বিচ্ছিন্নভাবে নিলে একটি থেকে অধিক পরিমাণে সহজ জীবনের সৃষ্টি হতে পারে; অপরটি থেকে অধিক কষ্টকর জীবনের। সম্পদের ব্যবহারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে এই দুটি গুণই জড়িত। সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা বলি না যে, সম্পদকে ভদ্রভাবে বা বিক্রমের সঙ্গে ব্যবহার করা সঙ্গত। আমরা বলি সম্পদকে ন্যায়সঙ্গতভাবে, অর্থাৎ আধিক্য পরিহার করে ব্যবহার করা সঙ্গত। সম্পদ সম্পর্কে এটাই হচ্ছে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী।

তাছাড়া জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ না করলে সম্পদের সমতা করা নিরর্থক। বিভিন্ন নগরীর ক্ষেত্রে আমরা যেরূপ দেখি সেরূপ ভাবাও অহেতুক যে, বিনা বাধায় জন্মগ্রহণ চলতে দেওয়াতে ক্ষতি কিছু নাই, কারণ জন্মহার যতো অধিক হোক না কেন নিঃসন্তান দম্পতির কারণে নগরীর জনসংখ্যা সর্বদা স্থির থাকবে। প্লেটোর রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই উভয়ের ভারসাম্য অধিকতর সঠিকভাবে বজায় রাখা আবশ্যক হবে। বর্তমানে সম্পত্তি সন্তানদের মধ্যে বিভক্ত করার ব্যবস্থায় সন্তানদের সংখ্যা যতো অধিক হোক না কেন কাউকে দারিদ্র্য ভোগ করতে হয় না। কিন্তু প্লেটোর প্রস্তাবিত ব্যবস্থায় সম্পত্তির বিভাগ করা চলে না এবং উত্তরাধিকারী ব্যতীত পরিবারের সদস্যদের সংখ্যা অল্প কিংবা অধিক যাই হোক, তাদের সম্পত্তিহীন হয়ে থাকতে হয়। বস্তুত আমাদের পক্ষে অধিকতর উত্তম হবে সম্পদের মালিকানার পরিমাণকে সীমিত করার চেয়ে সন্তান উৎপাদনকে সীমিত করা। একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার অধিক যেন

সন্তান জন্মগ্রহণ না করে সেটি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক। অবশ্য এই সংখ্যা নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে শিশুমৃত্যু এবং নিঃসন্তান দম্পত্তি—এরূপ সংশ্লিষ্ট বিষয়কেও খেয়ালে রাখতে হবে। প্রায় রাষ্ট্রের প্রচলিত ব্যবস্থা অনুযায়ী সন্তান-জন্ম নিয়ন্ত্রণহীন রাখার কারণে অনিবার্যভাবে নাগরিকদের মধ্যে দারিদ্র্যের সৃষ্টি হয়। এবং এই দারিদ্র্য থেকেই সৃষ্টি হয় অসন্তোষ এবং অপরাধ। পূর্বকালের অন্যতম আইনদাতা করিন্থ্-এর ফিডনের অভিমত ছিল, উত্তরাধিকার হিসাবে সম্পত্তির পরিমাণ অধিক বা অল্প যাই হোক, নগরীতে গৃহ এবং নাগরিকদের সংখ্যা সমান রাখা আবশ্যক। 'লজ'-এর বিধান ভিন্নরূপ দেখা যায়। (এগুলির সর্বোত্তম ব্যবস্থা কি হবে সে সম্পর্কে আমাদের অভিমত পরবর্তীকালে দেওয়া যাবে। এখানে 'লজ'এর আর একটি অপূর্ণতার কথা যোগ করা যায়। ব্যাপারটি হচ্ছে শাসকদের সম্পর্কে। প্রশ্নটি হচ্ছে, শাসিত থেকে শাসকের পার্থক্য নির্দিষ্ট হবে কি প্রকারে? প্লেটোর কথা হচ্ছে টানা এবং পোড়েনের প্রকাশ এক নয়। শাসক এবং শাসিতের সম্পর্কটিও সেরূপ হওয়া আবশ্যক।)[১]

এছাড়া প্লেটো যেখানে একজন নাগরিকের সমগ্র সম্পত্তির বৃদ্ধির পরিমাণ মূল সম্পত্তির পাঁচ গুণে নির্দিষ্ট করেছেন সেখানে জমিগত সম্পত্তির বৃদ্ধির পরিমাণ নির্দিষ্ট না করে দেবার কি কারণ হতে পারে? একটি পরিবারকে দুটিতে বিভক্ত করার প্রস্তাবেরও যুক্তি কি? বাস্তব ক্ষেত্রে এর কোন সুবিধা আছে বলে আমার মনে হয় না। প্লেটো হয়ত প্রত্যেককে দুটি ঘর দেবার ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু একজনের পক্ষে দুঘরে বাস করার উপায় কি?

[প্লেটোর 'লজ'-এ বর্ণিত রাষ্ট্রের সংগঠনগত ত্রুটির আলোচনাকালে এ্যারিস্টট্‌ল গোড়াতেই 'পলিটিয়া' বা সংবিধান কথাটি ব্যবহার করছেন। এর দ্বারা তিনি একটি বিশেষ ধরনের রাষ্ট্র-সংগঠনকে বুঝাতে চেয়েছেন। আধুনিককালে 'পলিটি' শব্দ দ্বারা এ্যারিস্টট্‌লের এই বিশেষ সংবিধান ব্যবস্থাকে বুঝান হয়। প্রচীন গ্রিসে, খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে 'পলিটি' বলতে একটি উত্তম ব্যবস্থাকে বুঝাত। উত্তম, কারণ 'পলিটি' কোন চরম ব্যবস্থা নয়। এ্যারিস্টট্‌ল কোন্ ধরনের মধ্যম-রাষ্ট্র বা মধ্যবিত্ত—রাষ্ট্র পছন্দ করেন তার বিবরণ পাওয়া যাবে ৪র্থ পুস্তকে। বর্তমান আলোচনাতে যে সমালোচনা তা 'পলিটি'কে নাকচ করার জন্য নয়। এ্যারিস্টট্‌ল-এর কথা হচ্ছে প্লেটো যে একে 'রিপাবলিক'-এর বদলে দ্বিতীয় সর্বোত্তম রাষ্ট্র হিসাবে চিন্তা করেছেন, সে চিন্তা তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে সক্ষম হবে না।]

রাষ্ট্রের সংগঠনগত যে কাঠামো তৈরি করা হয়েছে তার সমগ্রটিই না গণতন্ত্র, না কতিপয়তন্ত্র। সাংবিধানিক কাঠামোটি হচ্ছে এই দু'-এর মধ্যেবর্তী একটি ব্যবস্থা। একে আমরা অনেকে সময়ে 'পলিটি' বলে আখ্যায়িত করে থাকি। প্লেটোর প্রস্তাবিত ব্যবস্থার সদস্য হচ্ছে তারা যারা অস্ত্র বহন করে। প্লেটো যদি এমন ব্যবস্থার প্রস্তাব এই কারণে করে থাকেন যে অপর কোন ব্যবস্থার চেয়ে আমাদের নগর রাষ্ট্রগুলিতে এই ব্যবস্থার সাক্ষাৎ সাধারণভাবে আমরা অধিক পাই, তাহলে সে কারণটি হয়ত আমরা গ্রহণ করতে পারি। কিন্তু প্লেটো যদি এই ব্যবস্থাকে দ্বিতীয় সর্বোত্তম এবং তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের তুলনাতেই মাত্র ন্যূন বলে বিবেচনা করেন তাহলে কথাটিকে আমরা স্বীকার করতে পারিনে। তেমন ক্ষেত্রে

১. অনুবাদের যে অংশ প্রথম বন্ধনীর মধ্যে রাখা হয়েছে সে অংশ পেঙ্গুইন-এ প্রকাশিত টি. এ. সিনক্লেয়ার-এর 'পলিটিক্‌স'-এর পাদটিকায় মুদ্রিত হয়েছে। স. ফ. ক

কেউ ল্যাসিডিমোনিয়ার কিংবা অধিকতর অভিজাততান্ত্রিক অপর কোন রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে বাঞ্ছনীয় মনে করতে পারে। যথার্থই এমন অনেকে আছেন যারা অভিমত প্রকাশ করেন যে, সর্বপ্রকার ব্যবস্থার মিশ্রিত ব্যবস্থাই হচ্ছে সর্বোত্তম সংবিধান। এবং এ কারণেই তারা ল্যাসিডিমোনিয়া অর্থাৎ স্পারটার সংবিধানের প্রশংসা করেন। কেউ কেউ বলেন, এ ব্যবস্থা তৈরি হয়েছে কতিপয়তন্ত্র, রাজতন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মিশ্রণে। এ সংবিধানে যে রাজার পদ রয়েছে সে পদ হচ্ছে রাজকীয়; প্রবীনদের পরিষদ হচ্ছে কতিপয়তন্ত্র। আবার 'ইফরদের' মাধ্যমে শাসিত হওয়ার পদ্ধতি একে পরিণত করেছে গণতন্ত্রে। কারণ ইফরগণ নির্বাচিত হয় জনগণ দ্বারা। কিন্তু অন্যদের অভিমত ভিন্নতর। তাঁরা বলেন ইফরদের ক্ষমতা একে স্বৈরতন্ত্রে পরিণত করেছে। গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় যৌথ খাদ্য গ্রহণ এবং স্পারটীয়দের দৈনন্দিন যৌথ জীবন যাত্রায়। কিন্তু প্লেটোর 'লজ'-এর প্রস্তাব হচ্ছে, সর্বোত্তম সংবিধান তৈরি হওয়া উচিত গণতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্রের মিশ্রণে। অথচ এ দুটি ব্যবস্থা হয় কোন সাংবিধানিক ব্যবস্থা নয়, অথবা সর্বাধিক খারাপ ব্যবস্থা। কাজেই মিশ্রণের প্রশ্ন হলে কোন মিশ্র সংবিধানে অন্যান্য সংবিধানের বিভিন্ন উপাদানসমূহকেও গ্রহণ করার পক্ষে জোর যুক্তি রয়েছে।

এইভাবে দেখলে আমরা দেখব, 'লজ'-এর প্রস্তাবিত সংবিধানে রাজতন্ত্রের কোন বৈশিষ্ট্য নাই। কতিপয়তন্ত্রের দিকে ঝোঁকসহ এর মধ্যে কেবলমাত্র মিশ্রণ রয়েছে গণতন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্রের। এর পরিচয় পাওয়া যায় পদাধিকারীদের নিয়োগের ব্যবস্থা থেকে। আমি একটি নির্বাচিত সংখ্যার মধ্য থেকে লটারীর ভিত্তিতে এদের বাছাই করার ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন। এ ব্যবস্থা কতিপয়তন্ত্র এবং গণতন্ত্র উভয়তে বিদ্যমান। কিন্তু অধিকতর ধনবান নাগরিকদের ক্ষেত্রেই মাত্র এরূপ বিধান করা যে, তারা পরিষদের সদস্য হতে পারবে এবং দায়িত্বাধিকারীদের নির্বাচিত করা সহ নাগরিকের করণীয় সকল কর্তব্য তারা সম্পাদন করবে—এর মধ্যে কতিপয়তন্ত্রের চরিত্র বিদ্যমান। তাছাড়া পদাধিকারীদের অধিকাংশকে ধনীকদের মধ্য থেকে সংগ্রহ করার চেষ্টা এবং উচ্চতম পদগুলিকে উচ্চতম আয়ের নাগরিকদের জন্য নির্দিষ্ট করাও কতিপয়তন্ত্রের বৈশিষ্ট্য বহন করে। প্লেটো কাউন্সিলের সদস্যপদের নির্বাচনের যে ব্যবস্থার প্রস্তাব দিয়েছেন তাও কতিপয়তান্ত্রিক। এটা অবশ্য ঠিক যে, প্রাথমিকভাবে সকলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিন্তু ব্যবস্থাটিতে এমন দেখা যায় যে, নির্বাচকগণ সবচেয়ে অধিক পরিমাণের সম্পত্তিবানদের মধ্য থেকে কয়েকজনকে প্রথমে নির্বাচিত করছে। তারপরে নিম্নতর শ্রেণী থেকে তারা সমসংখ্যক ব্যক্তিকে নির্বাচিত করছে। তার পরবর্তীতে নির্বাচিত করা হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণী থেকে। কিন্তু প্রথম দুটি শ্রেণী চতুর্থ শ্রেণী থেকে নির্বাচন করতে বাধ্য থাকবে এরূপ বিধান ব্যতীত তৃতীয় অথবা চতুর্থ শ্রেণী থেকে নির্বাচিত করার কোন সাধারণ বাধ্যতা আমরা প্রস্তাবের মধ্যে দেখিনে। অথচ এসব কথার পরে আমরা দেখি প্লেটো বলছেন, প্রত্যেকটি শ্রেণী থেকে সমসংখ্যক প্রতিনিধি কাউন্সিলে নির্বাচিত হবে। এর ফল হবে এই যে, উচ্চতম আয়ের-শ্রেণী থেকে যারা নির্বাচিত করবে তারা সংখ্যায় অধিকতর এবং অবস্থানে উচ্চতর শ্রেণীর হবে। কারণ ভোটদানে যখন কোন বাধ্যতা নাই, তখন নিম্নতর শ্রেণীগুলি ভোদটান করা থেকে বিরত থাকবে। এই বিবেচনাগুলির ভিত্তিতে দেখা যায় যে, মিশ্র সংবিধানের ন্যায় সংবিধান কতিপয়তন্ত্র এবং গণতন্ত্রের সমন্বয়ে সংগঠিত করা উচিত নয়। এই ধরনের সংবিধান সম্পর্কে আমাদের অভিমত নিয়ে আলোচনার সময়ে পরবর্তীকালে বর্তমান সিদ্ধান্তকে আমরা অধিকতর শক্তিশালী বলে দেখতে পাব। এবং নির্বাচিতদের মধ্য থেকে নির্বাচনের পদ্ধতি বিপজ্জনক। কারণ সংখ্যা অধিক না হলেও কোন সংখ্যক লোক যদি পরস্পরকে সমর্থনের জন্য জোটবদ্ধ হয় তাহলে নির্বাচনের ফল তাদের ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হবে। প্লেটোর আইন বা 'লজ' সম্পর্কে আমাদের বিবেচনা এই পর্যন্ত থাক।

সপ্তম অধ্যায়

পূর্বগামী চিন্তাবিদদের উল্লেখ : ফ্যালিস

প্লেটোর 'রিপাবলিক' ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রপরিকল্পনার কথাও আমরা জানি। এদের রচনাকারীদের মধ্যে অনেকে আছেন যাঁরা জীবনযাপনগতভাবে রাজনীতিজ্ঞ বা দার্শনিক। আবার অনেকে আছেন যাঁরা এর অন্তর্গত নন। এঁদের পরিকল্পনা প্লেটোর 'রিপাবলিক' বা 'লজ'-এর চেয়ে প্রচলিত সংবিধানসমূহের অধিকতর নিকটবর্তী। এই সমস্ত সংবিধানের ভিত্তিতে বর্তমানের মানুষ জীবনযাপন করছে। কিন্তু এঁদের কেউ স্ত্রী-পুত্র-কন্যার উপর যৌথ স্বামীত্ব বা যৌথ ভোজনালয়ে মেয়েদের খাদ্য গ্রহণ—এরূপ অভিনব প্রস্তাব করেন নি। তাঁরা মূল বিষয়গুলির উল্লেখ করাই প্রয়োজন বোধ করেছেন। অনেকের নিকট এই মূল বিষয়গুলির অন্তর্গত হচ্ছে সম্পদের সম্ভবমতো সর্বোত্তম বণ্টন ব্যবস্থা। কারণ, তাঁদের অভিমত, জীবনের এই মূল চাহিদাগুলির ক্ষেত্রেই বিরোধের উদ্ভব ঘটে। ক্যালসেডন-এর ফ্যালিসই প্রথম সকল নাগরিকের সম্পত্তিকে সমান করার প্রস্তাব করেছিলেন। তাঁর সে প্রস্তাবের পেছনেও এই উদ্দেশ্যটি বিদ্যমান ছিল। ফ্যালিস-এর অভিমত ছিল, এ কাজ গোড়াতে করলে কোন অসুবিধা ঘটে না। কিন্তু রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার পরে ব্যবস্থাটি চালু হয়ে গেলে এ প্রস্তাব কার্যকর করা কঠিন হতে পারে। তথাপি দ্রুততার সঙ্গে সম্পত্তি যে সমান করা যায় না তেমন নয়। ধনীরা যৌতুক প্রদান করবে কিন্তু গ্রহণ করবেনা এবং যারা দরিদ্র তারা যৌতুক গ্রহণ করবে কিন্তু প্রদান করবেনা, এমন বিধানের মাধ্যমে সকল সম্পত্তিকে শীঘ্রই সমান করে তোলা যায়। প্লেটো যখন 'লজ' রচনা করেন তখন তিনি এরূপ মত পোষণ করতেন যে একটা বিশেষ পর্যায় পর্যন্ত সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকা উচিত। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, তাই বলে সম্পত্তির ক্ষুদ্রতম পরিমাণের মালিকানার পাঁচগুণের অধিক পরিমাণ সম্পত্তি রাখার অধিকার কোন নাগরিকের থাকবে না। তবে যারা এই নীতিতে আইন তৈরি করবেন তাঁরা একটা জিনিষ অবশ্যই বিস্মৃত হবেন না যে, সম্পত্তির পরিমাণ নির্ধারণ করার সময়ে সন্তানদের সংখ্যাও তাঁদের নির্ধারিত করে দেওয়া উচিত। কিন্তু এ বিষয়টি তাঁরা ভুলে যাওয়ার প্রবণতা দেখান। কারণ সম্পত্তির পরিমাণের তুলনাতে সন্তান-সন্ততির সংখ্যা অত্যধিক হলে সম্পত্তি সংক্রান্ত এরূপ আইন রক্ষা করা অসম্ভব হবে। এরূপ ক্ষেত্রে যারা এক সময়ে ধনী ছিল তারা দরিদ্রে পরিণত হবে। কিন্তু এটি বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। কারণ তাহলে এরূপ নাগরিকদের মনের মধ্যে বিপ্লবের যে প্রবণতা দেখা দেবে তাকে রোধ করা সম্ভব হবে না।

সে যা হোক, যে যৌথ সংস্থাকে আমরা রাষ্ট্র বলি তার উপর সম্পত্তির সাম্যনীতির বেশ পরিমাণ প্রভাব আছে, এ কথা যে অনেকে বহুপূর্বেই উপলব্ধি করেছিলেন, তা আমরা দেখতে পাচ্ছি। সলোন রচিত আইনের মধ্যে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এমন নগরী রয়েছে যেখানে সীমাহীন পরিমাণে জমি সংগ্রহের উপর বিধিনিষেধ রয়েছে। তেমনিভাবে জমি

বিক্রির বিরুদ্ধেও আইনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে লকরি। এখানকার আইনের বিধান হচ্ছে, পারিবারিক কোন বিপর্যয় জমির বিক্রয় অনিবার্য করেছে, এরূপ প্রমাণিত হলেই মাত্র জমি বিক্রি করা যাবে। অন্যান্য আইনে প্রায়ই নির্দেশ রয়েছে যে, পূর্বপুরুষদের জমিকে অক্ষত রাখতে হবে। এই আইন বাতিল করার ফলেই লিউকাস-এর সংবিধান অতিমাত্রায় গণতান্ত্রিক হয়ে পড়ে। তখন আর উপযুক্ত গুণসম্পন্ন নাগরিককে দায়িত্বের পদে নিযুক্ত করা সম্ভব হল না।

সম্পত্তির সমতার নীতিতেও পরিমাণকে অতি উঁচু কিংবা অতি নীচুতে নির্ধারিত করা যায়। অতি উঁচুতে বিলাসিতার আধিক্য ঘটবে। অতি নীচুতে জীবন যাপন অনিবার্যরূপে কষ্টকর হয়ে দাঁড়াবে। কাজেই এটা পরিষ্কার যে, আইনদাতার জন্য সম্পত্তির সমতার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। উঁচু এবং নীচু—এই দুই এর মধ্যবর্তী একটা পরিমাণ নির্দিষ্ট করার কথা তাকে ভাবতে হবে। তবে, সকলের জন্য মধ্যম পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিলেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। কারণ সম্পত্তি সমান করার চাইতে অধিক প্রয়োজন হচ্ছে ক্ষুধা বা চাহিদার সমতা সৃষ্টির। এবং সে কার্য আইন অনুযায়ী শিক্ষাদানের মাধ্যমেই মাত্র করা সম্ভব। সম্ভবত ফ্যালিস-এর জবাব হবে, ঠিক এটিই তাঁর নিজের ইচ্ছা ছিল। কারণ তাঁর এরূপ অভিমত আছে যে, শিক্ষা এবং সম্পত্তি : রাষ্ট্রের মধ্যে এই উভয় ক্ষেত্রে সমতা হওয়া উচিত। কিন্তু সে ক্ষেত্রে কিরূপ শিক্ষা, তাও সঠিকভাবে বলতে হবে। এক রকম এবং সমান শিক্ষা হবে, কেবলমাত্র এ কথা বলে দেওয়া যথেষ্ট নয়। ‘এক এবং সমশিক্ষা’ এমন হতে পারে যে-শিক্ষার ফলে এমন নাগরিকের সৃষ্টি হবে যারা নিজেদের জন্য সম্পদ অথবা সম্মান, কিংবা উভয় নিজিষই অর্জন করার চেষ্টা করবে। এবং সম্পদের অসমতার চাইতে সুবিধাসমূহের অসমতা থেকে বিরোধ কম সৃষ্ট হয় না। অবশ্য দুটো ক্ষেত্রে কারণগুলি পরস্পর বিপরীত। অর্থাৎ অধিক সংখ্যক, দরিদ্রগণ, সম্পত্তির অসমতাতে এবং উচ্চতর শ্রেণীর লোকেরা সম্মানের সমতাতে বিক্ষুব্ধ হয়। কারণ হোমারের কথায় তখন ‘উত্তম এবং অধমকে একই পাল্লায় ওজন করা হয়।’

সম্পদের সমতার পক্ষে এমন দাবী করা হয় যে, কারুর যখন ক্ষুধার কারণে খাদ্য বা পরিধানের জন্য বস্ত্র চুরি করার আবশ্যক হবে না তখন এরকম অপরাধও আর সংঘটিত হবে না। কিন্তু সম্পদের ক্ষেত্রে যে অপরাধ সংঘটিত হয় তার মূল কেবল জীবনের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব নয়। মানুষ যে সমস্ত দ্রব্য বহুদিন যাবৎ লাভ করার ইচ্ছা পোষণ করে এসেছে সে সমস্ত দ্রব্যকে সে ভোগ করতে চায়। তাদের এমন ইচ্ছা যদি প্রয়োজনের পরিমাণকে অতিক্রম করে যায় তাহলে তারা অপরাধের মাধ্যমে তাকে পূরণ করতে চাইবে। কেবল তাই নয়। মানুষ আবার এমন আনন্দকেও লাভ করতে চায় যে আনন্দ কোন কষ্টের সৃষ্টি করবে না। কাজেই তিন রকম লোক এবং তিন রকম প্রতিবিধানের কথা আমাদের চিন্তা করতে হয় : জীবন ধারনের জন্য যারা চুরি করে তাদের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা এবং জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু দ্বিতীয় ধরনের জন্য প্রয়োজন হচ্ছে আত্মসংযমের। তাদের লোভকে সংযত করার অভ্যাস করতে হবে। তৃতীয়, যারা নিজেদের ব্যতীত কোন কিছু লাভ করার মধ্যে আনন্দ চায় না তাদের জন্য দর্শন যথেষ্ট। অন্য দু'ধরনের লোকের ন্যায় তাদের তৃতীয় কোন পক্ষের প্রয়োজন নেই। বড় অপরাধগুলির ক্ষেত্রে সত্য হচ্ছে এই যে, এ সকল অপরাধের কারণ জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাব নয়। এগুলির মূল হচ্ছে মানুষের লোভের আধিক্য। আমরা কি এমন কথা শুনেছি, কেউ স্বৈরাচারী হয়েছে কেননা তার শীতের পরিধেয়র অভাব ঘটেছে?

সে নিজেকে উষ্ণ রাখতে চেয়েছে? এবং সে কারণে অপরাধের পরিমাণের দিক থেকে প্রতিবিধানের ক্ষেত্রে কোন চোরকে হত্যা করার চাইতে কোন স্বৈরাচারীকে হত্যা করা অধিক শ্রেয়। কাজেই আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে : ফ্যালিস-এর প্রস্তাবে গুরুত্বহীন অপরাধের বিরুদ্ধেই মাত্র ব্যবস্থাগ্রহণ সম্ভব হবে।

এছাড়া আর একটা কথা আছে। ফ্যালিস-এর প্রধান চিন্তার বিষয় হচ্ছে তাঁর নগরীর অভ্যন্তরের সুব্যবস্থাপনা। কিন্তু তিনি প্রতিবেশী এবং অন্যান্য নগরীর সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়টি বিবেচনার মধ্যে আনেননি। কিন্তু এটি ঠিক নয়। সংবিধান তৈরির সময়ে যুদ্ধের শক্তি সংগ্রহের বিষয়ে বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে ফ্যালিস কোন বক্তব্য রাখেন নি। একটি রাষ্ট্রের সম্পদই হচ্ছে তার শক্তি। এবং অভ্যন্তরীণ প্রয়োজনের উপযুক্ত সম্পদ থাকাই যথেষ্ট নয়। বহির্বিপদকে মোকাবিলা করার জন্যও সম্পদ আবশ্যক। এজন্য রাষ্ট্রের সমগ্র সম্পদের পরিমাণ এত অধিক হওয়া উচিত নয় যে তার উপর অধিকতর শক্তিশালী প্রতিবেশীর লোভের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে পারে এবং এমন আক্রমণকে প্রতিহত করা রাষ্ট্রের পক্ষে অসম্ভব হয়। আবার সম্পদের পরিমাণ এত অল্প হওয়াও উচিত নয় যে সমশক্তির বা অপর কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তির অভাব ঘটে। ফ্যালিস অবশ্য সম্পদের কোন সীমা নির্দিষ্ট করেন নি এবং এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নাই যে, উদ্বৃত্ত সম্পদ বিশেষভাবেই উপকার সাধন করে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সীমা একটা নির্দিষ্ট করা আবশ্যক। এ সীমাকে আমরা সর্বোত্তম এইভাবে ব্যক্ত করতে পারি যে, মোট সম্পদের পরিমাণ এত অধিক হওয়া উচিত নয় যাতে অধিকতর শক্তিশালী রাষ্ট্র তাকে দখল করা লাভজনক মনে করে যুদ্ধ বাধাতে পারে। সম্পদের পরিমাণ এরূপ হওয়া উচিত যে, তার পরিমাণের দ্বারা আকৃষ্ট না হয়েও যদি কেউ আক্রমণ করে তাকে যেন প্রতিহত করা সম্ভব হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ-বলা যায়, অটোফ্রাড্যাটিস যখন আটারনিউস-এর অবরোধের পরিকল্পনা করলেন তখন তার শাসক অটোফ্রাড্যাটিসকে বললেন যে, তাকে প্রথমে বিবেচনা করতে হবে,ঐ নগরকে দখল করতে তার কত দিনের প্রয়োজন হবে এবং এই সময়ের যুদ্ধের মূল্য কি দাঁড়াবে। রাজা আরো বললেন : 'এই মূল্যের কিছু কমও যদি আমাদের দেওয়া হয় তাহলে আটারনিউসকে দখল করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে আমার কোন আপত্তি নেই।' রাজার এমন কথায় অটোফ্রাড্যাটিস বিষয়টি দ্বিতীয়বার বিবেচনা করেছিলেন এবং আটানিউসকে অবরোধের চিন্তা তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন।

কাজেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্বসংঘাতের বিরুদ্ধে সম্পদের সমতার কিছুটা মূল্য থাকলেও এর ফলদায়ক ক্ষমতা খুব বেশি নয় এবং তাকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া আমাদের উচিত নয়। কারণ, প্রথম দফাতে অসন্তোষের সৃষ্টি হবে উচ্চতর শ্রেণীসমূহের মধ্যে। তারা মনে করবে, সমতার চাইতে অধিকতর উত্তম তাদের প্রাপ্য। এবং উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবমূলক ষড়যন্ত্রের অনেক দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত মনুষ্য চরিত্রের এই এক অপূর্ণতা যে মানুষ কখনো তৃপ্ত হয় না। প্রথমে যদি তারা দু'টো 'আবোল[১]' পরিমাণ সাহায্য চায় তবে তা আদায় করতে না করতে অধিকতরের দাবী করে এবং ক্রমান্বয়ে সে দাবীর কোন সীমা থাকে না। এর কারণ, মানুষের প্রয়োজনের শেষ নেই এবং বেশির ভাগ লোকই এই প্রয়োজন পূরণের চেষ্টাতেই তাদের জীবন ব্যয় করে। কাজেই একটা স্থিতিশীল সমাজ পেতে হলে সম্পদের সমতা সৃষ্টির চাইতে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করা

১. আবোল ঔবওল প্রাচীন গ্রিসের রৌপ্যমুদ্রা, দেড়পেন্স পরিমাণ।

আবশ্যক যাতে স্বাভাবিকভাবে যারা উচ্চতর শ্রেণীর লোক তারা যেন তাদের প্রাপ্য অংশের অধিক দাবী না করে এবং যারা নিম্নতর শ্রেণীতে অবস্থিত তারাও যেন সেরূপ করতে না পারে। এর অর্থ নিম্নতর যারা তারা দুর্বলতর হবে বটে, কিন্তু পদদলিত নয়।

তাছাড়া 'সম্পদের সমতা' বলতে ফ্যালিস যা বলেছেন তাতেও ভুল রয়েছে। কারণ তিনি কেবল জমির পরিমাণের সমতার ব্যবস্থা করেছেন এবং এ কথা ভুলে গেছেন, সম্পদের মধ্যে পরিবারের দাসগণ, গো-মেষ, মুদ্রা অর্থাৎ অস্থাবর, সম্পত্তি বলতে যা বুঝায় সে সবও অন্তর্ভুক্ত। সমতা কিংবা সম্পদের কিছু পরিমাণ সীমা এ সমস্ত দ্রব্যাদির ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট করা আবশ্যক। তা নাহলে এক্ষেত্রে অবস্থা যেমন ইচ্ছা তেমন হবে। ফ্যালিস-এর আইনগত প্রস্তাবগুলি থেকে বুঝা যায় তিনি এমন নগরী সংগঠিত করার চিন্তা করেছেন যার লোকসংখ্যা কম। এমন নগরীতে দক্ষ কারিগর সকলকে রাষ্ট্রের নাগরিক নয়, দাস হিসাবে চিন্তা করা হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয়ভাবে দাস নিয়োগের চিন্তা করলে সকল দক্ষ কারিগর নয়, কেবল সেবামূলক কার্যে নিযুক্তদেরই দাস গণ্য করা উচিত। এপিড্যামনাস-এর ব্যবস্থা সেরূপ। এক সময়ে ডিওফ্যানটাস এথেন্স নগরীতে এরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। ফ্যালিস-এর 'রিপাবলিক'-এর ওপর এই সকল মন্তব্য দ্বারা পাঠক বুঝতে পারবেন এর মধ্যে ভাল এবং মন্দ কি রয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

নগর পরিকল্পক হিপপোডামাস-এর কথা

ইউরিফন-এর পুত্র হিপপোডামাস এসেছিলেন মিলেটাস থেকে। যাঁরা রাষ্ট্রের সংবিধান রচনার কাজে নিজেরা নিযুক্ত ছিলেন তাঁদের ছাড়া হিপপোডামাসই এমন লোক যিনি সর্বোত্তম রাষ্ট্র সম্পর্কে সর্বপ্রথম আলোচনা করেছেন। নগরীকে বিভিন্ন এলাকায় বিভক্ত করার পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেছেণ এবং পাইরিউস-এর সড়ক পরিকল্পনাও তিনি তৈরি করেছিলেন। অন্যলোকদের থেকে ভিন্নভাবে জীবনধারণের তাঁর একটি প্রবণতা ছিল। এ জন্য তাঁর জীবনপদ্ধতি বিভিন্ন কারণে অদ্ভুত বলে বোধ হত। অনেকে মনে করত এই অদ্ভুত হওয়ার প্রবণতাই তাঁর লম্বা কেশ রক্ষণ এবং মহার্ঘ অলঙ্কারাদি পরিধানের মধ্যে অত্যুগ্র ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পোষাক পরিধানে তাঁর একটা বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, হিপপোডামাস গ্রীষ্ম এবং শীত সকল সময়ে একইরকম সস্তা এবং উষ্ণ বস্ত্র পরিধান করতেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ হওয়ারও তিনি দাবী করতেন। হিপপোডামাস দশ সহস্র নগরবাসীর একটি নগরের পরিকল্পনা করেছিলেন। এই নগরকে আবার তিনি তিনভাগে বিভক্ত করেছিলেন। এর একভাগে ছিল দক্ষ মজুর। একভাগে কৃষিজীবী। তৃতীয় ভাগ ছিল অস্ত্রধারী এবং দেশরক্ষাকারীদের। নগরীর ভুখণ্ডটিকেও তিনি তিনভাগে বিভক্ত করেছিলেন : পবিত্র বা ধর্মীয় এলাকা, জন এলাক এবং ব্যক্তিগত এলাকা। দেবতাদের পূজা-অর্চনার খরচ আসত ধর্মীয় এলাকার উৎপাদন থেকে। দেশরক্ষকদের পোষণ হত জন এলাকা থেকে এবং কৃষিজীবীদের ব্যক্তিগত জমি থেকে। আইনসম্পর্কেও তাঁর মত ছিল যে, আইন তিন প্রকারের। এর প্রত্যেকটির চরিত্র নির্দিষ্ট হত বিরোধের বা অভিযোগের বৈশিষ্ট্য থেকে। অভিযোগের একটি শ্রেণী ছিল : মানুষের দৈহিক ক্ষতি, আর একটি সম্পত্তির ক্ষতি এবং তৃতীয়টি মানুষের হত্যা। বিচারের ক্ষেত্রে একটি সর্বোচ্চ আপীল আদালতের তিনি চিন্তা করেছিলেন। যে সমস্ত অভিযোগের বিচার প্রাথমিক দৃষ্টিতে সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন হয়নি বলে বোধ হত, তার সবগুলিকে এই সর্বোচ্চ আপিল আদালতে প্রেরণের ব্যবস্থা ছিল। এই আদালত গঠিত হওয়ার প্রস্তাব ছিল বাছাই করা প্রধান নাগরিকদের সমন্বয়ে। বিচারের রায়কে পক্ষে বিপক্ষে ভোট দ্বারা নির্ধারণের তিনি বিরোধী ছিলেন। হিপপোডামাস-এর প্রস্তাব ছিল, প্রত্যেক বিচারকের সম্মুখে লিখন-খণ্ড স্থাপন করা হবে এবং তাতে তাঁরা অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁদের প্রস্তাবিত দণ্ড বা খেসারতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করবেন; অভিযুক্ত বেকসুর খালাস হলে লিখনখণ্ডগুলি লিখনশূন্য রাখবেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত যদি এর দু'এর কোন একটি না হয় তাহলেও বিচারককে লিখন-খণ্ডে তাঁর অভিমত উৎকীর্ণ করতে হবে। হিপপোডামাস প্রচলিত ব্যবস্থাকে এ কারণে অবাঞ্ছিত মনে করতেন যে, এ-ব্যবস্থায় বিচারক হয় এ পক্ষে নয়ত ও পক্ষে রায় দিতে বাধ্য হন। এর ফলে নিজের বিবেক অনুযায়ী ভোটদানের যে শপথ তাঁরা গ্রহণ করেন

তার প্রতি তাঁদের মিথ্যাচার করতে হয়। এর পরে তিনি যে সমস্ত আইনের উল্লেখ করেন তার মধ্যে এরূপ আইন ছিল যে, দেশের স্বার্থের অনুকূলে যারা কোন কিছু আবিষ্কার করবেন তাঁরা তাঁদের সে আবিষ্কারের জন্য সম্মানিত হবেন এবং পুরস্কার লাভ করবেন। এবং দেশের জন্য যুদ্ধে যারা নিহত হবেন রাষ্ট্র নিজ ব্যয়ে তাঁদের সন্তানদের প্রতিপালন করবে। (মনে হয় হিপপোডামাস-এর ধারণা ছিল, এই বিধানটি একেবারে নতুন। কিন্তু তা ঠিক নয়। অবশ্যই বর্তমানে এথেন্সে এবং অন্যত্র এরূপ বিধানের প্রচলন রয়েছে।) তাছাড়া সরকারের কর্মচারী সকলের, অধিবাসীদের দ্বারা নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। নগরবাসীদের যে তিনটি অংশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তারা ছিল নির্বাচকমণ্ডলী। নির্বাচিত এই কর্মচারীদের দায়িত্ব ছিল জনস্বার্থের এবং বিদেশী এবং অনাথদের বিষয়গুলি দেখা।

[এর পরবর্তী আলোচনাটিতে দেখা যায়, এ্যারিস্টট্ল এটা ধরে নিয়েছেন যে, অস্ত্রবহন করা পূর্ণ নাগরিকতা এবং রাষ্ট্রীয় পদ অধিকারের একটি পূর্বশর্ত।]

হিপপোডামাস-এর শাসন ব্যবস্থার এগুলি হচ্ছে প্রধান বৈশিষ্ট্য। প্রধানত এগুলিই আলোচনার যোগ্য। এ ক্ষেত্রে আমার প্রথম সমালোচনা হচ্ছে সমগ্র নাগরিকদের তিনভাগে ভাগ করার উপর। কারণ যারা দক্ষ মজুর, কৃষিজীবী এবং অস্ত্রবহনকারী—তারা সকলেই পূর্ণ নাগরিকতার অধিকারী। অথচ কৃষিজীবী যারা তাদের অস্ত্র নাই। যারা শ্রমজীবী তাদের জমিও নাই, অস্ত্রও নাই। এর ফলে এরা উভয়েই যারা অস্ত্রের অধিকারী তাদের ভৃত্যে পর্যবসিত হয়ে যায়। এমন অবস্থায় রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব এবং সম্মানকে সকলের পক্ষে সমানভাবে ভোগ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আর এটা অপরিহার্যও বটে, যারা সেনাপতি এবং যাদের দায়িত্ব নাগরিকদের রক্ষা করা , এক কথায় যারা উচ্চতম পদের অধিকারী তাদের সকলকে অস্ত্রের অধিকারীদের মধ্য থেকে গ্রহণ করা আবশ্যক। অপরদিকে এরা সকলে যদি পূর্ণ নাগরিক না হয় তাহলে তারা শাসনতন্ত্রে সন্তুষ্ট থাকবে, এমন আশা করা যায় কি প্রকারে? আমার কথা হচ্ছে, যারা অস্ত্রের অধিকারী হবে তারা বাকি দুটি অংশ থেকে অবশ্যই ক্ষমতার ক্ষেত্রে উচ্চতর হবে। কিন্তু তাদের ষংখ্যা অধিক না হলে এমনটি হওয়া সহজ নয়। আবার এরা যদি সংখ্যায় অধিক হয় তাহলে অপরের নাগরিকতার কিংবা শাসনের পদ অধিকারের কি প্রয়োজন? তাছাড়া, যারা কৃষিজীবী তারা যদি কেবল তাদের নিজেদের এবং তাদের পরিবারবর্গের পোষণ করে তাহলে রাষ্ট্রের জন্য তাদের আবশ্যকতা কি? দক্ষ শ্রমিকদের কথা বলছিনে। তাদের অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রের জন্যই তারা আবশ্যক। অন্যত্র যেমন হচ্ছে, তারা নিজেদের পেশা থেকে নিজেদের পোষণ করতেও সক্ষম। কিন্তু কৃষিজীবীগণ যদি অস্ত্রধারীদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব বহন করে তবেই তাদেরকে রাষ্ট্রসংস্থার শরীক হিসাবে গণ্য করার যুক্তি থাকে। কিন্তু হিপপোডামাস-এর পরিকল্পনায় আমরা তার সাক্ষাৎ পাইনে। যে জমি তারা কর্ষণ করে সে জমি তাদের। এবং তাকে কর্ষণওকরে নিজেদের স্বার্থে। অস্ত্রধারীদের পোষণের জন্য সাধারণ বা যৌথ জমির ব্যবস্থা অবশ্য দেখা যায়। কিন্তু সে জমি কর্ষণ করবে কে? অস্ত্রধারীগণ নিজেরাই যদি সে জমি কর্ষণ করে তাহলে হিপপোডামাস-এর পরিকল্পনানুযায়ী যোদ্ধা এবং কৃষকদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। আবার কৃষক ব্যতীত অপর কেউ যদি যোদ্ধাদের জন্য যোদ্ধাদের জমি কর্ষণ করে তাহলে একটি চতুর্থ শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। কিন্তু এই শ্রেণী তাহলে সমাজে কোন অবস্থানহীন এবং সমগ্র ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই একটা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এমন

হতে পারে যে, একই লোক ব্যক্তিগত এবং সরকারি উভয় প্রকার জমি কর্ষণ করল। কিন্তু তেমন ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির পক্ষে নিজের এবং যোদ্ধার পরিবারের প্রয়োজনীয় যথেষ্ট পরিমাণ ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হবে না। তাহলে জমির এই বিভাগের সার্থকতা কি? এদের উভয়ের পক্ষেই সাধারণ জমি থেকেই নিজেদের এবং যোদ্ধাদের ভরণ-পোষণের দ্রব্যাদি পেতে অসুবিধা কি? এখানে ব্যক্তিগত জমি এবং ওখানে সরকারি জমি, এভাবে ভিন্নভাবে কর্ষণ করার পরিবর্তে একটি অখণ্ড জমি উভয় প্রয়োজনে কর্ষণ করাতে আপত্তি কি? এখানে বেশ পরিমাণ বিভ্রান্তির আমরা পরিচয় পাই।

আদালতের রায়ের ক্ষেত্রেও হিপপোডামাস-এর প্রস্তাবগুলি এর চাইতে খুব উত্তম নয়। তিনি মনে করেন, রায় যেখানে স্পষ্টতর 'হাঁ' কিংবা 'না' বাচক হবে সেখানেও বিচারকদের ব্যাখ্যামূলকভাবে সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করতে হবে। কিন্তু এমন হলে ডাইকাস্ট, আদালতের পরিবর্তে মীমাংসাকারীতে পরিণত হবে। সালিশ বা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে এমনটি হয়। একাধিক সালিশ থাকলে তাঁরা নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোচনা করেন। কিন্তু এটি আদালতে যেমন সম্ভব নয়, তেমনি বাঞ্ছনীয়ও নয়। কারণ, আইন প্রণেতাগণের সকলেই এরূপ ব্যবস্থা রাখেন যেন বিচারকগণ নিজেদের মধ্যে আলোচনার কোন সুযোগ না পান। তাছাড়া বিচারকগণের প্রত্যেকে খেসারতের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিবেন—এ নিয়ম থেকেও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে। কারণ, একজন বিচারক মনে করতে পারেন খেসারতের দণ্ড হলেও বাদীর দাবীর চাইতে তার পরিমাণ কম হতে পারে। ধরা যাক বাদীর দাবী হল বিশ মিনা। কিন্তু একজন বিচারক বললেন, দণ্ডের পরিমাণ হবে দশ মিনা (এর বিপরীতও হতে পারে।) আর একজন বিচারক সিদ্ধান্ত করলেন দণ্ডের পরিমাণ হবে চার মিনা। বস্তুত পার্থক্যটি এমননিভাবেই হতে থাকবে। কেউ বাদীর দাবীর সবটাই সমর্থন করতে পারেন। আবার কেউ দাবীর একটি পয়সাও না মানতে পারেন। তখন এমন ক্ষেত্রে ভোট কি ভাবে গণনা করা হবে? তাছাড়া স্পষ্ট 'না' বা 'হাঁ' বলার দ্বারা কাউকে তার শপথের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্তদানের কথাও বুঝায় না। সিদ্ধান্তে কোন জটিলতা না থাকলে বিচারক সততার সঙ্গেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। কারণ, যে বিচারক বাদীর দাবী অস্বীকার করবেন তাঁর সে অস্বীকৃতির অর্থ এই নয় যে, বাদীর আদৌ কোন প্রাপ্য নাই। এর অর্থ বিচারক বিশ মিনার দাবী নাকচ করেছেন। শপথের বিরুদ্ধে কাজ করার অবস্থা দাঁড়াবে তখন যখন একজন বিচারক বাদীর বিশ মিনার দাবি গ্রহণযোগ্য নয় বিবেচনা করেও সে দাবি তার মঞ্জুর করবেন।

[এরপরে নতুন কোন আবিষ্কারের জন্য পুরস্কার প্রদানের যে প্রস্তব হিপপোডামাস করেছেন এ্যারিস্টট্ল সে প্রস্তাবকে সমালোচনা করছেন। এ ক্ষেত্রে এ্যারিস্টট্ল কোন কারিগরী আবিষ্কারের তথ্যের ভিত্তিতে যে আপত্তি তুলছেন এমন নয়। অবশ্য একথা ঠিক যে, কোন কারিগরী বিদ্যার কথা যদি তিনি নির্দিষ্টভাবে অবগত হতেন তাহলে তার সম্পর্কে তিনি সন্দেহ পোষণ করতেন। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকে মানুষ নিজেদের অভিজ্ঞতাকে দেখেছে নতুন কারিগরী আবিষ্কার রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্য গুরুত্বহীন নয়। নতুন আবিষ্কার রাষ্ট্রের সমগ্র ব্যবস্থাকেই পাল্টে দেয়। কিন্তু এখানে এ্যারিস্টট্লের উদ্বেগের বিষয় নতুন সামাজিক এবং রাজনৈতিক ভাব বা ধারণা। যে কোন প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার জন্য নতুন কোন ভাব অবশ্যই সন্দেহের বিষয়। এ্যারিস্টট্ল-এর এরূপ বিষয়ের উত্থাপন অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। প্রশ্নটি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং কঠিনতম প্রশ্নগুলির অন্যতম। কোন শাসন ব্যবস্থার অস্তিত্ব যতক্ষণ স্বেচ্ছাচারের বিরোধী শক্তি

হিসাবে কাজ করে ততক্ষণ সে শাসনব্যবস্থাকে অবশ্যই মানতে হবে। এ্যারিস্টটলের রক্ষণশীল মনোভাবের ভিত্তিও সেখানে। গ্রিকদের অভিজ্ঞতাই এর ভিত্তি। এ্যারিস্টট্‌ল অবস্থার উন্নতিকে নাকচ করছেন না। তিনি স্বীকার করেন অতীতে নতুন ভাব দ্বারা অবস্থার উন্নতি সাধন করা হয়েছে। যে কোন কালে এমন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু এ্যারিস্টট্‌ল এসব ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা এবং অনাগ্রহেরই পরামর্শ দিচ্ছেন।]

এবার আর একটি বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। হিপপোডামাস-এর প্রস্তাব হচ্চে রাষ্ট্রের উপকারী কোন কিছু যারা আবিষ্কার করবে তাদেরকে পুরস্কৃত করতে হবে। প্রস্তাবটি দেখতে এবং শুনতে উত্তম। কিন্তু বেশ বিপদজনকও বটে। এর ফলে পর্দার অন্তরালে যেমন চক্রান্তের সৃষ্টি হবে তেমনি অনেক সময়ে এ থেকে শাসনব্যবস্থাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। এই যদি অবস্থা হয় তাহলে এর সঙ্গে আর একটি ব্যাপারও জড়িত। বৃহত্তর সেই প্রশ্ন থেকে একে বিচ্ছিন্ন করা চলে না। প্রশ্নটি হচ্ছে : একটা নগরীতে পূর্বপুরুষদের যে সনাতন নিয়মনীতি, প্রথা চলে আসছে, অধিকতর উত্তম কিছুর সন্ধান পেলেই সেগুলি পরিবর্তন করা কি মঙ্গলকর, না অমঙ্গলকর? জবাবটি যদি এই হয় যে, এরূপ পরিবর্তন অমঙগলকর তাহলে হিপপোডামাস-এর এরকম প্রস্তাব শ্রবনমাত্র গ্রহণ করা কঠিন। কেউ তো এমন প্রস্তাবও নিয়ে আসতে পারে যে, সমাজব্যবস্থা এবং তার বিধানসমূহকে আমরা ভেঙ্গে দিই। ভেঙ্গে দিলে মানুষের মঙ্গল সাধিত হবে।

যা হোক বিষয়টির যখন অবতারণা করা হয়েছে, তখন এ নিয়ে আরো একটু আলোচনা করা আবশ্যক। কারণ, পরিবর্তনের পক্ষেও যুক্তির দিক রয়েছে। সমাজ ব্যতীত অন্যান্য বিজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা অবশ্য নির্দিষ্টভাবেই বলতে পারি যে, সকল ক্ষেত্রে পরিবর্তন আমাদের মঙ্গল সাধন করেছে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে পুরোন পদ্ধতিকে আমরা পরিত্যাগ করেছি। অন্যান্য দক্ষতার ক্ষেত্রেও প্রশিক্ষণ ও পদ্ধতিতে উন্নতি সাধিত হয়েছে। এখন রাষ্ট্রের কথা তুললে আমাদের বলতে হয়, যেহেতু রাজনীতিকেও আমরা অনুরূপ একটি বিজ্ঞান বলে গণ্য করি, সে কারণে এ-ক্ষেত্রেও আমরা কিছু উন্নতির আশা করি। এবং সে আশা অহেতুক নয়। পুরোন বিধি এবং প্রথাসমূহ কতবেশি অনুন্নত এবং অসংস্কৃত এবং অবিবেচিত ছিল, তা চিন্তা করলে এই পরিবর্তনের উত্তমতার দিকটি আমরা বুঝতে পারি। পূর্বে গ্রীকগণ সবসময়ে অস্ত্রবহন করে চলত। তারা পরস্পরের নিকট থেকে তাদের কনেকে ক্রয় করত। তাছাড়া এমন সব প্রথার রেশ এখনো পাওয়া যায় যেগুলি আমাদের মনে হাসির উদ্রেক করে। দৃষ্টান্ত হিসাবে সাইমির একটি আইনের উল্লেখ করা যায়। এ আইন অনুযায়ী হত্যার অভিযোগের ক্ষেত্রে বাদীপক্ষ যদি অভিযুক্তের পরিবারের মধ্য থেকেও কিছু সংখ্যক সাক্ষী সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় তাহলেই অভিযুক্তকে হত্যার অপরাধে অপরাধী বলে রায় দেওয়া চলে। পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সাধারণত উত্তম আইনকে পরিবর্তিত করা হয়, শুধু সনাতন প্রথাকে নয়। আমাদের আদি পূর্ব-পুরুষদের সাধারণ বিবেচনাহীন ধারণাকে আকড়ে থাকারও অবশ্য কোন অর্থ নেই। আমরা একথাও বলতে পারি, যে সকল বিধি বিধানকে লিখিত আকারে রাখা হয়েছে সেগুলিকেও অপরিবর্তনীয় ভাবার কারণ নেই। অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে তুলনার ভিত্তিতে আমরা একথাও বলতে পারি, রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বশেষ বিষয়টি পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করে রাখা অসম্ভব। সাধারণ নীতিই মাত্র লিপিবদ্ধ করা যায়। বিশেষ ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ কিভাবে ঘটবে তা বিশেষ ক্ষেত্রই নির্দিষ্ট

করবে। এ আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার যে, এমন অবস্থাও হতে পারে, যখন পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। এবং এমন আইনও থাকতে পারে যাকে পরিবর্তন করা আবশ্যক। কিন্তু আর একটি দিক থেকে দেখলে একথাও সত্য যে, এমন ক্ষেত্রে সর্বাধিক সতর্কতার আবশ্যক। এমনও হতে পারে যে, সামান্য কিছু পরিমাণ উন্নতির প্রতিপক্ষে আমরা আইনকে সহজে পরিবর্তন করার অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার বিপদের সম্মুখীন হবো। তখন শাসনকে অমান্যতার অভ্যাসে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার বিনিময়ে নাগরিক সামান্য সুবিধাই মাত্র লাভ করবে। এ ক্ষেত্রে দক্ষতার সঙ্গে তুলনা ঠিক হবে না। আইনকে পরিবর্তন করা এবং বিজ্ঞানের কোন পদ্ধতি পরিবর্তন করা এক কথা নয়। দু'এর মধ্যে পার্থক্য আছে। একটা উন্নততর পদ্ধতি গ্রহণের নানা আকর্ষণ আছে। কিন্তু প্রথার বাইরে মান্যতার ক্ষেত্রে আইনের নিজের আর কোন শক্তি নেই। কিন্তু প্রথা তথা অভ্যাস একদিনে তৈরি হয় না। এটি গড়ে উঠতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। কাজেই প্রতিষ্ঠিত আইনের ইচ্ছামাত্র পরিবর্তন আইনের শক্তিকে দুর্বল করে। আইনকে যদি পরিবর্তন করতে হয় তাহলে প্রথমে স্থির করতে হবে, সকল আইনকে কিংবা মাত্র কিছু সংখ্যক আইনকে পরিবর্তন করা হবে। এবং এ পরিবর্তন কি সকল রকম শাসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য? এবং পরিবর্তনের উদ্যোগই বা কে নেবে? যে কেউই কি এমন উদ্যোগ গ্রহণ করবে কিংবা কেবল কিছু সংখ্যক ব্যক্তি? তাতেও বড় রকমের পার্থক্যের সৃষ্টি হবে। যাহোক, এ আলোচনা আমরা এখন স্থগিত রাখতে পারি। অন্য সময়ে এ নিয়ে আবার আলোচনা করা যাবে।

নবম অধ্যায়

প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার কথা : ল্যাসিডিমনিয়া, ক্রিট এবং কার্থেজের শাসনব্যবস্থা

[এ্যারিস্টট্‌ল এভাবে শাসনব্যবস্থার তাত্ত্বিক অর্থাৎ প্লেটো, ফ্যালিস এবং হিপপোডামাস -এর আলোচনাকে সমাপ্ত করেছেন। এর পরে তিনি বাস্তব রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রচলিত শাসনব্যবস্থাসমূহ নিয়ে আলোচনা শুরু করছেন। এর মধ্যে তিনি উল্লেখ করছেন ল্যাসিডিমনিয়া (স্পারটা), ক্রিট এবং কারথেজ-এর শাসনব্যবস্থাসমূহের। এগুলির বিশেষ খ্যাতি রয়েছে। স্পারটার শাসনব্যবস্থার নানা ত্রুটির কথা এ্যারিস্টট্‌ল উল্লেখ করলেও চতুর্থ পুস্তকে তাঁর এরূপ মন্তব্য পাওয়া যায় যে, তিনি স্পারটার ব্যবস্থাকে সামগ্রিক বিচারে এবং বিভিন্ন উপাদানের মিশ্রণের বিচারে তাঁর নিজের 'পলিটি'র সদৃশ বলে গণ্য করেন।

এই ব্যবস্থাগুলির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এ্যারিস্টট্‌লের দু'টি বিচার উল্লেখযোগ্য। তাঁর আলোচনার বৈশিষ্ট্য এই দু'টি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীভূত হয়েছে বলে মনে হয়। ১. একেবারে সর্বোত্তম বা আদর্শ শাসনব্যবস্থা এবং কোন বিশেষ স্থান বা কালের বিচারে সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা এক কথা নয়। ২. একজন নাগরিককে যদি নাগরিকোচিত গুণাবলি অর্জন করতে হয় তবে তার এমন কাজ করা চলবেনা যে কাজ তাকে হীন করতে পারে। এ থেকে এ্যারিস্টট্‌ল এই বিবেচনায় পৌঁছেন যে, নাগরিক যদি হীন কাজ অর্থাৎ নিম্নস্তরের কাজ না করে তাহলে একটা নিম্নতর শ্রেণীর আবশ্যক যে শ্রেণী নানা উৎপাতের উৎস হয়ে দাঁড়াবে। এ্যারিস্টট্‌ল-এর আলোচনা থেকে আমাদের এই বিস্ময়ের উদ্রেক হয় যে, তিনি এই সমস্যার বিষয়ে যেমন অধিক কিছু বলছেন না, তেমনি এর বিরুদ্ধে দমনমূলক আইন তৈরির প্রস্তাব ব্যতীত অপর কোন প্রস্তাবও তিনি দিচ্ছে না।]

ল্যাসিডিমনিয়ার অধিবাসীদের শাসনতন্ত্র কিংবা ক্রিটবাসীদের শাসনতন্ত্র এবং সাধারণভাবে অপর সকল শাসনতন্ত্র সম্পর্কে দু'টি প্রশ্ন আলোচনা করা আবশ্যক : প্রথমত চরম উত্তমের দিক থেকে বিচার করলে এ সকল শাসনতন্ত্রকে ভাল কিংবা খারাপ—কি বলে আখ্যায়িত করতে পারি? দ্বিতীয়ত এ সকল শাসনতন্ত্র বা সংবিধানের মধ্যে এমন কিছু কি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা এদের ইপ্সিত লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়? এ আলোচনায় প্রথম কথা হচ্ছে, কোন সুশাসিত নগরের জন্য যা প্রয়োজন সে হচ্ছে এই যে, নাগরিকগণকে দৈহিক কাজ থেকে মুক্ত থাকতে হবে। কিন্তু এই শর্তটির পূরণ কেমন করে হবে, এটি বলা সহজ নয়।

দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা দেখি, স্পারটার হেলটগণ যেরূপ প্রভুদের যে কোন দুর্যোগের অপেক্ষায় থাকে এবং দুর্যোগের সময়ে স্পারটীয় প্রভুগণকে আক্রমণ করে, তেমনি থেসালীতেও দাসগণ প্রভুদের আক্রমণ করছে। কিন্তু ক্রিটে এ পর্যন্ত এরূপ ঘটতে দেখা

যায় নি। এর একটি কারণ হয়ত এই যে, প্রতিবেশী নগরগুলো নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে রত থাকলেও দাসদের বিদ্রোহের সময়ে কেউ দাসদের সঙ্গে কখনো যোগদান করে নি। কেউ এরূপ করেনি কারণ প্রত্যেকেরই নিজের স্বার্থ এতে জড়িত ছিল, প্রত্যেক নগরীতেই দাসশ্রেণী আছে। কিন্তু স্পারটার প্রতিবেশীদের ক্ষেত্রে দেখি যে, আরগিভস, মেসেনিয়া এবং আরকেডিয়া—প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলির সকলেই স্পারটার প্রতি বৈরীমনোভাবাপন্ন। ঠিক তেমনি থেসালিতেও গোড়া থেকে আমরা দাসদের অভ্যুত্থান সংঘটিত হতে দেখি। কারণ থেসালির অধিবাসীগণও তাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র, যথা একিয়া, পারহিবিয়া এবং ম্যাগনেশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে রত ছিল। এরূপ বিপদের উৎস যদি কিছু নাও থাকে তবু নগরবাসীর সর্বক্ষণের একটি সতর্ক চিন্তা থাকা আবশ্যক, যেন তারা তাদের অধীনস্থ্ দাসদের সঙ্গে নির্বিঘ্ন জীবন যাপন করতে পারে। তুমি দাসদের যদি অধিক প্রশ্রয় দাও তবে তারা অচিরে স্বাধীনতার মনোভাব প্রদর্শন করতে থাকে এবং প্রভুদের সঙ্গে সম অধিকার দাবী করতে শুরু করে। আবার তাদের সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করলে তাদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয় এবং তারা বিদ্রোহাত্মক রূপ ধারণ করে। কাজেই এ থেকে এটা বুঝা যায়, যে সকল নগর হেলটদের নিয়ে এরূপ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তারা এ সমস্যার কোন সমাধান এখনো স্থির করতে পারেনি।

স্পারটার মেয়েদের যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়টিও উল্লেখ করা যায়। এ স্বাধীনতা যেমন তার সংবিধানের উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে না, তেমনি নগরীর সুখেরও বৃদ্ধি ঘটায় না। উভয় ক্ষেত্রে এ স্বাধীনতা ক্ষতিকর। কারণ গৃহকে আমরা যেমন মেয়ে এবং পুরুষ হিসাবে বিভক্ত করি, নগরীকেও আমরা সংখ্যার ভিত্তিতে মোটামুটি সমানভাবে পুরুষ এবং মেয়েদের বিভাগে বিভক্ত করি। যে সকল সংবিধানে মেয়েদের অবস্থান সুনির্ধারিত নয় সে সকল সংবিধানেই নাগরিকদের এক অংশ অর্থাৎ মেয়েদের বিষয়ে যে উপযুক্ত বিধানের ব্যবস্থা নেই, এ কথা বুঝতে হবে। স্পারটার ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি ঘটেছে। কারণ এই নগরীর বিধান দাতা অবশ্য সমগ্র নগরীকে দৃঢ়বদ্ধ করার উদ্দেশ্য পোষণ করেছিলেন এবং সে অনুযায়ী তিনি পুরুষদের বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তাও করেছেন, কিন্তু মেয়েদের ব্যাপারে তাঁর ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। মেয়েদের বিষয়টিকে তিনি অবহেলা করেছেন। কারণ, স্পারটার মেয়েদের জীবন-যাপনে কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তারা যে কোন বিলাসব্যসনে এবং যথেচ্ছাচারে লিপ্ত হতে পারে। এর একটি অনিবার্য পরিণতি এই হয়েছে যে, ধনবান হওয়ার উপরই সব চাইতে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই প্রবণতার প্রকাশ ঘটে প্রধানত সেই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যেখানে পুরুষেরা মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত। সামরিক ও যুদ্ধপ্রিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই প্রবণতা সচরাচরই দেখা যায়। অবশ্য কেল্ট উপজাতি এবং অন্যান্য যে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে সমকামের প্রকাশ্য সমর্থন রয়েছে তারা এর ব্যতিক্রম। এদের আচরণে মনে হয় আরিস এবং আফ্রোদিত-এর মিলনের যে উপাখ্যান আছে তা হয়ত ভিত্তিহীন নয়। অবশ্য এটা বোধগম্য, সামরিক বাহিনীর লোকদের মধ্যে যৌন কামনার প্রবণতা স্বাভাবিক। এ কামনার লক্ষ্য মেয়ে কিংবা পুরুষ—যেই হোক না কেন স্পারটার যে যুগে মেয়েদের প্রাধান্য দেখা যায় সে যুগে বিরাজিত অবস্থার মূলে এই কারণ বিদ্যমান। তাছাড়া, মেয়েরা শাসক এবং শাসকেরা মেয়েদের দ্বারা শাসিত—এই দুই অবস্থার মধ্যে পার্থক্য কি? উভয়ক্ষেত্রে ফল একই। যুদ্ধ ক্ষেত্র ব্যতীত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে সাহসিকতাকে আমরা খুব

প্রয়োজনীয় গুণ বলে বিবেচনা করিনে। কিন্তু এক্ষেত্রেও স্পারটাতে মেয়েদের প্রভাব ক্ষতিকরই হয়েছে। এটার প্রমাণ পাওয়া গেছে ল্যাকোনিয়া (স্পারটা) যখন থিব এর অধিবাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল তখন। অন্যান্য রাষ্ট্রে মেয়েরা প্রয়োজনীয় যে ভূমিকা পালন করে সে ভূমিকার বদলে স্পারটাতে মেয়েরা শত্রুর চাইতেও অধিক পরিমাণে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছিল। অবশ্য স্পারটার ইতিহাস থেকে বিষয়টিতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। ল্যাকোনিয়ার মেয়েদের মধ্যে পূর্বকাল থেকেই একটা নিয়ন্ত্রণহীনতার অবস্থা দেখা যায়। তার কারণ এই নগরীর জীবনে দীর্ঘসময় ধরে তার পুরুষেরা আরগিভ বা আরকেডিয়া বা মেসেনিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থানের কারণে নিজেদের গৃহে অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য হয়েছে। এর পরে তারা যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সামরিক বাহিনীর চরিত্রোপযোগী বাধ্যতার প্রবণতা নিয়ে নগরীর আয়েশের জীবনে প্রত্যাবর্তন করল তখন বিধানদাতা লাইকারগাস-এর বশ্যতা স্বীকারে তাদের কোন অসুবিধা হল না। কিন্তু এই বশ্যতার বৈশিষ্ট্যটি মেয়েদের চরিত্রে ছিল না। এ রকম কথিত আছে, লাইকারগাস মেয়েদেরকেও তাঁর বিধানের বশ্যতায় আনয়নের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মেয়েদের প্রতিরোধের সম্মুখে তাকে তাঁর সে চেষ্টা পরিত্যাগ করতে হয়। আমরা যে ত্রুটির বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম তার মূলে এই কারণ নিহিত এবং এ কারণেই উপরোক্ত অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। সে যা হোক, আমাদের বর্তমানের প্রশ্ন হচ্ছে, কোন্‌টা ঠিক এবং কোন্‌টা ঠিক নয়। কাউকে প্রশংসা কিংবা নিন্দা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এ ক্ষেত্রে আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, স্পারটায় মেয়েদের বিষয়টি সঠিক ছিল না। সংবিধানের মূল চরিত্রেরই এটা বিরোধী এবং অর্থগৃধ্নুতার যে প্রবণতা আমরা বর্তমানে দেখতে পাই তার প্রধান উৎস হচ্ছে এই অবস্থা।

এর পরে আমাদের আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত স্পারটার সম্পত্তি মালিকানার ক্ষেত্রে বিরাজিত অসমতা। এখানে দেখা যায়, স্পারটার কোন কোন অধিবাসীর সম্পত্তির পরিমাণ অত্যধিক ; আবার অপর অনেকের সম্পত্তির পরিমাণ একেবারেই অল্প। সমস্ত জমি অল্পসংখ্যক লোকের হাতে এসে জমা হয়েছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে যেমন, এখানেও তেমনি সংবিধান প্রণয়নের ত্রুটিই এর কারণ। স্পারটার বিধান দাতা অবশ্য সঠিকভাবেই জমির ক্রয় বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু দান বা উইলের মাধ্যমে জমির মালিকানা হস্তান্তরের বিষয়টির উপর তিনি কোন নিষেধ আরাপ করেন নি। এ থেকে সেই একই ফলের উদ্ভব ঘটল। তাছাড়া স্পারটাতে দেখা যায় সমগ্র জমির দুই পঞ্চমাংশের মালিক মেয়েরা। এর কারণ হচ্ছে দু'টি : ১. উত্তরাধিকারিনীর সংখ্যা অনেক এবং ২. যৌতুকের পরিমাণ অধিক। যৌতুকের ব্যাপারেও আইন প্রণয়নের প্রয়োজন ছিল। এ ক্ষেত্রে একেবারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ অথবা যৌতুকের পরিমাণ সামান্য কিংবা তেমন অধিক না হওয়ার ব্যবস্থা রাখা আবশ্যক ছিল। উত্তরাধিকারিনীর প্রশ্নে অবশ্য আইনে যে বিধান রয়েছে সে বিধান অনুযায়ী যে কারুর সঙ্গে তাদের বিয়ে দেওয়া যায়। এমন যদি হয়, কোন পুরুষ এ ব্যাপারে মৃত্যুর পূর্বে কোন নির্দেশ রেখে যায়নি, তাহলে তার সম্পত্তি ব্যবস্থাপক হিসাবে যে নিয়োজিত হবে সে উত্তরাধিকারিণীকে তার ইচ্ছামত ব্যক্তির নিকট প্রদান করতে পারবে।

সম্পত্তির মালিকদের মধ্যে পুরুষদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়াতে পূর্ণ নাগরিকের সংখ্যা হাজারেরও কমে গিয়ে পৌঁছল, অথচ জমির যা পরিমাণ ছিল তাতে দেড় সহস্র অশ্বারোহী এবং পঞ্চাশ সহস্র ভারী পদাতিকের পোষণ চলত। ইতিহাস প্রমাণ করেছে ব্যবস্থটি উত্তম

ছিল না। একটা মাত্র সংঘর্ষের ফলই (৩৭১ খ্রিস্টপূর্বের লিউকট্রার যুদ্ধ)[১] স্পারটার জন্য ভয়ানক হয়ে দাঁড়াল। তার বিপর্যয় ঘটল কেবল লোক বলের অভাবে। এরকম শোনা যায়, স্পারটার পূর্বকালের রাজাদের আমলে স্পারটানগণ অন্যান্য মানুষকেও নাগরিকতা প্রদান করত। এর ফলে দীর্ঘকালীন যুদ্ধের সময়ও তাদের পুরুষের সংখ্যায় ঘাটতি হত না। এমনও শুনা যায়, কোন এক সময়ে এরূপ স্পারটানদের সংখ্যা দশহাজার দাঁড়িয়েছিল। এ সকল জনশ্রুতি সত্য কিংবা মিথ্যা যাই হোক, সম্পত্তির পরিমাণ একটা স্তরে সমানভাবে হ্রাস করে নগরীতে পুরুষ নাগরিকের সংখ্যা উর্ধ্বদিকে রাখাই শ্রেয়। কিন্তু স্পারটার সন্তান জন্মদানের ক্ষেত্রে উৎসাহ দেওয়ার যে আইন আছে তা সম্পত্তির মালিকদের মধ্যে এরূপ কোন ভারসাম্য রক্ষা করার প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে। কারণ, স্পারটানদের সংখ্যা যতো অধিক করা যায় তত ভাল, এরূপ মনোভাব থেকে বিধান দাতা নাগরিকদের যত অধিক সংখ্যক সম্ভব সন্তান জন্মদানে উৎসাহিত করেছেন। এর দৃষ্টান্ত হিসাবে একটি আইনের উল্লেখ করা যায়। এই আইন অনুযায়ী যে পিতার তিনটি পুত্র আছে তাকে সামরিক বাহিনীতে দায়িত্ব পালন থেকে রেহাই দেওয়া হয়। এবং যার চারটি পুত্রসন্তান আছে তাকে কোন রকম কাজই করতে হয় না। কিন্তু এটা তো পরিষ্কার যে, পিতার যদি বহু পুত্র জন্মগ্রহণ করে তবে তার সম্পত্তিও পুত্রদের মধ্যে বণ্টিত হবে এবং দরিদ্রের সংখ্যা তাতে বৃদ্ধি পাবে।

এ ছাড়া ল্যাসিডিমনিয়ার ইফরদের পদ সম্পর্কিত বিষয়টি এই শাসনতন্ত্রের আর একটি ত্রুটি। ইফর পদ স্বাধীনভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই নিয়ন্ত্রণ করে। ইফর পদের পাঁচজন সদস্যকেই সমগ্র নাগরিকদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করা হয়। এর ফলে যারা তেমন সঙ্গতি-সম্পন্ন নয় তারাও অনেক সময়ে ইফর পদে নির্বাচিত হয় এবং এদের দারিদ্র্যের কারণে এদের মধ্যে ঘুষ গ্রহণের প্রবণতা দেখা দেয়। এর বহু দৃষ্টান্ত অতীতে পাওয়া গেছে। (আমাদের সময়েও এ্যানড্রস-এর কাহিনী আমরা অবগত আছি। এক্ষেত্রে দেখা যায় অর্থের উপঢৌকনে কয়েকজন ইফর এত অধিক পরিমাণে দুর্নীতিদুষ্ট হয়ে পড়েছে যে নগরীর অবস্থা যে অধিকতর শোচনীয় হয়ে পড়েনি এটা ভাগ্যের কথা।) ইফরদের ক্ষমতার পরিমাণ যেমন অত্যধিক তেমনি ইফরগণ স্বৈরতান্ত্রিক। এর ফলে স্পারটার রাজাগণ পর্যন্ত ইফরদের সন্তুষ্টির কথা চিন্তা করতে বাধ্য হন। এবং এ কারণে শাসনতন্ত্রের ক্ষতিও অধিক পরিমাণে সাধিত হয়েছে। যে শাসনতন্ত্রকে অভিজাততন্ত্র হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল, সে শাসনতন্ত্র এখন গণতন্ত্রের চরিত্রই অধিক ধারণ করেছে। 'ইফর' পদ হিসাবে খারাপ নয়। এর একটা গুণ, ইফর পদ শাসনতন্ত্রকে ঐক্যবদ্ধ রাখে। সাধারণ মানুষ একে পছন্দ করে, কারণ এর মাধ্যমে ক্ষমতায় অংশগ্রহণের একটা সুযোগ তারা লাভ করে। কাজেই আইনদাতা লাইকারগাস-এর ইচ্ছার কারণে হোক কিংবা অবস্থার কারণে হোক, এই বৈশিষ্ট্য জনসাধারণের বিশেষ পছন্দসই হয়ে দাঁড়িয়েছে। (এর যুক্তি হচ্ছে এই যে, কোন শাসনতন্ত্র যদি স্থায়ী হতে চায় তবে সমাজের সকল অংশের নিকট এটা গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত এবং সকলেরই শাসনতন্ত্রের স্থায়িত্ব কামনা করা উচিত। স্পারটার রাজাদের শাসনতন্ত্র সম্পর্কে এই ইচ্ছাটি আছে, কারণ এই শাসনতন্ত্র তাদের পদমর্যাদা এবং আর্থিক লাভ—উভয়ের উৎস। সর্বোত্তম নাগরিক যারা তারাও এটি চায়, কারণ সর্বোত্তম হিসাবে প্রবীণ পরিষদের সভ্য হওয়ার তাদের একটা অধিকার আছে। আর

১. এ্যারিস্টট্‌ল ৩৭১ খৃস্ট পূর্বাব্দের লিউকট্রার যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছেন।

সাধারণ লোক পছন্দ করে, কারণ ইফর পদ সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত।)[১] কিন্তু গোড়াতে সকল নাগরিকদের মধ্য থেকে ইফরদের নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও তার নির্বাচনের বর্তমান ব্যবস্থা আমার নিকট শিশুসুলভ বলে বোধ হয়। ইফরদের এক্তিয়ারগত অধিকারও আছে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এরা বিচারমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু যে কেউ যখন ইফরপদে নির্বাচিত হতে পারে তখন নির্দিষ্ট আইনকানুনের বাইরে স্বাধীনভাবে বিচার করার কোন ক্ষমতা তাদের থাকা উচিত নয়। নির্দিষ্ট নিয়ম ও নির্দেশের ভিত্তিতেই তাদের বিচার করা উচিত। তাছাড়া ইফরদের জীবনযাপন প্রণালী শাসনতন্ত্রের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেখানে অপর সকলে কৃচ্ছ্রতার জীবন যাপন করে সেখানে ইফরগণ আয়েশের জীবন ধারণ করে। সাধারণের কৃচ্ছ্রতার পরিমাণ এত অধিক যে, তারা নিজেরা এমন জীবন যাপন করতে অক্ষমতা হেতু আইনকে উপেক্ষা করে ভোগ বিলাসের জীবন যাপন করে।

[এর পরে আমরা দেখি এ্যারিস্টট্‌ল কমিটি এবং পদাধিকারীদের অবসর গ্রহণের সময়ে নিজেদের সম্পর্কে হিসাবদানের ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করছেন। এখানে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিও এ্যারিস্টট্‌ল যে বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করেছেন, সেটি উল্লেখযোগ্য।]

প্রবীণদের পরিষদ, 'গারুশিয়া'-র ক্ষমতা সম্পর্কেও আপত্তি আছে। তবে এদের সম্পর্কে এ কথাও কেউ বলতে পারে যে, যতক্ষণ উত্তম এবং মানবিক গুণাবলিতে সুপ্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের নিয়ে এ পরিষদ গঠিত হবে ততক্ষণ এ পরিষদ রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলকর। কিন্তু কথা হচ্ছে এদের কার্যকাল নিয়ে। ইফরগণ এই পদে সারা জীবনের জন্য সদস্য থাকে। এবং ক্রমান্বয়ে তাদের দেহের বার্ধক্যের সঙ্গে মনের বার্ধক্যও বৃদ্ধি পেতে থাকে। কাজেই গুরুত্বপূর্ণ বিচারকার্যে তাদের এক্তিয়ার থাকা উচিত কিনা, এটি একটি প্রশ্ন। এবং আমরা যখন দেখি যে, এদের শিক্ষা ও পরিচর্যা এমন যে আইনদাতার মনে এরা কোন আস্থার ভাব সৃষ্টি করতে পারেনি, তখন অবস্থাটা বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। লক্ষ্য করা গেছে এই পরিষদে যারা দায়িত্ব পালন করে তারা তাদের দায়িত্ব পালনকে পারিতোষিক এবং পক্ষপাতিত্বের দুর্নীতিগ্রস্ত করে তোলে। এ কারণে বর্তমানের রীতি অনুযায়ী তাদের কার্যাবলি সমালোচনার ঊর্ধ্বে থাকা উচিত নয়। অবশ্য একথা বলা যায় যে, সমস্ত কর্তৃপক্ষের উপর ইফরদের কমিটিগুলির তদারকী ব্যবস্থা তো রয়েছে। কিন্তু তাতে আবার ইফরদের হয়তো যেমন অত্যধিক পরিমাণে ক্ষমতা অর্পণ করা হয় তেমনি আমরা 'কর্তৃপক্ষের জবাবদিহী' বলতে যা বুঝাতে চাই সে উদ্দেশ্য এর দ্বারা সাধিত হয় না। তদুপরি, 'গারুশিয়ার' নির্বাচনে যে পদ্ধতিতে প্রার্থী নির্ধারিত হয় সেটি অর্বাচীনতার নামান্তর। যে নাগরিক এই পরিষদের সদস্য হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে, তার নিজেকেই সদস্যপদের সম্মান প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করতে হবে। এ নিয়ম একেবারেই বেঠিক। আমার কথা হচ্ছে, যে দায়িত্ব পালনের যোগ্য, সে ইচ্ছুক হোক বা না হোক, তাকে দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সেজন্য তাকে সম্মত করতে হবে। কিন্তু স্পারটাতে, দেখা যায় আইনদাতা—এবং শাসনতন্ত্র তৈরিতে এটিই তার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি,

১. বন্ধনীর অনুবাদ সিনক্লেয়ারকৃত ইংরেজি অনুবাদের পাদটীকা থেকে গৃহীত।

—প্রথমে নাগরিকদের উচ্চাকাঙ্ক্ষী করে তুলেন এবং পরে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে তাদের গারুশিয়াতে নির্বাচনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন। যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী নয় সে নির্বাচিত হওয়ার ইচ্ছাও প্রকাশ করেনা। কিন্তু সত্য হচ্ছে এই যে, মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং পদ অধিকার করা এবং অর্থোপার্জনের কামনাই হচ্ছে সচেতন অন্যায়ের অন্যতম শক্তিশালী কারণ।

[এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পূর্বকাল থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২১৯ শতাব্দী পর্যন্ত স্পারটাতে একই সময় দু'জন বংশক্রমিক রাজার শাসন করার ব্যবস্থা চলে আসছিল। তাছাড়া সামরিক বাহিনীতে মিলিতভাবে খাদ্য গ্রহণের সাধারণ প্রথাকে স্পারটাতে সর্বসময়ের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল।]

এবার স্পারটার রাজপদ সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এখানে আমাদের বলার বিষয় এই নয় যে, রাজপদ থাকা ভাল কিংবা খারাপ। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, স্পারটাতে যে পদ্ধতিতে বর্তমানে রাজপদের ব্যবস্থা রয়েছে, এটি থাকার চাইতে না থাকা ভাল। আমাদের অভিমত হচ্চে, রাজপদের ক্ষেত্রে কাউকে তার ব্যক্তিগত জীবনের গুণাবলির ভিত্তিতে রাজপদে অধিষ্ঠিত করা উচিত। এটা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি, স্পারটার আইন দাতা পর্যন্ত বিশ্বাস করেন না যে, অতি উত্তম ব্যক্তিকে তৈরি করা সম্ভব। রাজারা এরূপ উঁচু মানের হবেন, এমন বিশ্বাস তিনি পোষণ করেন না। এ থেকেই বুঝা যায় কেন স্পারটানগণ গুরুত্বপুর্ণ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে রাজাদের সঙ্গে রাজাদের ব্যক্তিগত শত্রুকে প্রেরণ করার ব্যবস্থাটি গ্রহণ করত এবং কেন তারা দুই রাজার মধ্যে মতের অমিলকে উত্তম বলে বিবেচনা করত। তাছাড়া একসঙ্গে খাদ্যগ্রহণের ব্যবস্থা, যাকে ল্যাসিডিমনিয়াতে 'ফিডিশিয়া' বলে অভিহিত করা হয়, যার দ্বারাই প্রবর্তিত হয়ে থাকনা কেন মোটেই সন্তোষজনক নয়। বরঞ্চ ক্রিটে যে ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে সে অনুযায়ী খাদ্যব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় খরচে পরিচালিত হওয়া উচিত। স্পারটাতে খাদ্যগ্রহণের ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অর্থের যোগান দিতে হয়। কিন্তু অনেকে আছে যারা নিতান্ত দরিদ্র এবং এদের পক্ষে প্রয়োজনীয় উচ্চ হারে অর্থ প্রদান করা সম্ভব হয়না। এর ফলে আইনবিদের মূল বাঞ্ছিত উদ্দেশ্যের বিপরীতটিই ঘটে। কারণ একত্রে খাদ্য গ্রহণের রীতি প্রবর্তিত হয়েছিল ব্যবস্থাটিকে গণতান্ত্রিক করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু স্পারটায় যে নিয়ম বর্তমানে প্রচিলত তাতে ব্যবস্থাটি আর যাই হোক, মোটেই গণতান্ত্রিক নয়। কারণ যাদের সঙ্গতি নাই, তারা এই ব্যবস্থাতে শীরক হ'তে পারেনা। অথচ নাগরিকতা নির্ধারণের প্রচলিত মাপকাঠি একটি। যারা ভোজের অর্থ প্রদানে অক্ষম তারা নাগরিক হতেও অক্ষম।

নৌবাহিনীর অধিনায়কত্বের প্রশ্নেও অনেকের আপত্তি আছে। সে আপত্তির যথেষ্ট ভিত্তি আছে। কারণ, যে ব্যবস্থা আছে সে ব্যবস্থা অনেক গুরুতর বিরোধের উৎস। কারণ, একদিকে রাজারা যেখানে দেশ রক্ষা বাহিনীর স্থায়ী সেনাপতি সেখানে রাজাদের উপরে আবার নৌবাহিনীর একটা ভিন্ন অধিনায়কত্ব স্থাপন করা হয়েছে। স্পারটানদের আর একটি বিষয়ে প্লেটো তাঁর 'আইন'-এ সমালোচনা করেছেন। এই ক্ষেত্রটিতেও স্পারটার আইনদাতার নীতিসমূহ বাস্তবে পালিত হয় নি। প্লেটোর সমালোচনা হচ্ছে : স্পারটার সমগ্র সমাজ-সংগঠনের লক্ষ্য হচ্ছে নাগরিকদের একটি মাত্র গুণ, অর্থাৎ তাদের সামরিক গুণকে মজবুত করে তোলা। সামরিক গুণকেই শক্তি অর্জনের জন্য মূল্যবান বলে মনে করা হয়।

এ কারণে স্পারটীয়গণ যুদ্ধ অবস্থায় বেশ সমৃদ্ধি অর্জন করেছে, কিন্তু প্রাধান্যের অবস্থা অর্জিত হওয়ার পরবর্তীতে তারা ক্ষয় প্রপ্ত হতে শুরু করে। শান্তির অবস্থাতে বাস করা কাকে বলে তা তারা জানত না। এবং সেজন্য যুদ্ধের জন্য শিক্ষাদান ব্যতীত অপর কোন শিক্ষাদানের উপর তারা কোন গুরুত্ব আরোপ করত না। এরই সমান আর একটি মারাত্মক ভুল হচ্ছে তাদের এই চিন্তা যে, তারা যখন সঠিকভাবেই মনে করে যে মানুষ যা কিছু চাইবে তাকে ন্যায়ের মাধ্যমে অর্জন করতে হবে, তখন আবার এমন ধারণাও তাদের রয়েছে যে, মানুষ যা পাওয়ার চেষ্টা করে তা ন্যায়ের চাইতে অধিকতর কিছু। স্পারটীয়গণ তাদের অর্থব্যবস্থা পরিচালনাতেও ব্যর্থ হয়েছে। তারা বিরাট বিরাট যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু সে যুদ্ধ পরিচালনা করার অর্থ তাদের কোষাগারে থাকেনি। কর প্রদানের ব্যাপারেও তারা যত্নবান নয়। সমস্ত জমি হচ্ছে স্পারটীয় নাগরিকদের অধীনস্থ। এ কারণে তারা পরস্পর রাজকর কি দিল কিংবা না দিল তা অনুসন্ধানের কোন আগ্রহ নেই। তার ফলে লাইকারগাস যে সন্তোষজনক অবস্থার কথা চিন্তা করেছিলেন বাস্তব পরিস্থিতি তার বিপরীতে এসে পৌঁছেছে। লাইকারগাস এমন এক নগরী প্রতিষ্ঠা করেছেন যার নিজের কোন আর্থিক সামর্থ্য নেই কিন্তু যার নাগরিকদের আগ্রহ কেবল নিজেদের জন্য অর্থ উপার্জনেরই।

ল্যাসিডিমনিয়দের শাসনব্যবস্থার এইগুলি হচ্ছে আসল ত্রুটি। এ সম্পর্কে এই আলোচনাই যথেষ্ট।

দশম অধ্যায়

ল্যাকোনিয়া এবং ক্রিটের শাসনব্যবস্থার মধ্যকার সাদৃশ্য

[স্পারটার শাসনব্যবস্থার আলোচনার ক্ষেত্রে এ্যারিস্টট্‌ল যে সমস্ত ত্রুটির কথা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে সম্পত্তির মালিকানা, উত্তরাধিকার, ক্ষমতা এবং মেয়েদের প্রভাব। ক্রিটের অবস্থা ও সমস্ত বিষয়ে অধিকতর শোচনীয় হলেও আমরা ক্রিট নিয়ে আলোচনার সময়ে এ্যারিস্টট্‌লকে এসব বিষয় উল্লেখ করতে দেখিনে। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রে আলোচনার যেখানে জোর সে হচ্ছে, এথেন্সের সঙ্গে এদের পার্থক্য। এথেন্সে দীর্ঘকাল যাবৎ আইন সম্পত্তির পুরুষ-মালিকদের অবস্থানকে শক্তিশালী করে তুলেছিল। ক্রিটে একাধিক নগরী ছিল। কিন্তু তাদের শাসনতন্ত্রসমূহের মধ্যে একটা সাধারণ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল।]

ক্রিটে যে ধরনের শাসনব্যবস্থার সাক্ষাৎ আমরা পাই ল্যাসিডিমোনিয়ার শাসনতন্ত্রের সঙ্গে তার বেশ মিল দেখা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ক্রিটের শাসনব্যবস্থা আদৌ স্পারটার চাইতে খারাপ নয়। তবে সাধারণভাবে এ কম সুসম্পূর্ণ, একথা আমরা বলতে পারি। এ রকমও কথা আছে, এবং সে কথাটা সত্য বলেই মনে হয় যে, ল্যাসিডিমনিয়ার শাসনব্যবস্থা প্রধানত ক্রিটকে আদর্শ ধরেই তৈরি করা হয়েছে। (আর, সাধারণভাবে যে সমস্ত শাসনতন্ত্র পরবর্তীকালে গঠন করা হয় সে সব শাসনতন্ত্র পূর্বকার চেয়ে অধিকতর উন্নত হয়ে থাকে।) পুরাতন কাহিনীতে এরূপ আছে যে, লাইকারগাস[১] রাজা চারিলাস-এর অভিভাবকত্ব পরিত্যাগ করার পরে বিদেশ গমন করেন এবং বেশিরভাগ সময় তিনি ক্রিটে অতিবাহিত করেন। তিনি যে ক্রিটকে তার অবস্থানের জন্য নির্বাচিত করেছিলেন, তার কারণ উভয় দেশের অধিবাসীদের মধ্যে চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের মিল ছিল। এখানকার লিকটীয়গণ ল্যাকোনিয়া থেকে আগত বাসিন্দা ছিল। ক্রিটে তারা যখন এসেছিল তখন স্থানীয় অধিবাসীদের নিজেদের একটা শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। নবাগতগণ এই শাসনব্যবস্থাকেই গ্রহণ করেছিল। এবং আজ পর্যন্ত নগরীগুলির পার্শ্ববর্তী গ্রাম জনপদের অধিবাসীগণ সেই ব্যবস্থার আইনকে অপরিবর্তিতভাবে ব্যবহার করছে। তাদের বিশ্বাস এ সকল আইনের আদি প্রতিষ্ঠাতা মিনোস[২] নিজে। ক্রিট দ্বীপের অবস্থান এরূপ যেন প্রকৃতি তাকে গ্রিক জগতের উপর প্রাধান্য স্থাপনের জন্যই তৈরি করেছে। যে সাগরের তীরে অধিক সংখ্যক গ্রিকদের বাস ক্রিট সেই সাগরের মধ্যেই অবস্থিত। ক্রিটের এক মাথা

১. লাইকারগাস : স্পারটার প্রাচীনকালের বিধানদাতা বলে পরিচিত। গবেষকদের মধ্যে ঐতিহাসিকতা নিয়ে মতদ্বৈধ আছে।

২. মিনোস : গ্রিক উপাখ্যানে মিনোস ক্রিটের রাজা বলে অভিহিত।

থেকে পিলোপনেস-এর দূরত্ব যেমন খুব বেশি নয় তেমনি এশিয়ার দিকবর্তী সীমানায় রয়েছে ট্রিয়পিয়াম এবং রোড্‌স। এর জন্য মিনোস-এর পক্ষে একটা সামুদ্রিক সাম্রাজ্য তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি এই দ্বীপগুলির কতকগুলিকে নিজের শাসনের অধীনস্থ করেছিলেন, আবার কতকগুলির মধ্যে বসতিস্থাপনকারীদের পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। পরিণামে তিনি সিসিলিকে আক্রমণ করেছিলেন এবং সেখানে কামিকস-এর নিকটবর্তী স্থানে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

এখানে ল্যাকোনিয়ার (স্পারটা) সঙ্গে ক্রিটের শাসনব্যবস্থার কয়েকটি সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করা চলে। ক্রিটের ভূমিদাসরা যা, ল্যাসিডিমোনিয়ার হেলটগণ তাই। উভয় দেশে সাধারণ ভোজের ব্যবস্থা রয়েছে। এই সাধারণ ভোজনকে পূর্বকালে স্পারটীয়গণ বর্তমানের ন্যায় 'ফিডিশিয়া' বলে আখ্যায়িত করত না। ক্রিটবাসীরা যেমন এই ভোজনকে 'এ্যানড্রিয়া' বলে অভিহিত করে, স্পারটীয়গণও তখন এই নামেই একে অভিহিত করত। রাজনৈতিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তাদের কর্মচারীদের 'কসময়' বলে অভিহিত করা হয়। এদের ক্ষমতা স্পারটার ইফরদের ন্যায়। কিন্তু ক্রিটে এদের সংখ্যা যেখানে দশ, ইফরদের সংখ্যা সেখানে পাঁচ। ক্রিটের প্রবীণদেরও একটি পরিষদ আছে। এদের সংখ্যা এবং ক্ষমতা উভয় দেশেই এক। ক্রিটবাসীদেরও রাজার পদ ছিল। কিন্তু এ পদকে তারা বিলুপ্ত করে দিয়েছে এবং যুদ্ধের সময়ে 'কসময়'গণই নেতৃত্ব প্রদান করে। নাগরিক-সংসদের সদস্য সকলেই। কিন্তু প্রবীণদের পরিষদ এবং কসময়-দের গৃহীত সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করা ব্যতীত এ সংসদের কোন ক্ষমতা নেই। সাধারণ ভোজনের ব্যবস্থা ল্যাকোনিয়ার চাইতে ক্রিটে উত্তম। স্পারটার নিয়ম হচ্ছে সাধারণ ভোজে সকলকেই মাথাপ্রতি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে হয়। এই অর্থ দিতে ব্যর্থ হলে নাগরিকের নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হয়। একথা আমরা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু ক্রিটের ব্যবস্থা অধিকতর সামাজিক। এখানকার নিয়ম হচ্ছে, কৃষিজাত সমগ্র দ্রব্যাদির এবং ভূমিদাসের প্রদত্ত কর থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণকে প্রথমত পৃথক করে রাখা হয় দেবতাদের পোষণ এবং সামাজিক কার্যাদির জন্য। এর আর একটি অংশকে নির্দিষ্ট করা হয় যৌথ ভোজনের জন্য। এভাবে নগরীর স্ত্রী-পুরুষ এবং শিশু সকলকেই রাষ্ট্রীয় অর্থেই পোষণ করা হয়। ক্রিটের বিধানদাতা কৃচ্ছ্রতাকে মঙ্গলকর বলে বিবেচনা করতেন এবং সাধারণ ভোজনের ক্ষেত্রে মিতব্যয়িতা রক্ষার জন্য তিনি বিশেষভাবে চিন্তাও করেছেন। তাছাড়া স্ত্রী এবং পুরুষদের ভিন্নবাসের ব্যবস্থা করে এবং পুরুষদের মধ্যে যৌন সম্পর্কের ব্যবস্থা করে জন্মহারকে কম রাখারও তিনি চেষ্টা করেছেন। এ সব ক্ষেত্রে তাঁর ব্যবস্থা ভাল কিংবা মন্দ ছিল, তার আলোচনা অন্যত্র করা যাবে। তবে এটা পরিষ্কার যে, যৌথ ভোজনের ব্যাপারে ক্রিটবাসীদের ব্যবস্থা ল্যাকোনিয়ার চাইতে উত্তম।

'কসময়'-এর ক্ষেত্রে আমরা বলব, তাদের এ ব্যবস্থা 'ইফর'-ব্যবস্থার চাইতে ক্ষতিকর। ইফর ব্যবস্থার যেটা প্রধান ত্রুটি, অর্থাৎ তার নির্বিচার সাংগঠনিকতা, সে ত্রুটি কসময়-এর মধ্যেও দেখা যায়। কিন্তু এ ব্যবস্থার প্রধান যে গুণ, অর্থাৎ শাসনব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করার ক্ষেত্রে এর অবদান, এ গুণ কসময়-এর নেই। কারণ, স্পারটাতে সমস্ত নাগরিকদের মধ্য থেকেই ইফরদের নির্বাচিত করা হয়। সে কারণে রাষ্ট্রের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বসমূহে সকল নাগরিকদের অংশীদারীত্বের একটা বোধ থেকে শাসনতন্ত্রকে স্থায়ী করে রাখার তাদের একটি মনোভাব আছে। কিন্তু ক্রিটে কসময় নির্বাচিত হয় সকল নাগরিকদের মধ্য থেকে নয়। তাদের নির্দিষ্ট করা হয় কয়েকটি পরিবারের মধ্য থেকে।

(এবং প্রবীণদের পরিষদের সদস্যদের তারা নির্বাচিত করে কসময়-এর সদস্যদের মধ্য থেকে। এবং এদের সম্পর্কে স্পারটার প্রবীণদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মন্তব্যকেই আমরা উল্লেক করতে পারি। এরাও সমালোচনার উর্ধ্বে এবং আজীবন তারা এই সদস্যপদের অধিকারী। ফলে এদের সুবিধা সুযোগ এই প্রতিষ্ঠানের গুণকে অতিক্রম করে যায়। তাছাড়া আইনের ভিত্তিতে না করে নিজেদের ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের ক্ষমতা বিপজ্জনক।) কসময়-এ সদস্যপদ লাভের জন্য নাগরিকবৃন্দ যে আগ্রহ পোষণ করে না—এটি এ শাসনব্যবস্থার সুস্থতার কোন লক্ষণ নয়। কারণ কসময়-এর সদস্যপদ ইফরব্যবস্থার ন্যায় লাভের উৎস নয়। আর ক্রিট একটি দ্বীপ। এ কারণে বৈদেশিক স্বর্ণের দুর্নীতির আশঙ্কা এদের কম।

> [এ্যারিস্টট্লের অভিমত হচ্ছে, এই শাসনব্যবস্থায় কর্মচারীগণ নিজেদের উদ্যোগে যদি তাদের দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ না করে তাহলে শাসনতান্ত্রিকভাবে অবস্থিত কর্মকর্তাদের কাউকে অপসারণের কোনো ব্যবস্থা নেই।]

এই প্রতিষ্ঠানের ত্রুটিসমূহ দূর করার ব্যবস্থাকে আমরা বলতে পারি অচল, ইচ্ছামাফিক এবং অ-নিয়মতান্ত্রিক। প্রায় দেখা যায়, কোন কসময়কে তার দায়িত্ব থেকে অপসারিত করা হচ্ছে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। এই ষড়যন্ত্রের উদ্যোগ আসে আর কোন কসময় থেকে কিংবা কসময়-বহির্ভূত ব্যক্তিদের কাছ থেকে। তাদের মেয়াদের মধ্যে কসময় যে পদত্যাগ করতে না পারে তা নয়। কিন্তু এ ব্যবস্থা ব্যক্তির ইচ্ছার উপর ছেড়ে না দিয়ে নিয়মের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত করা অধিকতর উত্তম। কারণ নির্দিষ্ট নিয়মের হেরফের হতে পারে না। কিন্তু সবচাইতে খারাপ হচ্ছে এমন পরিস্থিতি যেখানে কোন কসময় আদৌ থাকে না। আর এমন অবস্থা প্রায়ই ঘটতে দেখা যায়। কারণ ক্ষমতাবান যারা তারা নিয়মের পরিণাম থেকে অব্যাহতি লাভের ইচ্ছাতেই এমন অবস্থার সৃষ্টি করে। এ থেকে এটা পরিষ্কার যে, ক্রিটে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কিছু থাকলেও ক্রিটে যথার্থভাবে কোন সংবিধানের অস্তিত্ব নেই। যা আছে তাকে একপ্রকার বংশগত শাসন বলা চলে। এবং এ ব্যবস্থার ভিত্তি হচ্ছে জবরদস্তী। ক্ষমতাবানদের প্রবণতা হচ্ছে নিজেদের মিত্র এবং সাধারণ নাগরিকদের মধ্য থেকে এমন লোকদের গ্রহণ করা যারা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বরত থাকবে এবং তার ফলে সমগ্র শাসনব্যবস্থাকেই অকার্যকর করা সম্ভব হবে। এর নিশ্চিত পরিণাম হচ্ছে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব লোপ। এর ফলে 'রাজনৈতিক সংস্থা' বলে আমরা যাকে অভিহিত করেছি তা ভেঙ্গে পড়াই অনিবার্য। বস্তুত মারাত্মক অবস্থা হচ্ছে সেই অবস্থা যখন রাষ্ট্রকে যারা আঘাত করতে চায় রাষ্ট্রের ক্ষমতাবান তারাই। সে যা হোক, আমরা পূর্বেই বলেছি, ক্রিটের যা রক্ষাকবচ সে হচ্ছে তার ভৌগলিক অবস্থান। স্পারটাতে বৈদেশিকদের বহিষ্কার যেমন, তেমনি ভূখণ্ড থেকে ক্রিটের দূরত্ব বৈদেশিক হাত থেকে ক্রিটকে উত্তমভাবে রক্ষা করেছে। এই কারণেই ক্রিটের ভূমিদাসগণ যেখানে বাধ্য থাকে, ল্যাসিডিমনিয়ার হেলটগণ সেখানে প্রায়ই বিদ্রোহাত্মক হয়ে উঠে। এছাড়া ক্রিটবাসীদের সমুদ্রপথে কোথাও কোন উপনিবেশ নেই। এসব কারণে তাদের শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা তত দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু দুর্যোগের সময়ে দুর্বলতা আর লুক্কায়িত থাকে না। সাম্প্রতিককালে যখন যুদ্ধ এসে ক্রিটকে আঘাত করল তখন ক্রিটের শাসনব্যবস্থার দুর্বলতা প্রকাশিত হয়েছে। ক্রিটের সংবিধান সম্পর্কে আমাদের এই আলোচনাই যথেষ্ট।

একাদশ অধ্যায়
স্পারটা এবং কার্থেজ

[অগ্রীসীয় নগর রাষ্ট্রের মধ্যে একটি মাত্র যে নগর রাষ্ট্রের আলোচনা আছে সে হচ্ছে কার্থেজ। কিন্তু কার্থেজ সম্পর্কে বিস্তারিত কোন বিবরণ নেই। এ্যারিস্টট্ল কার্থেজকে স্পারটার সঙ্গে তুলনা করে বিচার করেছেন এবং মনে করেন যে, স্পারটার যেমন রাজপদ, প্রবীণ পরিষদ এবং সমরাধিনায়ক রয়েছে, কার্থেজেরও এই সব পদ আছে। সুতরাং এর অতিরিক্ত বিবরণের কোন আবশ্যকতা নেই। এ্যারিস্টট্লের আলোচনা থেকে এ কথা বুঝা যায়, এ্যারিস্টট্ল মনে করেন, কার্থেজের মূল শক্তি তার আর্থিক সম্পদ। এবং এই বৈশিষ্ট্যকেই তিনি কার্থেজের শাসনব্যবস্থার বড় বিচ্যুতি বলে গণ্য করেন। তবে এ্যারিস্টট্ল এ কথা স্বীকার করেন যে, কার্থেজের শাসনব্যবস্থা কার্থেজবাসীদের নিকট গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হচ্ছে এবং সে কারণেই সে স্থায়িত্ব লাভ করেছে।]

রাষ্ট্রীয় শাসনের সুব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অন্য অনেকের চাইতে কার্থেজবাসীদের বেশ সুনাম রয়েছে। কতগুলি ব্যাপারে ল্যাসিডিমোনিয়াবাসীদের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। প্রকৃতপক্ষে ক্রিট, ল্যাসিডিমোনিয়া এবং কার্থেজ—এই তিনটি শাসনব্যবস্থার পরস্পরের যেমন বেশ কয়েকটি সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনি অপর সকলের সঙ্গে এদের পার্থক্যও অনেক। কার্থেজের অনেক প্রতিষ্ঠান উত্তম। এর মাধ্যমে বঝা যায়, অধিবাসীগণ যখন যার যার নির্দিষ্ট দায়িত্বে সন্তোষের সঙ্গে অবস্থান করে, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে যখন গুরুতর কোন অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি না হয় এবং কোন স্বৈরশাসক যখন নিজেকে প্রভু হিসাবে ঘোষণা করেনা তখন শাসনব্যবস্থা সুসংগঠিত।

তাদের মিলনসভার ভোজনালয়গুলিও স্পারটার 'ফিডিশিয়ার' অনুরূপ। স্পারটার যেমন 'ইফর' প্রতিষ্ঠান, কার্থেজেরও তেমনি ১০৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিষদ রয়েছে। বরঞ্চ ইফর-এর চাইতে এটি উত্তম। এর সদস্যদের ইফরদের ন্যায় নির্বিচারে নিযুক্ত না করে সর্বোত্তমদের মধ্য থেকে বাছাই করা হয়। কার্থেজের রাজপদ এবং প্রধান-পদ স্পারটার রাজা এবং গারুশিয়রাই মত। এ সকল পদে নির্বাচনের ভিত্তি যেমন অত্যধিক ব্যাপক নয়, তেমনি অত্যধিক সংকীর্নও নয়। রাজাদের একটিমাত্র পরিবার থেকে কিংবা যে কোন পরিবার থেকে নিযুক্ত করা হয় না। রাজপদে নিয়োগ নির্ভর করে বয়সের চাইতে বিশিষ্টতার উপর। কার্থেজের শাসনব্যবস্থার এই বৈশিষ্ট্যটি গুরুত্বপূর্ণ। গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে নিম্নমানের লোকের নিয়োগ প্রচুর ক্ষতির কারণ হতে পারে। ল্যাসিডিমোনিয়ার ক্ষেত্রে এর দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি। কার্থেজের বিরুদ্ধে অবশ্য শাসনব্যবস্থার কোন একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ অনুসরণ না করার সমালোচনা করা যায়। কিন্তু তেমন সমালোচনা আমাদের আলোচিত তিনটি রাষ্ট্রের উপরই প্রযোজ্য। অভিজাততন্ত্র বা আমি যাকে 'পলিটি' বলে অভিহিত

করেছি তার দিক থেকে এই শাসনব্যবস্থার ব্যতিক্রম এখানে যে,এর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য কতিপয়-তন্ত্রের চরিত্র ধারণ করে। আবার অপর কিছু বৈশিষ্ট্য একে গণতন্ত্রে পর্যববসিত করেছে। এই শেষের ব্যাপারটির একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কার্থেজের রাজা এবং প্রধানগণ যখন একমত হয়ে মনে করেন, কোন বিষয়কে জনসাধরণের নিকট পেশ করা হবে তখন বিষয়টি জনসাধারণের নিকট পেশ করা হয়। আবার তারা যখন এরূপ ঐক্যমত না হন তখনো বিষয়টি জনসাধাণের নিকট পেশ করা হয়। আবার এরূপ বিষয়ে জনসাধারণের কেবল যে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তসমূহকে শ্রবণ করার অধিকার আছে, তাই নয়। জনসাধারণ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণেরও অধিকারী। তাদের সামনে পেশ করা প্রস্তাবসমূহের বিরোধিতা করার এবং অভিমত প্রকাশ করার অধিকারও যে কোন ব্যক্তিরই রয়েছে। এমন অধিকার অপর দু'টি শাসনব্যবস্থার মধ্যে আমরা দেখিনা। এবার চক্রতন্ত্র বা কতিপয়ীর বৈশিষ্ট্যগুলি দেখা যাক : এগুলির মধ্যে রয়েছে। পাঁচের কমিটিসমূহ। এগুলিকে বলা যায় পঞ্চতন্ত্র, 'পেন্টার্কী'। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই এদের নিয়ন্ত্রণে। কেবল যে শূন্যপদকে অস্থায়ীভাবে তারা পূরণ করতে পারে তাই নয়। 'শতক' হচ্ছে তাদের সর্বোচ্চ শাসনতান্ত্রিক সংস্থা তার সদস্যদেরও তারা নিযুক্ত করতে পারে। তাছাড়া অপরের চাইতে তাদের দায়িত্বের মেয়াদও অধিককাল। কমিটির সদস্যপদে নিযুক্ত হওয়ার পূর্ব থেকেই যেমন তারা তাদের প্রভাব খাটাতে আরম্ভ করে, কমিটির সদস্যপদ থেকে অবসর গ্রহণের পরও তারা তাদের প্রভাব বজায় রাখে। তবে এদের অভিজাততান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যটি এই যে, এরা এদের দায়িত্ব পালনের জন্য কোন অর্থ লাভ করেনা এবং লটারীর মাধ্যমেও তারা নির্বাচিত হয় না। এরূপ আরো দু'একটি বিষয়ের কথা বলা যায়। যেমন, আইন সম্পর্কীয় সকল বিরোধের সিদ্ধান্ত এই কমিটিগুলিই গ্রহণ করে। স্পারটার ব্যবস্থা এরূপ নয়। সেখানে আইনগত বিরোধের কোনটির মীমাংসা যদি এক শ্রেণীর লোক দ্বারা সম্পাদিত হয়, তার অপর কোন প্রশ্ন অপর কোন ব্যক্তিবর্গ দ্বারা সম্পাদিত হয়ে থাকে।

তবে কার্থেজের শাসনব্যবস্থার অভিজাততন্ত্র থেকে চক্রতন্ত্রে যাওয়ার যে প্রবণতা সবচেয়ে প্রকট সে প্রবণতা কার্থেজবাসীদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। কার্থেজবাসীগণ বিশ্বাস করে রাষ্ট্রের শাসকদের কেবল সর্বোত্তমদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করলেই চলবে না, তাদের সর্বাধিক সম্পদবান হতে হবে। তাদের যুক্তি হচ্ছে, যার যথেষ্ট পরিমাণে সম্পদগত সঙ্গতি নেই তার পক্ষে উত্তম শাসক হওয়া কিংবা উত্তম শাসক হওয়ার মত অবসর পাওয়া অসম্ভব। এখন, আমরা যদি সম্পদের ভিত্তিতে নির্বাচনকে চক্রতন্ত্রী এবং গুণের ভিত্তিতে নির্বাচনকে অভিজাততান্ত্রিক বলি, তাহলে কার্থেজের অনুসৃত এই পদ্ধতিকে 'তৃতীয় এক নীতির ভিত্তিতে শাসক নির্বাচন' বলে আমাদের অভিহিত করতে হয়। তৃতীয় এই নীতিটিই কার্থেজবাসীদের উপর আরোপ করা হয়েছে। কারণ গুণ এবং সম্পদ, এই দু'টি নীতিকেই তারা নির্বাচনের সময়ে, বিশেষ করে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, রাজা এবং সেনাধ্যক্ষদের নির্বাচনের সময়ে বিবেচনা করে। কিন্তু অভিজাততন্ত্র থেকে চক্রতন্ত্রের দিকে কার্থেজের বিধানদাতার এই বিচ্যুতিকে একটি ত্রুটি বৈ আর কিছু বলা চলে না। কারণ সর্বোত্তম যেন প্রয়োজনীয় অবসর লাভ করতে পারে এবং দায়িত্বে নিযুক্ত অবস্থাতেই শুধু নয়, ব্যক্তিগত নাগরিক হিসাবেও তার আচরণে কিংবা কর্মসম্পাদনে নিয়মের আদর্শ থেকে কোন দিকে যেন বিচ্যুতি না ঘটে তার ব্যবস্থা গোড়া থেকে রাখা অত্যাবশ্যক। কিন্তু এক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের জন্য অবকাশ দানের নিমিত্ত আর্থিক সম্পদের কথা যেমন আমাদের ভবতে হবে, তেমনি কার্থেজের ন্যায় রাজপদ এবং সেনাধ্যক্ষের মত সর্বোচ্চ পদগুলি ক্রয়-বিক্রয়ের প্রথাও নিতান্ত গর্হিত। যে রাষ্ট্রে এই পদ্ধতি আইন এবং

প্রথাগত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সে রাষ্ট্রে গুণের বদলে সম্পদই প্রধান বিবেচ্য হয়ে দাঁড়ায় এবং সমগ্র রাষ্ট্রের তখন অর্থোপার্জনের প্রবণতা প্রকট হয়ে দেখা দেয়। কারণ, সর্বোচ্চ স্তরের কর্তৃপক্ষ যাকে সর্বাধিক মূল্যবান বলে গণ্য করে, অপর সকলের জীবনে সেটাই আরাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। উচ্চতমকেই সকলে অনুসরণ করে। আর গুণকে যেখানে সর্বাধিক মূল্যবান বলে বিবেচনা করা না হয়, সেখানে অভিজাততন্ত্রকে একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। লোকে যখন ক্ষমতার অবস্থান সংগ্রহের জন্য বিরাট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে তখন সে ক্ষমতা থেকে কিছু লাভ করার প্রত্যাশা তার অযৌক্তিক নয়। এমনকি যে দরিদ্র কিন্তু সৎ, সেও কিছু লাভ করতে চায়। কাজেই যে তেমন সৎ নয় এবং যে ইতিমধ্যেই নিজের পকেট থেকে অর্থ ব্যয় করেছে সে কোন লাভের প্রত্যাশ্যা করবে না, এমন আশা করা যায় না। এবং এ কারণে যার দায়িত্ব পালনের সর্বোত্তম অবস্থা আছে তাকেই সেই দায়িত্বে নিযুক্ত করা সঙ্গত। অবশ্য বিধানদাতা যদি সকল সৎ মানুষকে সঙ্গতিপূর্ণ করার ধারণা পরিত্যাগও করেন, তথাপি যারা দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছে তাদের যেন দায়িত্ব পালনের অবসর জোটে, তার ব্যবস্থা তাঁকে করতে হবে।

আর একটি বৈশিষ্ট্যও উল্লেখযোগ্য। বৈশিষ্ট্যটি হচ্ছে দায়িত্বের বহুত্ব। এক ব্যক্তির একই সময়ে বহু দায়িত্ব পালন করার রীতিটি কার্থেজবাসীগণ অবশ্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য করে, কিন্তু এটি অধিকাংশ লোকের নিকটই আপত্তিজনক বলে বোধ হবে। একথা নিশ্চয়ই সত্য, কোন একটি কাজ যখন এক ব্যক্তি সম্পাদন করে তখন কাজটি সুসম্পাদিত হতে পারে। বিধানদাতার কর্তব্য হচ্ছে এই অবস্থাটিকে নিশ্চিত করা, একই ব্যক্তিকে একই সময়ে সঙ্গীতাবিশারদ এবং পাদুকা প্রস্তুতকারক তৈরি করা নয়। শাসনের ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য। নগরীটি যদি খুব ক্ষুদ্র হওয়ার কারণে অনিবার্য না হয় তাহলে প্রজ্ঞার এবং গণতন্ত্রের বিষয় হচ্ছে এই যে, শাসনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রকারের লোকের অংশগ্রহণ থাকা আবশ্যক। কারণ একথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি, এই রীতিতে দায়িত্বকে অধিকতর ব্যাপকভাবে বণ্টন করা চলে এবং তার ফলে প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট কার্য অধিকতর দক্ষতা এবং দ্রুততার সঙ্গে সম্পাদিত হতে পারে। সামরিক এবং নৌবাহিনীর ক্ষেত্র থেকে বিষয়টির দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে। এখানেও তো বলা চলত দায়িত্ব বণ্টনের প্রয়োজন নেই, কারণ 'হুকুম প্রদান' এবং 'হুকুম মান্য করা' সবরকম বাহিনীর মধ্যেই বিদ্যমান।

> [কিন্তু এমন ব্যবস্থা কার্থেজে সম্ভব হবে না। কারণ, সেখানে সব চাইতে অর্থবানরাই সব রকম কর্তৃত্ব ভোগ করে। প্রশ্ন হচ্ছে, এমন হলে তারা কার্য কেমন করে সম্পাদন করে? এর জবাব হবে এই যে, এমন ক্ষেত্রে জীবন ধারণের মানকে অবশ্যই একটা উঁচুস্তরে বজায় রাখতে হবে।]

কিন্তু শাসনব্যবস্থা যখন চক্রতন্ত্র হয়ে দাঁড়ায় তখন এর পরিণাম থেকে যে তারা অব্যাহতি পায় তার কারণ তারা সম্পদবান। একটা সময় অন্তর তারা অধিবাসীদের এক অংশকে পরিপার্শ্বের নগরীগুলিতে প্রেরণ করে। এ পদ্ধতিতে তারা রাষ্ট্রের গণ্ডগোলকে দূরীভূত করে এবং সমাজকে স্থায়িত্ব এবং ধারাবাহিকতা দান করে। কিন্তু এগুলিকে কোন নির্দিষ্ট নীতি না বলে ভাগ্যের ব্যাপার বলা সঙ্গত। বিধানদাতার নীতি থাকা উচিত রাষ্ট্রকে সর্বপ্রকার অসন্তোষ থেকে মুক্ত রাখার। কিন্তু যে ব্যবস্থা প্রচলিত আছ তাতে ভয়ানক কোন গণ্ডগোলের সূত্রপাত হলে এবং ব্যাপকভাবে শাসিত মানুষ বিদ্রোহ করলে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠার কোন ব্যবস্থা আইনের অন্তর্ভুক্ত নেই।

ল্যাসিডিমনিয়া (স্পারটা), ক্রিট এবং কার্থেজের শাসনব্যবস্থার আলোচনা এই পর্যন্ত করা গেল। এই তিনটি শাসনব্যবস্থাই আমাদের আলোচনার দাবী রাখে।

দ্বাদশ অধ্যায়

রাষ্ট্র চিন্তাবিদদের প্রকারভেদ : তাত্ত্বিক এবং রাজনীতিক

[এরপরে বিভিন্ন বিধানদাতা, বিশেষ করে এথেন্স নগর রাষ্ট্রের সলোন সম্পর্কে কিছু বিবিধ মন্তব্য এবং তাঁর অবদান সম্পর্কে দুইটি পরস্পর পৃথক মূল্যায়নের উল্লেখ এ্যারিস্টট্ল করছেন।]

যাঁরা রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থাসমূহের উপর নিজেদের অভিমত প্রকাশ করেছেন তাঁদেরকে আমরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে যতখানি প্রাসঙ্গিক ততখানি আমরা প্রথম শ্রেণীর আলোচকদের সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এই প্রথম শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এঁরা নিজেরা রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি এবং নিজদের সমগ্র জীবনে তাঁরা ব্যক্তিগত নাগরিকের জীবনই যাপন করেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা রাজনীতিতে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের পরে নিজেদের রাষ্ট্রে কিংবা বৈদেশিক নগরীতে আইনদাতা হয়ে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। এঁদের মধ্যে কিছু সংখ্যক কেবল আইন রচনা করেছেন। আবার লাইকারগাস এবং সলোনের ন্যায় কিছু সংখ্যক আইনের রচনা এবং সমাজ কাঠামো সংগঠিত করে সংবিধান তৈরি করেছেন। লাইকারগাস এবং স্পারটার শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আমি ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। সলোনের সংবিধানের গুণ সম্পর্কে মতামতের ক্ষেত্রে বিভিন্নতা আছে। যাঁরা তাঁকে একজন উত্তম আইনদাতা বলে বিবেচনা করেন তাঁদের যুক্তি হচ্ছে : ১. তিনি নিরঙ্কুশ এবং একচ্ছত্র চক্রতন্ত্রকে ভেঙ্গে দিয়েছিলেন ; ২. তিনি নাগরিকদের দাস করা রহিত করেছিলেন ; ৩. তিনি বিভিন্ন উপাদানের সংমিশ্রণে এথেন্স-এর প্রচলিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে তৈরি করেছিলেন। এই আলোচনাকারীগণ বলেন, সলোনের শাসনতন্ত্রে চক্রতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং গণতন্ত্রের উপাদানসমূহের মিশ্রণ ঘটেছে। এই মিশ্রণে এরিয়প্যাগাস-এর পরিষদ হচ্ছে চক্রতন্ত্রের উপাদান, কর্মচারীদের নিয়োগ হচ্ছে অভিজাততন্ত্রের এবং বিচার ব্যবস্থা গণতান্ত্রিক উপাদান। প্রকৃতপক্ষে সলোন যখন এই কাজ সম্পাদন করেন তখন এর প্রথম দুটি উপাদান, অর্থাৎ পরিষদ এবং অফিসারদে নিয়োগ, পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল। এক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা এই ছিল যে, তিনি এ দু'টি ব্যবস্থা বাতিল করে দেননি। অপরদিকে সকল নাগরিকদের মধ্য থেকে বিচারকদের নিয়োগ করে তিন এথেন্সে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এবং যাঁরা সলোনকে সমালোচনা করেন তাঁরা এই ক্ষেত্রেই তাঁকে সমালোচনা করেন। তাঁরা অভিযোগ করেন, লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিত গণ আদালতের হাতে সকল বিষয়ের চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদানের মাধ্যমে সলোন তাঁর ব্যবস্থার অপর ভাগটিকে বিনষ্ট করেছেন। এই আদালতগুলি যখন ক্ষমতাবান হয়ে দাঁড়াল তখন তারা জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করার জন্য যেমন খুশি তেমন কাজ করতে শুরু করল। তাদের আচরণে মনে হল যেন তারা কোন

স্বৈরশাসককে তোষামোদ করছে। এবং এর পরিণামেই যে গণতন্ত্রকে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি সে গণতন্ত্রের সৃষ্টি হয়েছে। এফিয়ালটিস এবং পেরিক্লিস এ্যারিওপ্যাগাস-এর পরিষদের ক্ষমতা হ্রাস করে দিলেন এবং জুরি হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য পেরিক্লিস অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন। এমনভিবে এক নেতার উত্তরাধিকারী অপর নেতা শাসনব্যবস্থাটাকে ক্রমান্বয়ে গণতন্ত্রে পরিণত করলেন। কিন্তু আমার মনে হয় এই পরিণাম যতোনা সলোনের ইচ্ছার ফল তার অধিক অবস্থার সৃষ্টি। যেমন ধরা যাক পারশ্য যুদ্ধে এথেন্স-এর নৌশক্তির বৃদ্ধির কথা। এথেন্স-এর এই সমুদ্রশক্তির মূলে ছিল এথেন্স-এর জনসাধারণই। এর ফলে জনসাধারণের মনে নিজেদের সম্পর্কে একটা শক্তিবোধের সৃষ্টি হল। জনসাধারণ এখন নির্বাচিত করতে লাগল নিম্নমানের ব্যক্তিদের তাদের নেতা হিসাবে। উত্তমদের তারা বিরোধিতা করল। সলোনের কথা বললে বলতে হয়, সলোন জনসাধারণের হাতে ন্যূনতম ক্ষমতাই অর্পণ করেছিলেন। তিনি তাদের কর্মচারীদের নির্বাচন এবং তাদের জবাবদিহী করার অধিকার দিয়েছিলেন। এ অধিকার ব্যতীত জনসাধারণের অবস্থা দাস কিংবা শত্রু ব্যতীত আর কিছু হত না। কিন্তু তাঁর সংবিধানে বিশিষ্ট এবং সচ্ছল ব্যক্তিদের মধ্য থেকে অফিসারদের নির্বাচনের ব্যবস্থা ছিল। তার অর্থ, সলোন কেবল নিম্নতম স্তরের সম্পত্তিবানদের এই ব্যবস্থার বাইরে রেখেছিলেন। (এদের বলা হত থেটিস। সম্পত্তিবানদের অপর উচ্চতর তিনটা শ্রেনীকে বলা হত : পেন্টাকসিওমেডিম্‌নি, জিউগিটি এবং নাইট।)

এছাড়া আইনদাতাদের মধ্যে ছিলেন জালিউকাস। ইনি এপিজাফিরিয় লকরীয়দের জন্য আইন রচনা করেছেন। কাটানার চারণডাস যেমন নিজেদের নগরীর জন্য তেমনি কালসিডিক থেকে উদ্ভূত ইতালি এবং সিসিলির অন্যান্য নগরীর জন্যও আইন তৈরি করেছিলেন।[১] এছাড়া ছিলেন করিনথ্‌-এর ফিলোলাস যিনি থিব-এর জন্য আইন রচনা করেন। ফিলোলাস ছিলেন বাকচিয়াদ বংশ থেকে উদ্ভূত। ফিরোলাস অলিম্পিক ক্রীড়ার বিজয়ী ডায়োক্লিস-এর প্রেমার্থী হয়েছিলেন। কথিত আছে এই ডায়োক্লিস তাঁর নিজের জননী এ্যালকিয়ণ-এর প্রেমাবেগে বিক্ষুব্ধহয়ে করিনথ পরিত্যাগ করে থিবিস-এ চলে যান। এখানেই ফিলোলাস-এর সঙ্গে তাঁর প্রেমাস্পদের মিলন ঘটে এবং তাঁরা দুইবন্ধু এই নগরীতে জীবন অতিবাহিত করেন। দর্শনার্থী যারা আসে তাদেরকে এখনো এই দুই বন্ধুর সমাধি দেখানো হয়। সমাধির একটি অপরটি থেকে দৃষ্ট হয়। তবে এদের একটিকে করিনথ থেকেই দেখা যায়। কিন্তু দ্বিতীয়টিকে দেখা যায় না। তাঁদের সম্পর্কে কাহিনী আছে যে, তাঁরা উভয় মিলেই সমাধি দুটির পরিকল্পনা করেছিলেন। ডায়োক্লিস তাঁর সমাধি এমন স্থানে রচনা করেছিলেন যেখান থেকে তার তিক্ত স্মৃতির দেশ করিনথ দৃষ্টির গোচর হবে না। কিন্তু ফিলোলাস এমন স্থান নির্দিষ্ট করেছিলেন যেখান থেকে তা দৃষ্টির গোচরে আসে। এভাবেই তাঁরা থিবিস-এ জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। ফিলোলাস এদের আইনদাতা হন এবং তাঁর প্রবর্তিত আইনের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সন্তান জন্মদান

১. অনেকে অনোম্যাকরিটাসকে একেবারে আদি দক্ষ আইনবিদ বলে অভিহিত করেন এবং মনে করেন যে তিনি লকরিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তাঁরা এও বলেন, অনোম্যাকরিটাস ক্রিটে একজন ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা হিসাবে পরিচিত ছিলেন। ক্রিটের থেলিস তাঁর বন্ধু ছিলেন এবং লাইকারগাস ও জালিউকাস থেলিস-এর আলোচনা শুনেছেন এবং চারণডাস জালিউকাসকে শ্রবণ করেছেন। কিন্তু এসব কথা বিশ্বাস করলে আর কালক্রমের কোন বালাই থাকে না। —এ্যারিস্টট্‌ল

সংক্রান্ত আইন। থিবিস-এর অধিবাসীগণ একে অভিহত করেছিল 'পালক গ্রহণের' আইন বলে। এর একটি ব্যবস্থা এমন ছিল যাতে জমির খণ্ডের কোন পরিবর্তন না ঘটে। চারণডাস-এর আইন সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলার নেই। কেবল মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর আইনের কথা বলা যায়। মিথ্যা সাক্ষ্য দানকে তিনি দণ্ডনীয় অপরাধ বলে নির্দিষ্ট করেছিলেন। আইনের সতর্ক এবং বিস্তারিত প্রণয়নে চারণডাস আধুনিক আইনদাতাদের চেয়েও অধিক সুনির্দিষ্ট। ফ্যালিয়াস-এর বৈশিষ্ট্য ছিল সম্পত্তি সমতাকরণের ক্ষেত্রে। প্লেটোর ক্ষেত্রে আমরা তাঁর সম্পত্তি, স্ত্রী এবং সন্তানদের উপর যৌথ স্বামিত্বের এবং মেয়ে এবং পুরুষ উভয়ের জন্য যৌথ ভোজনের প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করতে পারি। তাছাড়া প্লেটো নেশাগ্রস্তদের সম্পর্কেও আইন নির্দিষ্ট করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, পানশালার কর্তৃত্ব সুস্থ মানুষের উপর ন্যস্ত করা আবশ্যক। প্লেটো একথাও বলেছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের এক হাতের বদলে দুই হাতেই অস্ত্রচালনায় দক্ষ হতে হবে। ড্রাকোর আইনের কথাও বলা যায়। তবে এগুলি প্রচলিত শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সংযোজন বিশেষ। ড্রাকোর আইন দণ্ডের দিক থেকে খুব কড়া চিল, একথা বলা ব্যতীত এ সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলার নেই। পিট্টাকাসও কিছু আইন তৈরি করেছিলেন—কিন্তু তিনি কোন শাসনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা নন। তাঁর রচিত একটি আইন উল্লেখযোগ্য। এই আইনের নির্দেশ ছিল যে, সুস্থ ব্যক্তির চেয়ে নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির অপরাধ অধিকতর দণ্ডনীয় হবে। এমন ব্যক্তিকে অধিকতর পরিমাণে জরিমানার দণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে। নেশাগ্রস্ততা কোন মানুষের পক্ষে দণ্ড লাঘবের কোন অজুহাত হতে পারে না, এই ছিল পিট্টাকাস-এর অভিমত। থ্রেসের চালসিডিয়ার উপদ্বীপের অধিবাসীদের আইনদাতা ছিলেন রেগিয়াম-এর এ্যানড্রোমাস। তাঁর আইনের বিষয় ছিল হত্যা এবং উত্তরাধিকারিনী সংক্রান্ত আইন। তবে এসব আইন সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলার কথা আমি ভাবতে পারছিনে।

কল্পিত এবং বাস্তব শাসনব্যবস্থানসমূহের ক্ষেত্রে এই আলোচনার অধিক আলোচনা আমরা করছিনে।

তৃতীয় পুস্তক

প্রথম অধ্যায়

নাগরিকের সংজ্ঞা : নাগরিকতার প্রশ্ন

সংবিধানের বৈচিত্র্য এবং প্রকারভেদ আলোচনা করতে হলে আমাদের রাষ্ট্রের দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। তাহলে শুরুতেই আমাদের রাষ্ট্রের সংজ্ঞা প্রদান আবশ্যক। কিন্তু এক্ষেত্রে কোন ঐক্যমতের অস্তিত্ব নেই। যেমন দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, রাষ্ট্রের কার্যক্রম প্রসঙ্গে কেউ বলে, কোন কার্যক্রম রাষ্ট্র গ্রহণ করেছে, আবার অনেকে বলে কার্যক্রম রাষ্ট্র গ্রহণ করে না, গ্রহণ করে সরকার, সে চক্রতন্ত্র বা একনায়ক বা যাই হোক না কেন। একথা অবশ্য পরিষ্কার যে, রাজনীতিক এবং আইনদাতা—এঁদের কার্যক্রম রাষ্ট্রেরই বিষয়াবলী। কিন্তু সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রে বসবাসকারী মানুষকে সংগঠিত করার ব্যবস্থা বিশেষ। যে কোন সমগ্রের ক্ষেত্রে যা সত্য রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তা সত্য : রাষ্ট্রকে আমাদের তার অংশসমূহে বিশ্লেষণ করতে হবে। এবং নাগরিকের বিষয়ই আমাদের প্রথম বিবেচনা করতে হবে। কারণ রাষ্ট্র হচ্ছে নাগরিকদেরই সমষ্টি। কাজেই আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে : কে নাগরিক? আমরা সঠিকভাবে কিসের ভিত্তিতে একজন মানুষকে নাগরিক হিসাবে আখ্যায়িত করতে পারি? এমন অনেক সময়ে দেখা যায়, গণতন্ত্রে যে নাগরিক বলে বিবেচিত, চক্রতন্ত্রে সে নাগরিক বলে স্বীকৃত নয়। (এখানে অবশ্য আমরা যারা 'নাগরিক'-এর অভিধাটি মাত্র অর্জন করে, যাদের উপর নাগরিকতা অর্পিত হয় তাদের কথা বাদ দিতে পারি। আবার নগরীর কোন অধিবাসী হলেও আমরা একজনকে নাগরিক বলিনে। যেমন, দাসগণ। তারা রাষ্ট্রে বাস করে, কিন্তু দাসগণ নাগরিক নয়।) একটা সংজ্ঞা হতে পারে এই যে, 'বিচারালয়ে যাদের অধিকার আছে এবং যারা আইনগত অভিযোগ আনয়ন করতে পারে এবং যাদের বিরুদ্ধে আইনগত অভিযোগ আনয়ন করা যেতে পারে তারা হচ্ছে নাগরিক।' কিন্তু এমন সংজ্ঞার পরিধি বিরাট। বিচারলয়ের অধিকার তো বাণিজ্যগত সম্পর্কে সম্পর্কিত যে কারুর রয়েছে। অন্তত অংশত বটে। কারণ যে বৈদেশিক নগরীতে বাস করে তাকে হয়ত—আইনের ক্ষেত্রে অপর কাউকে তার পক্ষে থেকে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিয়োগ করতে হয়। এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অংশীদারী আংশিক মাত্র। (আবার যে শিশু বয়ঃপ্রপ্ত হয় নি কিংবা যারা বৃদ্ধ হয়ে দায়িত্ব পালন থেকে অবসর গ্রহণ করেছে তাদেরকে আমরা নাগরিক বললেও, তারা যথার্থভাবে নাগরিক নয়। তাদের মধ্যে যে শিশু তাকে বলতে হয় অপরিণত নাগরিক এবং যে বৃদ্ধ তাকে অবসরপ্রাপ্ত নাগরিক। কিংবা প্রসঙ্গের ভিত্তিতে উপযুক্ত কোন শব্দ সংযোজিত করেই তাদের নাগরিক বলতে হয়। আমাদের প্রশ্ন অপূর্ণ নাগরিক নয়। আমাদের প্রশ্ন, কাকে আমরা যথার্থভাবে পরিপূর্ণ এবং শর্তনিরপেক্ষভাবে নাগরিক বলতে পারি। যাদের নির্বাসিত করা হয়েছে কিংবা যাদের ভোটাধিকার নাকচ করা হয়েছে, তাদের বিষয়টা স্থির করা তেমন কঠিন নয়।)

আমার মনে হচ্ছে, একজন নাগরিকের সঙ্গে অপর সকলের যা পার্থক্য সে হচ্ছে,

বিচারে অংশগ্রহণ এবং কর্তৃত্ব ধারণে তার অধিকার। এক কথায় বলতে গেলে আইনগত, রাজনৈতিক এবং শাসনগত ক্ষমতার অধিকারই হচ্ছে নাগরিকের বৈশিষ্ট্য। নাগরিক যে সমস্ত দায়িত্বের অধিকারী হয় তার কোনটি হয়ত মেয়াদের শর্ত দ্বারা নির্দিষ্ট, কোনটির শর্ত হয়ত এরূপ যে, কোন অবস্থাতেই উক্ত পদ একই ব্যক্তি দুবার অধিকার করতে পারবে না। আবার কোনটিকে হয়ত কিছু সময়ের বিরতির পরে অধিকার করা যাবে। কিন্তু বিচারকদের তালিকার সদস্যপদ লাভ করার ন্যায় কেবল পদ লাভ কিংবা নাগরিক-সংসদের সদস্য হওয়ার ক্ষেত্রে এরূপ কোন শর্ত নাই। কেউ হয়ত বলতে পারে যে, এই সমস্ত পদের অধিকারীগণ প্রকৃত পক্ষে শাসন করে না। কাজেই 'শাসনে অংশগ্রহণের' কথা বলা অহেতুক। কিন্তু এমন যুক্তি গ্রহণ করা চলে না। কারণ, এ সমস্ত পদের অধিকারীগণ নানা ক্ষমতা ভোগ করে। এবং যারা ক্ষমতা ভোগ করে তারা শাসনে অংশগ্রহণ করে না, এমন কথা বলা হাস্যকর। যাই হোক, পদ অধিকারী এবং শাসনকারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আসলে আমাদের এমন একটি শব্দ নেই যার দ্বারা আমরা বিচারক, জুরী এবং আইন পরিষদের সদস্য—এই উভয় পদের অধিকারীকে চিহ্নিত করতে পারি। এক্ষেত্রে সংজ্ঞার যেখানে অভাব সেখানে আমি বলব, এ ক্ষমতাকে 'অনির্দিষ্ট ক্ষমতা' বলে উল্লেক করা যায়। আমরা তাহলে নাগরিকদের সংজ্ঞা দান করে বলব, নাগরিক হচ্ছে তারা যারা ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করে। বাস্তবে নাগরিক শব্দ যাদের উপর প্রয়োগ করা হয় আমাদের এই সংজ্ঞার মধ্যে তাদের প্রায় সকলকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আবার আমাদের একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটা সংস্থা যার অন্তঃকাঠামোগুলো পরস্পর থেকে গুণগতভাবেই পৃথক হতে পারে। এর কোনটি প্রাথমিক বা মৌলিক। কোনটি অ-প্রাথমিক বা নিম্নতর গুরুত্বের এবং এদের সকলের মধ্যে সাধারণ কোন সাদৃশ্য আদৌ না থাকতে পারে। এবং এ জন্যই বিভিন্ন ধরনের শাসনতন্ত্রের মধ্যে গুণগত পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এর কোনটি যুক্তিগতভাবে হয়ত অপর কোনটির পূর্বগামী। কারণ, যেগুলিকে আমরা বিকৃত বা ভিন্ন বলি সেগুলিকে বিশুদ্ধ শাসনের পরেই আসতে হয়, আগে নয়। '(ভিন্ন' বলতে আমি কি বুঝাতে চাচ্ছি, সে কথা আমি পরে ব্যাখ্যা করব।) এ কারণেই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে 'নাগরিক'-এর অর্থ ভিন্ন দাঁড়াবে। আর তাই নাগরিকের যে সংজ্ঞা আমরা তৈরি করেছি সে সংজ্ঞা গণতন্ত্রের ক্ষেত্রেই সবচেয়ে উত্তমভাবে প্রযোজ্য। অন্য শাসনব্যবস্থায় যে এর প্রয়োগ হতে পারে না, এমন নয়। কিন্তু সেটি অপরিহার্য নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কিছু কিছু শাসনব্যবস্থা আছে যেখানে 'গণ' বলতে আমরা যা বুঝি তার অস্তিত্ব নেই। সেখানে সুনির্দিষ্ট সদস্যপদ সহ কোন সংসদ নাই। যা আছে তা নাগরিকদের সাময়িক সম্মিলন। আবার বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও কোথাও কোথাও নাগরিকদের সকলেই যে পালাক্রমে বিচারকার্যে অংশগ্রহণ করে এমন নয়। তার কোন একটি অংশই মাত্র এই কার্যে নিয়োজিত থাকে। যেমন স্পারটাতে বিচারের কাজ সম্পন্ন করে ইফরগণ। ইফরদেরই কেউ না কেউ এজন্য নির্দিষ্ট থাকে। হত্যার ঘটনার বিচার করে প্রবীণগণ। অন্য বিষয়ের বিচার সাধিত হয় অপর কোন সংগঠন দ্বারা। কার্থেজের ক্ষেত্রেও তাই। কার্থেজেও দেখি সকল ঘটনারই বিচার করে নির্দিষ্ট সরকারি সংগঠনসমূহ। এ সকল বিভিন্নতা যাই হোক, নাগরিক সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের সংজ্ঞা পরিত্যাগের প্রয়োজন নাই। বরঞ্চ আমরা সেটিকে অন্য সকল ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রয়োগযোগ্য করে সংশোধিত করতে পারি। এবং এক্ষেত্রে 'অনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের' বদলে 'সরকারিভাবে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ' কথাটি বললেই চলে। কারণ পূর্ণভাবে কিংবা আংশিকভাবে

এই সকল সংগঠনের উপরই আইনগত কিংবা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। আমাদের এই আলোচনা থেকে একথা এবার পরিষ্কার হচ্ছে, নাগরিক আমরা কাকে বলব। আমরা বলব, যখনই কোন রাষ্ট্রের কোন ব্যক্তি শাসনসম্পর্কিত বা বিচারবিভাগীয় দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত হবে তখনই আমরা তাকে সেই রাষ্ট্রের নাগরিক বলে অভিহিত করব। এবং মোটামুটিভাবে এমন নাগরিকের সংখ্যা যদি এরূপ হয় যে, তারা একটা আত্মনির্ভর অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম, তবে আমরা নাগরিকদের এই সম্মিলনকে রাষ্ট্র বলে আখ্যায়িত করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কাদের নাগরিক বলে গণ্য করা উচিত

বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক সময়ে নাগরিকের সংজ্ঞা দিয়ে বলা হয় যে, পিতা এবং মাতা উভয় দিক দিয়ে যে নাগরিকের সন্তান সে হচ্ছে নাগরিক। অনেকে আবার আরো কঠিন হয়ে দাবী করেন দুই, তিন, এমনকি এর চাইতে অধিক পুরুষ যাবৎ যার পূর্বপুরুষগণ নাগরিক সে হচ্ছে নাগরিক। নাগরিকের এই জন্মগত সংজ্ঞাটিকে বাস্তব এবং প্রশ্নের ত্বরিত সমাধানমূলক মনে হলেও অনেকে আবার তিন চার পুরুষ পেছনে যাওয়ার ক্ষেত্রে আপত্তি তুলেন। তাঁরা বলেন কোন বর্তমান নাগরিকের প্রপিতামহের নাগরিকত্ব কিভাবে নির্দিষ্ট করা যাবে? (এ প্রশ্নে লিওনটিনির গরজিয়াস কিছুটা পরিহাস এবং কিছুটা গুরুত্বের সঙ্গে বলেন, গৃহ তৈরির মালমশলা যেরূপ রাজমিস্ত্রী যেমন বানায় তেমন, ঠিক অনুরূপভাবে লারিসার মানুষ তার নাগরিককে যেমন বানিয়েছে লারিসার নাগরিকগণ হচ্ছে তেমন।...) এমন আপত্তির জবাব অবশ্য কঠিন নয়। সেই পূর্বপুরুষগণও যদি আমাদের সংজ্ঞানুযায়ী শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করে থাকে তবে তারাও নাগরিক ছিল। অবশ্য বংশ ধারায় নাগরিকতা নির্দিষ্ট করার পদ্ধতিটি আমরা বসতিস্থাপনকারী কিংবা রাষ্ট্রের আদি প্রতিষ্ঠাতাদের উপর প্রয়োগ করতে পারিনে। কিন্তু আমি মনে করি, এ ক্ষেত্রে যে প্রশ্নটা গুরুত্বপূর্ণ সে হচ্ছে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের পরে নাগরিকতা নির্দিষ্ট করার প্রশ্ন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এথেন্সের স্বৈরশাসকদের বিতাড়নের পরে ক্লিয়েসথেনিস যখন বহু বৈদেশিক এবং দাসদের গোত্রভুক্ত করে নাগরিক করে ফেলেন তখন এই সমস্যাটি দেখা দিয়েছিল। এখানে প্রশ্নটা এই নয় : এই ব্যক্তিগণ কি নাগরিক? প্রশ্নটা হচ্ছে : এমন ব্যক্তিদের নাগরিক করা কি ঠিক, না বেঠিক? (অনেকে এ ব্যাপারে অধিকতর অগ্রসর হয়ে বলেন : বেঠিক এবং ভিত্তিহীন এর মধ্যে পার্থক্য করা নিরর্থক। আসলে যারা সঠিকভাবে নাগরিক হতে পারে না তাদের নাগরিক বলে গণ্য করা আদৌ যুক্তিযুক্ত কিনা? কিন্তু প্রশ্নটার এমন জবাবও সহজ নয়। কারণ, কেউ যদি অন্যায়ভাবেও শাসন করে তবে সে কারণে সে অ-শাসক বলে অভিহিত হয় না। তাকে আমরা শাসকই বলি। এবং যখন আমরা 'শাসনকার্যে' অংশগ্রহণ করাকে নাগরিকের সংজ্ঞা হিসাবে নির্দিষ্ট করেছি তখন যারাই সেই কার্যে অংশগ্রহণ করছে তাদের উপর নাগরিকতা শব্দের প্রয়োগকে অযৌক্তিক বলতে পারি নে।)

তৃতীয় অধ্যায়

রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ধারাবাহিকতার প্রশ্ন

এই প্রশ্নটিকে বৃহত্তর অপর যে প্রশ্নটি আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় কোন কার্যের প্রকৃতি এবং তার ধারবাহিক প্রযুক্ততা, তা থেকে আলাদা করা চলে না। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে চক্রতন্ত্র বা স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে যখন পরিবর্তন সংঘটিত হয় তখনকার সমস্যা। এমন অনেকে আছেন যাঁরা মনে করেন এরূপ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নূতন ব্যবস্থা পুরাতন ব্যবস্থার চুক্তিসমূহের শর্তাবলী পালনে বাধ্য নয়। তাঁদের যুক্তি, পুরাতন চুক্তি সম্পাদন করেছে রাষ্ট্র নয়, চুক্তি সম্পাদন করেছে স্বৈরশাসক। অনুরূপভাবে চক্রতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র অপরাপর চুক্তি যাই জোরের ভিত্তিতে এবং সাধারণের স্বার্থকে উপেক্ষা করে করে থাকুক না কেন, সে সব চুক্তির বাধ্যতাও এরা অস্বীকার করার কথা বলেন। এ কথার অর্থ হচ্ছে, যে-গণতন্ত্র জোরের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে-গণতন্ত্রের কার্যক্রমও চক্রতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্রের ন্যায় রাষ্ট্রের নয়, সরকার কর্তৃক সম্পাদিত বলে বিবেচিত হবে। এটাকে আবার আর একটি প্রশ্নের অংশ হিসাবে আমাদের দেখতে হয়। একটা রাষ্ট্র যে একই রাষ্ট্ররূপে এখনো অস্তিত্বমান আছে, কিংবা সে ভিন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, তা বুঝার উপায় কি? এর একটা জবাবে এই হতে পারে যে, ভূখণ্ড এবং অধিবাসীদের ভিত্তিতে আমরা এটি নির্দিষ্ট করবো। কিন্তু এমন জবাবে অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যাবে না। কারণ, ভূখণ্ড এবং অধিবাসী উভয়কে বিভক্ত করা চলে এবং অধিবাসীদের কিছু পরিমাণকে ভূখণ্ডের এক অংশে এবং অপর সংখ্যাকে অপর অংশে রেখে এ দুটি অংশকে দুটি রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা যায়। যাহোক এটি হয়ত তত গুরুত্বপুর্ণ ব্যাপার নয়। এটার উদ্ভব ঘটেছে 'পলিস' শব্দটিকে আমরা যে রাষ্ট্র এবং ভূখণ্ড উভয় অর্থে ব্যবহার করি, তা থেকে। প্রশ্নের আর একটা দিক হচ্ছে, রাষ্ট্রের আকারের দিক। একই ভূখণ্ডে যদি মানুষ বাস করে তাহলেও প্রশ্ন, কত সংখ্যক অধিবাসী হলে রাষ্ট্র বা নগরের একক অস্তিত্ব রক্ষিত হবে? এ প্রশ্নের জবাব নগরের বেষ্টনী দেয়ালের ভিত্তিতে দেওয়া চলে না। কারণ, সমগ্র পিলোপনেসকে ঘিরেই তো একটা দেয়াল তৈরি করা সম্ভব। ব্যাবিলন কিংবা অপর যে কোন ভূখণ্ড,—একটা নগরের পরিবর্তে একটা জাতি যেখানে অধিষ্ঠিত,—তার ক্ষেত্রেও একথা সত্য। (ব্যাবিলনের ক্ষেত্রে এরূপ কথা শোনা যায় যে, নগরটি দখল হয়ে যাওয়ার দুদিন পরেও নগরের একটি অংশ নগরের এ ভাগ্য সম্পর্কে অজ্ঞই থেকেছিল। রাষ্ট্রের আকার, অধিবাসীর সংখ্যা এবং তাদের জাতিগত বৈচিত্র্য : এগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এসব বিষয়ের আলোচনাতে আমরা পরে আবার ফিরে আসব।[১])

১. ৭ম পুস্তক দ্রষ্টব্য।

একই ভূখণ্ডে একই অধিবাসীগণ যদি বসবাস করতে থাকে তথাপি রাষ্ট্রের ধারাবাহিকতার মূল প্রশ্নটি মীমাংসিত হয়ে যায় না। প্রশ্নটির অস্তিত্ব তখনো থেকে যায়। একদিক দিয়ে আমরা অবশ্য বলতে পারি, যতদিন পর্যন্ত বংশগত ধারাবাহিকতা বজায় থাকে ততদিন রাষ্ট্রের অপরবির্তিত পরিচয় বজায় থাকে। যেমন, নদীর পানিতে সর্বদা পরিবর্তন ঘটতে থাকলেও আমরা নদীর নামকে পরিবর্তন করিনে। একই নামে তাকে আমরা অভিহিত করি। তেমনি রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যেও এক পুরুষের স্থানে অপর পুরুষ জন্মলাভ করলেও পুরুষানুক্রমে আমরা তাকে একই রাষ্ট্র বলে অভিহিত করতে পারি। অপরদিকে আবার এও বলা যেতে পারে যে, অধিবাসীগণকে এভাবে এক বলা গেলেও রাষ্ট্র ভিন্নতর হয়েছে। কারণ, যেহেতু রাষ্ট্র হচ্ছে একটি বিশেষ শাসনব্যবস্থায় সংঘবদ্ধ একটি জনগোষ্ঠী সেহেতু নাগরিকদের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে চরিত্রগতভাবে যখন ভিন্ন হয়ে যায় তখন রাষ্ট্রেরও অনুরূপ পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এ অবস্থাকে আমরা নাটকের কোরাস বা গায়কদলের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। এই গায়কদল কোন সময়ে একটি বিয়োগান্ত নাটকে তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে ; কোন সময়ে তারা মিলনান্ত নাটকেও তাদের ভূমিকা পালন করতে পারে। কিন্ত একই ব্যক্তি নিয়ে তারা সংঘটিত হলেও প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা বিভিন্ন। অন্যান্য যৌথ সংস্থার ক্ষেত্রেও এই নীতিটি প্রযোজ্য। সঙ্গীতের একই স্বরলিপি দ্বারা ডোরীয় কিংবা ফ্রিজীয় ধারা সৃষ্টি করা চলে। একথা ঠিক হলে রাষ্ট্রের অস্তিত্বের ধারাবাহিকতার চিহ্ন হওয়া উচিত অধিবাসীদের জাতিগত চরিত্র নয়, চিহ্ন হওয়া উচিত শাসনব্যবস্থার চরিত্র। এর ফলে অধিবাসীগণ এক কিংবা পরিবর্তিত, উভয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নাম পরিবর্তিত, হবে কিংবা হবে না তা নির্দিষ্ট করা সম্ভব।

[শাসনতন্ত্র তথা শাসনব্যবস্থার চরিত্রকে রাষ্ট্রের ধারাবাহিকতার নিয়ামক করার ফলে নতুন শাসনব্যবস্থা পুরাতন ব্যবস্থার সকল বাধ্য-বাধকতার অধীন না হওয়ার যুক্তিট জোরদার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য এ্যারিস্টট্‌ল প্রশ্নটির মীমাংসাতে এখনো পৌছেছেন বলে অভিমত প্রকাশ করছেন না। কারণ তাঁর বক্তব্যে সংযোজন ঘটিয়ে তিনি বলেন :]

কিন্তু শাসনব্যবস্থা যদি পরিবর্তিত হয় তাহলে নূতন ব্যবস্থা পুরাতন ব্যবস্থার ঋণ পরিশোধে বাধ্য কিংবা বাধ্য নয়, এটি একটি ভিন্ন প্রশ্ন।

[শাসনব্যবস্থা প্রসঙ্গে নাগরিক এবং রাষ্ট্রের চরিত্রের বিষয়টি এ্যারিস্টট্‌ল এতক্ষণ আলোচনা করে থাকলেও আলোচনাটি এখনো সম্পূর্ণ হয় নি। নাগরিকের এমন সংজ্ঞার চেষ্টা করা হয়েছে যে সংজ্ঞা সকল শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু এমন সংজ্ঞা পাওয়া সহজ হয় নি। এ ক্ষেত্রে নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। এই অসুবিধারই আর একটি রূপের সাক্ষাৎ ঘটে যখন এ্যারিস্টট্‌ল 'উত্তম নাগরিক কে' এই প্রশ্নটি আলোচনা করেন। এ্যারিস্টট্‌ল বুঝতে পারছেন, এখানেও প্রশ্নের জবাব বেশ পরিমাণে নির্ভর করে নাগরিক কোন্ শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত, তার উপর।]

চতুর্থ অধ্যায়

উত্তম ব্যক্তি এবং উত্তম নাগরিকের প্রশ্ন

যে সমস্ত প্রশ্ন আলোচিত হয়েছে তার সঙ্গে সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন হচ্ছে : একজন উত্তম ব্যক্তির উত্তমতা এবং একজন দায়িত্বশীল এবং কর্তব্যপরায়ণ নাগরিকের উত্তমতা কি এক অথবা ভিন্ন? এ ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে একজন নাগরিকের উত্তমতা সম্পর্কে কিছু ধারণা তৈরি করা আবশ্যক। একজন নাগরিক একটি সংস্থার সদস্য, যেমন একজন নাবিক জাহাজের পরিচালকবৃন্দেরই একজন। এবং এখানে লক্ষ্যণীয় যে, জাহাজের কর্মীবাহিনীর প্রত্যেকের যদিও নিজ নিজ নির্দিষ্ট কর্ম এবং কর্ম অনুযায়ী প্রত্যেকের দাঁড়ি, মাঝি, আড়কাঠি ইত্যাদিরূপ নাম থাকে এবং আপন আপন কাজে তাদের প্রত্যেকের দক্ষতা থাকে, তথাপি তাদের সকলের একটা মিলিত দক্ষতাও থাকে : জাহাজকে নিরাপদে চালিয়ে নেবার দক্ষতা। এ দক্ষতায় প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করে, কারণ জাহাজের নিরাপদ গতি কর্মীবাহিনীর সকলেরই কর্মের লক্ষ্য। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের নাগরিকগণ নিজদের মধ্যে যতই বিভিন্ন প্রকারের হোক না কেন, রাষ্ট্র তথা যে শাসনব্যবস্থার তারা নাগরিক তার নিরাপত্তাই হচ্ছে সকলের লক্ষ্য। কাজেই নাগরিকের উত্তমতা হবে শাসনব্যবস্থার স্বার্থের ভিত্তিতে উত্তমতা। আর যেহেতু রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা একাধিক, সে কারণে একজন উত্তম নাগরিকের একটিমাত্র ত্রুটিহীন আদর্শ-উত্তমতাকে নির্দিষ্ট করা চলে না। কিন্তু যিনি উত্তম ব্যক্তি তিনি একটি আদর্শ গুণের ভিত্তিতেই উত্তম। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, যে-গুণের কারণে একজন উত্তম মানুষ উত্তম বলে বিবেচিত হন সে গুণ ব্যতিরেকেই একজন মানুষের পক্ষে দায়িত্বশীল এবং উত্তম নাগরিক হওয়া সম্ভব।

বিষয়টিকে আর একদিক থেকে দেখা যাক। সর্বোত্তম শাসনতন্ত্র বা শাসনব্যবস্থার উত্তমতার কথা ধরা যাক। মনে করা যাক যে, একটা রাষ্ট্র কেবল উত্তম এবং কর্তব্যপরায়ণ মানুষ দ্বারাই গঠিত হয়েছে। এমন হলে, এ রাষ্ট্রের প্রত্যেকে মানুষ তার নিজের দায়িত্ব উত্তমরূপেই সম্পাদন করবে এবং তার দায়িত্ব উত্তম রূপে পালন তার উত্তমতার উপরই নির্ভরশীল হবে। কিন্তু যেহেতু সকল নাগরিকের পক্ষে একইরূপ উত্তম হওয়া অসম্ভব, সে কারণে এমন রাষ্ট্রেও উত্তম ব্যক্তির উত্তমতা এবং উত্তম নাগরিকের উত্তমতাকে আমরা এক বলতে পারি নে। কারণ একজন উত্তম নাগরিকের উত্তমতা সকল নাগরিকেরই সাধ্যায়ত্ত হতে হবে। তাহলেই মাত্র একটি রাষ্ট্রের পক্ষে যথার্থরূপে উত্তম হওয়া সম্ভব হবে। কিন্তু কোন রাষ্ট্রের সকল মানুষ যদি উত্তম না হয় তাহলে সকল উত্তম নাগরিককে উত্তম মানুষ বলা সম্ভব হবে না।

তাছাড়া একটি নগর অসম অংশ দিয়েই গঠিত হয়। এবং একটি সজীব প্রাণীর ক্ষেত্রে আমরা যেমন দেখি, তার মধ্যে রয়েছে দেহ এবং মন, এবং মনের মধ্যে রয়েছে প্রজ্ঞা এবং প্রবৃত্তি, পরিবারের মধ্যে রয়েছে স্বামী এবং স্ত্রী এবং একটি ব্যবসায়ের মধ্যে রয়েছে

মালিক এবং দাস, তেমনি একটি নগর এ রকম এবং এর অতিরিক্ত বিভিন্ন প্রকার উপাদান দিয়ে গঠিত হয়। কাজেই একটা নৃত্যদলের নেতা এবং আর সকল নৃত্যশিল্পীর উত্তমতা যেমন একটি গুণেই মাত্র নির্দিষ্ট হতে পারে না, তেমনি রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের উত্তমতাও মাত্র একটি গুণে নির্দিষ্ট হতে পারে না।

আমরা যা বলেছি সাধারণভাবে তা অবশ্যই সত্য। কিন্তু একটা প্রশ্ন উঠতে পারে : তাহলেও কোন বিশেষ ক্ষেত্রে একজন উত্তম মানুষ এবং একজন উত্তম নাগরিক—উভয়ের মধ্যে কি একই গুণের অস্তিত্ব থাকতেপারে না? আমাদের জবাব হবে : হ্যাঁ, এমন হতে পারে। কারণ এটা তো আমাদের স্বীকৃত কথা যে, একজন উত্তম শাসক যেমন উত্তম তেমনি প্রাজ্ঞ। রাষ্ট্র পরিচালনায় জ্ঞান অপরিহার্য। (অনেকে বলেন রাষ্ট্রশাসন হচ্ছে একান্তই জ্ঞানের ব্যাপার। এ কারণে শাসকদের জন্য তাঁরা গোড়া থেকেই ভিন্নশিক্ষা ব্যবস্থার কথা বলেন। এক্ষেত্রে তাঁরা উল্লেখ করেন—(১) রাজ কুমারদের অশ্ব-চালনায় শিক্ষিত করার প্রথা এবং (২) ইউরিপিডিস-এর যে বাণীতে উক্তি করা হয়েছে : শিক্ষায় আভরণ নয়, জাতির যা প্রয়োজন কেবল তারই শিক্ষাদান—এমন দৃষ্টান্তের) কিন্তু উত্তম শাসক এবং উত্তম মানুষের উত্তমতাকে অভিন্ন বললেও যেহেতু যে শাসক নয়, শাসিত সেও একজন নাগরিক, সে কারণে আমরা নির্বাধ ভাবে একথা বলতে পারিনে যে, নাগরিকের উত্তমতা এবং উত্তম মানুষের উত্তমতা সর্বদা এক। আমরা কেবল এতটুকু বলতে পারি, কোন বিশেষ নাগরিকের ক্ষেত্রে এমনটি হতে পারে। কারণ শাসকের উত্তমতা এবং নাগরিকের উত্তমতাকে নিশ্চয়ই আমরা এক বলব না। আর নিঃসন্দেহে এই কারণেই ফিরি-এর জাসন বলেছিলেন, তিনি শাসন বৈ অপর কোন কাজে দক্ষ নন। এবং সে কারণে শাসক না থাকলে তার আহারেরও সংস্থান হয় না, তাকে অভুক্ত থাকতে হয়।

অবশ্য হুকুম দান করা এবং হুকুম মান্যকরা—এই উভয়কে জানা নিশ্চিতভাবেই উত্তম এবং নাগরিকের উত্তমতা বলতে আমরা এই দুটি গুণ—অর্থাৎ শাসন করা এবং শাসিত হওয়াকেই বুঝাব। কাজেই আমরা যদি বলি শাসকের উত্তমতা হচ্ছে উত্তম শাসনের গুণ বেং নাগরিকের উত্তমতা হচ্ছে শাসন করা এবং মান্যকরা—এই উভয় ক্ষেত্রে উত্তমতা—তাহলে দুটো গুণকে এক স্তরের বলে বিবেচনা করা চলে না।

স্বৈরশাসন বলেও একটা ব্যাপার আছে। স্বৈরশাসনের অবস্থায়ও কাজ করার প্রয়োজন পড়ে। কিন্তু এমন কাজ দাস সুলভ কাজ। এমন কাজের ক্ষেত্রে প্রভুকে দাসের শ্রম ব্যবহারের অধিক জানতে হয় না। এর বাইরে যা কিছু অর্থাৎ কোন কাজ সম্পাদন করতে পারার ক্ষমতা, অন্যকথায় ভৃত্যের যা কাজ তা একেবারেই দাস সুলভ। বিভিন্ন রকম কাজ, যেমন দৈহিক শ্রমের দক্ষ এবং অদক্ষ কাজের উপরে এই কথাটি প্রযোজ্য। একমাত্র চরম গণতন্ত্রেই কারিগরদের শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। কাজেই যে কাজের উপর প্রভু আছে সে কাজ কোন উত্তম ব্যক্তি বা রাষ্ট্রনীতিক বা উত্তম নাগরিকের শেখার প্রয়োজন পড়ে না। এদের পক্ষে এ কাজের ব্যবহার জানাই যথেষ্ট। তা না হলে প্রভু এবং ভৃত্যের মধ্যকার পার্থক্যের অস্তিত্ব থাকে না।

কিন্তু আর একটি শাসনের কথা আমাদের বলতে হয়। এ শাসন হচ্ছে জন্মগতভাবে যারা স্বাধীন এবং সমান তাদের মধ্যকার শাসন। এই শাসনকে আমরা বলব 'সাংবিধানিক' বা 'রাজনীতিক' শাসন। এবং এই শাসনকেই শাসক আয়ত্ত করবে শাসিত হওয়ার দক্ষতার মধ্য দিয়ে, যেমন সেনাবাহিনীতে আদেশদানের ক্ষমতা একজনকে আয়ত্ত করতে হয় প্রথমে একজন আজ্ঞাবহ অফিসার হিসাবে। এবং এই নীতিটি উত্তম নীতি। কারণ আদেশ

পালন করাকে প্রথমে শিক্ষা করা ব্যতীত একজন উত্তম সেনাধ্যক্ষ হওয়া সম্ভব নয়। তার অর্থ এই নয় যে, উত্তম শাসন এবং উত্তম বাধ্যতা এক। এর অর্থ হচ্ছে, উত্তম নাগরিকের অবশ্যই শাসন করা এবং শাসিত হওয়া—এই উভয়ের জ্ঞান এবং দক্ষতা থাকতে হবে। নাগরিকের উত্তমতা বলতে আমরা এই বিষয়টিকেই বুঝে থাকি : অর্থাৎ স্বাধীন মানুষের উপর স্বাধীন মানুষের শাসন।

এবার উত্তম মানুষের কথায় আসা যাক। এখানেও দ্বৈতচরিত্রের ব্যাপার আছে : শাসিত এবং শাসক হিসাবে উত্তমতার দিক। সরকারের ক্ষেত্রে উত্তম কর্ম এবং ন্যায় : এই দুই-এর মধ্যে যে অভিন্নতা তেমন অভিন্নতা শাসিতের ক্ষেত্রে সত্য না হলেও, ব্যক্তির ক্ষেত্রে এর একটা সত্যতা আছে। একথা পরিষ্কার যে, যে-উত্তম ব্যক্তি স্বাধীন এবং শাসিত তার উত্তমতা এবং ন্যায় সর্বদা এক এবং অভিন্ন না হতে পারে। স্ত্রী এবং পুরুষের মধ্যে সাহসের ক্ষেত্রে আমরা যেমন বিভিন্নতা দেখি, তেমনি উত্তম ব্যক্তির উত্তমতাও শাসক এবং শাসিত হিসাবে ভিন্নরূপের হতে পারে। কোন পুরুষের সাহস যদি স্ত্রীলোকের সাহসের অধিক না হয় তাহলে আমরা তাকে কাপুরুষ বলি। একটি স্ত্রীলোকের বাকসংযম যদি একজন উত্তম এবং সদাচারী পুরুষের মত না হয় তাহলে আমরা তাকে বাকসর্বস্বা হিসাবে অভিহিত করি। গৃহের মধ্যে মেয়ে এবং পুরুষের ভূমিকা এক নয়। পুরুষের কাজ হচ্ছে অর্জন করা, মেয়ের কাজ রক্ষা করা। কিন্তু শাসকের যে বিশেষ গুণ বা উত্তমতার আবশ্যক তা হচ্ছে প্রজ্ঞা। অবশিষ্ট যে সকল গুণ তা আমার মতে শাসক এবং শাসিত—উভয়েরই থাকতে পারে। শাসিত হওয়ার জন্য যে গুণের আবশ্যক তা প্রজ্ঞা নয়। সে হচ্ছে সঠিক জ্ঞান। শাসিতকে বলা চলে বাঁশীর নির্মাতা এবং শাসককে বংশীবাদক, বাঁশী যে বাজাতে জানে।

উত্তম মানুষ এবং উত্তম নাগরিক—এ দুয়ের মধ্যে যে ব্যবধান বিদ্যমান, এদের উভয়ের উত্তমতার বৈশিষ্ট্য এবং তাদের ব্যবধানের পরিমাণটি এবার পরিষ্কার হল।

[এ্যারিস্টটল্ এবার নাগরিকতার আলোচনায় ফিরে এসেছেন। তাঁর আলোচনায় দেখা যায়, তিনি একথা অবশ্যই জানেন যে কোন কোন রাষ্ট্রে 'বানাউসি' বা শ্রমিক পরিপূর্ণ নাগরিকতা ভোগ করে। কিন্তু এ্যারিস্টটলের মতে এমন লোকদের জীবিকার কারণেই নাগিরক হওয়ার গুণ এবং যোগ্যতা থাকা সম্ভব নয়। কিন্তু এ কারণে নাগরিকতার কি নূতন সংজ্ঞাদানের কোন প্রয়োজন আছে। এ্যারিস্টটল তেমনটি মনে করেন না। তিনি তাঁর অভিমত পোষণ করেই বলেন নাগরিক একটি বিশেষ শ্রেণির মানুষ এবং যারা জীবিকা হিসাবে বাণিজ্য কিংবা দৈহিক শ্রমে সর্বদা নিযুক্ত তাদের পক্ষে নাগরিক শ্রেণিভুক্ত হওয়া সম্ভব নয়।—]

পঞ্চম অধ্যায়

শ্রমিকরা কি নাগরিক?

কিন্তু নাগরিকের সংজ্ঞা সম্পর্কে প্রশ্ন এখনো থেকে যায়। প্রশ্নটি হচ্ছে, নাগরিক কে? যার যোগ্যতা আছে এবং শাসনে অংশগ্রহণে যার সুযোগ আছে, তাকেই কি যথার্থ নাগরিক বলা হবে কিংবা শ্রমিকদেরও আমাদের নাগরিক বলে গণ্য করা উচিৎ? আমরা যদি দ্বিতীয় জবাবটি গ্রহণ করি এবং শ্রমিকরা শাসনে অংশগ্রহণে অক্ষম হলেও আমরা যদি তাদের নাগরিক বলে আখ্যায়িত করি তাহলে 'নাগরিক' বলতে যে উত্তমতা বুঝায় রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে তা আর প্রযোজ্য থাকে না। কারণ, শ্রমিকগণ এই গুণ ধারণ করে না অথচ শ্রমিকরাও এখানে নাগরিক। অপর দিকে প্রশ্ন হচ্ছে, যদি সে নাগরিক না হয়, তাহলে রাষ্ট্রে তার অবস্থান কোন্ শ্রেণির মধ্যে? রাষ্ট্রের একজন শ্রমিক নগরে বাসকারী একজন বৈদেশিক নয়। কিংবা সে একজন পর্যটকও নয়। তাহলে আমরা তাকে কোন্ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করব? আমাদের এরূপ যুক্তি থেকে অদ্ভুত কোন জবাব বেরিয়ে আসবে, এমন নাও হতে পারে। কারণ নাগরিকদের যে শ্রেণিগুলির কথা আমরা উল্লেখ করেছি, দাসগণ কিংবা মুক্ত করে দেওয়া যে দাস তারা এর কোন শ্রেণিরই অন্তর্গত নয়। এবং আমরা এমন ধারণাও আদৌ পোষণ করিনে যে, রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য যাদেরই প্রয়োজন তাদের সকলকেই নাগরিক বলে আমাদের অভিহিত করতে হবে। শিশুরাও তো রাষ্ট্রের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয়, প্রাপ্ত বয়সের ন্যায়ই প্রয়োজনীয়। কিন্তু এ বিষয়ে আমরা পূর্বেই বলেছি, শিশুদের শর্তহীনভাবে নাগরিক বলা চলে না। বিশেষ অর্থেই মাত্র তাদের নাগরিক বলা চলে। প্রাচীনকালে দেখা যায়, কোন কোন দেশে শ্রমিকদের দাস কিংবা বৈদেশিক শ্রেণির অন্তর্গত করে রাখা হচ্ছে। এমন দৃষ্টান্ত এখনো পাওয়া যায়। কিন্তু যে রাষ্ট্র সর্বোত্তম রাষ্ট্র সে রাষ্ট্রে শ্রমিক নাগরিক বলে গণ্য হতে পারে না। এমন কি যদি শ্রমিককে নাগরিক বলে গণ্য করা হয় তাহলে নাগরিকের উত্তমতা সকলের ক্ষেত্রে কিংবা কেবলমাত্র স্বাধীন নাগরিকের ক্ষেত্রে আর প্রযোজ্য হবে না। তখন বাস্তবিকভাবে দৈহিক শ্রম থেকে মুক্ত অধিবাসীর উপরই মাত্র এর প্রয়োগ হবে। (দৈহিক শ্রমের এই কাজগুলি কোন নাগরিকের ব্যক্তিগত দাসদের দ্বারা কিংবা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে শ্রমিকদের দ্বারা সম্পাদিত হতে পারে।)

এক্ষেত্রে আর খানিকটা আলোচনা এই সমস্ত লোকের অবস্থাটিকে পরিষ্কার করবে। এবং এ ব্যাপারে বাস্তব অবস্থার উল্লেখই যথেষ্ট হবে বলে আমার মনে হয়। এখানে যা উল্লেখযোগ্য সে হচ্ছে এই যে, সংবিধান বা শাসনব্যবস্থা যেমন বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে, নাগরিকরা, বিশেষ করে শাসনের ক্ষেত্রে, নাগরিকরাও তেমনি বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। এদিক থেকে কোন একটি শাসনব্যবস্থায় একজন শ্রমিক বা কোন কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে নাগরিক হওয়া যেখানে প্রয়োজনীয়, অন্যকোন শাসনব্যবস্থায় সেখানে এমনটি অসম্ভব বলে বিবেচিত হতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, অভিজাততন্ত্র কিংবা অপর যে

শাসনব্যবস্থায় পদোন্নয়ন নির্ভর করে গুণ এবং যোগ্যতার উপর সেখানে শ্রমিকের পক্ষে নাগরিক হওয়া অসম্ভব। কারণ যাকে একজন শ্রমিক বা কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির জীবন যাপন করতে হয় তার পক্ষে একজন নাগরিকের সকল গুণ এবং যোগ্যতা অর্জন করা একেবারেই অসম্ভব। ধনীক শাসনব্যবস্থায় শাসনের জন্য যেখানে উচ্চপরিমাণে সম্পদের অধিকারী হতে হয় সেখানে একজন শ্রমিকের পক্ষে নাগরিক হওয়া সম্ভব নয় ; একজন কারিগরের পক্ষে অবশ্য অসম্ভব নয়। কারণ অনেক দক্ষ কারিগর ধনীতে পরিণত হয়।

[সর্বক্ষণ কার্যে নিযুক্ত বেতনভুক ব্যক্তির পক্ষে নাগরিক হওয়া এবং শাসকদের দায়িত্ব পালন করা যে সম্ভব নয়—এ অভিমত যে কেবল এ্যারিস্টট্‌লই পোষণ করতেন, এমন নয়।]

থিবিস নগরীতে একটি নিয়ম ছিল যে কোন ব্যবসায়ী বা কর্মে নিযুক্ত কারুর পক্ষে নাগরিক হতে হলে তার কর্ম থেকে অবসর গ্রহণের পরে দশ বৎসর সময় অতিক্রান্ত হতে হবে। অনেক শাসনব্যবস্থায় একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক বৈদেশিকদের পর্যন্ত নাগরিকশ্রেণিভুক্ত করার প্রথা বিদ্যমান রয়েছে। কোন কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বৈদেশিক পিতা এবং নাগরিক মাতার সন্তানকেও নাগরিক বলে বিবেচনা করা হয়। অনেক দেশে আবার অবৈধ সন্তানদেরও নাগরিকত্ব দেওয়া হয়। এ সমস্ত নিয়মের পেছনের কারণ হচ্ছে জনসংখ্যার স্বল্পতা। কিন্তু দেখা যায়, যথার্থ নাগরিকদের স্বল্পতার কারণে এরূপ ববস্থার মারফত নাগরিক বৃদ্ধির পরে রাষ্ট্র ক্রমান্বয়ে নাগরিক গ্রহণের এরূপ ব্যবস্থা রহিত করতে থাকে। এমন রহিতকরণ প্রথমে প্রযুক্ত হয় দাস পিতা বা দাসমাতার সন্তানের উপর। পরবর্তীতে এটি যোগ করা হয় নাগরিক মাতা এবং অ-নাগরিক পিতার সন্তানের উপর এবং পরিশেষে নাগরিক হওয়ার অধিকার নাগরিক পিতা এবং নাগরিক মাতার সন্তানের মধ্যেই কেবল সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়।

এই আলোচনা থেকে দুটো বিষয় পরিষ্কার হয় : প্রথমত, নাগরিকদের রকমভেদ আছে; দ্বিতীয়ত, যথার্থভাবে একজন নাগরিক কেবল সে, যার শাসনকার্যের সুবিধাভোগে অধিকার আছে। হোমারের একটি উক্তি আছে : অবস্থানহীন ভবঘুরে। এখানেও বলা যায়, অবস্থানের কল্যাণে শাসনের কোন অধিকার যে ভোগ করে না সে বৈদেশিক বৈ অপর কিছু বলে গণ্য হতে পারে না। (অনেক সময়ে এরূপ ক্ষেত্রে অনুসৃত নিয়ম প্রকাশ্যভাবে বিবৃত হয় না। তার ফলে অধিবাসীদের অনেকে তাদের অবস্থান এবং অধিকার সম্বন্ধে অন্ধকারেই বাস করতে থাকে।)

আমাদের সামনে প্রশ্ন ছিল : উত্তম মানুষ এবং উত্তম নাগরিকের উত্তমতা এক কিংবা বিভিন্ন। সেই প্রশ্নটির জবাব এবার দেওয়া হল। আমরা দেখলাম, কোন রাষ্ট্রে এ দুটি অভিন্ন হলেও, অপর কোন রাষ্ট্রে বিভিন্ন হতে পারে। এবং যেখানে অভিন্ন সেখানে সকল নাগরিকের পক্ষে এটি অর্জন করা সম্ভব নয়। কেবল মাত্র যারা 'রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ'—অর্থাৎ যারা একক কিংবা যৌথভাবে রাষ্ট্রীয় কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতার অধিকারী তাদের পক্ষেই এমন গুণ আয়ত্ত করা সম্ভব।

[নাগরিকতার আলোচনা এ্যারিস্টট্‌ল শেষ করেছেন। তৃতীয় পুস্তকের শুরুতে তিনি শাসনব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। শাসনব্যবস্থার সেই

আলোচনা তিনি এবার শুরু করছেন। বিভিন্ন রাষ্ট্রব্যবস্থার অন্বেষণে এ্যারিস্টট্‌ল একটা কথা বলেছিলেন যে, নাগরিকতার কোন শাসনব্যবস্থা-নিরপেক্ষ সংজ্ঞা নির্ধারণ কষ্টকর। নাগরিকতা নির্ভর করে যে সমাজব্যবস্থায় নাগরিক জীবন ধারণ করে তার উপর। সংবিধান বা শাসনব্যবস্থা সম্পর্কেও এখন তাঁর সেই প্রশ্ন ; এর অভিন্ন সংজ্ঞা কি? কিন্তু এ ক্ষেত্রে জবাবের চেষ্টা করার তেমন প্রয়োজন হয় না। কারণ, শাসনব্যবস্থা যে কেবল একটি নয়—তার যে প্রকারভেদ হয় এটি ইতিমধ্যেই স্বীকৃত হয়েছে। প্রশ্নটা তাই সংবিধানের সংজ্ঞা নয়—প্রশ্ন হচ্ছে সংবিধান থেকে সংবিধানের পার্থক্য নির্দিষ্ট করার উপায় কি? শাসনব্যবস্থাকে আমরা শ্রেণিবদ্ধ করব কি প্রকারে? এ্যারিস্টট্‌লের জবাব, হচ্ছে, এর প্রধান নির্ধারক হচ্ছে নাগরিকদের সামগ্রিক চরিত্র। এ জবাব অবশ্য সে কালের প্রচলিত জবাব। যেটা কতিপয় বা ধনিক শাসন ব্যবস্থা সেখানে নাগরিকের সংখ্যা কম। এই কমসংখ্যকই হচ্ছে নাগরিক-সমগ্র। দ্বিতীয়ত নির্ধারক হচ্ছে 'কুইবোনো' বা শাসনের উদ্দেশ্য : কার উদ্দেশ্য শাধনে শাসনব্যবস্থার পরিচালনা?]

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংবিধান বা শাসনব্যবস্থা কতপ্রকারের হতে পারে

এ প্রশ্নগুলির আলোচনা যখন শেষ হয়েছে তখন আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা শুরু করা আবশ্যক। প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি একটি সংবিধান নিয়ে আলোচনা করব—না একাধিক? একাধিক সংবিধান যদি আমাদের আলোচ্য হয় তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, এমন সংবিধানের সংখ্যা কত এবং তাদের মধ্যকার পার্থক্যই বা কি? 'সংবিধান' বলতে আমরা বুঝব রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষমতা, এবং বিশেষ করে সকল ক্ষমতার উপরে যে সার্বভৌম ক্ষমতা, তার সংগঠন। এখানে একটা কথা স্পষ্ট যে, যে কোন শাসনব্যবস্থায় শাসক তথা নাগরিকগণই সার্বভৌম। এদিক থেকে সংবিধান হচ্ছে, নাগরিকবৃন্দেরই সর্বমোট সংস্থা। এর দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখা যায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ডিমস বা জনতাই সার্বভৌম। কিন্তু ধনিক ব্যবস্থায় কতিপয় হচ্ছে সার্বভৌম। এক সংবিধান থেকে অপর সংবিধানের পার্থক্য এখানেই : নাগরিকদের সংগঠন-বৈশিষ্ট্য। এই নির্ধারক সকল সংবিধানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এ আলোচনার শুরুতেই আমাদের বলা উচিত, রাষ্ট্রের লক্ষ্য কি? কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রের অস্তিত্ব? এই সঙ্গে আসে শাসনব্যবস্থা বা নগরের মানুষের তথা একটি যৌথ সমাজের সদস্য হিসাবে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণকারী শাসনব্যবস্থার প্রকারভেদের কথা। আমাদের আলোচনার একেবারে গোড়াতে পরিবারের শাসন এবং স্বৈরশাসনের পার্থক্যের কথা বলতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে একটি রাষ্ট্রীয় জীব। এমনকি পারস্পরিক সাহায্য লাভের যখন প্রয়োজন হয় না তখনো মানুষের স্বভাবগত প্রবণতা হচ্ছে সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের। অবশ্য মানুষ যে একত্র হয় সে স্বার্থের ঐক্য থেকেই হয়। কারণ সকলের যৌথ জীবনই প্রত্যেক মানুষের উত্তম জীবন যাপনের সহায়ক। এবং এই উত্তম জীবনই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য ; যেমন যৌথভাবে রাষ্ট্রের, তেমনি পৃথকভাবে ব্যক্তির। কিন্তু গোড়াতে মানুষ সমাজ যে তৈরি করে এবং সমাজেই যে সে বাস করে সে তার জীবন রক্ষার তাগিদেই। অবশ্য কেবল জীবনযাপনটাও মূল্যহীন নয়। সমস্যায় যদি সে অত্যধিকভাবে আকীর্ণ না হয় তাহলে কেবল জীবনধারণেরও একটা মূল্য আছে। এবং একথা বলা যায় যে, বেশিরভাগ মানুষ যে দুঃখ কষ্ট ভোগ করে সে এ কারণে যে, মানুষ বাঁচার মধ্যেই একটা আনন্দ বোধ করে এবং সে মনে করে বেঁচে থাকার মধ্যেও একটা উত্তমতা বিদ্যমান।

সে যা হোক, এবার শাসনের বিষয়টিতে ফিরে আসা যাক। আমার আলোচনাতে আমি প্রয়শঃ এর সংজ্ঞার প্রশ্নটি উল্লেখ করি। শাসনের যে সকল বিভিন্নতার সাক্ষাৎ আমরা পাই তাদের পার্থক্য নির্দিষ্ট করা খুব শক্ত নয়। প্রথমত ধরা যাক দাসের উপর প্রভুর শাসনের কথা। এ শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য প্রভুর স্বার্থ সাধন। দাসের উপকার এ শাসন, থেকে যা

আসে তা আনুষঙ্গিক মাত্র। আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, যে-মানুষ স্বাভাবগতভাবে দাস তার নিজের কোন স্বার্থ বলে কিছু থাকতে পারে না। প্রকৃতিগতভাবে যে প্রভু তার স্বার্থই দাসের স্বার্থ। কিন্তু প্রভুর অবশ্যই দাসের জীবন রক্ষা সম্পর্কে ভাবতে হয়। কারণ, দাস বেঁচে থেকে তার সেবা করতে পারলে তবেই তার স্বার্থ। এদিক থেকে প্রভু-দাস সম্পর্কটি বজায় রাখার কথা তাকে ভাবতে হয়। দাসের উপর প্রভুর শাসন ছাড়া, স্ত্রীর উপর স্বামীর শাসনের কথাও আমাদের বলতে হয় এবং সন্তানদের উপর পিতার শাসন বা সমগ্র পরিবারের উপর গৃহস্বামীর শাসন। এই শাসনকে আমরা বলি 'পরিবার ব্যবস্থা'। এ শাসনের লক্ষ্য যেমন শাসকের স্বার্থ সাধন—তেমনি শাসক ও শাসিত উভয়ের স্বার্থ সাধন। বরঞ্চ বলা চলে চিকিৎসক বা ক্রীড়াবিদদের শিক্ষাদাতার দক্ষতার ন্যায় গৃহস্বামীর শাসনের লক্ষ্য নিজের স্বার্থ সাধন নয়, শাসিতেরই স্বার্থসাধন। চিকিৎসকের প্রধান স্বার্থ নিরাময় করা। তার নিজের উপকার আনুষঙ্গিক। (অবশ্য শিক্ষাদাতাও যে শিক্ষার্থীর পর্যায়ে না যেতে পারে এমন নয়। যে নাবিক নৌযান পরিচালনা করে সে নৌযানের নাবিককুলেরই একজন। নাবিক বা উভয়ের প্রথম লক্ষ্য তাদের দায়িত্বে ন্যস্ত মানুষের স্বার্থরক্ষা। আবার উপকারের ক্ষেত্রে নাবিককুল বা প্রশিক্ষকমণ্ডলীর অন্যতম হিসাবে অপর সকলের সঙ্গে উপকারেরও সে পাত্র।)

সর্বশেষে উল্লেখ করতে পারি রাষ্ট্রীয় শাসনের। এখানে নাগরিকদের সাদৃশ্য এবং সমতার ভিত্তিতে যখন শাসনব্যবস্থা সংগঠিত তখন সকলকেই পালাক্রমে আমরা শাসক বলে অভিহিত করতে পারি (শাসনের এ নীতি এমন কিছু নতুন নয়। বেশ প্রাচীন কালেও এর সাক্ষাৎ মেলে। তবে বর্তমানের চেয়ে তার পার্থক্য এখানে যে, পুরাকালে এ নীতির প্রয়োগ ছিল স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। সকল মানুষই তখন পালাক্রমে সামাজিক দায়িত্ব পালনকে নিজের কর্তব্য বলে বিবেচনা করত। এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তার লক্ষ্য থাকত নিজের স্বার্থ সাধন নয়। লক্ষ্য থাকত অপর সকলের স্বার্থ সাধন। কারণ অপর সকলেও তাদের দায়িত্ব পালনে নিজের বদলে অপরের স্বার্থকেই সাধন করেছে। কিন্তু বর্তমানের রীতি ভিন্ন। এখন রাষ্ট্রীয় দায়িত্বকে আত্মস্বার্থ সাধনের উৎস হিসাবে দেখা হয়। আর এ কারণেই দায়িত্বের পদলাভের পর পালাক্রমে তাকে ত্যাগ করার বদলে তাকে আগলে রাখার প্রবণতাই অধিক। এ যেন রোগ নিরাময়ের উপায়ের উদ্দেশ্যে রুগীর উর্ধশ্বাস পৌঁছাবার প্রতিযোগিতা। যেন পদ লাভেই তাদের রোগের নিরময়।) যাই হোক, এটা পরিষ্কার, যে-শাসনের লক্ষ্য সকলের মঙ্গল সেটাই যথার্থ। আসল ন্যায়ের সঙ্গেই এর সঙ্গতি। অপরদিকে কেবল শাসকের স্বার্থ সাধন যার লক্ষ্য সে শাসন অবশ্যই অন্যায়। এমন শাসন হচ্ছে যথার্থ শাসনের মানদণ্ড থেকে বিচ্যুতি। এমন শাসন হচ্ছে দাসের উপর প্রভুর শাসনের সমতুল্য। কারণ সেখানেও শাসকের স্বার্থই আসল, শাসিতের নয়। কিন্তু রাষ্ট্র দাসের সংস্থা নয়, রাষ্ট্র হচ্ছে স্বাধীন মানুষের সংস্থা।

সপ্তম অধ্যায়

কত প্রকারের শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান

পার্থক্যের এই সূচকটি নির্দিষ্ট করার পরে আমাদের বিবেচনা করতে হবে, কি কি শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান আছে এবং তাদের সংখ্যা কত। এ আলোচনার শুরুতে আমরা উল্লেখ করব সেই শাসনব্যবস্থার যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলের মঙ্গলসাধন। এটাকে আমরা সঠিক বা যথার্থ শাসনব্যবস্থা বলতে পারি। এই সংবিধান নির্দিষ্ট করতে সক্ষম হলে আমাদের পক্ষে এর বিচ্যুতির প্রকারগুলি চিহ্নিত করা সহজ হবে। আমরা দেখেছি সংবিধান এবং রাষ্ট্র বলতে এক জিনিষকেই বুঝায়। নাগরিকই হচ্ছে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা। সার্বভৌমের অবস্থান ঘটে এক, কতিপয় কিংবা বহুর মধ্যে। কিন্তু এদের লক্ষ্য যদি এক কতিপয় কিংবা বহুর স্বার্থসাধন হয় তাহলে এরা প্রত্যেকেই যথার্থ থেকে বিচ্যুত। কারণ, হয় আমাদের বলতে হবে যে, যারা রাষ্ট্রের অংশীদার তার নাগরিক নয়, অথবা তাদের সকলেরই রাষ্ট্রের মঙ্গলের উপর অধিকার থাকতে হবে। এই বিচারে যথার্থ শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে নীচের নামগুলি সাধারণত প্রয়োগ করা হয় :

১. একের শাসন: সকলের মঙ্গলের জন্য : রাজতন্ত্র

২. একের অধিক বটে কিন্তু কয়েকজনের মাত্র শাসন : সকলের মঙ্গলের জন্য অভিজাততন্ত্র
(অভিজাততন্ত্র মানে সর্বোত্তমতন্ত্র, কারণ হয় সর্বত্তম ব্যক্তিরা এখানে শাসন করে কিংবা রাষ্ট্র এবং তার সকল সদস্যের সর্বোত্তম মঙ্গল এর লক্ষ্য)।

৩. নাগরিকদের অধিকাংশের শাসন : সমগ্র সমাজের মঙ্গলের জন্য : 'পলিটি'
('পলিটি' আর সংবিধান বা শাসনব্যবস্থা একই কথা। তবে 'পলিটি' শব্দ ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, এক কিংবা কতিপয়ের পক্ষে বিশেষ যোগ্যতা অর্জন সম্ভব হলেও যোগ্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রে অতি উচ্চমান অর্জন করা বহুর পক্ষে অবশ্যই কঠিন। দক্ষতার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র যুদ্ধক্ষমতাতেই সাধারণ মানুষের পক্ষে একটা মান আয়ত্ত করা সম্ভব। এবং সে কারণেই এই তৃতীয় ধরনের 'যথার্থ সংবিধানে' নাগরিক—সেনারই আসলে সার্বভৌম এবং যারা অস্ত্রবহন করে কেবল তারাই এর সদস্য।)

এবার এই শাসন ব্যবস্থাগুলির প্রত্যেকটির বরাবর আমরা এর বিচ্যুত ব্যবস্থার উল্লেখ করতে পারি:

১. রাজতন্ত্র থেকে বিচ্যুতি হচ্ছে : স্বৈরতন্ত্র

২. অভিজাততন্ত্র থেকে বিচ্যুতি হচ্ছে : কতিপয় তন্ত্র

৩. পলিটি বা বহুর সাংবিধানিক শাসন থেকে বিচ্যুতি হচ্ছে : গণতন্ত্র।

একথা নিশ্চিত যে স্বৈরতন্ত্র হচ্ছে একেবারেই একের শাসন এবং কেবল সেই একক শাসকের স্বার্থ সাধনের জন্য; কতিপয়তন্ত্রের শাসন হচ্ছে কতিপয় বিত্তবানদেরই স্বার্থের জন্য এবং গণতন্ত্র হচ্ছে বিত্তহীনদের স্বার্থ সাধনের শাসন। কিন্তু এর কোনটির লক্ষ্যই সমগ্র সমাজের মঙ্গল সাধন নয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংবিধান বা শাসনব্যবস্থা কতপ্রকারের হতে পারে

এ প্রশ্নগুলির আলোচনা যখন শেষ হয়েছে তখন আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা শুরু করা আবশ্যক। প্রশ্ন হচ্ছে আমরা কি একটি সংবিধান নিয়ে আলোচনা করব—না একাধিক? একাধিক সংবিধান যদি আমাদের আলোচ্য হয় তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, এমন সংবিধানের সংখ্যা কত এবং তাদের মধ্যকার পার্থক্যই বা কি? 'সংবিধান' বলতে আমরা বুঝব রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষমতা, এবং বিশেষ করে সকল ক্ষমতার উপরে যে সার্বভৌম ক্ষমতা, তার সংগঠন। এখানে একটা কথা স্পষ্ট যে, যে কোন শাসনব্যবস্থায় শাসক তথা নাগরিকগণই সার্বভৌম। এদিক থেকে সংবিধান হচ্ছে, নাগরিকবৃন্দেরই সর্বমোট সংস্থা। এর দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখা যায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ডিমস বা জনতাই সার্বভৌম। কিন্তু ধনিক ব্যবস্থায় কতিপয় হচ্ছে সার্বভৌম। এক সংবিধান থেকে অপর সংবিধানের পার্থক্য এখানেই : নাগরিকদের সংগঠন-বৈশিষ্ট্য। এই নির্ধারক সকল সংবিধানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এ আলোচনার শুরুতেই আমাদের বলা উচিত, রাষ্ট্রের লক্ষ্য কি? কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রের অস্তিত্ব? এই সঙ্গে আসে শাসনব্যবস্থা বা নগরের মানুষের তথা একটি যৌথ সমাজের সদস্য হিসাবে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণকারী শাসনব্যবস্থার প্রকারভেদের কথা। আমাদের আলোচনার একেবারে গোড়াতে পরিবারের শাসন এবং স্বৈরশাসনের পার্থক্যের কথা বলতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে একটি রাষ্ট্রীয় জীব। এমনকি পারস্পরিক সাহায্য লাভের যখন প্রয়োজন হয় না তখনো মানুষের স্বভাবগত প্রবণতা হচ্ছে সমাজবদ্ধ জীবন যাপনের। অবশ্য মানুষ যে একত্র হয় সে স্বার্থের ঐক্য থেকেই হয়। কারণ সকলের যৌথ জীবনই প্রত্যেক মানুষের উত্তম জীবন যাপনের সহায়ক। এবং এই উত্তম জীবনই হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য ; যেমন যৌথভাবে রাষ্ট্রের, তেমনি পৃথকভাবে ব্যক্তির। কিন্তু গোড়াতে মানুষ সমাজ যে তৈরি করে এবং সমাজেই যে সে বাস করে সে তার জীবন রক্ষার তাগিদেই। অবশ্য কেবল জীবনযাপনটাও মূল্যহীন নয়। সমস্যায় যদি সে অত্যধিকভাবে আকীর্ণ না হয় তাহলে কেবল জীবনধারণেরও একটা মূল্য আছে। এবং একথা বলা যায় যে, বেশিরভাগ মানুষ যে দুঃখ কষ্ট ভোগ করে সে এ কারণে যে, মানুষ বাঁচার মধ্যেই একটা আনন্দ বোধ করে এবং সে মনে করে বেঁচে থাকার মধ্যেও একটা উত্তমতা বিদ্যমান।

সে যা হোক, এবার শাসনের বিষয়টিতে ফিরে আসা যাক। আমার আলোচনাতে আমি প্রায়শঃ এর সংজ্ঞার প্রশ্নটি উল্লেখ করি। শাসনের যে সকল বিভিন্নতার সাক্ষাৎ আমরা পাই তাদের পার্থক্য নির্দিষ্ট করা খুব শক্ত নয়। প্রথমত ধরা যাক দাসের উপর প্রভুর শাসনের কথা। এ শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য প্রভুর স্বার্থ সাধন। দাসের উপকার এ শাসন, থেকে যা

আসে তা আনুষঙ্গিক মাত্র। আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, যে-মানুষ স্বাভাবগতভাবে দাস তার নিজের কোন স্বার্থ বলে কিছু থাকতে পারে না। প্রকৃতিগতভাবে যে প্রভু তার স্বার্থই দাসের স্বার্থ। কিন্তু প্রভুর অবশ্যই দাসের জীবন রক্ষা সম্পর্কে ভাবতে হয়। কারণ, দাস বেঁচে থেকে তার সেবা করতে পারলে তবেই তার স্বার্থ। এদিক থেকে প্রভু-দাস সম্পর্কটি বজায় রাখার কথা তাকে ভাবতে হয়। দাসের উপর প্রভুর শাসন ছাড়া, স্ত্রীর উপর স্বামীর শাসনের কথাও আমাদের বলতে হয় এবং সন্তানদের উপর পিতার শাসন বা সমগ্র পরিবারের উপর গৃহস্বামীর শাসন। এই শাসনকে আমরা বলি 'পরিবার ব্যবস্থা'। এ শাসনের লক্ষ্য যেমন শাসকের স্বার্থ সাধন—তেমনি শাসক ও শাসিত উভয়ের স্বার্থ সাধন। বরঞ্চ বলা চলে চিকিৎসক বা ক্রীড়াবিদদের শিক্ষাদাতার দক্ষতার ন্যায় গৃহস্বামীর শাসনের লক্ষ্য নিজের স্বার্থ সাধন নয়, শাসিতেরই স্বার্থসাধন। চিকিৎসকের প্রধান স্বার্থ নিরাময় করা। তার নিজের উপকার আনুষঙ্গিক। (অবশ্য শিক্ষাদাতাও যে শিক্ষার্থীর পর্যায়ে না যেতে পারে এমন নয়। যে নাবিক নৌযান পরিচালনা করে সে নৌযানের নাবিককুলেরই একজন। নাবিক বা উভয়ের প্রথম লক্ষ্য তাদের দায়িত্বে ন্যস্ত মানুষের স্বার্থরক্ষা। আবার উপকারের ক্ষেত্রে নাবিককুল বা প্রশিক্ষকমণ্ডলীর অন্যতম হিসাবে অপর সকলের সঙ্গে উপকারেরও সে পাত্র।)

সর্বশেষে উল্লেখ করতে পারি রাষ্ট্রীয় শাসনের। এখানে নাগরিকদের সাদৃশ্য এবং সমতার ভিত্তিতে যখন শাসনব্যবস্থা সংগঠিত তখন সকলকেই পালাক্রমে আমরা শাসক বলে অভিহিত করতে পারি (শাসনের এ নীতি এমন কিছু নতুন নয়। বেশ প্রাচীন কালেও এর সাক্ষাৎ মেলে। তবে বর্তমানের চেয়ে তার পার্থক্য এখানে যে, পুরাকালে এ নীতির প্রয়োগ ছিল স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। সকল মানুষই তখন পালাক্রমে সামাজিক দায়িত্ব পালনকে নিজের কর্তব্য বলে বিবেচনা করত। এবং দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তার লক্ষ্য থাকত নিজের স্বার্থ সাধন নয়। লক্ষ্য থাকত অপর সকলের স্বার্থ সাধন। কারণ অপর সকলেও তাদের দায়িত্ব পালনে নিজের বদলে অপরের স্বার্থকেই সাধন করেছে। কিন্তু বর্তমানের রীতি ভিন্ন। এখন রাষ্ট্রীয় দায়িত্বকে আত্মস্বার্থ সাধনের উৎস হিসাবে দেখা হয়। আর এ কারণেই দায়িত্বের পদলাভের পর পালাক্রমে তাকে ত্যাগ করার বদলে তাকে আগলে রাখার প্রবণতাই অধিক। এ যেন রোগ নিরাময়ের উপায়ের উদ্দেশ্যে রুগীর ঊর্ধশ্বাস পৌঁছাবার প্রতিযোগিতা। যেন পদ লাভেই তাদের রোগের নিরময়।) যাই হোক, এটা পরিষ্কার, যে-শাসনের লক্ষ্য সকলের মঙ্গল সেটাই যথার্থ। আসল ন্যায়ের সঙ্গেই এর সঙ্গতি। অপরদিকে কেবল শাসকের স্বার্থ সাধন যার লক্ষ্য সে শাসন অবশ্যই অন্যায়। এমন শাসন হচ্ছে যথার্থ শাসনের মানদণ্ড থেকে বিচ্যুতি। এমন শাসন হচ্ছে দাসের উপর প্রভুর শাসনের সমতুল্য। কারণ সেখানেও শাসকের স্বার্থই আসল, শাসিতের নয়। কিন্তু রাষ্ট্র দাসের সংস্থা নয়, রাষ্ট্র হচ্ছে স্বাধীন মানুষের সংস্থা।

সপ্তম অধ্যায়

কত প্রকারের শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান

পার্থক্যের এই সূচকটি নির্দিষ্ট করার পরে আমাদের বিবেচনা করতে হবে, কি কি শাসনব্যবস্থা বিদ্যমান আছে এবং তাদের সংখ্যা কত। এ আলোচনার শুরুতে আমরা উল্লেখ করব সেই শাসনব্যবস্থার যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সকলের মঙ্গলসাধন। এটাকে আমরা সঠিক বা যথার্থ শাসনব্যবস্থা বলতে পারি। এই সংবিধান নির্দিষ্ট করতে সক্ষম হলে আমাদের পক্ষে এর বিচ্যুতির প্রকারগুলি চিহ্নিত করা সহজ হবে। আমরা দেখেছি সংবিধান এবং রাষ্ট্র বলতে এক জিনিষকেই বুঝায়। নাগরিকই হচ্ছে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা। সার্বভৌমের অবস্থান ঘটে এক, কতিপয় কিংবা বহুর মধ্যে। কিন্তু এদের লক্ষ্য যদি এক কতিপয় কিংবা বহুর স্বার্থসাধন হয় তাহলে এরা প্রত্যেকেই যথার্থ থেকে বিচ্যুত। কারণ, হয় আমাদের বলতে হবে যে, যারা রাষ্ট্রের অংশীদার তার নাগরিক নয়, অথবা তাদের সকলেরই রাষ্ট্রের মঙ্গলের উপর অধিকার থাকতে হবে। এই বিচারে যথার্থ শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে নীচের নামগুলি সাধারণত প্রয়োগ করা হয় :

১. একের শাসন: সকলের মঙ্গলের জন্য : রাজতন্ত্র

২. একের অধিক বটে কিন্তু কয়েকজনের মাত্র শাসন : সকলের মঙ্গলের জন্য: অভিজাততন্ত্র

(অভিজাততন্ত্র মানে সর্বোত্তমতন্ত্র, কারণ হয় সর্বত্তম ব্যক্তিরা এখানে শাসন করে কিংবা রাষ্ট্র এবং তার সকল সদস্যের সর্বোত্তম মঙ্গল এর লক্ষ্য)।

৩. নাগরিকদের অধিকাংশের শাসন : সমগ্র সমাজের মঙ্গলের জন্য : 'পলিটি'

('পলিটি' আর সংবিধান বা শাসনব্যবস্থা একই কথা। তবে 'পলিটি' শব্দ ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ, এক কিংবা কতিপয়ের পক্ষে বিশেষ যোগ্যতা অর্জন সম্ভব হলেও যোগ্যতার প্রতিটি ক্ষেত্রে অতি উচ্চমান অর্জন করা বহুর পক্ষে অবশ্যই কঠিন। দক্ষতার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র যুদ্ধক্ষমতাতেই সাধারণ মানুষের পক্ষে একটা মান আয়ত্ত করা সম্ভব। এবং সে কারণেই এই তৃতীয় ধরনের 'যথার্থ সংবিধানে' নাগরিক—সেনারই আসলে সার্বভৌম এবং যারা অস্ত্রবহন করে কেবল তারাই এর সদস্য।)

এবার এই শাসন ব্যবস্থাগুলির প্রত্যেকটির বরাবর আমরা এর বিচ্যুত ব্যবস্থার উল্লেখ করতে পারি:

১. রাজতন্ত্র থেকে বিচ্যুতি হচ্ছে : স্বৈরতন্ত্র

২. অভিজাততন্ত্র থেকে বিচ্যুতি হচ্ছে : কতিপয় তন্ত্র

৩. পলিটি বা বহুর সাংবিধানিক শাসন থেকে বিচ্যুতি হচ্ছে : গণতন্ত্র।

একথা নিশ্চিত যে স্বৈরতন্ত্র হচ্ছে একেবারেই একের শাসন এবং কেবল সেই একক শাসকের স্বার্থ সাধনের জন্য; কতিপয়তন্ত্রের শাসন হচ্ছে কতিপয় বিত্তবানদেরই স্বার্থের জন্য এবং গণতন্ত্র হচ্ছে বিত্তহীনদের স্বার্থ সাধনের শাসন। কিন্তু এর কোনটির লক্ষ্যই সমগ্র সমাজের মঙ্গল সাধন নয়।

অষ্টম অধ্যায়

শাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি বিচারের ভিত্তি কি?

[আলোচনাক্রমে দেখা যাচ্ছে, ক্ষমতার বিন্যাসই যে কেবল একটি সংবিধান বা শাসন ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট করে এমন নয় ; বিত্ত বা সম্পদের বন্টনও এক্ষেত্রে সমপরিমাণে গুরুত্বপূর্ণ]

যে বিভিন্ন প্রকার শাসনব্যবস্থার আমরা উল্লেখ করেছি তাদের প্রকৃতি সম্পর্কে আর খানিকটা বিস্তারিতভাবে আমাদের আলোচনা করা আবশ্যক। কয়েকটি প্রশ্নের এখানে জবাব প্রয়োজন। যার দৃষ্টিভঙ্গী কেবল বাস্তবক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ তার পক্ষে এসব প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেলেও চলে। কিন্তু আমরা বিষয়টিকে একটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করছি। আমাদের পক্ষে এই সব প্রশ্নের জবাব উপেক্ষা করা চলে না। এদের প্রত্যেকের যথার্থ প্রকৃতি আমাদের নির্দিষ্ট করতে হবে।

স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কে আমরা বলেছি, যে রাজনৈতিক সংস্থাকে রাষ্ট্র বলা হয়, স্বৈরতন্ত্র হচ্ছে তার উপর স্বেচ্ছাচারী রাজকীয় শাসন। কতিপয়তন্ত্রের উদ্ভব ঘটে যখন সার্বভৌম ক্ষমতা বিত্তবানদের হাতে সীমাবদ্ধ থাকে এবং গণতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে বিত্তহীন তথা সম্পদ যারা সংগ্রহ করে জড়ো করতে পারে নি তারা যখন ক্ষমতা দখল করে। আমরা যে সমস্ত প্রশ্নের কথা উল্লেখ করেছি তাদের মধ্যে প্রথম কিস্তির প্রশ্নের লক্ষ্য হচ্ছে কতিপয়তন্ত্র এবং গণতন্ত্র। প্রশ্ন হচ্ছে, কতিপয়তন্ত্র এবং গণতন্ত্রের যথার্থ সংজ্ঞা কি? যদি এমন হয় যে, রাষ্ট্রের অধিকাংশ লোক বিত্তবান এবং তারাই সার্বভৌম শাসক, তাহলে এমন ব্যবস্থাকে বলা হয় গণতন্ত্র। কারণ অধিক সংখ্যক লোক এখানে শাসক। আবার যদি এমন হয় যে, যারা বিত্তহীন তারা সংখ্যায় বিত্তবানদের চেয়ে অল্প হলেও তারা অধিক ক্ষমতাশালী এবং শাসন ক্ষমতা তারাই দখল করেছে তখন এটাকে বলা হয় কতিপয়তন্ত্র। কারণ এখানে কতিপয় বা অল্প সংখ্যক শাসন করছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এরূপ সংজ্ঞা দানের মধ্যে একটা কিছু ভুল রয়ে যাচ্ছে। আমরা যদি আবার দুটো নীতিকে মিলিয়ে দিয়ে বিত্তকে সংখ্যাল্পতার সঙ্গে এবং বিত্তহীনতাকে সংখ্যাগুরুত্বের সঙ্গে যুক্ত করে সংজ্ঞাদানের চেষ্টা করি তাতেও নূতন সমস্যার সৃষ্টি হয়। কারণ, যে ছটি ব্যবস্থার আমরা উল্লেখ করেছি বাস্তবে এর অধিক যদি কোন শাসন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে যে দুটো ব্যবস্থার উল্লেখ আমরা এইমাত্র করেছি তাদের আমরা কি নামে অভিহিত করব? যে শাসনে বিত্তবানরা সংখ্যাধিক এবং যে শাসনে বিত্তহীনরা সংখ্যাধিক, তাদের আখ্যান কি হবে? আমাদের এ আলোচনাতে এটা বুঝা যাচ্ছে, শাসন ব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ধারণের নিয়ামক হওয়া উচিত বিত্ত, সংখ্যা নয়। শাসন ক্ষমতায় যারা আছে তারা সংখ্যায় অল্প কিংবা অধিক এটি মৌল বিষয়

নয়, এটি আকস্মিক ঘটনা মাত্র। অবশ্য বিত্তবানদের শাসন যে সর্বত্র অল্পের শাসন আর বিত্তহীনদের শাসন অধিকের শাসন তার কারণ বাস্তবে বিত্তবানরা সংখ্যায় অল্প এবং দরিদ্ররাই সংখ্যায় অধিক। কাজেই শাসন ব্যবস্থার পার্থক্যের বিষয়ে উল্লিখিত ভিত্তিটা যথার্থ নয়। কতিপয়তন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মধ্যকার পার্থক্যের ক্ষেত্র সংখ্যা নয়, বিত্ত ; বিত্ত থাকা কিংবা না থাকা। মূল কথা হচ্ছে, রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস যেখানে বিত্ত বা অর্থের শক্তি সেখানে শাসকদের সংখ্যা অল্প কিংবা অধিক যাই হোক, ব্যবস্থাটি হচ্ছে কতিপয়ী ব্যবস্থা। অপরদিকে বিত্তহীনরা যেখানে শাসক সে ব্যবস্থা গণতন্ত্রী ব্যবস্থা। অবশ্য আমরা দেখেছি, বাস্তবে বিত্তবানরা সংখ্যায় অল্প এবং বিত্তহীনরা সংখ্যায় অধিক। বিত্তবানরা সংখ্যায় অল্প কিন্তু নাগরিক মাত্রই স্বাধীনতার অধিকারী। ফলে বিত্তবানদের দাবি দাঁড়ায়, বিত্ত এবং স্বাধীনতা উভয় কারণে শাসন ক্ষমতার তারা দাবিদার।

নবম অধ্যায়

কতিপয়তন্ত্র এবং গণতন্ত্রের ন্যায়ের বৈশিষ্ট্য কি?

[পার্থক্যের আর একটি মানদণ্ড হচ্ছে ন্যায়। এর দ্বারাও এক সমাজব্যবস্থাকে অপর সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করে বিচার করা চলে এবং তার ভিত্তিতে তাদের শ্রেণিকরণও সম্ভব। কিন্তু আমরা দেখছি, এ্যারিস্টট্‌ল এই মানদণ্ডটিকে এ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করছেন না। এ্যারিস্টট্‌ল ন্যায়কে এখানে প্রচলিত শ্রেণিকরণের সঙ্গে যুক্ত করে ন্যায়কে বন্টনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখছেন। ন্যায় বলতে সকলের জন্য ন্যায্য প্রাপ্তিকে এখানে বুঝানো হচ্ছে। এ্যারিস্টট্‌লের অভিমত হচ্ছে নাগরিকের কাছ থেকে রাষ্ট্র যে অবদান লাভ করবে নাগরিকের সেই অনুপাতে সুযোগ সুবিধা রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রাপ্য হবে। অবশ্য অবদান বলতে অর্থের বা সম্পদের অবদানকে এ্যারিস্টট্‌ল বুঝাতে চাননি। অর্থ নয়, নৈতিক অবদানই মূল্যবান। এবং এ কারণে এ্যারিস্টটলের পরবর্তী আলোচনার বিষয় হচ্ছে রাষ্ট্রের নৈতিক ভিত্তি কি এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে আমরা অন্য প্রকার সংস্থা থেকে পৃথক করব কিভাবে?]

প্রথমে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে কতিপয়তন্ত্র এবং গণতন্ত্র, এদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য কি এবং বিশেষ করে ন্যায় সম্পর্কে কতিপয়তন্ত্র এবং গণতন্ত্রের অভিমত কি? কারণ, সকলেই ন্যায়ের কথা বলে কিন্তু তার কোন সংজ্ঞা তারা প্রদান করে না। তাছাড়া ন্যায়ের আলোচনাতে চরম ন্যায় বা ন্যায়ের সমগ্র সত্তাকে তারা তাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে না। তাই দেখা যায়, তারা ন্যায় বলতে বুঝায় সমতাকে। কিন্তু এ ন্যায়ও সকলের জন্য নয়, কেবল যারা সমান তাদের জন্য। অপরদিকে যারা অসম তারাও ন্যায়বান। কিন্তু তাদের ন্যায়ও সকলের জন্য নয়। যারা কেবল অসম তাদের জন্য। কিন্তু 'কাদের জন্য'—এই প্রশ্নটিকে এড়িয়ে গিয়ে ন্যায়ের আলোচনা ভ্রমের সৃষ্টি করবে। কারণ, এক্ষেত্রে আমরা নিজেদের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি এবং এ কথা তো সত্য যে, যাদের নিজেদের স্বার্থ জড়িত তাদের পক্ষে এমন ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়। কাজেই ন্যায় বলতে যখন ব্যাক্তি এবং বস্তুর ন্যায় বুঝায় (বস্তু এবং ব্যক্তির ন্যায়ের পার্থক্য আমার 'নীতিশাস্ত্রে' আলোচিত হয়েছে।) তখন অনেককে দেখা যায় তারা বস্তুর সমতার ক্ষেত্রে ঐক্যমত পোষণ করলেও মানুষের মধ্যে কার জন্য সমতা, এ প্রশ্নে আর একমত হতে পারে না। এবং এর কারণের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ হচ্ছে, এদের নিজেদের স্বার্থ জড়িত রয়েছে আর তাই বিচারের ক্ষেত্রে তাদের বিভ্রম ঘটছে। তাছাড়া এর আর একটি কারণ হচ্ছে, এই সকল মানুষ সীমাবদ্ধ অর্থে ন্যায়ের আলোচনা করলেও তারা মনে করে ন্যায়ের চরম বা সামগ্রিক সত্তা নিয়েই তারা কথা বলছে। এমন ক্ষেত্রে দেখা যায়, বিবদমানরা নিজেদের পক্ষের সীমাবদ্ধ ন্যায্যতাকে তার সীমা ছাড়িয়ে সমগ্রের

উপরে আরোপ করে। যেমন, এদের কেউ যদি বিত্ত তথা একটি ক্ষেত্রে অসমান হয় তাহলে সে বিবেচনা করে, সর্বক্ষেত্রেই সে অসমান। কিন্তু এমন বিবেচনা ভুল। আবার একথা বিবেচনা করাও ভুল, স্বাধীনতা তথা একটি ক্ষেত্রে যে সমান সে সর্বক্ষেত্রেই সমান। এ রকম যুক্তিতে মূল বিষয়টি বিনষ্ট হয়। মূল কথাটি হচ্ছে : মানুষ যদি বিত্তের ভিত্তিতে যুক্ত হয়ে কোন সংস্থা তৈরি করে থাকে তাহলে সেই সংস্থাটি রাষ্ট্র হলে তার অস্তিত্বের ক্ষেত্রে তাদের বিত্তের অনুপাতে তারা রাষ্ট্রের যৌথ মালিক।

কতিপয়ী বা বিত্তবানদের রাষ্ট্র এবং ন্যায় সম্পর্কে ধারণার এটাই হচ্ছে ভিত্তি। তাদের এ বিবেচনার পক্ষে এই বলা যায় যে, যৌথ মালিকানায় যে ব্যক্তি শতের মধ্যে একাংশ প্রদান করেছে সে অপর যে নিরানব্বই শতাংশ প্রদান করেছে তার সমান হবে, এমন দাবী করা চলে না। এ কথা যেমন মূল পুঁজির উপর প্রযোজ্য, তেমনি, প্রযোজ্য পুঁজি থেকে পরবর্তীতে প্রাপ্ত লাভের উপরও। কিন্তু রাষ্ট্র কোন পুঁজি নিয়োগের ব্যাপার নয়। রাষ্ট্র পুঁজি নিয়োগের চেয়ে অধিক কিছু। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কেবল জীবিকার ব্যবস্থা করা নয়। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য এমন জীবন সম্ভব করা, যে জীবনের একটা মূল্য আছে। তা না হলে কেবলমাত্র দাস বা পশুদের দ্বারাও রাষ্ট্র তৈরি হতে পারত। কিন্তু তেমন চিন্তা করা যায় না। কারণ দাস এবং পশু—এরা কেউ স্বাধীন সত্তা নয় এবং উত্তমের সৃষ্টিতে এদের অংশগ্রহণ সম্ভব নয়।

আবার রাষ্ট্র মানুষের মধ্যে পারস্পরিক রক্ষামূলক কোন চুক্তি মাত্রও নয়। তার চেয়ে সে অধিক। পণ্য বা বিভিন্ন সেবা বিনিময়ের কোন ব্যবস্থা মাত্রও রাষ্ট্র নয়। তেমন হলে ইট্রাসকা এবং কার্থেজ কিংবা অপর যারা পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে আবদ্ধ তাদের সকল অধিবাসীকে একটিমাত্র রাষ্ট্রের নাগরিক বলে গণ্য করা যেত। একথা ঠিক যে, তাদের মধ্যকার ব্যবসায় বাণিজ্য, অনাক্রমণ এবং মৈত্রী—প্রভৃতি বিষয়ে নির্দিষ্ট চুক্তিপত্র রয়েছে। কিন্তু একটি নাগরিকতাসহ এক রাষ্ট্র হওয়া থেকে এ মৈত্রী খুবই আলাদা। কারণ, প্রথমত, এদের সকলেরই নিজ নিজ সরকার রয়েছে এবং এমন কোন সংস্থা নাই একইভাবে যারা শাসিত বলে নিজেকে তারা গণ্য করে। দ্বিতীয়ত, একের নাগরিকের বৈশিষ্ট্য বা আচরণ অর্থাৎ তারা সৎ কিংবা অসৎ, এ নিয়ে উভয়ের মধ্যকার লেনদেনের অধিক তারা পরস্পর চিন্তা করে না। কিন্তু রাষ্ট্রের নাগরিকের বেলা একথা খাটে না। সেখানে এক নাগরিকের আচরণের ভালো খারাপ সম্পর্কে অপরকে ভাবতে হয়। কাজেই কেবল নামে মাত্র নয়, যাকে আমরা যথার্থভাবে রাষ্ট্র বলে অভিহিত করব তাকে ন্যায়ের কথা অবশ্যই ভাবতে হবে। তা না হলে সাধারণ একটা চুক্তির সঙ্গে ক্ষেত্রের পার্থক্য ব্যতীত রাষ্ট্রের সঙ্গে আর কোন পার্থক্যেরই অস্তিত্ব থাকবে না। এমন অবস্থায় বিধান আর যথার্থরূপে বিধান থাকে না, সে কেবল চুক্তিতে পর্যবসিত হয়। সফিষ্ট লাইকোফ্রন—এর ভাষায় বলা যায় যে, বিধান তখন 'অধিকারের পারস্পরিক নিশ্চয়তা' ব্যতীত আর কিছুই থাকে না। এমন বিধান নাগরিককে উত্তম এবং ন্যায়বানে পরিণত করতে পারে না। কিন্তু বিধানের তাই করা উচিত।

আরো কিছু দৃষ্টান্ত দিলে এটি পরিষ্কার হবে যে, রাষ্ট্রের এটিই হচ্ছে অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। মনে করা যাক করিন্‌থ্‌ এবং মেগারার ভূখণ্ডকে একত্র করে একটি দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ করলাম। তাতে কি তারা একটি রাষ্ট্রে পরিণত হবে? তার ফলে তারা একটি রাষ্ট্রে পরিণত হবে না। এমনকি মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ককে আমরা ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক বলি সেই বিবাহের ক্ষেত্রেও যদি এই দু'এর সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহলেও এরা একটি রাষ্ট্রে পরিণত হবে না। কিংবা মনে করা যাক সূত্রধর, ভূমি কর্ষণকারী, চর্মকার প্রভৃতি বিভিন্ন দক্ষতার দশ

হাজার মানুষ প্রায় নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করছে এবং তাদের পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে সততা অসততার নিয়ম নীতি সকলে মেনে চলছে। এমন হলেও যতক্ষণ অবধি এই মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যবসায়গত বিনিময় এবং আত্মরক্ষাকে অতিক্রম করে না যাবে ততক্ষণ এরূপ মানুষের সংস্থাও রাষ্ট্র বলে বিবেচিত হতে পারে না। প্রশ্ন হতে পারে, এর কারণ কি? কারণ এই নয় যে, এরূপ সংস্থার মধ্যকার বন্ধন হচ্ছে শিথিল-বন্ধন। কারণ, এরা সকলে যদি আরো ঘনিষ্ঠভাবে বসবাস করত এবং আমাদের উল্লিখিত সম্পর্কগুলির মধ্যে আবদ্ধ থাকত, নিজেদের গৃহের উপর তাদের সার্বভৌম শাসন থাকত এবং আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে তাদের পারস্পরিক সহযোগিতার মৈত্রী থাকত তাহলেও এমন সংস্থাকে আমরা যথার্থভাবে রাষ্ট্র বলে অভিহিত করতে পারতাম না। কারণ তারা ঘনিষ্ঠভাবেই বাস করুক কিংবা বেশ দূরত্বের ব্যবধানে তারা অবস্থিত হোক, তাদের সংস্থার চরিত্রটি একই রকমের থাকছে।

কাজেই এটা পরিষ্কার যে, রাষ্ট্রের সংজ্ঞা হিসাবে আমরা বলতে পারি নে যে, রাষ্ট্র হচ্ছে কেবল তেমন একটি মানবগোষ্ঠী যারা একই স্থানে বাস করছে, যাদের মধ্যে পরস্পরের ক্ষতিকর কাজের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ব্যবস্থা আছে এবং যাদের মধ্যে দ্রব্যাদি এবং সেবার বিনিময় প্রথাও প্রচলিত আছে। এটা অবশ্য ঠিক যে, রাষ্ট্র হতে হলে এই বিষয়গুলিকে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যগুলির প্রত্যেকটির উপস্থিতি মাত্রই কাউকে রাষ্ট্রে পরিণত করে না। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে রাষ্ট্রের অন্তর্গত সকলের—তথা সকল পরিবারের জন্য উত্তম জীবনযাপন সম্ভব করা। উত্তম জীবনের অর্থ হচ্ছে একটি পরিপূর্ণ এবং সন্তোষজনক জীবন। একথা সত্য যে, পরিবারসমূহ যদি একই ভূখণ্ডে বসবাস না করে এবং তাদের মধ্যে যদি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হতে না পারে, তবে এমন জীবনযাপন সম্ভব হবে না। এ কারণেই আমরা বিভিন্ন নগরে মানুষের মধ্যে বিবাহ, ভ্রাতৃত্ব, দেবতাদের উদ্দেশে বিসর্জনের উপলক্ষে পারিবারিক পুনর্মিলন—এবং অন্যান্য সামাজিক লেনদেনের মাধ্যমে জনসংস্থা প্রতিষ্ঠা করার প্রবণতা দেখতে পাই। মানুষের এ সমস্ত কার্যক্রম তার অনুরাগের প্রকাশ। কারণ, অপরের জন্য আমাদের অনুরাগের আকর্ষণই আমাদের কাছে সামাজিক জীবনকে কাম্য বলে অনুভূত করায়। আর এই সকল উপাদানই রাষ্ট্রের যে মৌল উদ্দেশ্য উত্তম জীবন, তা সৃষ্টিতে অবদান রাখে। কাজেই আমাদের অভিমত হচ্ছে, যে রাজনৈতিক সংস্থাকে আমরা রাষ্ট্র বলি তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কেবল মানুষের এক সঙ্গে বেঁচে থাকা নয়, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তম কার্য সাধন করা। কাজেই যারা এই উত্তম কার্যে অবদান রাখে তারাই রাষ্ট্রের রাজনৈতিক চরিত্র অর্জনে সাহায্য করে। এবং এক্ষেত্রে যাদের অবদান সর্বাধিক, রাষ্ট্রের মধ্যে তাদের অধিকার অপরের চেয়ে অধিক। অপর সকলে জন্মগতভাবে উত্তমদের সমান হতে পারে কিংবা পারিবারিকভাবে উচ্চতরও হতে পারে। কিন্তু উত্তম কার্য সাধনের ক্ষেত্রে তথা রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে তারা হীনতর। এবং এ কারণে বিত্তের ক্ষেত্রে উচ্চতর এবং উত্তমতার ক্ষেত্রে হীনতর যারা তাদের চেয়ে রাষ্ট্রের অংশীদারীতে উত্তমজনদের স্থানই উচ্চে অবস্থিত হবে।

এই আলোচনাতে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হল যে, বিভিন্ন প্রকার শাসনব্যবস্থা প্রসঙ্গে যারা 'ন্যায়'-এর কথা বলে তারা কথাটিকে সীমাবদ্ধ এবং আপেক্ষিক অর্থেই বলে।

দশম অধ্যায়

রাষ্ট্রের মধ্যে সার্বভৌম কে?

আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে : রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অবস্থান কোথায় হওয়া সঙ্গত? সার্বভৌমত্ব কি জনসাধারণের? না বিত্তবানদের? অথবা উত্তমের? সার্বভৌমত্ব কি এক ব্যক্তির, যে সর্বোত্তম ব্যক্তি, তার? কিংবা যে স্বৈরাচারী তার? এর যে কোন একটা জবাবেই আপত্তি উঠতে পারে। মনে করা যাক আমরা বললাম, সার্বভৌমত্ব হবে জনসাধারণের। তেমন হলে এই সার্বভৌম জনসাধারণ যখন তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার শক্তি ব্যবহার করে বিত্তবানদের বিত্ত বণ্টনে অগ্রসর হবে তখন তাদের সে বণ্টন কি অন্যায্য হবে না? জবাব হবে, কেন, সার্বভৌমের আইনগত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই তো কাজটি করা হচ্ছে? এমন জবাব সত্ত্বেও কার্যটিকে অন্যায়ের চরম ব্যতীত আর কিছু বলা যাবে না। তাছাড়া, যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তারা তাদের সেই শক্তিতে সমস্ত কিছু দখল করার মাধ্যমে যদি সংখ্যা লঘিষ্ঠের সম্পাদকেও দখল করে তাহলে তার ফলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু যে অধিকার অধিকারীর অস্তিত্বকে বিনষ্ট করে তাকে যেমন উত্তম বলা চলে না, তেমনি যা ন্যায্য তাও রাষ্ট্রকে ধ্বংস করতে পারে না। কাজেই এটা পরিষ্কার যে, এই কার্যক্রম আইনসঙ্গত হলেও আমরা একে ন্যায্য বলতে পারিনে। কেননা এমন কাজ ন্যায্য হলে স্বৈরাচারীর কাজকেও ন্যায্য বলতে হয়। কারণ তার শক্তির সার্বভৌমত্ব তাকে শক্তি প্রয়োগে সক্ষম করে। জনসাধারণ যেমন তাদের আপন ইচ্ছাকে বিত্তবানদের উপর জোর করে প্রয়োগ করছে, স্বৈরশাসকের আচরণটিও তেমনি। তৃতীয়ত, যারা সংখ্যালঘিষ্ঠ, কতিপয় এবং বিত্তবান তাদের শাসন যদি সঙ্গত হয়, অন্যকথায় তারা যদি সার্বভৌম হয় এবং তারা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্পদ লুণ্ঠন করে তাদের হৃতসর্বস্ব করে তবে তাদের সে আচরণকে কি ন্যায্য বলা যাবে? তাদের আচরণ ন্যায্য হলে, পূর্বে যাদের কথা বলা হয়েছে, তাদের আচরণও ন্যায্য। কিন্তু আমাদের জবাব হচ্ছে, এই তিনটির সকলের আচরণই অধম এবং অন্যায়। চতুর্থ বিকল্প হচ্ছে, উত্তমের শাসন। এ শাসনে উত্তমই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী হবে। কিন্তু এমন কথার বিরুদ্ধেও আপত্তি উঠবে। উত্তম সার্বভৌম—এ কথার অর্থ, সংবিধানগতভাবে অপর কারুর আর শাসনে অধিকার থাকবে না। পঞ্চম বিকল্পটি হচ্ছে : যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তিই মাত্র সার্বভৌম। তারই শাসনের অধিকার। এমন কথারও বিপদ আছে। শাসকের সংখ্যা আমরা যত হ্রাস করছি শাসনের বাইরে অবস্থিতের সংখ্যা তত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাছাড়া আপত্তির কথা এটাও বটে যে, আবেগ এবং প্রবৃত্তির বশীভূত যে মানুষ তাদের কারুর পক্ষেই সার্বভৌম হওয়া সঙ্গত নয়। সার্বভৌমিকতার অধিকারী হবে কেবলমাত্র আইন। আইনই হবে সার্বভৌম। কিন্তু তাতেও যে-সমস্ত প্রশ্ন আমরা উত্থাপন করেছি তার ফয়সালা হয়ে যাবে না। আইনেরও তো পক্ষপাত হতে পারে, কতিপয়ী কিংবা গণতন্ত্রী—এদের কারুর প্রতি। তাহলে যে পরিণতি আমরা পরিহার করতে চাচ্ছি তারই সংঘটনকে আমরা দেখতে পাব।

একাদশ অধ্যায়

অল্পের চেয়ে অধিকের হাতে সার্বভৌমত্ব থাকার যুক্তি : আইনের সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন

এই সার্বভৌমত্বের সঙ্গে আর যে যে প্রশ্ন জড়িত আছে তার আলোচনা আমরা অন্যত্র করব। কিন্তু বর্তমানে যে জবাবকে সবচেয়ে বেশি সমর্থনযোগ্য, এমন কি সবচেয়ে যথার্থ জবাব বলে আমাদের বোধ হচ্ছে সে হচ্ছে এই যে, সর্বোত্তমের সংখ্যা যেখানে কতিপয় সেখানে একক সর্বোত্তমের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকার চেয়ে শ্রেয় হচ্ছে অধিক সংখ্যকের হাতে সার্বভৌম ক্ষমতা অবস্থান করা। কারণ, এমন হতে পারে, সংখ্যাধিকের মধ্যে কোন একজন এককভাবে উত্তম না হলেও সকলের মিলিত উত্তমতা কতিপয়ের সর্বমোট উত্তমতার চেয়ে অধিক হবে। এটাকে তুলনা করা চলে একটি ভোজের সঙ্গে। ভোজের ক্ষেত্রে শুধু একজনের ব্যয়ে যে ভোজ আয়োজিত হয় তার চেয়ে সকলের মিলিত ব্যয়ের ভোজের মান অবশ্যই উৎকৃষ্ট। কারণ, যেখানে অধিক সংখ্যক মানুষের সমাবেশ সেখানে প্রত্যেকেই কিছু পরিমাণ উত্তমতা এবং বুদ্ধিগত উৎকর্ষের অধিকারী। এবং এদের সকলের উত্তমতা এবং বুদ্ধিমত্তা একত্রিত হলে বহু পা এবং হাত এবং বহু মন বিশিষ্ট একটি মানুষের মত শক্তি যে তৈরি হতে পারে তাতে সন্দেহ নাই। চরিত্র অনুধাবনের ক্ষমতার ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য। এ কারণেই সঙ্গীত এবং কাব্যের কোন সৃষ্টির সমঝদার হিসাবে জনসাধারণকেই অধিকতর উত্তম বলে আমরা গণ্য করি। জনসাধারণের কোন অংশ এই সৃষ্টির কোন একটি অংশের এবং অপর কোন অংশ সৃষ্টির অপর আর একটি ভাগের বোদ্ধা হতে পারে। কিন্তু তাদের মিলিত যে অভিমত সেটি সৃষ্টির সমগ্রের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। একের মধ্যে এই সম্মিলনের ক্ষেত্রটিতেই উত্তম ব্যক্তি জনতার বিচ্ছিন্ন একক কোন ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠ। জনসাধারণের মধ্যে যা বিচ্ছিন্ন ছিল, উত্তমের মধ্যে তা মিলিত হয়েছে। একটি সুন্দর মানুষ কিংবা একখানি সুন্দর চিত্র একজন অসুন্দর মানুষ বা বাস্তব বস্তুর চেয়ে এ কারণেই পৃথক। কোন মানুষের চোখ দুটি সুন্দর হতে পারে ; অপর কোন মানুষের অপর কোন অঙ্গ চিত্রের সুন্দর মানুষটির চেয়ে সুন্দর বোধ হতে পারে। কিন্তু যাকে বলছি আমরা চিত্রের সুন্দর মানুষ তার মধ্যে বাস্তবের বিচ্ছিন্ন সকল সুন্দরই সম্মিলিত হয়েছে। অবশ্য অল্প সংখ্যকের চেয়ে অধিকের এই উত্তমতা সকল অধিকের মধ্যেই যে, পাওয়া যাবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বস্তুত, এমন অধিকও থাককে পারে যেখানে এই উত্তমতা পাওয়া অসম্ভব বটে। মনে করা যাক, কথাটাকে আমরা পশু জগতের উপর প্রয়োগ করছি। এবং মানুষের মধ্যেও এমন অনেক মানুষ আছে যারা বন্য পশুর চেয়ে আদৌ তেমন উত্তম নয়। তাই বলে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে অধিকের যৌথ প্রজ্ঞার এই তত্ত্বকে আমরা গ্রহণ করতে পারবো না, এমন ভাবার কোন কারণ নাই।

[তার অর্থ এই নয় যে, সকল রকম সার্বভৌমিকতা সমানভাবে রাষ্ট্রের প্রত্যেক সদস্যরই করতলগত থাকবে। কিন্তু সার্বভৌম শক্তির বণ্টনে অগ্রসর হয়ে এ্যারিস্টট্ল দেখছেন বিষয়টি তেমন সহজ নয়। অচিরেই শক্তির বণ্টনে নানা জটিলতা এবং সমস্যার সাক্ষাৎ ঘটতে লাগল।]

এই আলোচনার ভিত্তিতে তাহলে আমরা সার্বভৌমত্বের অবস্থান কোথায় হওয়া উচিত এবং এই সম্পর্কিত অপর যে প্রশ্নটি আসে অর্থাৎ সংখ্যাধিক বা স্বাধীন নাগরিকের সার্বভৌমত্বের কার্যক্ষেত্র কি কিংবা কাদের উপরই বা তাকে প্রয়োগ করা হবে—সে প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারি। এখানে আমাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে সংখ্যাধিক নাগরিক, যদিও তারা স্বাধীন কিন্তু তারা ধনবান কিংবা উচ্চ অবস্থার নয় এবং সে কারণে তাদের মধ্যে উত্তমতা বা দক্ষতার কথা আমরা চিন্তা করতে পারি নে। কাজেই সরকারের উচ্চতম পদসমূহ তারা অধিকার করতে পারবে, একথা বলার অর্থ একটা বড় ঝুঁকিকে গ্রহণ করা। তাদের অধম অবস্থা তাদের অন্যায় কর্মে প্রবৃত্ত করবে এবং তাদের কোন দায়িত্ব কিংবা মর্যাদা প্রদান না করার মধ্যেও বিপদের ঝুঁকি বিদ্যমান থাকে। কারণ, কোন নগরীতে যখন এমন বহু লোক থাকে যাদের কোন সম্পদ নাই এবং কোন সরকারি মর্যাদা নাই তখন তারা অনিবার্যভাবে রাষ্ট্রের বৈরি শক্তিতে পরিণত হয়। এমন লোকদের রাষ্ট্রের উচ্চতম পদ থেকে বাইরে রাখলেও তাদের পক্ষে আইনমূলক এবং বিচারমূলক কার্যে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হবে।

রাষ্ট্রের এই বৈরি শক্তি থেকে পরিত্রাণের জন্যই সলোন এবং অপর আরো কিছু আইনদাতা বিধান দিয়েছিলেন যে, সরকারের কর্মচারীদের নির্বাচিত করার এবং তাদের দায়িত্বের মেয়াদ শেষে তাদের নিকট হিসাব চাইবার অধিকার জনসাধারণের থাকবে কিন্তু জনসাধারণ নিজেরা ব্যাক্তিগতভাবে এরূপ পদসমূহ অধিকার করতে পারবে না। এ বিধান আমাদের নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। এর ফলে সকলেরই ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার না থাকলেও সম্মিলিতভাবে কাজের মাধ্যমে সকল নাগরিকের একটা সমঝোতা লাভ করা সম্ভব। এভাবে জনসাধারণ উত্তম নাগরিকদের সঙ্গে সহযোগিতার দ্বারা নগরীর মঙ্গল সাধন করতে পারে। এটি তুলনীয় হচ্ছে সেই খাদ্যের সঙ্গে যেখানে মোটা ডালভাতের সঙ্গে কিছু উত্তম মশলাদির মিশ্রণ সমগ্র ব্যঞ্জনটিকে যেমন পুষ্টিকর তেমনি পরিমাণেও ভারী করে তোলে।

তবে শাসনব্যবস্থার ক্ষমতাসমূহের এমন বণ্টনে কতগুলি সমস্যারও সৃষ্টি হতে পারে। প্রথমে ধরা যাক জনসাধারণের নিকট সরকারি কর্মচারীদের জবাবদানের ব্যাপারটাকে। এখানে প্রশ্ন হবে, জবাবদিহীর উত্তম ব্যক্তি কে? চিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে কোন চিকিৎসার কার্য সঠিকভাবে সম্পাদিত হয়েছে কিনা সে সিদ্ধান্ত চিকিৎসাশাস্ত্র তথা রুগী নিরাময়ের কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ অর্থাৎ চিকিৎসাশাস্ত্রের লোকই দিতে পারে। অপর যে কোন দক্ষতামূলক কার্যের ক্ষেত্রে একথা সমানভাবে সত্য। চিকিৎসাবিদদের ক্ষেত্রে যেমন একজন চিকিৎসাবিদ চিকিৎসাবিদের নিকট জবাবদান করবে, সে রকম অপর কর্মের ক্ষেত্রেও সমানের কাছেই সমানের জবাবদান সঙ্গত। চিকিৎসাবিদ বলতে আমি কেবল সাধারণ চিকিৎসাব্যবসায়ে নিযুক্ত ব্যক্তিকে এবং তার ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞকে বুঝাচ্ছি না। বরঞ্চ যে কোন জীবিকার ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষানবিস পাওয়া যায়, একটা দক্ষতায় শিক্ষাপ্রাপ্ত তেমন শিক্ষানবিসকেও আমি বুঝাচ্ছি। এ ক্ষেত্রে জীবিকায় নিযুক্তদের অভিমত যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমন গুরুত্ব আমরা এই শিক্ষানবিসদের অভিমতকেও প্রদান করি। দ্বিতীয়ত,

নির্বাচনের ব্যাপারেও প্রশ্নটা থেকে যায়। সঠিক নির্বাচন কাদের দ্বারা সম্ভব? বিবেচ্য বিষয়ের জ্ঞান যাদের আছে তারাই সঠিকভাবে নির্বাচন করতে পারে। জমির জরিপকারী পারে সঠিকভাবে জমি জরিপ করতে, সমুদ্রের দিগদর্শক পারে সঠিকভাবে দিগদর্শন করতে। এরূপ অন্যত্রও। এটা অবশ্য স্বীকার্য যে, কোন কোন কার্যক্ষেত্রে এবং কোন কোন দক্ষতার ব্যাপারে এমন বিদ্যামোদীও পাওয়া যায় যারা বিশেষজ্ঞের চেয়ে অধিক না জানলেও বিষয়টির বেশ কিছু জ্ঞাত থাকে। এই সকল যুক্তি থেকে দেখা যায়, জনসাধারণের হাতে কর্মচারীদের নির্বাচন কিংবা তাদের জবাবদিহীর ক্ষমতা প্রদান করা উচিত নয়।

অবশ্য এখানেই যে যুক্তির শেষ কিংবা এরাই যে সঠিক যুক্তি এমন নাও হতে পারে। কারণ, প্রথম, কিছু পূর্বকার একটা যুক্তির এখানে উল্লেখ করা চলে। যুক্তিটি হচ্ছে, একটা নির্দিষ্ট মানের নিম্নতর যদি না হয় তাহলে জনসাধারণের মিলিত বুদ্ধির একটা মূল্য আছে। বিশেষজ্ঞের তুলনায় একজন নাগরিক ব্যক্তিগতভাবে নিম্নমানের হতে পারে। কিন্তু সকলে যখন সম্মিলিতভাবে কর্মরত হয় তখন তারা যৌথভাবে অধিকতর উত্তম হয়ে দাঁড়ায়। অন্তত অধিকতর অধম তারা হয় না। দ্বিতীয়, তাছাড়া এমন অনেক কর্ম আছে যেখানে কর্মী নিজেই যে সর্বোত্তম বিচারক বা একমাত্র বিচারক হবে, এমন কোন কথা নাই। এমন ক্ষেত্রে যাদের কাজটি করার দক্ষতা নাই, তারাও কাজটির পরিফলের উপর মতামত প্রদান করতে সক্ষম। যে দৃষ্টান্তটি এক্ষেত্রে স্পষ্টতই আমাদের সামনে উপস্থিত হয় সেটি হচ্ছে গৃহনির্মাণের দৃষ্টান্ত। যে-গৃহের ব্যবহারকারী, গৃহের মালিক কিংবা ভাড়ার ভিত্তিতে তাতে বসবাসকারী। নৌযানের হালটির ক্ষেত্রেও একথা বলা যায়। যানের কর্ণধার অর্থাৎ হালটির যে ব্যবহারকারী, যে সূত্রধর তাকে নির্মাণ করেছে তার চেয়ে উত্তমভাবে হালটির গুণাগুণকে বিচার করতে সক্ষম। এবং খাদ্যের ব্যাপারে রাধুনী নয়, যে আহার করে সেইই ভোজের ভালমন্দের উপর অভিমত দেয়। আমার মনে হয় এই যুক্তি দুটি প্রশ্নটির সমাধানের জন্য যথেষ্ট।

> [অর্থাৎ 'বিশেষজ্ঞেরই অধিকার' এ অভিমতটি যুক্তির জোরে পরিত্যক্ত হচ্ছে। যৌথভাবে জনসাধারণের বিজ্ঞতাও কম নয়। এ অভিমতটি যে প্লেটোর অভিমতের বিরোধী, এটি বলার অপেক্ষা রাখে না। যাই হোক, এ্যারিস্টট্‌ল আর একটি যুক্তির অবতারণা এবং জবাব শেষ করে জনতার যৌথ বিজ্ঞতার তত্ত্বটিকে পুনরায় ব্যক্ত করছেন।]

তবে এ ব্যাপারে আর একটি আপত্তি হচ্ছে এই যে, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উত্তম ব্যক্তিদের চেয়ে অধম ব্যক্তিদের অভিমত বড় হবে, এটি ঠিক নয়। পদস্থ কর্মচারীদের নির্বাচন এবং তাদের কার্যাবলী পর্যালোচনা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তবে এর জবাব হচ্ছে, এরূপ কার্য জনসাধারণ সম্পাদন করতে পারে এবং আমরা পূর্বে উল্লেখও করেছি যে, এরূপ দায়িত্ব বিভিন্ন শাসনব্যবস্থায় জনসাধারণের উপর অর্পণ করাও হয়। সেখানে এ সকল বিষয়ের উপর নাগরিক-পরিষদের পুরো নিয়ন্ত্রণ থাকে। এখানে এটাতে কিছু যায় আসে না যে, গণপরিষদের কিংবা নিম্নতর সংস্থা পরিষদের এবং জুরীতালিকার অনেক সদস্যের সম্পত্তির পরিমাণ সামান্য এবং এরা যে কোন বয়সেরই হতে পারে। কেবল কোষাগারের কর্মচারীদের, সমর অধিনায়কদের এবং অন্যান্য বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের পদের জন্য অধিক পরিমাণ সম্পত্তি থাকার শর্ত আরোপ করা হয়।

এই ব্যাপারগুলির মীমাংসা পূর্বের আলোচিত উপায়ে করা যায়। তবে আমাদের মূল প্রশ্নের দিকে আর একবার দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। সার্বভৌমত্ব বিষয়ে আমরা যে আলোচনা করেছি তাতে যে কথাটি সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হচ্ছে এই যে, সঠিকভাবে রচিত আইনই সার্বভৌম হওয়া উচিত। এবং এ কথাটিও স্পষ্ট যে, আইন হয়ত যে সকল বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশ দানে সক্ষম নয় সে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যক্তিগত কিংবা পরিষদগতভাবে সরকারের কর্মচারীদের উপর ন্যস্ত করা উচিত। সকল বিশেষ বিষয়ে সাধারণ নিয়ম তৈরি করা যে কখনো সহজ নয়, সে কথা সত্য। আমরা অবশ্য বলেছি, 'সঠিতভাবে রচিত আইন'; কিন্তু এরূপ আইনকে আবিষ্কার করা আমাদের পক্ষে এখনো সম্ভব হয় নি। কাজেই প্রশ্নটির যে শেষ মীমাংসা হয়ে গেছে, এমন কথা বলা যায় না। তবে এ কথা আমরা বলতে পারি, শাসনব্যবস্থাসমূহ যেমন বিভিন্ন হতে পারে, তেমনি আইনও ভাল অথবা খারাপ, ন্যায্য অথবা অন্যায্য হতে পারে। তবে এ কথাও সত্য যে, শাসনব্যবস্থার ধরনটি প্রথম বিবেচ্য। কারণ, শাসনব্যবস্থা যেরূপ হবে আইনও সেরূপ হবে। এবং এ কথা সত্য হলে, 'সঠিক' প্রকারের কোন শাসনব্যবস্থা অনুসারে আইন রচিত হলে আইন ন্যায্য আইন হবে। কিন্তু কোন 'বিকৃত' প্রকারের শাসন ব্যবস্থা অনুসারে রচিত হলে সে আইন অন্যায্য হবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

সমতা এবং অসমতার প্রকারভেদ সম্পর্কে আলোচনা

[এ্যারিস্টট্‌লের বর্তমান আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, ন্যায়ের অর্থ হচ্ছে রাজনীতিক ক্ষমতা, সুযোগসমূহ এবং মর্যাদার সুষম বণ্টন। এর আলোচনার সূত্রপাত ঘটে এই ধারণা থেকে যে, ক যদি খ-এর চেয়ে উত্তম তথা উচ্চতর হয় তাহলে উল্লিখিত সুযোগ সুবিধাসমূহের অধিক পরিমাণ অংশ দাবী করার অধিকার তার আছে। কাজেই প্রশ্ন হচ্ছে কোন্ প্রকারের উত্তমতার ভিত্তিতে একজন নাগরিক পদ এবং সুযোগসমূহের অধিকতর দাবী করতে পারে? দেখা যাচ্ছে এ্যাস্টিট্‌ল পরিবারগত আভিজাত্য এবং সম্পদের মালিকানাকেও এরূপ উত্তমতার তালিকার অন্তর্গত করছেন। এটি অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাছাড়াও তালিকার মধ্যে রয়েছে নৈতিক গুণ, ন্যায়বোধ এবং বিক্রম। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব যে গ্রহণ করবে তার মধ্যে সংস্কৃতি এবং শিক্ষার উচ্চমানও যে থাকা আবশ্যক, সে উল্লেখও আমরা দেখতে পাই। কারণ এ্যারিস্টট্‌লের অভিমত অনুযায়ী রাষ্ট্রের লক্ষ্য হচ্ছে উত্তম জীবন সাধন করা। এ সকল গুণের ক্ষেত্রে সকল নাগরিক সমান হতে পারে না এবং যে রাষ্ট্র এই সত্যটিকে বিস্মৃত হয় এবং নিরংকুশ সমতাকেই কাম্য বলে বিবেচনা করে সে রাষ্ট্র বিকৃত রূপের রাষ্ট্রের অন্তর্গত। অবশ্য ইতিপূর্বে শাসনতন্ত্রের ক্ষেত্রে এই বিবেচনাকে বিচ্যুতির নির্ধারক বলে বিবেচনা করা হয় নি। খারাপ ধরনের শাসনব্যবস্থা বলতে তখন মনে করা হয়েছিল সেই সব শাসনব্যবস্থাকে যেখানে রাষ্ট্রের এক অংশের স্বার্থ অপর সকলের স্বার্থের উপর প্রাধান্য লাভ করে। সেদিক থেকে 'সকলের মঙ্গল'-এর ধারণাটিকে এ্যারিস্টট্‌ল এখনো একটি উত্তম ব্যবস্থার চিহ্ন বলে বিবেচনা করছেন। এ্যারিস্টট্‌লের মতে, উচ্চতর শ্রেণীসমূহ শিক্ষা এবং দক্ষতায় সর্বদাই অপরের চেয়ে অধিকতর উত্তম হবে। তবে সংখ্যাধিকের উত্তমতাকেও হিসাবে রাখা আবশ্যক।]

প্রত্যেক প্রকার জ্ঞান এবং কর্মের যে লক্ষ্য থাকে তাকে উত্তম বলে বিবেচনা করা হয়। সকল প্রকার কর্মের যে সেরা কর্ম অর্থাৎ রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের কর্ম, তার ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে সত্য। রাষ্ট্রে যে-উত্তমকে লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয় তা হচ্ছে ন্যায়। এ ন্যায় হচ্ছে তাই যা সমগ্র সমাজের মঙ্গল সাধান করে। এবং সমাজের ন্যায় যে সকলের সাম্য সে কথাও এখন পরিষ্কার। আমি আমার 'নীতিকথায়' যে ন্যায়কে ব্যাখ্যা করেছি তার সঙ্গে এই ন্যায় অসঙ্গতিপূর্ণ নয়। কারণ উভয় ক্ষেত্রে অন্তর্নিহিত নীতি হচ্ছে এক, অর্থাৎ ন্যায় মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং সমানের জন্য সমান সমতা থাকতে হবে। আমরা বর্তমানে যা নির্ধারণ করতে চাচ্ছি তা হচ্ছে সমতা এবং অসমতার প্রকারভেদ; রাজনীতিক তত্ত্বের ক্ষেত্রে কোন্ প্রকার বিষয়ের সঙ্গে সমতার এই ধারণা সম্পর্কিত?

একটা যুক্তি এরূপ দেওয়া যায় যে, প্রত্যেক বিষয়তেই এটা প্রাসঙ্গিক এবং এও বলা যায়

যে, কোন একটি বিষয়ের শ্রেষ্ঠতাই রাষ্ট্রের পদসমূহের অসম বণ্টনের যুক্তি হিসাবে কাজ করতে পারে। এমন ক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের ধরে নিতে হবে যে, অপর সকল বিষয়ে সকল মানুষ সমান এবং এক প্রকারেরই। কারণ, মানুষের মধ্যে পার্থক্যটা যদি সাধারণ হয় তাহলে তাদের মধ্যকার ন্যায় এবং তাদের প্রাপ্যও ভিন্ন হবে। কিন্তু এমন যুক্তি গ্রহণ করলে আমাদের এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে, দেহের উচ্চতা কিংবা বর্ণ কিংবা অপর কোন উত্তম কিছুতে যদি একজন উচ্চতর হয় তাহলে রাজনৈতিক অধিকারের বণ্টনে তার একটি সুবিধা প্রাপ্য হবে। এখানে একটি ভুল কি স্পষ্ট হয়ে উঠে না? অন্য প্রকারের গুণ এবং দক্ষতার সঙ্গে তুলনাতে বুঝা যায় যে, ভুলটা স্পষ্ট। কারণ সমান বংশীবাদকদের মধ্যে কেউ যদি উচ্চতর বংশজাত হয় তাহলে তাকে অধিকতর উত্তম বাঁশীটি আমরা প্রদান করিনে। কেননা উচ্চতর বংশজাত বলে অধিকতর উত্তমরূপে সে বাঁশী বাজাতে সক্ষম হবে না। অধিকতর উত্তম বাঁশী ব্যবহারের অধিকার তারই হবে যে যন্ত্রটির অধিকতর উত্তম বাদক।

বিষয়টি যদি এখনো পরিষ্কার না হয়ে থাকে তাহলে আমাদের আলোচনা যত এগুবে তত পরিষ্কার হবে। ধরা যাক, একজন বংশীবাদক বাঁশী বাজানোর ক্ষেত্রে অনন্যভাবে শ্রেষ্ঠ কিন্তু জন্ম কিংবা দৈহিক সৌকর্ষে সে নিকৃষ্ট (এখানে মনে করা হচ্ছে, জন্মের আভিজাত্য এবং দেহের সৌষ্ঠব বাঁশী বাজানোর ক্ষমতার চেয়ে অধিকতর উত্তম এং আমাদের বংশীবাদকের ক্ষমতার তুলনাতে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব অধিকতর)—এমন ক্ষেত্রেও আমি বলব সর্বোত্তম বাঁশীটির মালিক তারই হওয়া উচিত। কারণ শ্রেষ্ঠত্ব কথাটি দক্ষতার সঙ্গে সম্পর্কিত,—দক্ষতার উন্নতি সাধন করলেই একটা গুণের শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু সেদিক থেকে সম্পদ বা সদ্বংশকে আমরা উত্তম বলে অভিহিত করতে পারিনে। কারণ, এরা দক্ষতাকে আদৌ বৃদ্ধি করে না। তাছাড়া তেমন হলে প্রত্যেকটি উত্তম বস্তুকেই অপর উত্তম বস্তুর সঙ্গে তুলনা করে পরিমাপ করতে পারতাম। কারণ, ধরা যাক রাষ্ট্রীয় ন্যায়ের ক্ষেত্রে মানুষের দৈর্ঘ্য একটা উত্তম গুণ। তাহলে দৈর্ঘ্যকেও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পদ এবং সদ্বংশের সঙ্গে সর্বদা প্রতিযোগিতায় নামতে হবে। অর্থাৎ আমরা যদি বলি 'খ' ন্যায়ের ক্ষেত্রে যত শ্রেষ্ঠ 'ক' দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর, তাহলে ন্যায়ের সাধারণ শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও ব্যাপারটা এরূপ দাঁড়ায় যেন সবকিছুই সবকিছুর সঙ্গে তুলনীয়। কারণ একটা বিশেষ কোন পরিমাণ যদি অপর পরিমাণ 'চ' এর চেয়ে অধিক হয় তাহলে আর একটা বিশেষ পরিমাণও কল্পিত 'চ' এর সমান। কিন্তু এমন পরিমাপণ রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। এবং সে কারণে আমাদের কাছে এটি স্পষ্ট থাকা আবশ্যক যে, রাষ্ট্রের পদবন্টনের ক্ষেত্রে সব রকমের অসমতা বিবেচনা না করাটাই ঠিক। যে অসমতা প্রাসঙ্গিক তাই মাত্র বিবেচ্য হওয়া সঙ্গত অর্থাৎ দৌড়ের দক্ষতা ক্রীড়ার প্রতিযোগিতায় যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দায়িত্ব গ্রহণের বেলা দৌড়ের দক্ষতা নয়, বরঞ্চ সেই দক্ষতা শ্রেয় যা সামগ্রিকভাবে রাষ্ট্রের উন্নতি বিধানে সাহায্য করে। সেদিক থেকে সমাজে যে সব গুণের গুরুত্ব আছে এবং সে কারণে যারা বিবেচ্য তাদের মধ্যে রয়েছে মহৎ জন্ম, স্বাধীন জন্ম এবং সম্পদ। কারণ রাষ্ট্রের যে সদস্য, তাকে যেমন স্বাধীন হতে হবে, তেমনি তাকে রাষ্ট্রের করপ্রদানকারীও হতে হবে। কারণ, আমরা যেমন দাস দ্বারা কোন রাষ্ট্র গঠন করতে পারিনে, তেমনি নিঃস্বদের দ্বারাও কোন রাষ্ট্র গঠন করতে পারি নে। এর অধিক আরো কিছু আবশ্যক। আরো কিছু বলতে আমি ন্যায়ের গুণ এবং সামরিক দক্ষতাকে বুঝাচ্ছি। এ সকল ব্যতীত একটি নগরীর জীবন এবং কর্ম সম্ভব নয়। এবং স্বাধীন নাগরিক এবং সম্পদবান বাদেও একটি নগর আদৌ গঠিত হতে পারে না। এবং ন্যায় ও সাহস বাদে নগরীর সুব্যবস্থাপনাও সম্ভব নয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চরম সমতা কিংবা অসমতা কাম্য নয়

যে কথাগুলি আমরা বললাম তার কিছু কিংবা সবগুলিই রাষ্ট্রের কাঠামো আলোচনার ক্ষেত্রে মানুষের দৃষ্টি সার্বিকভাবেই আকর্ষণ করেছে। তবে আমি পুনরায় বলতে চাই যে, রাষ্ট্রে উত্তম জীবন সাধনের জন্য বিবেচনার প্রশ্নে শিক্ষা, ন্যায়বোধ এবং দক্ষতার দাবী সবচেয়ে বেশি। কিন্তু যেহেতু যারা একটি বিষয়ে সমান তাদের সকল বিষয়ে সমান হওয়াটা অপরিহার্য নয় কিংবা যারা একটি বিষয়ে অসমান তাদের সকল বিষয়ে অসমান হওয়া অপরিহার্য নয়, সে কারণে আমরা বলব, যে-সকল শাসনব্যবস্থায় এরূপ চরম সমতা বিরাজ করে সে সকল শাসনব্যবস্থা বিকৃত কিংবা বিচ্যুত শাসনব্যবস্থা। এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সকল মানুষের দাবীতেই ন্যায়ের ভাগ কিছু আছে, কিন্তু তাদের সকল দাবীই ন্যায্য, এমন কথা সত্য নয়।

ধনবানদের দাবী হচ্ছে, জমিতে তাদের অধিকার, এবং জমি হচ্ছে সাধারণ সম্পত্তি। তদুপরি তাদের দাবী হচ্ছে, তারা হচ্ছে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। এক্ষেত্রে স্বাধীনজাত এবং সুজাত,—এদের উভয়ের দাবীর মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। কারণ এদের উভয়ের দাবীর ভিত্তি হচ্ছে জন্ম। এদের কথা হচ্ছে যাদের জন্ম অভিজাত তারা অনভিজাতদের চেয়ে পূর্ণরূপে নাগরিক। কারণ, সকল সমাজেই অভিজাত জন্মকে সম্মানের চোখে দেখা হয়। অভিজাতদের সন্তানদের অধিকতর উত্তম মানুষ হওয়ারই সম্ভাবনা। কারণ উত্তমভাবে জাত মানে হচ্ছে উত্তম ভিত্তি থেকে জাত। এর পরের কথা হচ্ছে, গুণ বা উত্তমতার দাবীর কথা। এ কথারও সার্থকতা আছে। একটা সমাজে ন্যায়বোধকে আমরা একটি উত্তম গুণ বলে সর্বদা অভিহিত করি। এ গুণটি নিশ্চিতই অপর সকল গুণকে আনয়ন করে। এর সঙ্গে অবশ্য আমাদের সংখ্যার জোরকে যুক্ত করা উচিত। এর দাবী হচ্ছে, সংখ্যালঘুর চেয়ে সংখ্যাগুরুর দাবী হচ্ছে অধিকতর জোরদার, অধিকত সমৃদ্ধ এবং অধিকতর উত্তম। সংখ্যার কথা বিবেচনায় আনলে এ দাবীরও ন্যায্যতা আছে।

এখন মনে করা যাক যে, উত্তম, সম্পদবান এবং উত্তম-জাত, এই তিন শ্রেণীর মানুষই একটি নগরীতে বিদ্যমান আছে; তাছাড়া অবশিষ্ট নাগরিকরাও রয়েছে। তাহলে কোন্ শ্রেণী ক্ষমতায় যাবে এবং শাসন করবে—এ নিয়ে কি বিসংবাদের উদ্ভব হবে না? অবশ্য যে তিন প্রকার শাসনব্যবস্থার কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি তাদের মধ্যে কোন প্রশ্নের উদ্ভব হবে না। তাদের পারস্পরিক পার্থক্য এই যে, কতিপয় বা ধনিকতন্ত্রে ক্ষমতা ধারণ করে ধনবানগণ, অভিজাততন্ত্রে ক্ষমতা ধারণ করে উত্তমগণ, ইত্যাদি। কিন্তু আমদের প্রশ্ন হচ্ছে, একই সময়ে যখন পরস্পরবিরোধী দাবী উত্থাপিত হবে তখন সিদ্ধান্ত নেবার উপায় কি? দৃষ্টান্ত হিসাবে ধরা যাক যে, যাদের উত্তম গুণ এবং যোগ্যতা আছে তারা সংখ্যায়

নগণ্য। এমন হলে ক্ষমতার বন্টন কেমন করে ঘটবে? আমরা কি নির্দিষ্ট দায়িত্বের ভিত্তিতে অর্থাৎ এই দায়িত্ব পালনের উপযুক্ত কতজন নাগরিককে পাওয়া যায় তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব? অথবা আমরা বলব যে, এদের সংখ্যাটি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ না হলে এদের দ্বারা নগর গঠন করা সম্ভব হবে না। এ প্রশ্ন একটি চিরন্তন প্রশ্ন এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার সকল দাবীর ক্ষেত্রে প্রশ্নটির উদ্ভব হয়। এ দিক থেকে যারা সম্পদ কিংবা জন্মের ভিত্তিতে ক্ষমতার দাবী করে তাদের দাবীতে কোন ন্যায্যতা থাকবে না। কারণ, এমন নীতিতে কোন একজন যদি সকলের চেয়ে অধিক সম্পদবান হয় তাহলে সকলের উপর তার একক শাসন হওয়ার কথা উঠবে। অনুরূপভাবে উত্তম জন্মের ক্ষেত্রে যে নাগরিক সর্বোত্তম স্বাধীন নাগরিক, সকলের উপর তারই শাসন করার কথা উঠবে। উত্তমতার ভিত্তিতে যে অভিজাততন্ত্র সেখানেও প্রশ্নটি আসবে। কারণ সকল উত্তমের মধ্যে যে সর্বোত্তম এই নীতিতে সকলের উপর তার শাসনের দাবী হবে সর্বাধিক। আবার সংখ্যাধিক যারা তারা বলতে পারে সংখ্যাল্পের চেয়ে তাদের শক্তি অধিক। সুতরাং শাসনের দাবী তাদের। আবার এমনও হতে পারে কোন একজনের কিংবা কতিপয়ের কিন্তু সংখ্যাধিকের চেয়ে কম সংখ্যকের শক্তি অধিক হল, তখন তারা বলবে সংখ্যাধিকরা নয়, তারাই হবে সার্বভৌম।

এই সকল আলোচনায় এটা বুঝা যাচ্ছে, এর কোন দাবীই সঠিক নয়। এ সবের ফল দাঁড়ায় এই যে, একদল মানুষ দাবী করছে তারাই শাসক হবে এবং অপর সকলে শাসিত হবে। কারণ, এদের দাবীর ভিত্তি সম্পদ কিংবা গুণ যাই হোক না কেন, এদের বিরুদ্ধে সংখ্যায় যারা অধিক তাদের দাবীর পক্ষেও ন্যায্যতা অবশ্যই কিছু থাকবে। কোন কোন ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক যে অল্প সংখ্যকের চেয়ে অধিক উত্তম হতে পারে না, এমন নয়। এমন কি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে না ধরে সামগ্রিকভাবে ধরলে তারা সংখ্যাল্পের চেয়ে অধিক সম্পদবানও হতে পারে। এরকম অবস্থার যেখানে উদ্ভব হয় সেখানে একজন বিধানদাতা, যিনি যথার্থভাবেই সবচেয়ে সঠিক বিধান প্রণয়নে আগ্রহী তিনি কি সংখ্যাধিকের স্বার্থে তাঁর আইন প্রণয়ন করবেন কিংবা অধিকতর উত্তমের স্বার্থে তাঁর আইন রচনা করবেন, প্রায়শ লোকে এরূপ যে প্রশ্ন উত্থাপন করে তার জবাবদানে কোন অসুবিধা ঘটবে না।

'সবচেয়ে ঠিক' কথা দ্বারা আমরা বুঝাতে চাচ্ছি 'সুসম এবং সমভাবে ঠিক'। এবং এর আসল অর্থ হচ্ছে সমগ্র রাষ্ট্র এবং সকল নাগরিকের মঙ্গল। মূলত একজন নাগরিক হচ্ছে সে যার শাসন করা এবং শাসিত হওয়া, উভয়তে অংশগ্রহণ রয়েছে। প্রত্যেক শাসনব্যবস্থায় এটা একই প্রকার হয়, এমন নয়। কিন্তু সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থায় নাগরিক বলতে তাকে বুঝায় যার যোগ্যতা আছে এবং যে উত্তম জীবনের লক্ষ্যে শাসন করা এবং শাসিত হওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

কিন্তু যদি এমন একজন থাকে কিংবা কিছুসংখ্যক (কিছুসংখ্যক মানে নগরীর সকল সংখ্যক নয়।) যারা অসাধারণভাবে গুণী—অর্থাৎ নগরীর অপর সকলের গুণ এই একের কিংবা কতিপয়ের গুণের সঙ্গে আদৌ তুল্য নয় তাহলে এমন লোককে আমরা রাষ্ট্রের অংশ বলে মনে করতে পারি নে। সে কিংবা তারা রাষ্ট্রকে অতিক্রম করে যায়। অপর সকলের সঙ্গে গুণের ব্যাপারে সমান মাত্রায় তাদের বিচার করার অর্থ তাদের প্রতি অবিচার করা। কারণ, গুণ এবং রাজনৈতিক যোগ্যতায় তারা অপর সকলের চেয়ে বহুদূর পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। এরূপ লোককে আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবেই মনুষ্যকুলে দেবতা বলে বিবেচনা করতে পারি। এরূপ হলে এদের ক্ষেত্রে স্পষ্টতই আইনের প্রশ্ন আসবে না। কারণ আইন বলতে জন্ম এবং যোগ্যতা উভয়তে সমতা বুঝায়। এবং এমন কোন আইন নাই যে আইন এরূপ

অসাধারণ লোককে শাসন করতে পারে। তারা নিজেরাই তাদের কাছে আইন এবং অপর কেউ তাদের জন্য আইন প্রণয়ন করলে তারা তাদের পীড়নের দায়ে দায়ী বলে অভিহিত হবে। এমন ক্ষেত্রে এরূপ অসাধারণ ব্যক্তিগণ এ্যানটিসথেনিস-এর উপাখ্যানে সিংহের সঙ্গে সমতার দাবীকারী খরগোশের প্রতি সিংহ যেমন বলেছিল সিংহের সেই ভাষায় তারাও বলতে পারে ঃ 'তাহলে তোমাদের নখ এবং দাঁত প্রদর্শন কর।' এরূপ লোককে শাসনকরা অসম্ভব বলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে এদের বহিষ্কারের প্রথা প্রচলিত হয়। এই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি সমতার নীতির উপর এত অধিক গুরুত্ব আরোপ করত যে তারা কাউকে সম্পদ, জনপ্রিয়তা কিংবা রাজনৈতিক প্রভাব অর্জনের জন্য কোন উপায়ের কারণে অত্যধিক ক্ষমতাশালী দেখলে তাদেরকে সমাজচ্যুত করে নগরী থেকে নির্দিষ্টকালের জন্য বহিষ্কার করে দিত। (পুরানেও এরূপ কাহিনী পাওয়া যায়। স্বর্ণ-মেষ সন্ধানী আরগো অভিযাত্রীগণ হিরাক্লিসকে পশ্চাতে ফেলে গেল, কারণ জাহাজের অপর সকল নাবিকের চেয়ে সে ছিল বহুগণ বেশি শ্রেষ্ঠ।) একজন স্বৈরশাসক যখন তার বিপজ্জনক প্রতিদ্বন্দ্বীকে অপসারিত করে তখন সে স্রেফ এই নীতির ভিত্তিতেই তার কার্য সম্পাদন করে এবং 'মাথাগুলো ছেঁটে ফেল' বলে থ্রাসিবুলাসকে দেওয়া পেরিয়ানডার-এর উপদেশকে যারা নিন্দা করে তারা খুব যে সঠিক, এমন নয়।[১] এ উপায়টি কোন স্বৈরশাসকদের জন্যই যে উপকারী, এমন নয়। কতিপয় তথা ধনিকতন্ত্র এবং গণতন্ত্র—এরাও একই রীতি অনুসরণ করে। কারণ, মাথা কেটে ফেলার যা ফল, প্রধান ব্যক্তিদের সমাজচ্যুতকরণ এবং নির্বাসনে প্রেরণের ফলও তাই। তাছাড়া সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের দুর্বল করার রীতি কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও সীমাবদ্ধ নয়। বৃহৎ এবং শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীনগর তথা রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নিয়মিতভাবেই এই রীতি প্রয়োগ করে। (যেমন ১. এথেন্স যখন শক্তিশালী হয়ে উঠল তখন সে রাষ্ট্রসংঘের শর্তকে ভঙ্গ করে লেসবস, কিওস এবং সামোসকে নিজের অধীনস্থ করে ফেলল; ২. পারস্যের সম্রাটও মেডিস, ব্যাবিলনীয় যারা তাদের পূর্বকার প্রাধান্য নিয়ে গর্ব করত, তাদের দমন করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন।) মোটকথা প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির প্রশ্ন সকল সরকারের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এ শুধু বিচ্যুত ব্যবস্থা অর্থাৎ যে সব সরকার নিজেদের স্বার্থে এই পদ্ধতি গ্রহণ করে তাদের প্রশ্ন নয়, সঠিক শাসনব্যবস্থাসমূহের জন্যও এ প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ।

[এ আলোচনা থেকে দেখা যায়, এ্যারিস্টট্‌ল অসাধারণ ব্যক্তিকে যত না সম্পদ তার অধিক তাকে একটি দায় হিসাবে দেখছেন। কারণ, যে কোন ক্ষেত্রে নিয়মের ব্যতিক্রমে তিনি উদ্বিগ্ন। এর ফলে এ্যারিস্টট্‌ল একাধিক হাস্য উদ্রেককারী উপমা প্রদানেও দ্বিধা করেন না।]

কেবল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে নয়, নিয়মের ব্যতিক্রমকে গ্রহণ না করার দৃষ্টান্ত আমরা অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। চিত্রকর যখন জীবন্ত প্রাণীর একটি চিত্র তৈরি করেন তখন তার কোন একটি পাকে অনুপাতের অধিক দীর্ঘ করে তার চিত্রের সঙ্গতি নষ্ট করেন না।

১. থ্রাসিবুলাস পেরিয়ানডার-এর নিকট উপদেশের জন্য যে দূত পাঠিয়েছিল পেরিয়ানডার তাকে মৌখিক কোন জবাব দিলেন না। পেরিয়ানডার তখন তাঁর শস্যক্ষেত্রে পদচারণা করছিলেন। দূতের সম্মুখে তিনি ক্ষেতের মাথা উঁচু দণ্ডগুলির মাথা ছেঁটে অপরগুলোর সমান করে দিতে লাগলেন। দূত তাঁর একাজের কোন তাৎপর্য বুঝতে পারল না। কিন্তু বিষয়টিকে সে থ্রাসিবুলাসের নিকট বর্ণনা করল। থ্রাসিবুলাস বুঝলেন, তার উচিত তার প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠ সকলকে শেষ করা।

পায়ের বিরাটত্ব মোহণীয় হলেও এ কার্য তিনি করেন না। যে জাহাজ তৈরি করে সেও তার জাহাজের কোন একটি অংশ প্রয়োজনীয় অনুপাতের অধিক বড় করে তৈরি করেন না। সঙ্গীতের শিক্ষক তার গায়কের দলে এমন কোন গায়ককে গ্রহণ করেন না যার একার স্বর অপর সকলের চেয়ে সূক্ষ্মতর এবং দরাজতর। এ কারণে যে শাসকগণ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের জোরের ভিত্তিতে অপসারিত করেন, তাদের সঙ্গে প্রজাদের সু-সম্পর্ক থাকবে না, এমন কোন কথা নাই। অবশ্য শাসকদের এমন কাজের শর্ত এই যে তাদের শাসন প্রজাদের জন্য মঙ্গলকর হতে হবে। কাজেই নির্বাসনের তত্ত্বটিকে একেবারে অন্যায় বলা চলে না। বিষম-অনুপাত, অত্যধিক সম্পদ বা জনপ্রিয়তার ক্ষেত্রে এর কিছু পরিমাণ রাজনৈতিক ন্যায্যতা আছে। অবশ্য বিধানদাতা গোড়া থেকে সমাজকে যদি এমনভাবে গড়তে পারেন যে এরূপ চরম ঔষধের আবশ্যক হবে না তাহলে সেটি অধিকতর উত্তম হবে। অন্যথায় প্রয়োজন হলে অবস্থার সংশোধনের জন্য এরূপ উপায় গ্রহণ করাই শ্রেয়।[১]

বিচ্যুত শাসনব্যবস্থায় অপর সব কিছুর ন্যায় নির্বাসন রীতিটিও ব্যবহৃত হয় শাসকদের ব্যক্তিগত স্বার্থে এবং তার ফলে এর সার্থকতাও হয় সীমাবদ্ধ। এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু প্রশ্নটি যখন সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে তোলা হয় তখন যথার্থই অসুবিধার সৃষ্টি হয়। আমরা ধরে নিলাম অত্যধিক জনপ্রিয়তা বা অত্যধিক সম্পদ কিংবা প্রভাবের ক্ষেত্রে নির্বাসন-পদ্ধতির প্রয়োগ যুক্তিসঙ্গত। কিন্তু যেখানে কোন নাগরিক যথার্থই অসাধারণ চরিত্র এবং যোগ্যতাসম্পন্ন সেখানে করণীয় কি হবে? এমন লোককে নির্বাসিত বা বহিষ্কৃত করা হোক, এরূপ কেউ বলবে না। আবার তার উপর আমরা শাসন করব, এমন কথাও চিন্তা করা যায় না। কারণ তার অর্থ হবে জিউসকে মানুষের সঙ্গে শাসনের দায়িত্ব পালন করতে বলা। এমন অবস্থায় প্রকৃতির হাতে নিজেদের সমর্পণ করা ব্যতীত আমাদের অপর কোন পথ থাকে না। তার মানে, এই লোক আমাদের শাসন করবে এবং আমরা আনন্দের সঙ্গে তাকে মান্য করব। এভাবেই এরূপ ব্যক্তি তাদের নগরীর রাজা, তথা স্থায়ী রাজায় পরিণত হয়।

---

১. অবশ্যই ব্যাপারটি অভিপ্রেতভাবে সবসময়ে ঘটেনি। অবস্থার সংশোধন হয় নি। কারণ নির্বাসনের ব্যবস্থা যারা গ্রহণ করেছে তারা রাষ্ট্রীয় স্বার্থরক্ষার চেয়ে নির্বাসনকে দলগত বিরোধে একটি অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করেছে।—এ্যারিস্টটল

চতুর্দশ অধ্যায়

রাজকীয় শাসন ব্যবস্থার আলোচনা

[সপ্তম অধ্যায়ে শাসন ব্যবস্থার ছ'টি প্রকারকে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। এদের তিনটি ছিল বিশুদ্ধ, বাকি তিনটি আদর্শ থেকে বিচ্যুত। তার পরবর্তীতে রাষ্ট্রের ন্যায় ধর্ম এবং সার্বভৌমত্বের প্রশ্ন দুটিকে কতিপয় কিংবা অধিক সংখ্যকের শাসনের পটভূমিতে আলোচনা করা হয়েছে। সে আলোচনাতে রাজতন্ত্রের কথা উল্লেখ করা হয় নি। এটা স্বাভাবিক। কারণ রাজতন্ত্রে রাজাই যেখানে সার্বভৌম সেখানে সার্বভৌমত্ব কার এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার বন্টন কিভাবে হবে, এ প্রশ্ন আসে না। কিন্তু এ্যারিস্টট্‌লের বিশ্লেষণে সকল রাজতন্ত্রই যে একচ্ছত্র বা নিরঙ্কুশ, এমন নয়। রাজকীয় ক্ষমতার পরিমাণেও তারতম্য হতে পারে। তাছাড়া একচ্ছত্র রাজতন্ত্র যদি উত্তম চরিত্রের হয় এবং স্বৈরশাসন না হয় তাহলে রাজতন্ত্রকেও শাসন ব্যবস্থার মধ্যে বিবেচনা করা আবশ্যক।

এ্যারিস্টট্‌ল তাঁর আলোচনাতে রাজতন্ত্র বলতে উত্তম রাজকীয় শাসনের প্রকারগুলিকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু স্বৈরতন্ত্র বলতে রাজতন্ত্রের বিচ্যুতি তথা বিকৃত প্রকারকে বুঝিয়েছেন। স্বৈরতন্ত্র অবশ্যই খারাপ শাসন, স্বৈরশাসকের ব্যক্তিগত গুণাগুণ যাই হোক না কেন। এর কারণ পূর্বেই দেখানো হয়েছে। প্রথমত, এ শাসন পরিচালিত হয় শাসকের নিজের স্বার্থে। দ্বিতীয়ত, এ শাসনে ক্ষমতা দখল করা হয় জোরের মাধ্যমে, আইনের মাধ্যমে নয়। তৃতীয়ত, ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় অনিচ্ছুক প্রজাদের উপর। এ্যারিস্টট্‌ল মনে করেন, রাজতন্ত্রগুলি উত্তম, কারণ রাজতন্ত্রের শাসন পরিচালিত হয় সমগ্র সমাজের স্বার্থে। রাজতন্ত্রের শাসন হচ্ছে ইচ্ছুক প্রজাদের উপর শাসন এবং তার প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োগের ভিত্তি হচ্ছে আইন, জোর নয়। এমন কি নিরঙ্কুশ ক্ষমতাও উত্তরাধিকার বা নির্বাচনের সূত্রে রাজা লাভ করতে পারে।]

এইমাত্র যা বলা হল তারপরে একান্তে রাজকীয় শাসন সম্পর্কে আমাদের আলোচনা করা উচিত। কারণ, রাজকীয় শাসনও এক প্রকার যথার্থ বা সঠিক শাসনব্যবস্থা। আমাদের বিচার করে দেখতে হবে, একটা দেশ বা নগরীর জীবনযাত্রা সংগঠনে অপর কোন ব্যবস্থার চেয়ে রাজকীয় শাসন উত্তম ফলদায়ক কি না। এবং এটিও প্রশ্ন যে, এইরূপ শাসনব্যবস্থা কি কেবল কারু জন্য সুবিধাজনক এবং অপর সকলের জন্য অসুবিধাজনক? কিন্তু তারও আগে আমাদের বিবেচ্য হচ্ছে, রাজকীয় শাসন কি কেবল এক প্রকারের, কিংবা এর মধ্যেও প্রকারভেদ আছে? আমরা বলব, স্পষ্টতই এখানেও প্রকারভেদ আছে এবং সকল প্রকার রাজতন্ত্র শাসনের ধরণ এক প্রকারের নয়।

সাংবিধানিক বা বিধানগত রাজতন্ত্রের স্পষ্টতম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ল্যাসিডিমনীয়দের[১] ব্যবস্থায়। এই ব্যবস্থায় রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধের সময়ে রাজা যখন সেনাবাহিনীর অধিনায়কত্ব করেন তখন যুদ্ধের সকল বিষয়ে তিনি সার্বভৌম। তাদের যুগ্ম রাজাদের হাতে ধর্মীয় ব্যাপারের তত্ত্বাবধানের দায়িত্বও অর্পণ করা হয়। এমন রাজকীয় ব্যবস্থাকে তুলনা করা চলে স্থায়ী এবং স্বাধীন সেনাধিনায়কতার সঙ্গে। যুদ্ধাভিযানে ছাড়া এই রাজার কাউকে মৃত্যুদণ্ডদানের ক্ষমতা নাই। (এখানে প্রাচীনকালে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতির অধিকার সম্পর্কে হোমারের কথা আমরা স্মরণ করতে পারি। আলোচনা সভায় অধিনায়ক আগামেমননকে নানা নিন্দাবাদও সহ্য করতে হত। কিন্তু অভিযান শুরু হলে তিনি হতেন জীবন মৃত্যুর প্রভু। এই ক্ষমতারই আভাস মেলে তাঁর এমন উক্তিতে ঃ "যুদ্ধের ক্ষেত্রে লড়াই থেকে পলায়ন করতে যদি আমি কাউকে দেখি তবে নিশ্চিতই তার দেহ সারমেয় আর পক্ষীকুলের ভক্ষ্য হয়ে দাঁড়াবে। এ থেকে কোন রেহাই নাই। কারণ, মৃত্যুর ক্ষমতা আমার হাতে।")

এটাকে তাহলে আমরা এক প্রকারের রাজতন্ত্র বলতে পারি। এখানে রাজা জীবনব্যাপী সেনাবাহিনীর অধিনায়ক। এ পদের অর্জন বংশানুক্রমে কিংবা নির্বাচনের মাধ্যমে হতে পারে। এর সঙ্গে একক শাসনের আর এক প্রকারকেও পাওয়া যায়। অ-গ্রীক রাজতন্ত্রের মধ্যে এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এই রাজাদের ক্ষমতা স্বৈরশাসকদের সমান। তবে এরা প্রতিষ্ঠিত হয় আইনগতভাবে কিংবা বংশগতভাবে। তবে এদের শাসন হচ্ছে দাসদের উপর প্রভুর শাসনের মত। এবং এর কারণ হচ্ছে এই যে, বর্বরগণ চরিত্রগতভাবে গ্রীকদের চাইতে (এশীয়গণ ইউরোপীয়গণের চেয়ে) অধিক দাস মনোভাবের এবং সে কারণে তারা তাদের স্বৈরশাসকদের বিনা প্রতিবাদে সহ্য করে থাকে। এজন্য একদিকে যেমন এই ব্যবস্থাকে স্বৈরতন্ত্র বলা চলে, অপরদিকে এদের আইনগত এবং বংশগত ভিত্তির কারণে এই ব্যবস্থা অধিক স্থায়ী। স্বৈরশাসকের সঙ্গে এদের আর একটা পার্থক্য এই যে, এদের দেহরক্ষীগণ স্বৈরশাসকের দেহরক্ষী নয়, তারা রাজকীয় দেহরক্ষী। রাজকীয় দেহরক্ষীগণ গঠিত হয় অস্ত্রধারী নাগরিকগণ দ্বারা। কিন্তু স্বৈরশাসকের দেহরক্ষী তৈরি হয় বিদেশী ভাড়াটে বাহিনী দ্বারা। এবং রাজার শাসন হচ্ছে স্বেচ্ছানুগত প্রজাদের উপর আইনগত শাসন। স্বৈরশাসকের শাসন হচ্ছে অনিচ্ছুক প্রজার উর জবরদস্তী শাসন। ফলে একজনের নিরাপত্তার উৎস যেখানে নাগরিকগণ, অপরজনের নিরাপত্তাহীনতার উৎস নাগরিকগণ; নাগরিকদের বিরুদ্ধেই তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা।

এভাবে আমরা তাহলে দুধরনের রাজতন্ত্রের সাক্ষাৎ পেলাম। এ ছাড়া তৃতীয় আর এক ধরনের কথা বলা যায়। এর অস্তিত্ব ছিল পুরাতনকালের গ্রীকদের মধ্যে। এই রাজাদের বলা হত 'এসিমেটিস'। এ ছিল এক প্রকারের নির্বাচিত একনায়ক। এই ধরনের শাসকের সঙ্গে বর্বরদের রাজতন্ত্রের পার্থক্য ছিল শুধু এই যে, এই রাজা বংশগত ছিল না। এবং এই শাসকের ভিত্তি ছিল আইনগত। শাসকগণ কখনো আজীবন শাসনে থাকতো। কখনো একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তারা ক্ষমতায় থাকতো, কোনো একটা নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদিত না হওয়া পর্যন্ত তাদের ক্ষমতার মেয়াদ থাকত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মাইটেলিন-এর জনসাধারণ পিটাকাসকে শাসক নির্বাচিত করেছিল এ্যান্টিমেনিডিস এবং কবি এ্যালকিউস-এর নেতৃত্বে যে নির্বাসিতগণ নগরীতে প্রত্যাবর্তন করতে চাচ্ছিল তাদের সেই অভিযানকে প্রতিহত

১. ল্যাসিডিমনীয় : স্পারটার ব্যবস্থা

করার জন্য। পিটাকাসকে যে এভাবে নির্বাচিত করা হয়েছিল, তার আভাস পাই আমরা এ্যালকিউস-এর একটি গানের এই কথা থেকে : "তারা গণ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে নিযুক্ত করল নীচু বংশের লোক পিটাকাসকে তাদের হতভাগ্য এবং লক্ষ্যশূন্য নগরীকে শাসন করার জন্য।" এদের শাসন সম্পর্কে এই বলা চলে যে, তাদের শাসন যে পরিমাণে প্রভু কিংবা স্বেচ্ছাচারীর মত ছিল সে পরিমাণে এরা স্বৈরশাসক ছিল। কিন্তু যে পরিমাণে তারা ইচ্ছুক প্রজাদের নির্বাচিত শাসক ছিল সে পরিমাণে তারা রাজকীয় ছিল।

চতুর্থ রকমের কথাও আমরা বলতে পারি। এদের অস্তিত্ব ছিল সেই বীরদের যুগে। এ শাসন যেমন বংশগত, তেমনি আইনগত এবং জনগণের স্বেচ্ছাগত ছিল। এই শাসকগণ তাদের শাসনের সূচনাতে শান্তি এবং যুদ্ধের ক্ষেত্রে নানা আবিষ্কারের উদ্যোগ নিত, জনসাধারণকে তারা ঐক্যবদ্ধ করত কিংবা তাদের জমির ব্যবস্থা করত। ফলে এরা ছিল জনপ্রিয় রাজা। পরবর্তী বংশধরদের ক্ষেত্রে এরা হত বংশগত রাজা। যুদ্ধের নেতৃত্ব নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব এই শাসকদের উপর ছিল এবং পুরোহিতগণ যে বিসর্জন-কার্য সম্পাদন করত না সে বিসর্জনের দায়িত্বও এদের হাতে ন্যস্ত ছিল। এই রাজারা আইনের বিচারকার্যও সম্পাদন করত। অনেকে এ কার্য শপথ গ্রহণ পুর্বক করত, অনেকে শপথ গ্রহণ ব্যতিরেকে করত। শপথ গ্রহণের সময়ে তারা দণ্ড বা তরবারিকে উত্তোলিত করত। আরো গোড়ার দিকে দেখা যায়, এই রাজারা রাষ্ট্রের বহিঃ এবং অন্তর সবরকমের বিষয়কেই ধারাবাহিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করত। পরের দিকে দেখা যায়, কেউ বা কিছু দায়িত্ব পরিত্যাগ করেছে, কাউকে বা জনসাধারণ দায়িত্ব থেকে অপসারিত করেছে। তবে দেবতাদের সামনে পশু বলিদানের দায়িত্ব সর্বত্রই রাজাদের হাতে ন্যস্ত থাকতে দেখা যায়। এমন ক্ষেত্রেও তাদের রাজা বলা হত। তবে যেখানে এরা সৈন্যবাহিনী এবং অভিযানের নেতৃত্ব নিজেদের হাতে রাখতে পারছে সেখানেই মাত্র এদের যথার্থভাবে রাজা বলে অভিহিত করা যায়।

আমরা তাহলে সর্বমোট চার প্রকারের সাংবিধানিক রাজতন্ত্র দেখতে পাচ্ছি : ১. বীর যুগের রাজতন্ত্র। জনসাধারণের নিকট এ রাজতন্ত্র গ্রহণযোগ্য ছিল। এর ভিত্তি ছিল সুনির্দিষ্ট কতকগুলি দায়িত্ব পালন এবং সুবিধা ভোগ। রাজা যেমন বিচারক ছিল, তেমনি সে সেনাধিপতি এবং ধর্মীয় প্রধানও ছিল। ২. বর্বরদের রাজতন্ত্র। এর ভিত্তি ছিল, আইন এবং বংশ। কিন্তু এর শাসন ছিল স্বৈরাচারমূলক। ৩. এসিম্‌নেটিয়া বা নির্বাচিত একনায়কতন্ত্র এবং ৪. ল্যাসিডিমনীয় রাজতন্ত্র। একে আজীবন বংশগত সেনাধিকতার অধিক কিছু বলা যায় না। বৈশিষ্ট্য হিসাবে এগুলিই হল চার প্রকার রাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। পরিশেষে একটি পঞ্চমের কথাও বলা যায়। এ শাসন উপরোক্তভাবে সীমাবদ্ধ ছিল না। এখানে রাজা এককভাবে সব কিছুই নিয়ন্ত্রণ করত। তার স্বাধীনতা রাষ্ট্রের সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করার সার্বভৌমত্বের ন্যায় স্বাধীনতা। এবং পরিবারের প্রধান যেমন পরিবার পালন করে এই রাজাও তেমনি রাষ্ট্রকে পালন করে। কারণ গৃহপালন এবং রাষ্ট্র পালন প্রায় একই প্রকারের। কাজেই নিরঙ্কুশ বা একচ্ছত্র রাজতন্ত্র বলতে আমি একটা রাষ্ট্র কিংবা রাষ্ট্রসমূহের সামগ্রিক শাসনকেই বুঝাচ্ছি।

পঞ্চদশ অধ্যায়

কোন্‌টি উত্তম : সর্বোত্তম ব্যক্তির শাসন কিংবা সর্বোত্তম আইনের শাসন?

[আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, রাজতন্ত্রের প্রথম চার প্রকার কোন না কোনভাবে সীমাবদ্ধ। পঞ্চম প্রকার হচ্ছে সীমাবদ্ধতাহীন। এদিক থেকে রাজতন্ত্রকে সীমাবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধতাহীন—এই প্রধান শ্রেণীতেও বিভক্ত করা চলে। সীমাবদ্ধ চার প্রকারের মধ্য থেকে ল্যাসিডিমনীয় বা স্পারটার রাজতন্ত্রকে তুলনার জন্য নেওয়া হয়েছে। কারণ, এই রাজতন্ত্র হচ্ছে সর্বাধিক সীমাবদ্ধ। কিন্তু সে কারণেই আবার এই প্রকারকে রাজতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রকার বলেও গ্রহণ করা চলে না। রাজার অধিকারের সীমাবদ্ধতার অর্থ ক্ষমতার কিছু বন্টন। কিন্তু ক্ষমতার বন্টন রাজতন্ত্রের চেয়ে অপর ব্যবস্থাতে অধিক। আর সে কারণে রাজতন্ত্রের প্রতিনিধি হিসাবে নিরংকুশ বা একচ্ছত্র রাজতন্ত্রকে আলোচনা করাই সঙ্গত। কিন্তু এখানে প্রশ্ন আসে : কতিপয় বা ধনিকতন্ত্র কিংবা গণতন্ত্রে ক্ষমতা বন্টনের আলোচনার সময়ে সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল যে, সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আইনই সার্বভৌম হওয়া সঙ্গত। (বর্তমান পুস্তকের ১১ অধ্যায়ের শেষের দিক) কিন্তু এখানে এমন এক রাজার কথা চিন্তা করা হচ্ছে, যে নিজে তার আইন রচনা করে, কারণ তার গুণ তথা প্রজ্ঞা তাকে তেমন বিধানদাতাতেই পরিণত করে। তাহলে আইন বড় না ব্যক্তি বড়—এ প্রশ্নের জবাব আমরা অধ্যায় ১৭ এবং ১৮ এর পূর্ব পর্যন্ত নির্দিষ্টভাবে পাইনে। কাজেই বর্তমানে যে আলোচনা পাওয়া যাচ্ছে তার প্রাসঙ্গিকতা প্রকার নির্বিশেষে সব রাষ্ট্রের জন্যই রয়েছে। এখানে ব্যক্তিক শাসন এবং আইনের ক্ষমতা—উভয়কেই পাশাপাশি একই সঙ্গে চিন্তা করা হচ্ছে।]

আমরা তাহলে বলতে পারি, নিরঙ্কুশ এবং ল্যাসিডিমনীয়—এই দুই প্রকার রাজতন্ত্র বিবেচনার বিষয় হতে পারে। বাকি প্রকারগুলো প্রধানত এই দুইএর মাঝখানের অবস্থা নির্দিষ্ট করে। এদের কারুর ক্ষমতা নিরঙ্কুশের চেয়ে কম কিন্তু ল্যাসিডিমনীয় প্রকারের চেয়ে অধিক। এখানে দুটো প্রশ্ন প্রধান : প্রথমত, প্রশ্ন হচ্ছে, বংশগত কিংবা নির্বাচনগতভাবে স্থায়ীরূপে সর্বাধিনায়ক থাকার ব্যবস্থাটি উত্তম কিংবা উত্তম নয়? দ্বিতীয়ত, সকল বিষয়ের ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত থাকবে, এই বিষয়টিও উত্তম কিংবা উত্তম নয়? প্রথম প্রশ্নটি অর্থাৎ অধিনায়কত্বের বিষয়টি শাসনব্যবস্থার নয়, বরঞ্চ আইনের প্রশ্ন। কারণ যে কোন ব্যবস্থার মধ্যেই এ রকম পদের অস্তিত্ব থাকতে পারে। এ জন্য এ প্রশ্নটির আলোচনা বাদ দিয়ে অপর প্রশ্নটির উপর আমার আলোচনা নিবদ্ধ করছি। কারণ এ প্রশ্নটি রাজকীয় শাসনের একটি ধরনের প্রশ্ন। একারণে বিষয়টি আলোচনা করে এর অন্তর্গত সমস্যাগুলির মোকাবেলা আমাদের করা প্রয়োজন।

একটি পুরাতন এবং মৌল প্রশ্ন নিয়েই আমাদের এ আলোচনা শুরু করতে হবে। প্রশ্নটি হচ্ছে : কোন্‌টি অধিকতর উত্তম? সর্বোত্তম ব্যক্তির শাসন কিংবা সর্বোত্তম আইনের শাসন? যারা বিশ্বাস করে, রাজকীয় শাসন উত্তম তাদের বক্তব্য হচ্ছে, আইন কেবল সাধারণ নীতি নির্ধারণ করতে পারে। সে কারণে প্রতিদিনের সমস্যার ক্ষেত্রে কোন নির্দেশ সে রাখতে পারে না। এবং তাই তাদের যুক্তি হচ্ছে, যে কাজের জন্য দক্ষতার আবশ্যক সে কাজের ক্ষেত্রে সর্বদা পুস্তকের ভিত্তিতে কিংবা আইনের অক্ষর দ্বারা পরিচালিত হতে হবে, এমন কথা বলা মূর্খতার নামান্তর। এমন কি মিশরেও দেখা যায় যে, রুগী চারদিনের মধ্যে দস্তুর মত চিকিৎসাতে নিরাময় না হলে চিকিৎসক চিকিৎসাপুস্তকের বহির্ভূত পদ্ধতি দ্বারাও তার রুগীর চিকিৎসা করতে পারে। এমন করাতে তার অধিকার আছে। কিন্তু এর পূর্বে এরূপ করলে তার নিজের দায়িত্বে তা করতে হবে। একই কারণে বলা চলে পুস্তকের ভিত্তিতে কিংবা আইনের অক্ষরে শাসন করার পদ্ধতি সর্বোত্তম পদ্ধতি নয়।

অপরদিক পথ নির্দেশক হিসাবে সাধারণত কোন নীতি বাদেও শাসক চলতে পারে না। সাধারণ নীতির গুণ এই যে, এর মধ্যে ব্যক্তিগত আবেগের ব্যাপারটি থাকে না। এ কারণে আবেগপ্রবণ ব্যক্তির চেয়ে সাধারণ নীতি অধিকতর উত্তম। একজন মানুষের অবশ্যই আবেগ থাকে। কিন্তু আইনের কোন আবেগ থাকে না। এর বিপরীতে কেউ বলতে পারে, নির্দিষ্ট কোন প্রশ্নে আইনের চেয়ে উত্তম সিদ্ধান্তদানের ক্ষমতা ব্যক্তির থাকে। যাহোক একটা বিষয় পরিষ্কার, একজন আইনদাতা থাকতে হবে। শাসকই আইন দাতা। কিন্তু আইনকে নির্দিষ্টভাবে নিবদ্ধ হতে হবে এবং যে ক্ষেত্রে আইন যথেষ্ট হবে না সে সব ক্ষেত্র ব্যতীত আইনকে হতে হবে সকল ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক। এরূপ ক্ষেত্রের কথা চিন্তা করা যাক। এমন হলে করণীয় কি হবে? আইন যখন একেবারে অকার্যকর কিংবা খারাপভাবে কার্যকর হয় তখন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কি একজন সর্বোত্তম ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকবে কিংবা সকল নাগরিকের সে ক্ষমতা থাকবে?

আমাদের নিজেদের কালে দেখছি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, সুপারিশমূলক প্রস্তাব নেওয়া হয় কিংবা করণীয় নির্দিষ্ট হয় সকলের যৌথ আলোচনায়। কিন্তু এসকল সিদ্ধান্ত নির্দিষ্ট সমস্যার উপর সিদ্ধান্ত। এক্ষেত্রে কোন একজন ব্যক্তি অপরসমূহের সঙ্গে তুলনাক্রমে তুচ্ছ হতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্র গঠিত হয় বহু লোক দ্বারা। এ কারণে একের দেওয়া ভোজের চেয়ে বহুর দেওয়া ভোজ যেমন উত্তম তেমনি যৌথভাবে রাষ্ট্রও ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। সুতরাং একজনের চেয়ে এবং সে একজন যেই হোক না কেন, বহুর বিচার ক্ষমতা একাধিক ক্ষেত্রেই অধিক হতে পারে। তাছাড়া বহু দুর্নীতিদুষ্টও হয় কম। অধিকতর পরিমাণ জল যেমন অল্পতর পরিমাণ জলের চেয়ে কম সহজে দূষিত হয়, তেমনি অল্পসংখ্যকের চেয়ে অধিকসংখ্যক কম সহজে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়। একজন বিচারকের বিচার তার খারাপ মেজাজে থাকা কিংবা আবেগের কারণে বিকৃত হতে পারে। কিন্তু বহুর পক্ষে সম্মিলিতভাবে একই সময়ে মেজাজ খারাপ করা এবং তার দ্বারা বিচারকে বিকৃত করা সহজ নয়। এর জন্য প্রচুর ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজন।

এ কথা যদি আমরা স্বীকার করি তাহলে আমাদের প্রথম দেখতে হবে, যেন প্রথমত, এই সংখ্যাধিকেরা স্বাধীন নাগরিক হয় এবং দ্বিতীয়ত, আইনের ব্যতিক্রম তারা তখনি মাত্র করবে যখন বিশেষ ক্ষেত্রে আইনের বিধান প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট বলে বোধ হবে না। অবশ্য সংখ্যা যেখানে অধিক সেখানে দ্বিতীয় শর্তটি পূরণ করা মোটেই সহজ না হতে পারে। কিন্তু উত্তম তথা উত্তম মানুষ এবং উত্তম নাগরিকের সংখ্যা যেখানে অধিক সেখানে

যদি আমরা প্রশ্ন করি : দুর্নীতি দুষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা কার সবচেয়ে কম, একক শাসকের কিংবা অধিক সংখ্যকের, যারা সকলে উত্তম, তাহলে এর একমাত্র জবাব হবে সংখ্যাধিকেরই দুষ্ট হওয়ার সবচেয়ে কম সম্ভাবনা। কিন্তু এ জবাবের পাল্টা যদি বলা হয়, সংখ্যাধিকেরা নানা উপদলে বিভক্ত হতে পারে। কিন্তু একক শাসকের পক্ষে এমনটি সম্ভব নয়, তাহলে তার জবাব হবে, উপদলের মানুষও এককের চেয়ে কম উত্তম কিংবা কম দায়িত্বশীল নয়। তাহলে সংখ্যাধিক এই উত্তমের শাসনকে আমরা যদি সর্বোত্তমের শাসন তথা অভিজাততন্ত্র বলে বর্ণনা করি এবং একের শাসনকে উত্তম শাসন হিসাবে রাজতন্ত্র বলি তাহলে রাষ্ট্রের জন্য সরকারের প্রকার হিসাবে অভিজাততন্ত্রকেই আমরা রাজতন্ত্রের তুলনায় কাম্য বলে বিবেচনা করব।[১]

[এখানে এসে আমরা একটি নতুন প্রসঙ্গ পাচ্ছি। অতীতের শাসনব্যবস্থার বিকাশের ইতিহাস কি, এ্যারিস্টট্‌ল সে বিষয়ে একটি আলোচনা তুলছেন। চতুর্থ পুস্তকের অধ্যায় ১৩তে আমরা এর একটা ভিন্নতর বিবরণ পাব। কিন্তু যে কথাটি উল্লেখযোগ্য সে হচ্ছে এই যে, অতীত সম্পর্কে প্লেটো এবং এ্যারিস্টট্‌লের যে সিদ্ধান্তসমূহ আমরা দেখতে পাই সেগুলি যত না তাদের আলোচনার ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক উপাদান তার অধিক হচ্ছে তাদের দার্শনিক হাতিয়ার।]

এখানে একটা জিনিষ আমরা আন্দাজ করতে পারি। একেবারে গোড়াতে রাজকীয় শাসন থাকার কারণ কি? এর কারণ এই ছিল যে, সেকালে, বিশেষ করে জনসংখ্যা স্বল্প থাকার জন্য বিশেষ দক্ষ এবং ন্যায়বান লোক যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া কষ্টকর ছিল। উত্তম ব্যক্তিদের একটা বিশেষ দায়িত্ব ছিল অপরকে পুরস্কৃত করা। এবং জনসাধারণ যারা উত্তম কার্য সাধন করত তাদের সেই কার্যের স্বীকৃতিস্বরূপ উত্তমদের রাজাহিসাবে নির্বাচিত করত। কিন্তু কালক্রমে যখন একই প্রকার উত্তম লোক অধিক সংখ্যায় পাওয়া সম্ভব হল তখন জনসাধারণ একজনের শাসন বরদাস্ত করার চেয়ে যৌথ শাসনই কামনা করতে শুরু করল এবং সংবিধান তৈরি করল। কিন্তু উত্তমদের শাসন স্থাপিত হলেও উত্তমরা আর উত্তম থাকল না। তারা রাষ্ট্রের সামাজিক সম্পত্তি থেকে লাভ আদায় করতে শুরু করল। আমরা একেই কতিপয়তন্ত্র বা ধনিকতন্ত্রের উৎস বলে একরূপ সঠিকভাবে উল্লেখ করতে পারি। কারণ, অর্থের লোভ হচ্ছে ধনিক চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। এর পরবর্তী পরিবর্তন ঘটে স্বৈরতন্ত্রে। এবং পরিশেষে স্বৈরতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের উদ্ভব। কারণ, যে কোন প্রকারে ধনবান হওয়ার প্রতিযোগিতা ধনীর সংখ্যা হ্রাস করে এবং জনতার শক্তিকে বৃদ্ধি করে। জনতা তখন বিদ্রোহ করে এবং গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। বর্তমানকালে যখন নগরগুলির আকার সার্বিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তখন একথা বলা চলে যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে পরিহার করা কষ্টসাধ্য।

যারা এরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, রাষ্ট্রের জন্য রাজকীয় শাসন সর্বোত্তম তাদের আরো কিছু প্রশ্নকে বিবেচনা করতে হবে। এরূপ প্রশ্নের একটি হচ্ছে রাজার পুত্রদের সম্পর্কিত। প্রশ্ন হচ্ছে : রাজার সন্তানগণও কি রাজা হবে? রাজারা অনেক সময়ে কি ধরনের মানুষ হিসাবে তাদের পরিচয় দিয়েছে, সে কথা বিবেচনা করলে আমাদের বলতে হয় যে,

১. সশস্ত্র বাহিনীর উপস্থিতি কিংবা অনুপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ নয়; গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সমচরিত্র বিশিষ্ট সংখ্যাধিকের অস্তিত্ব।—এ্যারিস্টট্‌ল

বংশগত রাজতন্ত্র ক্ষতিকর। অবশ্য নীতিটির সংশোধন করে বলা যায়, রাজা বংশগত নীতিটি পরিহারও করতে পারে। কিন্তু একথা বিশ্বাস করা কষ্টসাধ্য যে, রাজারা তাদের রাজ্যকে তাদের বংশধরদের হাতে তুলে দিবে না। মানুষের যা স্বভাব তাতে এরূপ প্রত্যাশা করা অত্যধিক হবে। তাছাড়া সশস্ত্রবাহিনীর প্রশ্নটিও রয়েছে। ভাবী রাজার কি একটি রক্ষীবাহিনী থাকবে? এই রক্ষীবাহিনী ব্যবহার করে সে কি যারা তার শাসনকে প্রতিরোধ করতে চায় তাদের উপর তার ইচ্ছাকে আরোপ করবে? কিংবা অন্য কি উপায়ে সে তার ক্ষমতাকে কার্যকর করতে সক্ষম হবে? তার ক্ষমতা যদি এরূপও হয় যে তাকে আইন মেনে চলতে হবে এবং নিজের ইচ্ছায় আইনবিরুদ্ধ কিছু করার তার ক্ষমতা নেই, তাহলেও আইনকে মান্য করাবার জন্য তার উপযুক্ত পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন হবে। তবে সংবিধান দ্বারা সীমাবদ্ধ ক্ষমতার রাজার ক্ষেত্রে এই প্রশ্নের জবাবদান হয়ত কঠিন নয়। তার নিশ্চয়ই একটি বাহিনী থাকবে এবং সে বাহিনী এমন হবে যার শক্তি থাকবে কোনো একব্যক্তি কিংবা কোন দলকে কাবু করার, কিন্তু সমগ্র জনতাকে তারা কাবু করে ফেলতে পারে, এমন শক্তি তাদের থাকবে না। আগের দিনে কোন ভাবী স্বৈরশাসককে যখন রক্ষীবাহিনী দেওয়া হতো তখন এ নীতিটি অনুসরণ করা হতো। এ কারণেই ডায়োনিসিয়াস যখন রক্ষীবাহিনীর দাবী করেছিল তখন অনেকে সাইরাকিউজবাসীদের পরামর্শ দিয়েছিল, এরূপ বাহিনীর সংখ্যা যেন এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজন দ্বারা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

স্বৈররাজার শাসন

[অধ্যায় ১৫-এর শুরুতে এ্যারিস্টট্ল যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন তার আলোচনা থেকে তিনি সরে গেছেন। রাজকীয় শাসনের সঙ্গে আইনের যে সম্পর্কের বিষয় তিনি আলোচনা করেছেন তা শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, অবাধ রাজতন্ত্রের নয়। নিম্নের আলোচনাতে দেখা যাচ্ছে এ্যারিস্টট্ল অবাধ রাজতন্ত্রের আলোচনাতে পুণরায় ফিরে এসেছেন। এখানে অধ্যায় ১৫-এর কিছু পুনরাবৃত্তিও রয়েছে। এবং তারপরে এ্যারিস্টট্ল পুনরায় আইনের ক্ষমতা এবং ব্যক্তির ক্ষমতার প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন।]

এবার আমরা সেই রাজার শাসন সম্পর্কে আলোচনা করব যে রাজার প্রত্যেকটি কাজ নিজের ইচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হয়। কারণ, যে রাজকীয় শাসনকে সাংবিধানিক বলা হয়েছে সে শাসন শাসনব্যবস্থার কোন প্রকারের অন্তর্গত নয়। একথা আমরা ইতিপূর্বে বলেছি। কারণ, স্থায়ী অধিনায়কতা গণতন্ত্র কিংবা অভিজাততন্ত্র অপর যে কোন শাসনতন্ত্রেই থাকতে পারে। এবং সমগ্রশাসনের দায়িত্বে এক ব্যক্তিকে স্থাপন করার ব্যাপারও অসাধারণ নয়। এপিডামনাস-এ যেমন, কিছু কম পরিমাণে হলেও ওপাস-এর শাসনেও এর সাক্ষাৎ আমরা পাই। কিন্তু আমরা এখন নিরঙ্কুশ বা অবাধ রাজকীয় শাসনের কথা বলছি। এ ব্যবস্থায় রাজা সবকিছুকে নিজের ইচ্ছা এবং মর্জিমত শাসন করে।

এমন অনেকে আছেন যারা বলেন, রাষ্ট্র যখন সমান মানুষের সংস্থা তখন কোন এক ব্যক্তি সকল নাগরিকের উপর শাসন করবে এটি প্রকৃতিসঙ্গত নয়। কারণ, প্রকৃতিগতভাবে যারা সমান তাদের সকলের সমান প্রকৃতিগত অধিকার এবং মর্যাদা থাকতে হবে। এবং এটা যদি সত্য হয় যে, অসম স্বাস্থ্যের মানুষের পক্ষে একই প্রকার খাদ্য কিংবা বস্ত্র—কোনটাই ভাল নয়, তাহলে এ কথা সম্মান এবং পদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। কাজেই ন্যায়ের দাবী হচ্ছে, শাসিত হওয়ার পরিমাণের চেয়ে অধিকতর শাসক কেউ হবে না—শাসনের ক্ষেত্রে পালাক্রমে সকলেরই সুযোগ থাকতে হবে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, আইনের কথাতে আমাদের আবার ফিরে যেতে হয়। কারণ পালাক্রমে শাসনের কথা হচ্ছে আইনের কথা। এ থেকে আমরা বলতে পারি ঃ আইনের শাসনই অধিকতর কাম্য, কোন একজন নাগরিকের শাসন নয়। যুক্তির এই ধারা নুসরণ করে আমাদের একথাও বলতে হয়, এমন যদি প্রমাণ করাও হয় যে, বিশেষ কিছু লোকের শাসন করা উচিত তাহলেও এমন লোককে আমাদের আখ্যায়িত করা উচিত আইনের রক্ষক বা আইনের সেবকরূপে। এঁরা বলেন, দায়িত্ব বা পদের প্রয়োজন আছে। তাই বলে এটা সঙ্গত নয় যে, একজন মাত্র সেই পদ ধারণ করে থাকবে। অন্তত সকলে যেখানে সমান সেখানে এটি সঙ্গত নয়।

আবার কোন বিশেষ ক্ষেত্রে আইন সমাধান দিতে পারছে না, সেই প্রশ্নের জবাবেও বলা

যায়, একজন মানুষের পক্ষেও এমন ক্ষেত্রে সমাধান প্রদান করা সমভাবেই অসম্ভব হতে পারে। এ রকম অবস্থার মোকাবেলার জন্যই আইনের প্রথম কাজ হচ্ছে শিক্ষাদান করা এবং তার পরেই মাত্র কাউকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতাদান করা। তখনি মাত্র অনির্দিষ্ট বিষয়গুলিকে তাদের সাধ্যমত সুবিবেচনার ভিত্তিতে তারা সমাধান করতে সক্ষম হবে। কোন বর্তমান নিয়ম নির্দেশ পরীক্ষার পরে যদি নতুন কোন প্রস্তাবের সাক্ষাৎ মেলে তবে তার ভিত্তিতে উন্নতি করার অবকাশও এই ব্যবস্থাতে থাকে। কাজেই যিনি বলেন আইনের শাসন করা উচিত তিনি দেবতা এবং যুক্তিকেই শাসক হতে বলেন, অপর কাউকে নয়। কিন্তু যিনি কোন মানুষকে শাসক বানাতে চান তিনি তার দ্বারা একটি বন্য জন্তুকেই আমন্ত্রণ করে আনেন। কারণ মানুষের প্রবৃত্তি বন্য জন্তুর মত। প্রবল আবেগ শাসক এবং মানুষের মধ্যে সর্বোত্তমকে পর্যন্ত ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করে। কিন্তু আইনের মধ্যে আবেগশূন্য যুক্তিরই অধিষ্ঠান।

কিন্তু আইনের সার্বভৌমিকতার বিরুদ্ধে আর একটি যুক্তি আছে। এ যুক্তি চিকিৎসা বিদ্যা কিংবা অপর কোন দক্ষতার উপমা ব্যবহার করে। এ যুক্তির কথা হচ্ছে, বই ধরে কোন চিকিৎসা চলে না। তার জন্য উত্তম হচ্ছে এমন কাউকে ডাকা যে চিকিৎসা করতে জানে। কিন্তু আমরা বলব, এই উপমা ভিত্তিহীন। চিকিৎসক তার নিজের যুক্তিগত বিচারের বিরুদ্ধে গিয়ে তার বন্ধুর স্বার্থে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে না। চিকিৎসকের কর্তব্য নিরাময় করা। সে তার রুগীর নিরাময় সাধন করে এবং তার প্রাপ্য অর্থ গ্রহণ করে। কিন্তু যারা সরকারী পদে অবস্থান করে তারা তাদের ইচ্ছা এবং অনিচ্ছার ভিত্তিতে নানা প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অবশ্য এমন যদি আমি মনে করি যে, আমার শত্রুরা ডাক্তারকে ঘুষ প্রদান করে আমার জীবন নাশের ব্যবস্থা করেছে তাহলে আমি 'বই থেকে ওষুধ গ্রহণের' কথাই বলব। আবার আমরা দেখি ডাক্তার নিজে যখন অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন সে তার চিকিৎসার জন্য অপর ডাক্তারকে ডেকে আনে এবং শিক্ষাপ্রদানকারীরা নিজেদের প্রশিক্ষণকালে অপর প্রশিক্ষককে আহবান করে। কারণ এই নীতি তারা বিশ্বাস করে যে, নিজের স্বার্থ এবং আবেগ যেখানে জড়িত সেখানে কারুর পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ অসম্ভব।

> [উপরের এই বাক্যের সঙ্গে পরবর্তী আলোচনার প্রথম বাক্যটির সম্পর্কটি আমরা একথা স্মরণ রাখলে বুঝতে পারব যে, এ্যারিস্টট্‌লের যেটি দুর্বলতা তা হচ্ছ সর্বদা মধ্যপথকে অন্বেষণ করার তাঁর চেষ্টা। দুই চরমের মধ্যে মধ্যবিন্দুতেই ন্যায়, মধ্যবিন্দুতেই গুণ—এই হচ্ছে এ্যারিস্টট্‌লের বিশ্বাস। তাঁর মতে, আইন তো পূর্ব থেকে কারুর পক্ষ অবলম্বন করে না। আইন না এ পক্ষের, না ওপক্ষের। এবং এই অবস্থানই সঙ্গত। কিছু সম্পর্কহীন আলোচনার সাক্ষাৎও আমরা নিম্নে পাই।]

একথা তাহলে পরিষ্কার যে, কোন্‌টা ঠিক, তার অন্বেষণের অর্থ হচ্ছে মধ্য পথের অন্বেষণ করা। কারণ আইন হচ্ছে মধ্যম।

নীতির আইন, বস্তুগত আইনের চাইতে যেমন অধিক বাধ্যতামূলক, তেমনি অধিক মৌলিক। অন্যকথায় বলা যায়, শাসক হিসাবে কোন মানুষ যদি লিখিত আইনের চেয়ে কম ভ্রমক্ষম হয় তাহলে মনে করতে হবে নীতির আইনের চেয়ে সে অধিক ভ্রমক্ষম।

অবশ্য একথাও সত্য যে, যেখানে এক ব্যক্তি একমাত্র শাসক সেখানে সবকিছুর উপর দৃষ্টি রাখা তার পক্ষে সহজ হবে না। এবং সে কারণে তার অধীনে তাকে অন্যান্য কর্মচারীদের নিযুক্ত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন এটি নয় যে, এরা তার শাসনের গোড়া

থেকে রয়েছে কিংবা পরবর্তীকালে তারা নিযুক্ত হয়েছে। এতে কোন পার্থক্য ঘটে না। তাছাড়া পূর্বের মত যদি বলা হয়, যে উত্তম তার শাসন করার অধিকার আছে, কারণ সে উত্তম, তাহলে বলতে হয়, দুজন উত্তম একজন উত্তমের চেয়ে অধিকতর উত্তম। এ জন্যই হোমারের উক্তি হচ্ছে : এক সঙ্গে দুজন যাওয়াই শ্রেয়। এবং এ কারণেই আগামেমনন আফসোস করে বলেন : 'আহা! আমার যদি এরকম দশজন পরামর্শদানকারী থাকত!'

আমাদের কালে আমরা দেখি যে, এমন কর্মচারী তথা বিচারক আছে যাদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে আইন যেখানে সিদ্ধান্তদানে সক্ষম নয়, সেখানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার। তবে এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে, আইন যেখানে সক্ষম সেখানে আইনের সিদ্ধান্তকেই শেষ সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করা সঙ্গত। তবে আইনের অন্তর্ভুক্ত করা যায় এমন ব্যাপার যেমন আছে, আইনের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না এমন বিষয়ও আছে। এ কারণেই নানা অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং পুরাতন প্রশ্নটি আবার উঠে আসে : কোন্‌টা কাম্য, সর্বোত্তম ব্যক্তির শাসন, না সর্বোত্তম আইনের শাসন? আইনের অন্তর্ভুক্ত করা যায় না সেই সব বিষয়, যে গুলির ফয়সালা আলোচনার ভিত্তিতে করা আবশ্যক। আইনের শাসন যারা সমর্থন করে তারা একথা অস্বীকার করে না কিংবা এরূপ বলে না যে, এ সমস্ত ক্ষেত্রে মানুষের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই। তাদের বক্তব্য হল, এমন ক্ষেত্রে ব্যক্তির সংখ্যা এক নয়, অধিক হওয়া সঙ্গত। ব্যক্তিক শাসনের ক্ষেত্রেও শাসক যদি আইন দ্বারা শিক্ষিত হয় তাহলে তার পক্ষেও এক উত্তম সিদ্ধান্ত প্রদান সম্ভব হতে পারে। কিন্তু তার চোখের সংখ্যা তো মাত্র এক জোড়া, তার কানের সংখ্যাও এক জোড়া এবং হাত এবং পায়ের সংখ্যাও অনুরূপ। এবং এ কারণে বহুজোড়া হাত-পা-চোখ-কানের যে বহুমানুষ তার চেয়ে এই এক ব্যক্তির বিচার এবং কর্মক্ষমতা যে উত্তম হবে, এমন আশা করা যায় না। আমাদের জীবনকালে আমরাও দেখতে পাচ্ছি, রাজকীয় শাসকগণ কথাটা বুঝেন এবং এ কারণে তাঁরা তাঁদের চোখ-কান-হাত-পা হিসাবে যারা কাজ করতে পারে এমন সব লোকদের নিজেদের অধীনে তাঁরা নিযুক্ত করেন। এসব লোক তাঁদের প্রতি বন্ধু-ভাবাপন্ন বলে তাঁরা এদের ক্ষমতার অংশীদার করেন। তারা যদি তাঁদের বন্ধু না হয় তাহলে তারা রাজার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করবে না। বস্তুত রাজার ইচ্ছাই হচ্ছে রাজকীয় শাসনের ভিত্তি। অপর দিকে তারা বন্ধু হলেও রাজকীয় শাসন টিকে থাকার নিশ্চয়তা নেই। কারণ বন্ধু বললে তাকে সমান এবং সদৃশ ভাবতে হয়। কাজেই রাজা যদি মনে করে তারা সমান এবং তাদেরও শাসনে অংশ থাকা আবশ্যক তাহলে একথার অর্থ দাঁড়ায় এই যে রাজাকেও স্বীকার করতে হচ্ছে যে, সমান এবং সদৃশ লোকদের শাসন করা উচিত। আর রাজকীয় শাসনের যারা বিরোধী তাদের দাবীও হচ্ছে এটি।

সপ্তদশ অধ্যায়

অবাধ রাজকীয় শাসন সম্পর্কে আরো কিছু কথা

কিন্তু এই সমস্ত আপত্তি কোন কোন ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হলেও, এমন ক্ষেত্র আছে যেখানে এরা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ প্রকৃতির মধ্যে আমরা অবশ্যই এমন অবস্থার সাক্ষাৎ পাই যেখানে ১. প্রভু হিসাবে একের শাসনের প্রয়োজন আছে; ২. রাজার শাসনেরও আবশ্যকতা রয়েছে; ৩. এমন অবস্থাও আছে যেখানে নাগরিকদের সাংবিধানিক শাসন ন্যায়সঙ্গত এবং সুবিধাজনক, দুইই। (প্রকৃতির ব্যবস্থার মধ্যে স্বৈরশাসনের অবস্থান আছে বলে আমরা মনে করিনে। কিংবা যাদের আমরা বিকৃত বা বিচ্যুত ব্যবস্থা বলেছি তাদেরও অবস্থান নেই। কারণ তারা প্রকৃতিবিরুদ্ধ) কিন্তু আমাদের আলোচনা থেকে এ কথা পরিষ্কার যে, যারা সমান এবং সদৃশ তাদের মধ্যে একজন সকলের উপর ক্ষমতা ধারণ করবে এটা ন্যায়সঙ্গত কিংবা সুবিধাজনক—এর কোনটিই নয়। এক্ষেত্রে এটা বড় কথা নয়, সে আইনের ভিত্তিতে শাসন করছে কিংবা আইন ব্যতীত শাসন করছে। কারণ, এখানে সে নিজেই আইন। এবং এটাও কোন কথা নয়, সে একজন উত্তম মানুষ এবং উত্তমদের উপর সে শাসন করছে, কিংবা সে উত্তম মানুষ নয়, এবং যারা উত্তম নয় তাদের উপর সে শাসন করছে, কিংবা সে সর্বোত্তম। এর কিছু ব্যতিক্রম থাকতে পারে। কিন্তু সাধারণ সত্য এটাই।

এবার ব্যতিক্রমের কথা বলতে হয়। অবশ্য এর কিছুটা পূর্বেই বলা হয়েছে। [অধ্যায় ১৩-এর শেষদিকে] কিন্তু এখানে প্রথমে আমার বলা আবশ্যক 'রাজকীয়', 'অভিজাততান্ত্রিক', 'নাগরিক' কিংবা 'পলিটি সংক্রান্ত'—ইত্যাদি কথা দ্বারা আমরা কি বুঝি।

কোন স্থানের জনতার একটি রাজকীয় শাসনের আবশ্যক হয় তখন, যখন তারা কোন অসাধারণ গুণের অধিকারী কোন ব্যক্তিকে তাদের রাষ্ট্রের নেতা হিসাবে গ্রহণ করার মনোভাব পোষণ করে। আবার নাগরিকরা সকলে স্বাধীন এবং রাষ্ট্রীয় শাসনের দায়িত্ব গ্রহণের দক্ষতা এবং গুণ সম্পন্ন নেতা হলে তাদের অভিজাততান্ত্রিক শাসন থাকাই সঙ্গত। নাগরিক শাসনের জন্য নাগরিকদের কিছু পরিমাণ সামরিক দক্ষতা থাকাও আবশ্যক। এবং অর্থনৈতিকভাবে যারা সম্পন্ন, গুণের ভিত্তিতে তাদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টনের নীতিতে শাসক এবং শাসিত হওয়ার যোগ্যতা তাদের থাকা প্রয়োজন।

কাজেই এমন কোন পরিবার কিংবা ব্যক্তিকে যদি পাওয়া যায় যার আসাধারণ গুণ এবং যোগ্যতা অপর সকলকে অতিক্রম করে যায় তাহলে এই অবস্থাকে আমরা একটা ব্যতিক্রমী অবস্থা বলে অভিহিত করতে পারি এবং এমন অবস্থাতে এটা যথার্থ এবং ন্যায়সঙ্গত যে এই পরিবার রাজকীয় পরিবার হবে এবং এই অসাধারণ ব্যক্তি রাজকীয়, সার্বভৌম এবং রাজা বলে মান্য হবে। কারণ, এ কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি, এই ব্যবস্থার মধ্যে আমরা সেই ন্যায়ের সাক্ষাৎ পেতে পারি যে ন্যায়ের ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে সকলের দাবী। একথা অভিজাততন্ত্র, ধনিকতন্ত্র (কপিয়তন্ত্র) কিংবা গণতন্ত্র—সকলের ক্ষেত্রেই সত্য। কারণ, এই সকল শাসনব্যবস্থারই কথা হচ্ছে যে তারা গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য গুণের বিবেচনা এক থেকে আরে পৃথক, একথা আমরা পূর্বে বলেছি। [অধ্যায় ৮] কিন্তু সর্বপ্রকারের গুণ যেখানে অসাধারণ সেখানে সেই অসাধারণ ব্যক্তিকে হত্যা করা হবে, কিংবা তাকে নির্বাসিত বা সমাজচ্যুত করা হবে কিংবা তাকেও পালাক্রমে শাসিত হতে হবে—এটা সঠিক হবে না। কারণ যদিচ এটা সত্য যে, অংশ সমগ্রের চেয়ে স্বাভাবিকভাবে বৃহত্তর হতে পারে না, তথাপি যে অসাধারণ ব্যক্তির কথা আমি উল্লেখ করেছি তার ক্ষেত্রে ব্যাপারটি তাই দাঁড়ায়। এ অবস্থায় এমন ব্যক্তিকে, পালাক্রমে নয়, স্থায়ীভাবে এবং সম্পূর্ণভাবে শাসক বলে স্বীকার করা এবং মান্য করা ব্যতীত অপর কোন উপায় থাকে না।

এবার তাহলে আমরা বলতে পারি, রাজকীয় শাসন, তার প্রকারভেদ, এরা রাষ্ট্রের জন্য ভাল কিংবা মন্দ, কোন্ ধরনের রাষ্ট্রের জন্য ভাল এবং মন্দ এবং কিভাবেই বা তারা ভাল কিংবা মন্দ—এসব প্রশ্নের আলোচনা সমাপ্ত হল।

অষ্টদশ অধ্যায়

তিন প্রকারের সঠিক শাসনব্যবস্থা

[এখানে একটি জিনিস লক্ষ্যণীয় যে, অবাধ বা নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র সম্পর্কে এ্যারিস্টট্‌ল তেমন কিছু বলেন নি। নিরঙ্কুশ রাজার চরিত্র কি এবং কোন অবস্থাতে এমন শাসন উত্তম হতে পারে, সে সম্পর্কে বিশেষ কোন্ আলোচনা আমরা পাইনে। নিরঙ্কুশ রাজকীয় শাসন আলোচনার সময়ে এ্যারিস্টট্‌ল কি আলেকজান্ডারকে স্মরণ করে কথা বলেছেন? এর সঠিক জবাব দেওয়া সহজ নয়। তবে রাজতন্ত্রের গুণের মধ্যে এ্যারিস্টট্‌ল যে বিজয় অভিযানকে অন্তর্ভুক্ত করেন নি, এটা উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী আলোচনাটি প্রায় পুনশ্চ জাতীয়। এখানে যেমন পেছনের তৃতীয় অধ্যায়ের বিষয়ের পুনরুল্লেখ আছে, তেমনি সপ্তম পুস্তকে যা আলোচিত হবে, তারও আভাস রয়েছে।]

আমাদের আলোচনাতে আমরা বলেছি, তিন প্রকারের শাসনব্যবস্থা আছে যারা সঠিক। আমরা এও বলেছি, এদের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে সেই ব্যবস্থা যেটি শাসিত হয় সর্বোত্তম মানুষ দ্বারা। (সর্বোত্তম যেমন একজন হতে পারে, তেমনি সর্বোত্তম একটি পুরো পরিবার হতে পারে, উত্তমতায় শ্রেষ্ঠ একটি জনসমষ্টিও হতে পারে, এদের মধ্যে কেউ শাসিত হওয়ার জন্য উত্তম, কেউ শাসক হওয়ার জন্য উত্তম ঃ কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য হচ্ছে সর্বাধিক কাম্য জীবন অর্জন করা।) পূর্বের একটি অধ্যায়ে [অধ্যায় ৪] আমরা এ বিষয়টিও দেখিয়েছি যে, উত্তম মানুষের উত্তমতা এবং উত্তম নাগরিকের উত্তমতা একই প্রকারের হওয়া উচিত। আমাদের এসব কথা থেকে এই সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসে যে, একটি উত্তম মানুষ এবং একটি উত্তম রাষ্ট্র তৈরির পন্থা অভিন্ন। শাসনব্যবস্থা রাজকীয় হোক কিংবা অভিজাততান্ত্রিক হোক, এ ক্ষেত্রে উপায়ের কোন ভিন্নতা নেই। কাজেই যে শিক্ষা এবং নীতির আদর্শ একজন মানুষকে উত্তম করতে সক্ষম, সেই শিক্ষা এবং নৈতিক আদর্শ একজন নাগরিককে নাগরিকের দায়িত্ব পালনে কিংবা রাজাকে রাজার কর্তব্য পালনে সক্ষম করে তোলে।

এই প্রশ্নগুলির যখন আলোচনা শেষ হয়েছে, তখন আমাদের উচিত সর্বোত্তম সংবিধান সম্পর্কে, বিশেষ করে এর প্রকৃতি কি এবং কি উপায়েই বা আমরা তাকে বাস্তবায়িত করতে পারি সে সম্পর্কে কিছু বলার চেষ্টা রা।

[কিন্তু এ্যারিস্টট্‌লের এই প্রতিশ্রুতির পূরণ এখানে ঘটছে না—আমরা এ আলোচনার সাক্ষাৎ পাই সপ্তম এবং অষ্টম পুস্তকে। এ কারণে পূর্বে এ্যারিস্টট্‌লের 'পলিটিকস'-এর অনেক সম্পাদক ৩য় পুস্তকের ১৮ অধ্যায়ের আলোচনার পরে সপ্তম এবং অষ্টম পুস্তকের আলোচনা স্থাপিত করে দিতেন। যাই হোক, বর্তমান প্রচলিত আকারে আমরা

পরবর্তী তিনটি পুস্তকে যে আলোচনা পাই তার জোর সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থার উপর নয়। তার জোর বাস্তবে ব্যবহার-উপযোগী সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থার উপর। বাস্তবে অর্জনযোগ্য সর্বোত্তম এই ব্যবস্থাকে এ্যারিস্টট্‌ল 'পলিটি' বলে অভিহিত করেছেন। ৩য় পুস্তকের ৭ম অধ্যায়ে আমরা এ আলোচনাকে একবার পেয়েছি। চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পুস্তকের মধ্যে আলোচনার একটা ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায়। চতুর্থ পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা আলোচ্য বিষয়ের একটি আংশিক তালিকার সাক্ষাৎ পাই, যদিও আলোচনার ক্ষেত্রে এই তালিকাসহ বিষয়ের সুসংবদ্ধ আলোচনার চেয়ে কিছুটা বিত্রস্ত আলোচনারই আমরা পরিচয় পাই।]

চতুর্থ পুস্তক

প্রথম অধ্যায়

উত্তম বিধানদাতা এবং উত্তম রাজনীতিজ্ঞ—এদের বিচার্য কি?

[চতুর্থ পুস্তকের শুরুতে আমরা এ্যারিস্টট্‌লের একটি সাধারণ সূত্রকে পাই। এ্যারিস্টট্‌ল পরবর্তীতে দৃষ্টান্ত প্রদানের মাধ্যমে এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। রাজনীতির দক্ষতার ক্ষেত্রে এর ব্যাপক প্রয়োগ। রাজনীতির তাত্ত্বিকদের একটি প্রবণতা হচ্ছে বাস্তব এবং নির্দিষ্ট জায়গার অবস্থার বিবেচনাকে অবহেলা করা। তবে বিশেষ অবস্থার প্রশ্ন ছাড়াও এমন একটি সংবিধানের চিন্তা করা আবশ্যক যে সংবিধানকে সাধারণভাবে বাস্তবায়িত করা যায়। এ্যারিস্টট্‌লের মতে এই ব্যবস্থার সাক্ষাৎ অভিজাততান্ত্রিক গণতন্ত্রের মধ্যে পাওয়া যা। এবং এ্যারিস্টট্‌ল এই ব্যবস্থাকেই 'পলিটি' বলে আখ্যায়িত করেছেন। (৩ : ৯ দ্রঃ)

যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবেচনার বিষয় একটি অংশ নয়, কিন্তু সমগ্র, এক প্রকার বিষয়ের সমগ্রটি যার চিন্তার ব্যাপার সে সকল জ্ঞান শাখার প্রয়োজন হচ্ছে তার নির্দিষ্ট শ্রেণীগত বিষয়ের সব কিছু সম্পর্কে অনুসন্ধান করা। শরীর চর্চাকে যদি আমরা এরূপ একটি জ্ঞানের শাখা ধরি এবং তার বিবেচ্য বিষয় যদি আমাদের দেহ হয়, তাহলে তার অনুসন্ধানের বিষয় হবে, কোন্ প্রকার শরীরের জন্য কোন্ প্রকার বস্তু উপকারী, তা নির্দিষ্ট করা। এবং এখান থেকেই নির্দিষ্ট করতে হবে, শরীরের সর্বোত্তম প্রশিক্ষণ কি? কারণ সর্বোত্তম দেহের জন্য সর্বোত্তম প্রশিক্ষনেরই আবশ্যক। তাছাড়া শরীর-শিক্ষকের বিবেচনার বিষয় এটিও যে, তাকে নির্দিষ্ট করতে হবে সর্বাধিক সংখ্যকের জন্য কোন্ বিশেষ শিক্ষাটি সর্বাধিক ফলদায়ক হবে। এমন কি, কেউ যদি সর্বোত্তম ক্রীড়া-প্রতিযোগীর দক্ষতা অর্জন করতে নাও চায়, যদি তার লক্ষ্য এর ন্যূনতর কিছু হয় তাহলে শিক্ষক কিংবা কৌশল শিক্ষাদানকারীর দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীকে সেই পরিমাণ যোগ্যতার শিক্ষাদান। নিরাময়বিজ্ঞান, যাননির্মাণ, বস্ত্রবয়ন, এরূপ প্রত্যেকটি দক্ষতার ক্ষেত্রেই আমরা সামগ্রিকতার এই নীতিটিকেই কার্যকর দেখতে পাই। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এই কথাটি নিঃসন্দেহে সত্য। কারণ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিবেচনার বিষয় হচ্ছে, সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা। সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা কি এবং বাইরের কোন প্রতিবন্ধকতা ব্যতিরেকে একেবারে আমাদের ইচ্ছানুযায়ী যদি একটি শাসনব্যবস্থা তৈরি করা সম্ভব হয় তাহলে তার রূপটি কি হবে—এই হচ্ছে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনার সিষয়। কিন্তু এটিও একমাত্র বিষয় নয়। এটি এর করণীয় প্রথম কাজ। এর আর একটি করণীয় হচ্ছে, কোন্ প্রকার মানুষের জন্য কোন্ প্রকার শাসনব্যবস্থা উপযোগী, সে বিষয়টিও আলোচনা করা। কারণ যাকে আমরা সর্বোত্তম বলব তাকে অর্জন করা হয়ত অসম্ভব হবে। সে কারণে উত্তম বিধানদাতা এবং উত্তম রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ—এদের বিবেচনার বিষয় হবে 'চরম উত্তম' এবং 'অবস্থার ভিত্তিতে উত্তম'—এই উভয় ব্যবস্থাই। তৃতীয় আর একটি করণীয়ের কথাও বলতে হয়। কোন বিদ্যমান ব্যবস্থা থেকেই এই

আলোচনাটিকে শুরু করতে হবে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, বিধানদাতাকে একটি বিদ্যমান ব্যবস্থা গোড়াতে কি ছিল তা যেমন আলোচনা করতে হবে, তেমনি ব্যবস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে কি উপায়ে সেটি সর্বাধিক কাল বজায় থাকতে পারে, তাও তাকে বিবেচনা করতে হবে। কথাটি বলছি আমি এমন একটি শাসন ব্যবস্থাকে লক্ষ্য করে যেটি হয়ত সর্বোত্তমের প্রয়োজন পূরণ করে একটি সর্বোত্তম ব্যবস্থা যেমন নয়, তেমনি যেটিকে অবস্থার ভিত্তিতে সর্বোত্তম বলাও সম্ভব নয়। এছাড়া চতুর্থ একটি ব্যবস্থার কথাও আমাদের চিন্তা করতে হবে। কোন্ ব্যবস্থাকে আমরা সাধারণভাবে সকল কিংবা প্রায় সকল রাষ্ট্রের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচনা করতে পারি? এটি হচ্ছে একটি বাস্তব প্রশ্ন এবং সংবিধানের প্রশ্ন নিয়ে যারা আলোচনা করেন তাদের অধিক সংখ্যকই অন্যান্য ক্ষেত্রে যত উত্তম দক্ষতা প্রদর্শন করুন না কেন, বাস্তবতার এই ক্ষেত্রে তাঁরা বিফল হন। কারণ, কেবল সর্বোত্তম নিয়ে আলোচনা করলে আমাদের চলবেনা। যেটি সম্ভব এবং যাকে সাধন করা সহজতর এবং সাধারণভাবে যেটি আয়ত্তের মধ্যে, তাকেও আমাদের বিবেচনার মধ্যে আনতে হবে।

কিন্তু এমন অনেক আছেন যাঁরা চরম সম্পূর্ণতার অন্বেষণেই নিজেদের নিবদ্ধ করেন। আবার অনেক আছেন যাঁরা একেবারে সর্বোত্তমের চিন্তা না করে এবং বাস্তব অন্যান্য ব্যবস্থার অপেক্ষা না করে শাসনব্যবস্থার একটি সাধারণ প্রকারের উপর জোর দেন এবং ল্যাসিডিমনিয় কিংবা অপর কোন ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন। কিন্তু যেটি প্রয়োজন সে হচ্ছে এমন একটি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা যেটিকে তার সংশ্লিষ্ট জনসাধারণ গ্রহণ করবে এবং বাস্তবে যা তারা পেয়েছে তার ভিত্তিতে এটিকে কার্যকর করতে পারবে বলে তারা অনুভব করে। কারণ বাস্তবে বিদ্যমান একটি ব্যবস্থাকে তার পায়ের উপর দাঁড় করাতে পারা একটি শাসন ব্যবস্থাকে নতুন করে একেবারে গোড়া থেকে তৈরি করার চেয়ে কম কঠিন কাজ নয়। এটি 'না-শেখা' 'তথা শেখা জিনিষকে বিস্মৃত হওয়ার মত ব্যাপার। প্রথমবারের কোন কিছু শেখার চেয়ে কঠিন হচ্ছে কোন কিছু শেখার পরে তাকে একেবারে ভুলে গিয়ে 'না শেখার' পর্যায়ে যাওয়া। কাজেই শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে যা বলা হয়েছে তার সঙ্গে এটিও যোগ করা অবশ্যক যে, রাজনীতিতে যাঁরা দক্ষ তাঁদের একটি করণীয় হচ্ছে বাস্তব রাষ্ট্রকেও উল্লিখিতভাবে সাহায্য প্রদান করা । কিন্তু শাসন ব্যবস্থা কত প্রকারের আছে এটি না জেনে এ কাজ করা সম্ভভ নয়। আজকাল অনেককে দেখা যায় যাঁরা বলেন যে, শাসন ব্যবস্থার প্রকার মাত্র দু'টি। তাদের একটি হচ্ছে একমাত্র গণতন্ত্র। অপরটি হচ্ছে একমাত্র কতিপয়ী বা চক্রতন্ত্র। কিন্তু এমন অভিমত সত্য নয়। এর ফলে বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার মধ্যকার পার্থক্যসমূহকে আমরা উপেক্ষা করি। আবার বিভিন্ন প্রকারে যে এদের বিন্যস্ত করা চলে, এই সত্যটিও অবজ্ঞাত হয়।

এগুলি বিশদভাবে বুঝার জন্য যে দক্ষতার আবশ্যক সেই দক্ষতার ভিত্তিতেই আমাদের রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ অনুধাবন করতে পারবেন, সর্বোত্তম আইন কি? এবং বিভিন্ন প্রকার শাসনব্যবস্থার কোন্‌টির জন্য কোন্ প্রকার আইন সর্বোত্তমভাবে উপযুক্ত। কারণ রীতি অনুযায়ী শাসনব্যবস্থার উপযোগী আইনকেই আমরা রচনা করব, আইনের উপযোগী শাসনব্যবস্থাকে নয়। এ দুটিকে আমরা এভাবে পৃথক করে দেখাতে পারি : সংবিধান বা শাসনতন্ত্র হচ্ছে ক্ষমতার পদগুলিকে বণ্টন করার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা বিশেষ। অধিকন্তু শাসনব্যবস্থায় নির্ধারিত হয় রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব কোথায় অবস্থিত এবং একটি সমাজবদ্ধ জনজীবনের আরাধ্য লক্ষ্য কি, সে বিষয় দুটিও। অপরদিকে সংবিধান থেকে

আইনের পার্থক্য এখানে যে, আইন হচ্ছে শাসকদের জন্য শাসনের এবং আইন ভঙ্গকারীদের দণ্ডদানের বিধানসমূহ। এ থেকে এটা পরিষ্কার যে, আইন রচনার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে শাসনব্যবস্থা কত প্রকারের হতে পারে তার সংখ্যা এবং তাদের একটি থেকে অপরটির পার্থক্য কোথায়—তার জ্ঞান দ্বারা কাজটি শুরু করা। এটা আমাদের বুঝতে হবে যে, সকল প্রকার কতিপয়ী বা চক্রতন্ত্রের জন্য এবং সকল প্রকার গণতন্ত্রের জন্য একই প্রকার আইন উত্তম বলে বিবেচিত হতে পারে না। কারণ কতিপয়ীতন্ত্র এবং গণতন্ত্র—এদের উভয়েরই একাধিক প্রকারভেদ রয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শাসনব্যবস্থার প্রকারভেদ : পুনরায় উল্লেখ

[ভাবগতভাবে যেটিকে আমরা সর্বোত্তম ব্যবস্থা বলব তারা শাসিত হবে সর্বোত্তমদের দ্বারা। এরূপ শাসকের সংখ্যা এক কিংবা একাধিক হতে পারে। এদেরকে রাজকীয় শাসন অথবা অভিজাতদের শাসন বলে অভিহিত করা যায়। কিন্তু যাকে 'পলিটি' বলা হচ্ছে সে ব্যবস্থা এরূপ নয়। 'পলিটি' হচ্ছে সাধারণভাবে সর্বোত্তম : সর্বপ্রকারে সর্বোত্তম নয়। এ ব্যবস্থা সহজে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে এই কারণে যে, অধিক সংখ্যক অধিবাসী এই ব্যবস্থাতে নাগরিক বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু অভিজাতদের শাসনব্যবস্থায় নাগরিকতাকে ন্যায়পরায়নতা, বুদ্ধি এবং সম্পত্তির যথেষ্টতার ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়।]

শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে গোড়াকার আলোচনাতে আমরা বিশ্লেষণ করে নিম্নোক্ত ছকটি নির্দিষ্ট করেছিলাম :

বিশুদ্ধ ব্যবস্থা : সংখ্যা তিনটি
রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং 'পলিটি'
বিচ্যুত ব্যবস্থা : সংখ্যা উপরোক্তরূপে তিনটি
রাজতন্ত্রের বিচ্যুতি : স্বৈরতন্ত্র,
অভিজাততন্ত্রের বিচ্যুতি : কতিপয় বা চক্রতন্ত্র,
'পলিটি'র বিচ্যুতি : গণতন্ত্র

অভিজাততন্ত্র এবং রাজতন্ত্রের আলোচনা ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে। (সর্বোত্তম ব্যবস্থার আলোচনা মূলত 'রাজতন্ত্র' এবং 'অভিজাততন্ত্র' শব্দ দুটির অর্থ নিরূপনেরই চেষ্টা। কারণ উভয় ব্যবস্থার লক্ষ্য অভিন্ন তথা ন্যায় এবং সমৃদ্ধিভিত্তিক শাসন।) এই দুই এর মধ্যকার পার্থক্যও আমরা উল্লেখ করেছি। তাছাড়া রাজতন্ত্র কখন্ গ্রহণ করা যায়, তাও নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কাজেই আলোচনার অবশিষ্ট রয়েছে 'পলিটি' এবং বাকি তিনটি, যথা ঃ কতিপয়তন্ত্র, গণতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র। এই বিচ্যুত ব্যবস্থার মধ্যে কোন্‌টি সবচেয়ে খারাপ এবং কোন্‌টি তার চেয়ে কম খারাপ—এটি আর আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। এর জবাব স্পষ্ট। কারণ, ব্যবস্থাগুলির মধ্যে যেটি প্রথম এবং সর্বোত্তম তার বিচ্যুত রূপটি অবশ্যই সবচেয়ে খারাপ। 'রাজতন্ত্র' কথাটি যদি সঠিক অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলে রাজতন্ত্রের অস্তিত্বের নিয়ামক হবে এই পদের অধিকারী ব্যক্তির সর্বোত্তম গুণ। এদিক থেকে স্বৈরতন্ত্র হবে সবচেয়ে খারাপ এবং পলিটি থেকে সর্বাধিক দূরত্বে অবস্থিত। তার পরবর্তী স্থান হবে কতিপয় বা চক্রতন্ত্রের। কারণ অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে এর পার্থক্য বিরাট। বিচ্যুতির ক্ষেত্রে

গণতন্ত্রকে বলা চলে সবচেয়ে কম আপত্তিকর ব্যবস্থা। আমার একজন পূর্বসূরী[১] এসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু আমার অভিমত থেকে ভিন্ন অভিমত তিনি পোষণ করেন। তাঁর অভিমত হচ্ছে, অপর সব ব্যবস্থাই যেখানে মোটামুটি উত্তম এবং কতিপয়তন্ত্র কিংবা অপর ব্যবস্থা বেশ কার্যোপযোগী, সেখানে গণতন্ত্র হচ্ছে সবচেয়ে খারাপ ব্যবস্থা। আমার অভিমত হচ্ছে, বিচ্যুত এই সব ব্যবস্থাগুলিই খারাপ এবং ভ্রান্ত। এবং এই সকল খারাপের মধ্যে বলতে গেলে গণতন্ত্রকে সর্বোত্তম বলতে হবে। এবং সেদিক থেকে এক কতিপয়তন্ত্রকে অপর কতিপয়তন্ত্র থেকে উত্তম বলার চেয়ে তাকে কম খারাপ বলাই সঙ্গত।

কিন্তু এই প্রশ্ন আপাতত থাক। তার চেয়ে বরঞ্চ আমরা নিম্নোক্তভাবে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করব : ১. শাসনব্যবস্থাসমূহের মধ্যকার পার্থক্য কি? কতিপয়তন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মধ্যেও যে প্রকারভেদ আছে, সেটি ধরে নিয়েই আমরা এ কথাটি বলছি। ২. সর্বোত্তম বাদে অপর কোন্ শাসনব্যবস্থাকে আমরা সর্বাধিক প্রচলিত এবং সাধারণভাবে গ্রাহ্য ব্যবস্থা বলে গণ্য করতে পারি? তাছাড়া এমন কোন ব্যবস্থা কি আছে যেটি সুগঠিত এবং সর্বোত্তম মানুষের হাতে দায়িত্ব দানের নীতির ভিত্তিতে রচিত, কিন্তু অধিকসংখ্যক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই যা প্রযোজ্য? এই শর্ত পূরণ করার মত শাসনব্যবস্থা কোন্‌টি? ৩. এর বাইরে শাসনব্যবস্থার মধ্যে কোন্‌টিকে আমরা কোন্ রাষ্ট্রের উপযুক্ত বলে গণ্য করব? কারণ এমন হতে পারে যে, কোন রাষ্ট্রের জন্য গণতন্ত্র উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে, এবং কোন রাষ্ট্রের জন্য কতিপয়তন্ত্র উপযুক্ত বলে বোধ হবে। ৪. যে আইনজ্ঞ এবং সংবিধানগুলি গঠন করবেন, গণতন্ত্র থেকে কতিপয়তন্ত্রের মত ব্যবস্থাতে উত্তরণে তাঁর পন্থা কি হবে? এবং পরিশেষে ৫. এগুলোর যথাসাধ্য আলোচনা যখন আমরা শেষ করব তখন এ প্রশ্নের আলোচনাও আমাদের পক্ষে আবশ্যক হবে যে, শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বার কারণগুলি কি এবং কি উপায়েই বা তারা কার্যকর থাকতে পারে। এক্ষেত্রে সাধারণ কারণ, এবং বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিশেষ কারণ এবং তার উৎসগুলিও আমাদের আলোচনা করতে হবে।

১. প্লেটো : পরিটিকাস বা স্টেটসম্যান

তৃতীয় অধ্যায়

শাসনব্যবস্থার সংখ্যাধিকের কারণ

শাসনব্যবস্থার সংখ্যাধিকের কারণ রাষ্ট্রের অংশসমূহের সংখ্যাধিকের মধ্যে নিহিত। আমরা প্রথমেই দেখি, সকল রাষ্ট্র গঠিত হয় কতগুলি পরিবার নিয়ে। আবার রাষ্ট্রের জনসমষ্টির মধ্যে এটিও দেখা যায় যে, এদের কিছু অংশ ধনবান, অপরে দরিদ্র কিংবা সামান্য উপায়ের মালিক। আবার আমরা এও দেখি, ধনী এবং দরিদ্র, এদের এক যেখানে সশস্ত্র অপর সেখানে নিরস্ত্র। তাছাড়া আমরা এও দেখতে পাই যে, সাধারণ অধিবাসীগণ প্রধানতঃ তিনটি জীবিকার মধ্যে বিভক্ত, যথা ঃ কৃষিকার্য, ব্যবসায় বাণিজ্য এবং দৈহিক পরিশ্রমজীবী শ্রমিক। উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যেও পার্থক্য বিদ্যমান। তাদের সম্পদের পরিমাণ এবং পরিধির ভিত্তিতেই এই পার্থক্য। এজন্যই আমরা কাউকে হয়ত জিজ্ঞাসা করি, তার অশ্বের সংখ্যা ক'টি? (অশ্বপালন বেশ ব্যয়বহুল পেশা। পুরোনকালে দেখা যায়, যে-নগরের অশ্বারোহী বাহিনী থাকত সে নগরগুলি ছিল সমৃদ্ধ কতিপয়তন্ত্রী শাসনভুক্ত। এমন রাষ্ট্রগুলি তাদের সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযানে অশ্বকে ব্যবহার করত। চ্যালচিস এবং ইরিত্রিয়াতে যেমন, এশিয়া খণ্ডে ম্যাগনেশিয়া এবং অন্য অশ্বপালন অঞ্চলে তেমনি আমরা এর সাক্ষৎ পাই।) অর্থ ব্যতীত পার্থক্যের সূচকের মধ্যে রয়েছে, জন্ম, ন্যায়ধর্ম এবং অপরাপর গুণসমূহ যাকে আমরা অভিজাততন্ত্রের অন্তর্গত বলে গণ্য করি। রাষ্ট্রের মূল উপাদানগুলির বিশ্লেষণকালে আমরা এগুলির উল্লেখ করেছি। কোন কোন সময়ে এরূপ দেখা গেছে যে এই সকল শ্রেণীর অধিবাসী নাগরিকতায় অংশ নিচ্ছে। কোন সময়ে এদের সংখ্যা অধিক হচ্ছে, কোন সময়ে সংখ্যা কম হচ্ছে। কাজেই এ থেকে এ কথা পরিষ্কার যে, রাষ্ট্রগুলির উদানসমূহ যেমন এক থেকে অপরে প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন হতে পারে, তেমনি শাসন ব্যবস্থাগুলিও এক থেকে অপরে প্রকৃতিগতভাবে পৃথক হতে পারে। শাসন ব্যবস্থা তথা শাসনতন্ত্র হচ্ছে ক্ষমতাসম্পন্ন পদের বিন্যাস ব্যবস্থা এবং এই বিন্যাস বণ্টন সর্বত্রই সম্পাদিত হয় রাষ্ট্রের অংশগ্রহণকারীদের ক্ষমতা এবং প্রভাবের অসমতার ভিত্তিতে অথবা সম্পদবান এবং সম্পদহীনদের মধ্যে সমতার ভিত্তিতে। এ কারণে ঊর্ধ্বতন ক্ষমতা এবং অংশসমূহের যত প্রকার বিন্যাসকরণ সম্ভব শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে পার্থক্যের তত প্রকারকে আমরা অনিবার্য বলতে পারি। তবে এদের সবগুলিকে দু'টি শিরোনামে বিভক্ত করা যায়। হাওয়াকে যেমন দক্ষিণে এবং উত্তরে বলে প্রধানত ভাগ করে অপরগুলিকে এদের ব্যতিক্রম বলে আমরা অনেক সময় অভিহিত করি, তেমনি শাসনব্যবস্থাকে প্রধান দু'টি প্রকার যথা গণতান্ত্রিক এবং কতিপয়তান্ত্রিক হিসাবে আমরা বিভক্ত করতে পারি। কারণ, অভিজাততন্ত্র যেমন এক প্রকার কতিপয়তন্ত্র, তেমনি যাকে আমরা পলিটি বলেছি সেও এক প্রকার গণতন্ত্র। এ প্রায় বাতাসের প্রবাহের ন্যায়। পশ্চিমের বাতাস উত্তরের সঙ্গে চলে এবং পূর্বের বাতাস দক্ষিণের সঙ্গে। এমন দ্বৈতভাব অনেকে সঙ্গীতের মধ্যে দেখতে পান।

তাঁরা বলেন সঙ্গীতের প্রকার দু'টি—যথা ডোরীয় এবং ফ্রিজীয়। সঙ্গীতের সকল সৃষ্টিকে তারা এই দু'টির একটি কিংবা অপরটি বলে অভিহিত করেন। শাসনতন্ত্র বিচারের ক্ষেত্রেও মানুষের প্রবণতা এরূপ। কিন্তু আমরা বলব, আমাদের বিভাগকরণের পদ্ধতিটি অধিকতর উত্তম। সেটি অধিকতর সঠিকও বটে। সেখানে কতিপয়তন্ত্র এবং গণতন্ত্রকে আমরা ব্যতিক্রম বা বিচ্যুতি বলে অভিহিত করেছি। সুগঠিত রাষ্ট্রের প্রকার হচ্ছে দু'টি কিংবা বলা চলে একটি। বাকি সবগুলি হচ্ছে বিচ্যুতি বা ব্যতিক্রম। হয় তারা সর্বোত্তম থেকে বিচ্যুত অথবা তারা সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ মিশ্রিত ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত। একেবারে চক্রবদ্ধ এবং নির্যাতনমূলক হলে এই বিচ্যুতিকে আমরা বলেছি কতিপয়তন্ত্র। কিংবা ব্যবস্থাটি শিথিল এবং চপলমতি হলে আমরা তাকে বলেছি গণতন্ত্র।

চতুর্থ অধ্যায়

গণতন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্রের মূল পার্থক্য : শাসকের সংখ্যা নয়, অর্থনৈতিক অবস্থা

গণতন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্রকে আজকাল লোকে সাধারণত যেভাবে সংজ্ঞায়িত করে তার একটি ক্রটি এই যে, জনগণ যেখানে সার্বভৌম সেখানে গণতন্ত্র এবং কতিপয় যেখানে সার্বভৌম সেখানে কতিপয়তন্ত্র : এরূপ অতি সহজ এবং চরম কথায় তারা এই শাসনব্যবস্থাগুলির ব্যাখ্যা প্রদান করে। এতে এরূপ বোধ হয় যেন কতিপয়তন্ত্র কিংবা অপর যে কোন শাসনব্যবস্থাতেই সংখ্যাধিকগণ সার্বভৌম থাকে না। কিন্তু ব্যাপারটি তা নয়। মনে করা যাক একটি নগরীতে এক হাজার তিনশত নাগরিক আছে। এদের মধ্যে এক হাজার জন ধনবান। এবং শাসনের ক্ষেত্র অপর তিনশত জন দরিদ্রের কোন অংশ নাই। এ তিনশত জনও স্বাধীন নাগরিক। অপরদের সঙ্গে ধনের ক্ষেত্র ব্যতীত তারা সমান। এমন ক্ষেত্রে কারুর বলা উচিত নয় যে, তেরশতের এই নগরীর ব্যবস্থা হচ্ছে গণতান্ত্রিক। অপরদিকে মনে করা যাক, যারা দরিদ্র তারা সংখ্যায় অল্প। তথাপি তারা শাসন ক্ষমতা দখল করেছে এবং সংখ্যায় অধিক যে ধনবান তাদের উপর শাসন করছে। এমন ক্ষেত্রে ধনবানদের যদি শাসনে আদৌ কোন অংশ দেওয়া না হয় তাহলে এব্যবস্থাকেও কতিপয়তন্ত্র বলা সঙ্গত হবে না। আমাদের বরঞ্চ এ কথা বলাই সঙ্গত যে, দরিদ্রগণ যেখানে সার্বভৌম সেখানকার ব্যবস্থা হচ্ছে গণতন্ত্র এবং ধনবানগণ যেখানে সার্বভৌম সেখানকার ব্যবস্থা হচ্ছে কতিপয়তন্ত্র। অবশ্য বাস্তবে যে বিষয়টিকে আমরা দেখি সে হচ্ছে এই যে, দরিদ্রগণ সংখ্যায় অধিক এবং ধনিকগণ সংখ্যায় অল্প অধিক হচ্ছে দরিদ্র, অল্প হচ্ছে ধনিক। কিংবা মনে করা যাক ইথিওপিয়াতে যেরূপ নিয়ম আছে সেরূপে শাসন ক্ষমতা দেহের দৈর্ঘ্যের ভিত্তিতে বন্টিত হয় কিংবা যারা সুন্দর পুরুষ তারাই শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয়, তাহলে এমন ব্যবস্থাকেও আমরা কতিপয়তন্ত্র বলে অভিহিত করব। কারণ অতি দীর্ঘ পুরুষ কিংবা অতিসুন্দর পুরুষদের সংখ্যা কতিপয়। এর ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থাকে আমরা উপযুক্তরূপে সজ্ঞায়িত করতে পারিনে। গণতন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্র, উভয় ব্যবস্থাই বিভিন্ন অংশের অধিবাসী সমন্বয়ে গঠিত। কিন্তু যেখানে দরিদ্রগণ সংখ্যায় অধিক নয়, অধিক সখ্যক হচ্ছে যারা ধনবান এবং তাদের উপর দরিদ্রগণ শাসন করছে তাহলে সেই ব্যবস্থাকে যেমন আমরা কতিপয়তন্ত্র বলে অভিহিত করতে পারিনে, তেমনি যেখানে ধনিকগণ সংখ্যাধিক এবং শাসনের অধিকারী সে ব্যবস্থাকেও আমরা গণতন্ত্র বলে অভিহিত করতে পারিনে। আমাদের এ দৃষ্টান্তগুলি একেবারে কাল্পনিক নয়। সংখ্যাল্প দরিদ্রের শাসনের দৃষ্টান্ত আমরা এ্যাপোলোনিয়া এবং থ্রেসে দেখতে পাই। কারণ এই উভয় নগরীতে দরিদ্রের সংখ্যা অবশিষ্টের চেয়ে কম ছিল এবং শাসনক্ষমতা এই আদি বসতি স্থাপনকারী বিশিষ্ট বংশের সংখ্যাল্প লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। অপর দৃষ্টান্তের সাক্ষাৎ পাই আমরা

কলোফোন-এ। এ নগরীতে লিডিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পূর্বে অধিক সংখ্যক অধিবাসীদের হাতে বিরাট পরিমাণ সম্পদ সংগৃহীত হয়েছিল। কাজেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হবে সেটি যেখানে স্বাধীন নাগরিকদের মধ্যে যারা দরিদ্র তারা তাদের সংখ্যার আধিক্যের শক্তিতে নগরীর সরকার পরিচালনা করে এবং কতিপয়তন্ত্র হচ্ছে সেই ব্যবস্থা যেখানে সংখ্যাল্প ধনিক এবং অভিজাতদের হাতে সরকার পরিচালনা ন্যস্ত থাকে।

শাসনব্যবস্থা অনেক প্রকারের। এবং এই প্রকারভেদের কারণ কি তা আমরা উল্লেখ করেছি। আমরা যেখান থেকে শুরু করে, [দ্রঃ অধ্যায় ৩, ৪র্থ পুস্তক] এবার দেখাব যে শাসনব্যবস্থার প্রকার যা বলা হয়েছে, তার চেয়েও অধিক। এগুলি কি এবং তাদের অস্তিত্বের কারণ কি, তা আমরা উল্লেখ করব। আমরা একথা বলেছি, কোন রাষ্ট্র অবিমিশ্র কোন একক সত্তা নয়। প্রত্যেক রাষ্ট্রই বহু অংশ দ্বারা গঠিত। মনে করা যাক আমাদের আলোচনার বিষয় শাসনব্যবস্থার প্রকার নয়। আমাদের আলোচ্য বিষয় পশু জীবনের প্রকারভেদ। তাহলে আমাদের জিজ্ঞাসার প্রথম প্রশ্নটি হত : যে কোন পশুর জীবনধারনের অপরিহার্য শর্তটি কি? সেই অপরিহার্য অংশগুলির মধ্যে আমাদের অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে পশুর সংবেদনের, খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহের এবং সেগুলিকে জারিত করে দেহের একীভূত করার অঙ্গগুলিকে। আমাদের উল্লেখ করতে হবে তার মুখ এবং পাকস্থলীর এবং তাছাড়া তার চলাচলের উপায় স্বরূপ অপর অঙ্গগুলিকে। এই যদি আমাদের আলোচনার বিষয় হত এবং তাদের মুখ, পাকস্থলী, সংবেদনঅঙ্গ এবং চলাচলর অঙ্গ সমূহের মধ্যে পার্থক্য থাকত তাহলে এই অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলির বিভিন্ন প্রকার সম্মিলনীতে বিভিন্ন প্রকার পশুর সৃষ্টি হত। কারণ জৈবিকভাবে কোন একটি প্রজাতি পশুর বিভিন্ন প্রকার মুখ কিংবা কর্ন থাকা সম্ভব নয়। কাজেই সমস্ত প্রকার অঙ্গ প্রতঙ্গের হিসাব নিয়ে আমরা যদি তাদের বিভিন্ন প্রকারে সম্মিলিত করি তাহলে বিভিন্ন প্রকার পশু-প্রজাতির সৃষ্টি হবে এবং এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে যতপ্রকার সম্মিলিত করা সম্ভব হবে ততপ্রকার পশু জীবনেরই আমরা সাক্ষাৎ পাব। এই নীতিটিকে আমরা আমাদের আলোচ্য শাসনব্যবস্থার উপর প্রয়োগ করতে পারি। কারণ রাষ্ট্রও একাধিক অঙ্গ নয়ে গঠিত। এটি প্রায়শঃ উচ্চারিত একটি কথা। এবং এই অংশগুলি হচ্ছে " ১. জমি কর্ষণকারী মানুষ অর্থাৎ নগরীর অধিক সংখ্যক অধিবাসী যারা খাদ্য সামগ্রীর উৎপাদনকার্যের সঙ্গে জড়িত ; ২. তাছাড়া রয়েছে সেই অংশ যাদের আমরা বলি 'বানাউসিক', অর্থাৎ নগরীর বিভিন্নকার্যে অপরিহার্য অধিবাসী। (এদের পুনর্বিভাগ করে একেবারে অপরিহার্য অংশ উচ্চতর স্বাচ্ছন্দ্য এবং সংস্কৃতি সৃষ্টিতে যাদের আবশ্যক তেমন অংশে আমরা নির্দিষ্ট করতে পারি।) ; ৩. ব্যবসায়ী অংশ। ব্যবসায়ী অংশ বলতে আমরা বুঝাব তাদেরকে যারা পাইকারী এবং খুচরা ক্রয়-বিক্রয়মূলক কার্যে তাদের সময় নিয়োগ করে; ৪. ভাড়াটে মজুরদের অংশ; এবং ৫. সেই শ্রেণীর লোক যারা যুদ্ধের সময় নগরীকে রক্ষা করবে। এই শেষের অংশটি অপর অংশগুলির মতোই অপরিহার্য। অন্যথায় নগরবাসীদের আক্রমণকারীদের দয়ার ভিত্তিতে জীবনযাপন করতে হবে। কিন্তু তেমন রাষ্ট্রকে রাষ্ট্র বলা যায় না। কারণ যারা অপরের দাস তাদের উপর 'রাষ্ট্র' শব্দটির ব্যবহার চলে না। একটি রাষ্ট্র হচ্ছে স্বাধীন এবং স্বপরিচালিত। কিন্তু একজন দাস আদৌ তা নয়।

[এ্যারিস্টট্‌লের এই শেষ বাক্যটির লক্ষ্য প্লেটোর 'রিপাবলিক' : ২য় পুস্তক, যেখানে প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের প্রাথমিক গঠনে সৈন্যদের কোন উল্লেখ করেন নি। এ্যারিস্টট্‌ল এই বিষয়টিকে এবার বিস্তারিত করেছেন।]

এ কারণে এই প্রশ্নটির ক্ষেত্রে 'রিপাবলিক'-এর আলোচনা আমার কাছে যতোনা যুক্তিগ্রাহ্য তার চেয়ে অধিক চতুর বলে বোধ হয়। কারণ আমরা দেখি সক্রেটিস বলেছেন একটি নগরীর গঠনে বস্ত্রবয়নকারী, কৃষিকার্য নির্বাহকারী, কর্মকার এবং নির্মাণকারী—এই চার শ্রেণীর মানুষের আবশ্যক। কিন্তু তার পরে দেখা যাচ্ছে, এই শ্রেণীসমূহ যথেষ্ট নয় বিবেচনা করে সক্রেটিস ধাতব শিল্পী, গৃহপালিত পশুরক্ষক এবং ব্যবসায়ী ও খুচরা বিক্রয়কারীকেও যুক্ত করছেন। এই হচ্ছে নগরীর প্রাথমিক গঠন। এবং এই গঠন থেকে মনে হয় যেন এরূপ রাষ্ট্রের গঠন হচ্ছে ন্যূনতমভাবে জীবন ধারণের জন্য, এর চেয়ে উচ্চতর কোন আদর্শের জন্য নয়। তাছাড়া রাষ্ট্রের জন্য চর্মশিল্পীর প্রয়োজন এবং কৃষিকার্য নির্বাহকারীর প্রয়োজনের মধ্যেও কোন পার্থক্য নাই। এরা উভয় সমান। দেশ রক্ষাকারী বাহিনীর প্রশ্নটিও রাষ্ট্রের আয়তন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার মাধ্যমে প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধার পূর্বে উত্থাপিত হচ্ছে না। তাছাড়া বিরোধের ক্ষেত্রে মীমাংসার জন্য বিচারের দায়িত্ব পালন করার মত লোকের প্রয়োজনর কথাও বাদ দেওয়া যায় না। প্রথমোক্ত চারটি শ্রেণী কিংবা অপর কোন শ্রেণীর মধ্যে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক। তদুপরি জীবন ধারণকারী কোন প্রাণীর মনকে যদি দেহের চেয়েও অধিক গুরুত্বপুর্ণ অংশ বলে আমরা বিবেচনা করি তাহলে নগরীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ অংশকে কেবলমাত্র জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অংশগুলির চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করতে হবে। এর দ্বারা আমি নাগরিকদের বিক্রম বা সংগ্রাম করার গুণ এবং বিচারকার্য নিষ্পন্ন করার প্রয়োজনীয় গুণসমূহকে বুঝাতে চাচ্ছি। এবং সর্বোপরি আসে বুদ্ধিগত ক্ষমতা তথা কার্যক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় প্রজ্ঞার কথা। এই সকল গুণের সাক্ষাৎ আমরা বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে পাই, কিংবা একই ব্যক্তির মধ্যে পাই, আমার যুক্তির ক্ষেত্রে সেটি বড় কথা নয়। সচরাচর এমনও দেখা যায় যে, একই ব্যক্তি যেমন কৃষিকার্য নিষ্পন্ন করছে, তেমনি সে অস্ত্রও বহন করছে। এবং এই উভয়কে আমরা যদি রাষ্ট্রের অংশ বলে বিবেচনা করি তাহল এটা পরিষ্কার যে, রাষ্ট্র গঠনের গোড়া থেকেই সামরিক উপাদানটিকেও রাষ্ট্রের অংশ বলে আমাদের গণ্য করতে হবে।

সম্পদ দ্বারা যারা সেবা করে তারা সপ্তম শ্রণী। আমরা তাদের বলেছি সম্পদবান। অষ্টম শ্রণীর অন্তর্ভুক্ত করতে পারি আমরা তাদের যারা রাষ্ট্রকর্তৃক নিযুক্ত হয় এবং সরকারের বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থেকে রাষ্ট্রীয় কার্যে অবদান রাখে। প্রশাসনগত কর্মচারী ব্যতীত একটি রাষ্ট্র চলতে পারে না এবং রাষ্ট্রের মধ্যে এরূপ লোক থাকা আবশ্যক যারা এই সকল পদে অধিষ্ঠিত হয়ে ধারাবাহিকভাবে কিংবা পালাক্রমে প্রশাসনিক কার্য নিষ্পন্ন করবে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য পরিষদের সদস্য এবং বিচারকার্যের জন্য বিচারকদের কথা আমরা উল্লেখ করেছি। এবার তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে সকল শ্রেণীর আমরা উল্লেখ করেছি তাদের সকলে যদি রাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় হয় এবং নৈতিকতা এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে যদি তাদের কাজ নিষ্পন্ন করতে হয় তাহলে এটা বুঝতে পারা যায় যে, রাষ্ট্রীয় কার্যে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ন্যায়বান থাকা অধিকতরভাবে আবশ্যক। অপর যে গুণাবলীর উল্লেখ করা হয়েছে সে সকল গুণ একই লোকের মধ্যে থাকতে পারে। একই লোক সৈনিক, কৃষিকার্য নির্বাহী এবং কারিগর হতে পারে। বিচারক এবং রাজনৈতিক উপদেশক তারাও এক হতে পারে। কিন্তু এক ব্যক্তি একই সঙ্গে ধনবান এবং দরিদ্র হতে পারে না। এবং এ কারণেই রাষ্ট্রের অধিবাসীদের প্রধান শ্রেণী বিভাগ হচ্ছে সম্পদবান এবং সম্পদহীন—এই দুই এর মধ্যে। এবং যেহেতু এদের একটি শ্রেণী প্রধানতঃ সংখ্যায় অল্প এবং অপর শ্রেণী সংখ্যায় অধিক সে কারণে এদের পরস্পরবিরোধী দু'টি শ্রেণী বলে মনে হয়। আর সে কারণেই শাসনব্যবস্থাগুলির মধ্যে এই

দু'টি শ্রেণীর একটি কিংবা অপরটির প্রাধান্যের প্রতিফলন ঘটে এবং তা থেকে গণতন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্র বা ধনিকতন্ত্র এই দু'টি প্রকার শাসনতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে।

শাসনব্যবস্থা অনেক রকম হতে পারে এবং কেন অনেক রকম হতে পারে, সে কথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। এবার আমরা দেখাতে চাই যে, কতিপয়তন্ত্র এবং গণতন্ত্র—এরও প্রকার কেবল একটি নয়। এরা একাধিক প্রকারের হতে পারে। অবশ্য এ কথাটিও পূর্বে যা বলা হয়েছে তা থেকেই পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। অধিবাসীদের মধ্যে আমরা দু'রকমের লোক পাই। এক হচ্ছে সাধারণ লোক। এদের আমরা বলি 'ডিমস' বা জনসাধারণ। অপর অংশ হচ্ছে উচ্চস্তরের লোক। এদেরকে আমরা বলি বিশিষ্ট বা অভিজাত। কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে আবার আমরা বিভিন্ন রকম বা শ্রেণীর লোকের সাক্ষাৎ পাই। যেমন সাধারণ লোকের মধ্যে একদল আছে যারা কৃষিকার্যে নিযুক্ত। আর একদল আছে যাদের কার্য হস্তশিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তাছাড়াও বাজারের ক্রয়-বিক্রয়ে নিযুক্ত লোকের অংশ রয়েছে। যারা সমুদ্রে যাতায়াত করে এবং সামুদ্রিক বিভিন্ন কাজে যারা লিপ্ত তাদের কথাও উল্লেখযোগ্য। তারা লড়াই করে কিংবা সামুদ্রিক বানিজ্য পরিচালনা করে, যাত্রীদের বহন করে কিংবা মৎস্য শিকার করে। (অনেক জায়গাতে অধিবাসীদের বিরাট অংশ সমুদ্রের সঙ্গে জড়িত নানা কাজে নিযুক্ত থাকে। টারেণটাম এবং বাইজানটিয়ামে মৎস্যজীবীদের সংখ্যাপ্রাচুর্য দেখা যায় ; এজিনা এবং চিওস-এ সংখ্যাধিক্য দেখা যায় ব্যবসায়ীদের। এথেন্সে যুদ্ধ জাহাজে কর্মরত আছে অনেক লোক। এবং টেনেডস-এ যাত্রী বহনই প্রধান কাজ।) এই সমস্ত শ্রেণীর সঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে পারি শ্রমিকশ্রেণীকে। তাছাড়া উল্লেখ করা যায় তাদের কথা যাদের সম্পদের পরিমাণ এত অল্প যে তাদের হাতে কোন অবসর থাকে না। এ ছাড়া উল্লেখ করা যায় যারা জন্মগতভাবে স্বাধীন নাগরিক নয় তাদের কথা। এরকম অন্য লোকেরও আমরা উল্লেখ করতে পারি। উচ্চশ্রেণীর লোক বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিচয় হচ্ছে এই যে, তারা অর্থ, জন্ম, গুণ, শিক্ষা এবং অনুরূপ অন্যান্য বিষয়ে বিশিষ্ট।

> [এ্যারিস্টটল গণতন্ত্রকে নরমপন্থা থেকে চরমপন্থা পর্যন্ত নানা উপভাগে বিভক্ত করেছেন। এ্যারিস্টটলের আলোচনায় 'আইন' এবং 'আদেশ'-এর মধ্যে যে স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায় সে পার্থক্যকে এথেন্সের জীবনে দেখা যায় না। সেদিক থেকে এটা যতোনা বাস্তব অবস্থার পরিচায়ক তার চেয়ে বেশি এ্যারিস্টটলের নিজের অনুমোদনের চিহ্ন।]

গণতন্ত্রের প্রকারভেদের মধ্যে সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সেই ব্যবস্থা যার গঠনের ভিত্তি হচ্ছে সাম্যের নীতি। এ রকম ব্যবস্থায় আইনের নির্দেশ হচ্ছে যে, ধনবানদের অধিক কোন সুবিধা দরিদ্রগণ ভোগ করবে না। এদের কোন শ্রেণী অপর শ্রেণীর উপর আধিপত্য করবে না। উভয়ই একেবারে সমান হবে। কারণ গণতন্ত্রেই বিশেষভাবে স্বাধীনতা এবং সাম্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, প্রচলিত এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে সমগ্র শাসনব্যবস্থায় সমান অধিকারই মাত্র তার উপযুক্ত অবস্থাটি তৈরি করতে পারে। কিন্তু জনসাধারণই সংখ্যায় অধিক এবং সংখ্যাধিকের সিদ্ধান্তই কার্যকর হয়। কিন্তু অসমতার এই অবস্থা গণতন্ত্রকে নাকচ করে দেয় না।

গণতন্ত্রকে আবার 'কিছু পরিমাণ সম্পদ থাকা কিংবা না-থাকার' ভিত্তিতেও শ্রেণীবদ্ধ করা যায়। এর আর একটি বিভাগ সম্ভব এই শাসনব্যবস্থা কি পরিমাণে আইনভিত্তিক পরিচালিত এবং কি পরিমাণে নয়, সে হিসাবে। এভাবে ধারাক্রমে গণতন্ত্রের যে ক'টি রূপ আমরা নির্দিষ্ট করতে পারি সেগুলি হচ্ছে :

১. রাষ্ট্রীয় দায়িত্বলাভের ভিত্তি হচ্ছে সম্পদের পরিমাণ। এর পরিমাণ কম—কিন্তু পরিমাণটি সময়ান্তরে পর্যালোচনাযোগ্য এ কারণে যে, যাদের সম্পদের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কমে যাবে তারা পদ লাভের যোগ্য আর থাকবে না ;
২. জন্মগত শর্তটি পূরণ করতে ব্যর্থ না হলে সকল নাগরিক পদ লাভের যোগ্য, কিন্তু বিধানসমূহ হচ্ছে সার্বভৌম ;
৩. নাগরিক হলে প্রত্যেকেই পদলাভের যোগ্য ; কিন্তু আইন সার্বভৌম ;
৪. পদের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী শাসনব্যবস্থারই অনুরূপ কিন্তু এ ব্যবস্থায় আইন নয়, জনতাই সার্বভৌম। এমন অবস্থার উদ্ভব হয় যখন প্রস্তাব বা আদেশের আকারে প্রকাশিত জনতার ইচ্ছা আইনের অনুশাসনকে লঙ্ঘন করে কার্যকর হয়। জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা তথা বাগ্মীরাই এমন অবস্থার সৃষ্টি করে থাকে।

কোন রাষ্ট্র যখন আইনের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিকভাবে শাসিত হয় তখন বক্তৃতাবাগীশদের কোন জায়গা থাকে না। তখন সার্বোত্তম নাগরিকই দায়িত্বের পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারে। কিন্তু যেখানে আইন সার্বভৌম নয় সেখানেই বক্তৃতা-বাগীশদের উদ্ভব। তখন জনগণ রাজকীয় চরিত্র ধারণ করে এবং মনে হয় যেন বহু ব্যক্তির সমন্বয়ে একজন শাসক তৈরি হয়েছে। বহুমাত্রিক, যৌথ বা ব্যক্তিগত শাসনকে অধম শাসন বলতে গিয়ে হোমার কি ইঙ্গিত করেছেন, সে বিষয়ে আমি সঠিক জানিনে। কিন্তু এটি পরিষ্কার যে, রাজকীয় যে জনতা আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়, সে জনতার শাসন যখন আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না তখন চরম ক্ষমতা ধারণ করা তার লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। তখন সে স্বৈরাচারীর চরিত্র গ্রহণ করে এবং যারা তাকে তুষ্ট করতে পারে তাদের সে পদোন্নতি এবং সম্মান দান করে। এ কারণে এরূপ গণতন্ত্র রাজতন্ত্রের বিচ্যুতিতে যে স্বৈরাচারের সৃষ্টি হয় ঠিক সেই স্বৈরাচারেরই সদৃশ এক শাসনব্যবস্থা। এই উভয় ব্যবস্থায় উত্তম নাগরিকগণ পদদলিত হয়। এবং একের প্রস্তাব অপরের নির্দেশ বৈ অপর কিছু নয়। স্বৈরাচারীর যেমন থাকে চাটুকার, গণতন্ত্রের তেমনি থাকে বক্তৃতাবাগীশ বক্তা। উভয় ক্ষেত্রে এরা শাসককে প্রভাবিত করে। চাটুকারগণ স্বৈরশাসকের উপর প্রভাব বিস্তারিত করে, বক্তৃতাবাগীশগণ জনসাধারণকে মোহিত করে। বক্তৃতাবাগীশদের পক্ষে এ কার্য করা সম্ভব হয় এ কারণে যে, প্রতিটি প্রশ্নই জনসম্মেলনে উপস্থিত করা হয় এবং এই জনসম্মেলনের নির্দেশ লিখিত আইনকে লঙ্ঘন করে। এর ফলে এদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কারণ জনগণ যেখানে সকলকে শাসন করছে, বক্তৃতাবাগীশরা সেখানে জনগণের অভিমতকেই শাসন করছে। কারণ সংখ্যাধিকেরা বাগ্মীদের নেতৃত্বকেই অনুসরণ করে। তদুপরি জনগণ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত কর্মচারীদের ক্ষমতাপ্রয়োগের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করে যখন বলে, ক্ষমতা জনসাধারণের, তখন এই অযুহাতটি ব্যবহার করে বক্তৃতা-বাগীশ দায়িত্বের পদই বিলুপ্ত করে দেয়। কাজেই এর ফলে কেউ যদি বলে যে, এরূপ গণতন্ত্র আদৌ কোন শাসনব্যবস্থা নয় তাহলে আমার মতে সে সঠিক অভিমতই ব্যক্ত করে। আইন যেখানে শাসন করে না সেখানে কোন শাসনব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকে না। সকলের উপরই আইনের শাসন থাকা আবশ্যক। কর্মচারীগণ নির্দেশ দান করবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। এমন হলেই মাত্র একটি শাসনব্যবস্থা বা শাসনতন্ত্রের কথা আমরা বলতে পারি। কাজেই গণতন্ত্রকে যদি আমরা স্বীকৃত শাসনব্যবস্থার একটি বলে অভিহিত করতে চাই তাহলে যেখানে সবকিছুর শাসক হচ্ছে গণ-ইচ্ছা সেখানে কোন যথার্থ গণতন্ত্র রয়েছে, এমন কথা আমরা বলতে পারিনে। কারণ কোন আদেশের সার্বজনীন কোন প্রযুক্ততা থাকতে পারে না। গণতন্ত্রের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে এই আলোচনাই যথেষ্ট।

পঞ্চম অধ্যায়

কতিপয়তন্ত্রের প্রকারভেদ

[গণতন্ত্রের অনুরূপ কতিপয়তন্ত্রের প্রকারসমূহের একটি তালিকা এবার তৈরি করা হচ্ছে এবং প্রসঙ্গক্রমে বিপ্লব এবং প্রতিবিপ্লবের উপর কিছু মন্তব্যের সাক্ষাৎও এখানে পাওয়া যাচ্ছে।]

কতিপয়তন্ত্রের চারটি প্রকাশ নির্দিষ্ট করা যায় :

১. সরকারী পদলাভের যোগ্যতা এখানে সম্পদের যোগ্যতা দ্বারা সীমাবদ্ধ। ফলে যারা তেমন স্বচ্ছল নয় তারা সংখ্যায় অধিক হওয়ার কারণে শাসনে তাদের কোন অংশগ্রহণ থাকে না। কিন্তু যে সম্পদ অর্জন করতে পারে সে শাসনেও অংশগ্রহণ করতে পারে।

২. সম্পদের যোগ্যতার শর্তটি পরিমাণগতভাবে এই ব্যবস্থায় এত উচ্চহারে নির্দিষ্ট করা হয় যে তার ফলে সকল পদ পূরণ করা সম্ভব হয় না। এবং এই শূন্যতাকে কর্মচারীগণ নিজেরাই সংযোজনের মাধ্যমে পূরণ করে ফেলে। (এই সংযোজনের কাজটি যদি সকলের মধ্য থেকে করা হয় তাহলে পদ্ধতিটিকে অভিজাততান্ত্রিক বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু এটি সীমাবদ্ধ কোন অংশ থেকে করা হলে পদ্ধতিটি গোষ্ঠীতন্ত্রের চরিত্র ধারণ করে।)

৩. বংশানুক্রমিক ব্যবস্থা। এখানে পুত্র পিতার পদে অধিষ্ঠিত হয়।

৪. এ ব্যবস্থাটিও বংশগত। এবং এখানে কর্মচারীগণই উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী, আইনের ক্ষমতা সার্বভৌম নয়। কতিপয়তন্ত্রী শাসন ব্যবস্থার মধ্যে এই চরম কতিপয়তন্ত্র রাজতন্ত্রের মধ্যে স্বৈরতন্ত্রের অনুরূপ এবং অব্যবহিতপূর্বে আলোচিত চরম গণতন্ত্রের অবস্থানই ধারণ করে। এরূপ কতিপয়তন্ত্রকে অনেক সময়ে 'ক্ষমতাবানদের ব্যবস্থা' বলেও অভিহিত করা হয়।

এভাবে কতিপয়তন্ত্র এবং গণতন্ত্রের প্রকারভেদের তালিকা আমরা সম্পন্ন করতে পারি। কিন্তু বাস্তবে যে, অবস্থা তালিকাকে অতিক্রম করে যেতে পারে সে কথাটি আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। এরূপ দৃষ্টান্ত প্রচুর পাওয়া যায়, যেখানে আইন অনুযায়ী শাসন ব্যবস্থাটি গণতান্ত্রিক নয়। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রথা এবং পরিচর্যার পদ্ধতির কারণে ব্যবস্থাটি তার কার্যক্রমে গণতান্ত্রিক। তেমনি আইনগতভাবে গণতান্ত্রিক হয়েও বাস্তবে প্রথা ও পরিচর্যার কারণে ব্যবস্থাটি কতিপয়তন্ত্রী চরিত্রই ধারণ করেছে। এরূপ ঘটার সম্ভাবনা বিশেষভাবে বিপ্লবের মাধ্যমে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনকালেই দেখা যায়। কারণ একদিকে

নাগরিকগণ যেমন তাদের পুরাতন জীবনযাত্রাকে একচোটে পরিত্যাগ করতে পারেনা তেমনি প্রতিপক্ষের উপর বিজয় থেকে তারা অল্পমাত্রার সুযোগ লাভেও সন্তুষ্ট থাকে। এর ফলস্বরূপ বিপ্লবের পূর্বে যে সমস্ত আইন প্রচলিত ছিল সেগুলির প্রয়োগ চলতে থাকে কিন্তু ক্ষমতার অবস্থান ঘটে তাদের হাতে যারা শাসনব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার কাজে নিজেদের নিযুক্ত করেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গণতন্ত্রের প্রকারভেদ

যে আলোচনা আমরা ইতিমধ্যে করেছি তাতে দেখা যায়, গণতন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্রেরও বিভিন্নরূপ থাকতে পারে। কারণ রাষ্ট্রের সমগ্র জনসমষ্টিকে যদি বিবেচনা করি তাহলে দেখা যায় হয়ত বা সকল অধিবাসীরই শাসনকার্যে অংশ রয়েছে, কিংবা কিছু অংশের রাষ্ট্রশাসনে অধিকার আছে কিন্তু অপরদের নাই। দেখা যায়, যে-রাষ্ট্রের কৃষিকার্য নির্বাহীদের সংখ্যা তাদের মোটামুটি পরিমাণে সম্পদ থাকার কারণে প্রধান, সেখানকার শাসন ব্যবস্থা আইনের ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। কারণ কাজ করে তাদের জীবন নির্বাহ করতে হয় এবং তাদের হাতে এমন অবসর থাকেনা যে অবসরে তারা রাষ্ট্রীয় পদও গ্রহণ করতে পারে। এবং সে কারণে পরিচালনার জন্য তারা আইনকে প্রতিষ্ঠিত করে এবং নিজেরা জনপরিষদের প্রয়োজনীয় সভাগুলিতেই যোগদান করে। আবার অধিবাসীদের বাকি অংশেরও যখন যথেষ্ট পরিমাণে সম্পদ অর্জিত হয় তখন তারাও আইন অনুযায়ী শাসনকার্যে অংশগ্রহণের অধিকার প্রাপ্ত হয়। এদিক থেকে বলা যায়, সম্পদের সকল মালিকগণই শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করে এবং সে কারণে এ শাসনব্যবস্থা একটি গণতন্ত্র। কারণ সকলে যেখানে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করেনা সেটি কতিপয়তন্ত্র। কিন্তু রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে সময় দান রাষ্ট্রের রাজস্ব থেকে সাহায্য ব্যতিরেকে সম্ভব হয় না। এটাও গণতন্ত্রের একটি প্রকার। এবং এর কারণের কথাও আমরা উল্লেখ করেছি।

অপর বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সম্পত্তি ব্যতীত জন্মের ভিত্তিতে শাসনের অধিকার আর একপ্রকার গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটায়। এখানে অধিবাসীগণ জন্মগতভাবে স্বাধীন নাগরিক। এখানে জন্মের ক্ষেত্রে যদি কোন প্রশ্নের অবকাশ না থাকে তবে সকলেই রাষ্ট্রীয় পদ লাভ করতে পারে। সকলের বলতে তাদেরকেই বুঝান হচ্ছে যাদের রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে ব্যয় করার মত সময় আছে। এমন গণতন্ত্রে আইন হচ্ছে সার্বভৌম। কারণ এখানে কোন রাজস্বের প্রশ্ন নাই। আবার এমনও হতে পারে যে, শাসনে অংশগ্রহণের অধিকার সকলের আছে কিন্তু যে সকল কারণের কথা বলা হয়েছে তার জন্য তারা সকলে বাস্তবে অংশ গ্রহণ করেনা। সেজন্য এখানেও আইনই হচ্ছে সার্বভৌম। চতুর্থ এবং চরম যে ধরনের গণতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে তার উদ্ভব ঘটে সর্বশেষে। এর মূলে রয়েছে নগরসমূহের বৃদ্ধি। কেবল যে এগুলি গোড়াকার চেয়ে বৃহত্তর হয়েছে তাই নয়। এদের রাজস্বের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে সকল নাগরিকের পক্ষেই শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। এমন কি যাদের নিজেদের কোন সম্পত্তি নাই তারাও রাষ্ট্রের আইন এবং প্রশাসনগত কাজে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হচ্ছে। কারণ এ সকল কাজের জন্য তারা রাষ্ট্র থেকে মাহিনা লাভ করছে। এর ফল পড়ে সাধারণ মানুষের উপরই সবচেয়ে বেশি। তাদের নিজেদের সম্পত্তিগত কোন ঝক্কি-ঝামেলা নাই। অপর দিকে যারা সম্পত্তিবান তাদের নিজেদের সম্পত্তির

পরিচর্যায় সময় ব্যয় করতে হয়। এ কারণে অনেক সময়েই তারা জনপরিষদ কিংবা আদালতের কাজে যোগদান করতে সক্ষম হয়না। কাজেই এই চতুর্থ প্রকার গণতন্ত্রে আইন নয় বরঞ্চ সম্পত্তিহীন জনসমষ্টিই সার্বভৌম হয়ে দাঁড়ায়।

চার প্রকার গণতন্ত্র সম্পর্কে অধিক আলোচনা আর না করলে চলে। কতিপয়তন্ত্রের মধ্যেও ধারাবাহিকভাবে এই ধরনের বিভিন্নতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। প্রথমত সম্পত্তিবানদের সংখ্যা অধিক হতে পারে, তাদের মোট পরিমাণও বেশি না হতে পারে, এবং কোন একজনের পরিমাণও অত্যধিক না হতে পারে। এক্ষেত্রে সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার সকল সম্পত্তিবানদের জন্যই উন্মুক্ত। এবং যেহেতু এখানে নাগরিকসংস্থার সদস্যের সংখ্যা অধিক সে কারণে ব্যক্তির চেয়ে আইনের শাসনই এখানে প্রধান। একজনের শাসন থেকে এ ব্যবস্থা অবশ্যই বিরাটভাবে পৃথক। এখানে নাগরিকদের সম্পত্তির পরিমাণ এত অধিক নয় যে তারা তার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করতে পারে এবং কোন কাজ বাদেই তারা জীবনধারণ করতে পারে। আবার তাদের সম্পত্তির পরিমাণ এত কমও নয় যে রাষ্ট্র থেকে তাদের পরিপোষণের আবশ্যকতা রয়েছে। সে কারণে আইনের শাসনই যে প্রধান হওয়া উত্তম, তাদের নিজেদের শাসন নয়, এমন চিন্তা তাদের মনে জাগ্রত হতে বাধ্য। আর একটি প্রকার এমন হতে পারে যে, আগের দৃষ্টান্তের চেয়ে সম্পত্তির মালিকদের সংখ্যা কম, কিন্তু তাদের সম্পত্তির পরিমাণ অধিক। এমন ক্ষেত্রে আমরা দ্বিতীয় ধরনের কতিপয়তন্ত্রের সাক্ষাৎ পাই। তাদের হাতে অধিকতর ক্ষমতা ন্যস্ত হওয়ায় এ ব্যবস্থার শাসকগণ নিজেদের আর্থিক অবস্থাকে অধিকতর লাভজনক করার আশা পোষণ করে। এ কারণে তারা নিয়ম তৈরি করে যেন তাদের নিজেদের পছন্দ করা লোক ব্যতীত অপর কেউ নাগরিকতা লাভ করতে না পারে। কিন্তু তাদের সংখ্যা যথেষ্ট না হওয়ার কারণে এমন নিষেধকে তারা আইন রচনা করে বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা করে। নিষেধের এই প্রক্রিয়াকে যখন তীব্রতর করা হয় এবং সম্পত্তিবানদের সংখ্যা যখন আরো হ্রাস পায় এবং তাদের সম্পদের পরিমাণও বৃদ্ধি পায় তখন কতিপয়তন্ত্রের তৃতীয় স্তরটি উপস্থিত হয়। এই ব্যবস্থায় সম্পত্তিবানগণ নিজেদের হাতে রাষ্ট্রের ক্ষমতাসম্পন্ন পদগুলি সীমাবদ্ধ করে রাখে। অবশ্য তারা এমন একটি আইন রচনা করে যাতে পিতার মৃত্যুর পরে পুত্র শাসনক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। এর চরম অবস্থা ঘটে তখন যখন এই শাসকরা সম্পদ এবং প্রভাব, উভয়ত অপর সকলকে অতিক্রম করে যায়। ক্ষমতাধরগোষ্ঠীর এরূপ শাসন প্রায় একের শাসনের রূপ গ্রহণ করে। এমন ব্যবস্থায় এই গোষ্ঠীর সদস্যগণই শাসন করে, আইন শাসন করেনা। এটাকেই আমরা চতুর্থ এবং চরম কতিপয়তন্ত্র বা চক্রতন্ত্র বলে অভিহিত করতে পারি। বলা চলে, এটি হচ্ছে চরমগণতন্ত্রের অনুরূপ আর একটি চরম ব্যবস্থা।

সপ্তম অধ্যায়

অভিজাতন্ত্রের বিষয়ে

[নিম্নের অধ্যায়তে অভিজাততন্ত্রের উল্লেখ করা হলেও অভিজাততন্ত্রের আলোচনা ৩য় পুস্তকেই সমাপ্ত হয়েছে। অবশ্য এ্যারিস্টট্‌লের নিকট অভিজাততান্ত্রিক শাসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সর্বোত্তমের শাসন। একারণে কতিপয়তন্ত্র বা গণতন্ত্রের কোন ব্যবস্থাও যখন উত্তমের উপর জোর প্রদান করে তখন সে শাসনব্যবস্থার উপরও সাধারণভাবে অভিজাততন্ত্র কথাটি প্রয়োগের একটি প্রবণতা আমরা এই আলোচনাতে দেখতে পাই। এরকম ব্যবস্থা কিছুটা মিশ্রিত ব্যবস্থা বটে—কিন্তু তা 'পলিটি' ব্যবস্থার অনুরূপ নয়।]

গণতন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্র ব্যতীত আরো দুটি ব্যবস্থা আছে। তার একটি হচ্ছে অভিজাততন্ত্র। এটিকে চারটি তথা রাজতন্ত্র, কতিপয়তন্ত্র, গণতন্ত্র, অভিজাতন্ত্র—এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অপরটি হচ্ছে তালিকার পঞ্চম ব্যবস্থা। এবং এটিকে আমরা অভিহিত করেছি 'পলিটি' বলে। (এটা অবশ্যই ঠিক যে, এই ব্যবস্থাটিকে বাস্তবে খুব কমই দেখা যায়। এ কারণে শাসন ব্যবস্থার যারা তালিকা তৈরী করেন তারা প্রায়শঃ এটিকে উপেক্ষা করেন এবং প্লেটোর ন্যায়, শাসনব্যবস্থাকে চারটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন।) অভিজাততন্ত্রের আলোচনা আমর ইতিপূর্বে সম্পন্ন করেছি। অভিজাততন্ত্রকে 'সর্বোত্তমের শাসন' বলা হয়। এবং এ নামটি যথার্থ। তবে এই নামটি দেওয়া উচিত সর্বোত্তম ন্যায় ধর্ম সম্পন্ন ব্যবস্থার উপর, কাল্পনিক কোন মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিবেচিত উত্তমের উপর নয়। কারণ ন্যায় ধর্মের একেবারে সর্বোত্তমের ক্ষেত্রেই মাত্র উত্তম মানুষ এবং উত্তম নাগরিক অভিন্ন হতে পারে। অন্যক্ষেত্রে একজন মানুষ উত্তম বলে বিবেচিত হয় কোন বিশেষ সমাজব্যবস্থার ভিত্তিতে। যা হোক, অভিজাততন্ত্র দ্বারা কতিপয়তন্ত্র এবং 'পলিটি'—এ উভয় থেকে ভিন্নতর একটি ব্যবস্থাকে বুঝান হয়। অর্থাৎ এ ব্যবস্থায় সরকারী পদে নির্বাচন ঘটে গুণের ভিত্তিতে, সম্পদের ভিত্তিতে নয়। অপর দু'টি ব্যবস্থা থেকে এ ব্যবস্থা ভিন্নতর। কারণ, যে সমস্ত শাসনব্যবস্থা প্রকাশ্যভাবে নিজেকে গুণভিত্তিক বলে ঘোষণা করেনা, সে শাসনব্যবস্থাতেও এমন বিশিষ্টগুণের নাগরিকগণ থাকে যাদের উত্তম মানুষ বলে স্বীকার করা হয়। এদিক থেকে কার্থেজের ন্যায় যে শাসনব্যবস্থায় সম্পদ, ন্যায় ধর্ম এবং জনসাধারণের মঙ্গল—এই তিন প্রকার উদ্দেশ্যের উপরই জোর দেওয়া হয় সে শাসনব্যবস্থাকেও আমরা অভিজাততান্ত্রিক বলে অভিহিত করতে পারি। কথাটি স্পারটার উপরও প্রয়োগ করা চলে। কারণ, এ ব্যবস্থার লক্ষ্য দু'টি,—যথা ন্যায় ধর্ম এবং জনসাধারণের মঙ্গল সাধন। আবার গণতন্ত্র এবং ন্যায়ের মিশ্রণও এখানে দেখা যায়। কাজেই আমরা বলতে পারি, যথার্থরূপে যেটি অভিজাততন্ত্র সে ব্যবস্থা ব্যতীত এই দু'টি যেমন বিবেচ্য, তেমনি পলিটির শাসনে কতিপয়ের প্রবণতা দেখা দিলে যে তৃতীয় ব্যবস্থাটির উদ্ভব ঘটে সে ব্যবস্থাটিও উল্লেখযোগ্য।

অষ্টম অধ্যায়

পলিটির আলোচনা

যাকে আমরা 'পলিটি' বলি সেই শাসনব্যবস্থা এবং স্বৈরতন্ত্রের আলোচনা এখনো বাকি রয়েছে। 'পলিটি'র আলোচনার স্থান এখানে নির্দিষ্ট করা হয়েছে এই কারণে যে, এটি কোন বিচ্যুত ব্যবস্থা নয়। অভিজাততন্ত্রের প্রকারগুলিকেও আমরা বিচ্যুত ব্যবস্থা বলব না। বিচ্যুত ব্যবস্থা হচ্ছে সেগুলি যেগুলি সর্বোত্তম ব্যবস্থা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। সে দিক থেকে অভিজাততন্ত্রের যে অপ্রধান রূপগুলো সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি সেগুলিও বিচ্যুত। স্বৈরতন্ত্রের আলোচনা সর্বশেষে করাই উত্তম। কারণ অপর ব্যবস্থাগুলির সঙ্গে তুলনা করলে স্বৈরতন্ত্র যথার্থরূপে কোন ব্যবস্থা নয়। কিন্তু আমাদের আলোচনা ব্যবস্থা নিয়ে। যাই হোক কোন্‌টির অবস্থান কোথায় তা উল্লেখের পরে পলিটির আলোচনা আমরা শুরু করতে পারি। কতিপয়তন্ত্র এবং গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা আমরা দিয়েছি তাতে পলিটির অর্থ এবং কার্যক্রম আমাদের নিকট অধিকতর পরিষ্কার হয়েছে, একথা বলা যায়। কারণ এক কথায় বলতে গেলে, পলিটি হচ্ছে কতিপয়তন্ত্র এবং গণতন্ত্রের একটি মিশ্রিতরূপ।

> [নিম্নের আলোচনাতে এ্যারিস্টট্‌লের একটি সমস্যা উল্লেখযোগ্য। তিনি একদিকে যেমন পলিটি শব্দটিকে শিক্ষা, সুজন্ম প্রভৃতি কতিপয়তন্ত্রের উত্তম বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণের উপর প্রয়োগ করতে চাচ্ছেন, এবং উত্তমের কারণে এদের অভিজাততন্ত্র হিসাবে অভিহিত করা যায় বলে মনে করছেন, অপরদিকে পলিটির প্রকারগুলিকে তিনি অভিজাততন্ত্র বলে অভিহিত করতে দ্বিধাবোধ করছেন এই কারণে যে, এই ব্যবস্থাগুলিকে ইতিপূর্বে গণতন্ত্র বলে অভিহিত করা হয়েছে। আবার সর্বোত্তমের শাসনের কিছু বৈশিষ্ট্যও যে পলিটির মধ্যে রয়েছে, সে কথা উল্লেখ করারও তিনি প্রয়োজন বোধ করছেন।]

বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের যে মিশ্রণের মধ্যে গণতন্ত্রের প্রবণতা প্রকাশ পায় সেগুলিকে সাধারণত 'পলিটি' বলে আখ্যায়িত করা হয়। আবার এগুলি যখন কতিপয়তন্ত্রের অভিমুখী হয় তখন তাদের অভিজাততন্ত্র বলে অভিহিত করা হয়। এর কারণ শিক্ষা এবং সুজন্ম সচ্ছলদের মধ্যেই অধিক দেখা যায়। তাছাড়া অসন্তুষ্টরা যা পাওয়ার জন্য অপরাধ কার্যে লিপ্ত হয়, সচ্ছলদের সে সব জিনিষ অর্জিত থাকে। এ কারণে এরা উচ্চশ্রেণীর এবং সুশিক্ষিত বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ বলে পরিচিত হয়। এবং যেহেতু অভিজাততন্ত্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চ পদগুলিকে নাগরিকদের মধ্যে সর্বোত্তমদের প্রদান করা সে কারণে কতিপয়তন্ত্রকেও মোটামুটি শিক্ষিতদের শাসন বলে মনে করা হয। তবে একটা জিনিষ আমার একেবারে অসম্ভব বোধ হয়। আমি মনে করিনে, যে-রাষ্ট্র উত্তম দ্বারা নয়, অধম দ্বারা শাসিত সে ব্যবস্থা যে সুশাসিত এবং আইন দ্বারা পরিচালিত হবে, এমন আমি মনে করিনে। তেমনি

যে রাষ্ট্রের উত্তম আইন নাই সে রাষ্ট্র সর্বোত্তমের রাষ্ট্র হতে পারে, তাও আমি মনে করিনে। যে রাষ্ট্রের আইন উত্তম কিন্তু আইনকে কেউ মান্য করে না, সে রাষ্ট্রও উত্তম এবং আইনগত সরকার-সম্পন্ন রাষ্ট্র নয়। কাজেই উত্তম ব্যবস্থার দু'টি উপাদানকে আমরা দেখতে পাই। এর একটি হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত আইনের প্রতি বাধ্যতা, অপরটি হচ্ছে উত্তম আইনের প্রতি বাধ্যতা। (কারণ অধম আইনের প্রতি বাধ্যতাও খুব সম্ভব।) তবে বাধ্যতা, অবস্থার প্রেক্ষিতে যে আইন সর্বোত্তম কিংবা যে আইন চরমরূপে উত্তম তার প্রতি প্রদর্শন করা যায়।

অভিজাততন্ত্রের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় পদের বন্টন পদের প্রাপকদের উৎকর্ষ এবং ন্যায়ের ভিত্তিতে হওয়া সঙ্গত। সম্পদ যেমন কতিপয়তন্ত্রের এবং স্বাধীনতা যেমন গণতন্ত্রের, তেমনি ন্যায় হচ্ছে অভিজাততন্ত্রের পরিচালনাকারী বৈশিষ্ট্য। (এ ক্ষেত্রে সংখ্যাধিকের নীতিটি আসল বৈশিষ্ট্য নয়। এ বৈশিষ্ট্য তিনটি ব্যবস্থাতেই বর্তমান। কতিপয়তন্ত্র হোক, কিংবা অভিজাততন্ত্র বা গণতন্ত্র, সকল ব্যবস্থাতেই শাসনে অংশগ্রহণকারীদের অধিকাংশ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে সিদ্ধান্তই মান্য হয়।) প্রায় নগরীতে দেখা যায়, শাসনগত যে পলিটি সে আসলে যতোটা না অভিজাততান্ত্রিক, তার চাইতে অধিক অভিজাততান্ত্রিক বলে তার সম্পর্কে দাবী করা হয়। কতিপয়তন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মিশ্রণের লক্ষ্য হচ্ছে সম্পদবান এবং দরিদ্র তথা অর্থ এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা, এই উভয়ের স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা। কিন্তু যে ব্যবস্থা কতিপয়তান্ত্রিক তার পক্ষে অভিজাততান্ত্রিক বলে দাবী করতে কোন অসুবিধা হয় না। কারণ, প্রায় সর্বত্রই সম্পদবান এবং সুশিক্ষিত উচ্চতর শ্রেণীকে একই রকম মানুষ বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু যেহেতু 'আমি একজন স্বাধীন মানুষ' 'আমি একজন সম্পদবান ব্যক্তি' এবং 'আমি চরিত্র এবং যোগ্যতার অধিকারী' কোন শাসনব্যবস্থায় এমন দাবী করার ভিত্তি হচ্ছে তিনটি সেজন্য একথা পরিষ্কার যে 'পলিটি' কথাটিকে 'সম্পদবান এবং দরিদ্র' এই দুই এর মিশ্রণের উপর যেমন প্রয়োগ করা সঙ্গত, তেমনি অভিজাততন্ত্র কথাটিকে 'সম্পদবান, দরিদ্র এবং ন্যায়পরায়ণ মানুষ'—এই তিনের মিশ্রণের উপরই প্রয়োগ করা উচিত। অবশ্য এটিকে আমি যথার্থ এবং প্রথম স্তরের অভিজাততন্ত্র বলে বিবেচনা করছিনে; এটি হচ্ছে দ্বিতীয় স্তরের অভিজাততন্ত্র।

এভাবে এটি দেখান গেল যে, রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্র ব্যতীত আরো শাসনব্যবস্থা রয়েছে। এবং এই শাসনব্যবস্থাগুলো কি তাও আমরা দেখলাম। তাছাড়া একটি অভিজাততন্ত্র আর একটি অভিজাততন্ত্র থেকে কিংবা পলিটি কিভাবে অভিজাততন্ত্র থেকে পৃথক হতে পারে, সেটিও আমরা দেখিয়েছি। অবশ্য পৃথক মানে সম্পর্কহীন নয়। এ দু'টি ঘনিষ্ঠভাবেই সম্পর্কিত।

নবম অধ্যায়

পলিটির সঙ্গে গণতন্ত্রের সম্পর্ক কি?

যে আলোচনা আমরা করেছি তার ভিত্তিতে এবার আমাদের দেখা আবশ্যক, যাকে আমরা পলিটি বলেছি সে ব্যবস্থার সঙ্গে গণতন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্রের সম্পর্ক কি। এ আলোচনাতে গণতন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্রের আপন আপন বৈশিষ্ট্যও প্রকাশিত হবে। কারণ এদের পার্থক্যগুলিকে যেমন আমাদের নির্দিষ্ট করতে হবে, তেমনি পার্থক্য নির্ধারিত করে তাদের উভয় থেকে উপাদান গ্রহণ করে তিনটি উপায়ের কোন একটির ভিত্তিতে তাদের মিশ্রিত করতে হবে। এই উপায়গুলির মধ্যে প্রথমে উভয় থেকে এদের মিশ্রিত আইনকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। এর দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা বলতে পারি, কতিপয়তন্ত্রে সম্পদবানরা বিচারালয়ে বিচারকের দায়িত্ব পালনের জন্য উপস্থিত না হলে তাদের জরিমানা করার একটি বিধি আছে। এবং যারা কম অর্থবান তাদের উপস্থিতির জন্য কোন অর্থ দিবারও ব্যবস্থা নাই। অপরদিকে গণতন্ত্রে বিচারকের দায়িত্ব পালনের জন্য অনুপস্থিত থাকলে ধনবানদের উপর জরিমানা ধার্য করার কোন বিধি নাই এবং যারা অসচ্ছল রাষ্ট্রীয় কাজের জন্য তাদের অর্থদানের ব্যবস্থা আছে। এই উভয় ব্যবস্থার একটি সমন্বয় সাধন করা যায় এবং তাতে একটি মধ্যব্যবস্থার উদ্ভব ঘটবে। তার ফলে পলিটিকে যেরূপ আমরা দু'টি ব্যবস্থার মিশ্রণ বলে অভিহিত করেছি তার উদ্দেশ্য এতে সাধিত হবে। উভয়কে একত্র করার এটি একটি উপায়। দ্বিতীয় উপায় হচ্ছে, উভয় ব্যবস্থার মধ্যবর্তী কিছু উপাদানকে গ্রহণ করা। যেমন, গণতন্ত্রে জাতীয় পরিষদের সদস্যপদের জন্য সম্পত্তিগত কোন শর্তের বিধান নাই। (থাকলেও তার পরিমাণ সামান্য।) অপরদিকে কতিপয়তন্ত্রে এরূপ সম্পত্তির শর্ত উঁচু পরিমাণে নির্ধারিত করা হয়। এর কোনটিই গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত নয়। কিন্তু এদের একটি মধ্যস্তর নির্দিষ্ট করা চলে। তৃতীয় উপায় হচ্ছে দু'টি ব্যবস্থায় যে সব বিধান রয়েছে তার মধ্যে কতিপয়তন্ত্র থেকে এক প্রস্ত এবং গণতন্ত্র থেকে আর এক প্রস্ত বিধান আমরা গ্রহণ করতে পারি। যেমন পদপূরণ করার ক্ষেত্রটির দৃষ্টান্ত ধরা যায়। এখানে লটারীর মাধ্যমে পদপূরণকে গণতান্ত্রিক বলা হয় এবং বাছাই-এর মাধ্যমে পদ পূরণকে কতিপয়তান্ত্রিক বলা হয়। অন্য কথায় সম্পত্তির শর্ত থাকাকে কতিপয়তান্ত্রিক এবং এমন শর্ত না থাকাকে গণতান্ত্রিক বলা হয়। এমন ক্ষেত্রে উভয় ব্যবস্থা থেকে একটি করে বিধিকে গ্রহণ করা চলে : কর্মচারীদের কতিপয়তান্ত্রিক ব্যবস্থা মত বাছাই করা যেতে পারে এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সম্পত্তি না থাকার ব্যাপারটিও গৃহীত হতে পারে। এতে শাসনব্যবস্থাটি যেমন পলিটির মত হবে, তেমনি তাতে অভিজাততন্ত্রের বৈশিষ্ট্যও থাকবে।

উপায় সম্পর্কে অধিক আলোচনা থাক। এরূপ মিশ্রণের গুণাগুণ সম্পর্কে এবার আলাপ করা যাক। এমন মিশ্রণের ফলে যে ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটবে তাকে যদি আমরা গণতন্ত্র কিংবা কতিপয়তন্ত্র বলে অভিহিত করতে পারি, তাহলে মিশ্রণটি উত্তম। মিশ্রণের গুণের কারণেই

এদের একটি কিংবা অপরটির উদ্ভ ঘটতে পারে। মধ্যম অবস্থার ক্ষেত্রেও ব্যাপারটি তাই। মধ্যমের মধ্যে উভয়েরই সাক্ষৎ পাওয়া যায়। ল্যাসিডিমনীয় শাসন ব্যবস্থায় এই দ্বৈত ধারণার প্রকাশ দেখা যায়। অনেকে এটিকে একটি গণতন্ত্র বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। কারণ এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য গণতান্ত্রিক। যথা, এর শিক্ষাব্যবস্থা। এর শিক্ষাব্যবস্থায় ধনবানদের সন্তানগণ যে পরিচর্যা লাভ করে, দরিদ্রদের সন্তানগণও সেই একই পরিচর্যা এবং শিক্ষা লাভ করে।' এবং শিশুরা যখন বড় হয় তখনো তাদের মধ্যে ধনী এবং দরিদ্র বলে কোন বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। সামাজিক ভোজনালয়ে খাদ্য ব্যবস্থায় কোন ভেদ নাই এবং ধনবানগণ যে পরিচ্ছদ পরিধান করে, দরিদ্রগণের পক্ষেও সেই একই পরিধেয় লাভ করা সম্ভব। তাছাড়া প্রবীণদের পরিষদের সদস্যদের জনসাধারণ নির্বাচিত করে। ইফর হিসাবে সাধারণ নাগরিক নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য। এবং এই দু'টি হচ্ছে রাষ্ট্রের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। অপরদিকে অনেকে এই ব্যবস্থাকে বলেন কতিপয়তন্ত্র—কারণ এর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কতিপয়তন্ত্রী। এদের মধ্যে রয়েছে লটারী গ্রহণ না করা, সকল সরকারী কর্মচারীদের নির্বাচিত করা, মৃত্যুদণ্ড প্রদান বা নির্বাসনে প্রেরণের ক্ষমতা কতিপয়ের হাতে সীমাবদ্ধ থাকা প্রভৃতি। আসলে যে শাসনব্যবস্থা কতিপয়তন্ত্র এবং গণতন্ত্রের সুসমন্বয় দ্বারা গঠিত সে ব্যবস্থা যেমন উভয়েরই সদৃশ হবে তেমনি কোনটিরই সদৃশ বোধ হবে না। এবং এর রক্ষা ব্যবস্থাও আত্মশক্তির ভিত্তিতে হতে হবে, বাইরের শক্তির ভিত্তিতে নয়। এবং সেজন্য এমন ব্যবস্থার পক্ষের লোক যখন বাইরে অধিক এবং ভিতরে কম হয় তখন এর আত্মরক্ষার শক্তি বিনষ্ট হয়। (যে কোন অধম শাসনব্যবস্থাতেই এমন অবস্থার উদ্ভব ঘটতে পারে।) বিশেষ করে যখন রাষ্ট্রের অধিবাসীদের কোন অংশ ভিন্নতর কোন শাসনব্যবস্থা গ্রহণের মনোভাবও প্রদর্শন করে না তখন পরিস্থিতি এরূপ দাঁড়ায়। যা হোক, পলিটি কিভাবে গঠিত হওয়া উচিত এবং কোন্‌গুলিকে অভিজাততন্ত্র বলা হয়—এসব বিষয়ে আলোচনা আমাদের নিষ্পন্ন হল, একথা আমরা বলতে পারি।

দশম অধ্যায়

স্বৈরতন্ত্রের বিষয়ে

স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কেও কিছু আলোচনা করার কথা আমরা বলেছিলাম। কিন্তু সে কারণে নয় যে, স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কে অনেক কিছু বলার আছে। বরঞ্চ সে এ কারণে য, শাসনব্যবস্থাগুলির মধ্যে এরও উল্লেখ থাকা আবশ্যক। শাসনব্যবস্থাসমূহের যে তালিকা আমরা তৈরি করেছি তার মধ্যে এরও একটি স্থান আছে। আমাদের এই আলোচনার এক অংশে আমরা রাজকীয় শাসন সম্পর্কে, বিশেষ করে সাধারণ অর্থে রাজকীয় শাসন একটি রাষ্ট্রের জন্য উত্তম কিংবা উত্তম নয়, তা নিয়ে কথা বলেছি। এবং রাজাদের নিযুক্ত করা হবে কিনা এবং কাদের মধ্য থেকে রাজাদের নিযুক্ত করা হবে—এ সব প্রশ্নও আলোচিত হয়েছে। রাজতন্ত্র আলোচনার সময়ে আমরা দু'রকম স্বৈরতন্ত্রেরও উল্লেখ করেছি। কারণ, একজন স্বৈরশাসক যেরূপ ক্ষমতাধারণ করে তা রাজার শাসনেরই অনুরূপ। তাছাড়া উভয় শঅসন আইনভিত্তিকও হতে পারে। (এর দৃষ্টান্ত অ-গ্রিকদের মধ্য থেকে দেওয়া যায়। এদের মধ্যে দেখা যায়, তাদের একক শাসককে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়ে তারা নির্বাচিত করছে। প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যেও 'এসিমেটি' নামে এরূপ একক শাসন বা নির্বাচিত স্বৈরশাসকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।) কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের যে দু'টি প্রকারের আমরা উল্লেখ করেছি তাদের একটি থেকে অপরটির পার্থক্য আছে। এদের মধ্যে যেটি অধিকতরভাবে রাজকীয় ধরনের তার শাসন যেমন আইনগত, তেমনি প্রজাদের আনুগত্যও স্বেচ্ছামূলক। কিন্তু অপরটি যথার্থই স্বৈরতন্ত্র। এখানে স্বৈরশাসকের ইচ্ছামাফিক শাসনকার্য পরিচালিত হয়। আবার একটি তৃতীয় ধরণের স্বৈরতন্ত্রের কথাও আমরা উল্লখ করতে পারি। এটি হচ্ছে একেবারে চরম প্রকারের স্বৈরতন্ত্র। এ শাসন হচ্ছে রাজতন্ত্রের একেবারে বিপরীত। এ ব্যবস্থায় শাসককে কোন জবাবদিহী করতে হয় না এবং সে যাদের উপর শাসন করে তারা সকলে তার সমান কিংবা তার চেয়ে উচ্চতর স্তরের। সে শাসন করে নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য, শাসিতের স্বার্থের জন্য নয়। এমন শাসকই হচ্ছে একেবারে স্বৈরশাসক। এটিই হচ্ছে তৃতীয় প্রকারের স্বৈরতন্ত্র। কোন মানুষ, সে যদি স্বাধীন নাগরিক হয় তাহলে, স্বেচ্ছায় এমন শাসকের বশ্যতা স্বীকার করে না। যে যা হোক, স্বৈরতন্ত্রের প্রকারগুলি এবং তাদের ভিত্তির কথা আমরা এভাবে উল্লেখ করলাম।

একাদশ অধ্যায়

পলিটি সম্পর্কে আরো কিছু কথা : মধ্যশ্রেণীর শাসনই হচ্ছে সর্বোত্তম

[নিম্নের অধ্যায় ১১-তে আমরা দেখি এ্যারিস্টট্‌ল পুনরায় 'পলিটি'র উল্লেখ করছেন এবং তার পক্ষে বিভিন্ন যুক্তি প্রদান করছেন। তাঁর যুক্তির ভিত্তি হচ্ছে 'মধ্যমই উত্তম'-তাঁর এই প্রখ্যাত নীতি। এই নীতি থেকে একটি মধ্যম প্রকারের শাসনব্যবস্থাতে যেতে তাঁর কোন অসুবিধা হচ্ছে না। কিন্তু এ ব্যবস্থাকে নিরঙ্কুশ রাজকীয় শাসনের পক্ষে যুক্তি প্রদানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করা কষ্টকর ব্যাপার বটে। মধ্যম প্রকারের শাসনব্যবস্থা গ্রীকদের সংঘাত-বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক জীবনে খুবই দুষ্প্রাপ্য ছিল। এরূপ একটিমাত্র শাসনব্যবস্থার কথা জানেন বলে এ্যারিস্টট্‌ল উল্লেখ করছেন এবং সে ব্যবস্থা হচ্ছে বিধানদাতা সলোনের ব্যবস্থা।]

প্রশ্ন হচ্ছে, সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা কি এবং অধিকসংখ্যক রাষ্ট্র এবং অধিকসংখ্যক মানুষের জন্য সর্বোত্তম জীবন বলতে কি বুঝায়? এই কথাটি বলার সময়ে মানুষ বলতে আমি তাদের কথাই বলতে চাচ্ছি যাদের ন্যায়ের মান সাধারণ মানুষের ঊর্ধে নয়, যারা যে শিক্ষার জন্য আগ্রহ পোষণ করে সে শিক্ষার জন্য বড় রকমের কোন দক্ষতা কিংবা বড় রকমের কোন সম্পদের প্রয়োজন পড়ে না। দ্বিতীয়ত, এ শাসনব্যবস্থা এমন যেটিকে আমরা সর্বাধিক সংখ্যক নগরীর উপর প্রয়োগযোগ্য বলে মনে করি। কিন্তু যে সব অভিজাততন্ত্র নিয়ে আমরা এতক্ষণ আলোচনা করেছি তার দ্বারা এ সকল শর্ত পূরণ হতে পারে না। অভিজাততন্ত্র যদি, যাকে আমরা 'পলিটি' বলেছি, তার নিকটবর্তী না হয় তাহলে তাকে আমরা অধিকসংখ্যক নগরীর আয়ত্তযোগ্য বলে ভাবতে পারিনে। (উভয় যখন অভিজাততান্ত্রিক নীতি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করে তখন আমরা দু'টিকে এক নামে অভিহিত করতে পরি।) এই সকল প্রশ্নের সিদ্ধান্ত একটি প্রাথমিক নীতির উপর নির্ভর করছে। আমাদের 'নীতিশাস্ত্রে' যখন বলেছিলাম 'মধ্যমই উত্তম' বা 'মধ্যমই ন্যায়' এবং সুখী জীবনের অর্থ হচ্ছে স্বাধীন, নির্বাধ এবং ন্যায়পরায়ণ জীবন তখন সে কথা যদি যথার্থ হয়ে থাকে তবে সর্বোত্তম জীবনের অর্থ হবে দুই চরমের মধ্যবর্তী অবস্থানের জীবন এবং তেমন জীবন উভয়প্রান্তের জন্যই আয়ত্তযোগ্য হবে। এই একই নীতিকে আমরা রাষ্ট্র বা নগরীর উত্তম কিংবা অধম হওয়ার উপরও প্রয়োগযোগ্য বলে মনে করতে পারি। কারণ, নগরীর শাসনব্যবস্থা হচ্ছে নগরীর জীবনধারারই প্রতিরূপ।

সকল রাষ্ট্রের মানুষের মধ্যে আমরা তিনটি শ্রেণীর সাক্ষাৎ পাই : এদের একটি হচ্ছে খুব সচ্ছল, অপরটি হচ্ছে খুব দরিদ্র এবং তৃতীয়টি হচ্ছে এ দুই এর মধ্যবর্তী স্তর। কাজেই ব্যাপারটা যদি এই হয় যে, নমনীয়তা এবং মধ্য অবস্থাই হচ্ছে সর্বোত্তম তাহলে এটা

পরিষ্কার যে, সম্পদের ক্ষেত্রে মধ্যপরিমাণই হচ্ছে সর্বোত্তম। এই অবস্থাই সবচেয়ে বেশি যুক্তিগ্রাহ্য, এবং যুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রাহ্য হচ্ছে অত্যধিক সম্পদ, অত্যধিক সৌন্দর্য, অত্যধিক শক্তি এবং অত্যধিক জন্মগত আভিজাত্য। এবং এর বিপরীতেও অগ্রাহ্য হচ্ছে অত্যধিক দারিদ্র্য, অত্যধিক দুর্বলতা এবং অত্যধিক নিষ্পেষিত অবস্থা। কারণ একদিকে প্রথমোক্ত দল যেখানে ব্যাপক আকারে হিংসাত্মক ঘটনার উৎস, অপরদিকে দ্বিতীয় দল হচ্ছে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং ক্ষুদ্র প্রকারের অপরাধের ভিত্তি। একদলের দুষ্কর্মের কারণ হচ্ছে 'হুবরিস' বা সম্পদের আধিক্য, অপরদলের দুষ্কর্মের কারণ হচ্ছে মূর্খতা। এবং এই মধ্যবর্তী স্তরের মধ্যেই আমরা একদিকে যেমন সাক্ষাৎ পাই পদ গ্রহণের অনাগ্রহের স্বল্পতা, তেমনি সাক্ষাৎ পাই পদগ্রহণে আগ্রহের সামান্যতা। এবং চরম, এই দুই শ্রেণীই রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর। চরমের ত্রুটি আরো আছে। যাদের অত্যধিক থাকে, অর্থাৎ শক্তি, সম্পদ, বন্ধুজন—জীবনে সাফল্যের এই সকল উপাদান অত্যধিক পরিমাণে যাদের আয়ত্তে তারা পদ গ্রহণের যেমন পারোয়া করে না, তেমনি দায়িত্ব কাকে বলে তাও তারা বুঝতে পারে না। তাদের চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য শৈশব থেকেই তাদের মধ্যে উপ্ত থাকে। এর ফলে বিদ্যায়তনে পর্যন্ত এরা এমন বড়ত্বের বোধ দ্বারা আবিষ্ট থাকে যে শিক্ষকের নির্দেশিত কার্য সম্পন্ন করার শিক্ষাও তারা অর্জন করে না। অপরদিকে এ সমস্ত উপাদান যাদের একেবারেই নাই তারা অত্যধিক দাস্য মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়ে। তার ফলে আদেশ দান করার ক্ষমতা তারা হারিয়ে ফেলে এবং যে কোন শাসনকে দাসের মতো মান্য করার প্রবণতা তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায়। অপর দলের আবার বাধ্যতা বোধই থাকে না। তারা আদেশ মান্য করা কাকে বলে তা জানে না। প্রভু-দাস সম্পর্কই তাদের একমাত্র পরিচিত সম্পর্ক। দাসের উপর হুকুম করার ক্ষমতাই তাদের একমাত্র ক্ষমতা। এর ফলে স্বাধীন নাগরিকদের কোন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটতে পারে না। যে রাষ্ট্র গঠিত হয় সে হচ্ছে প্রভু-দাসের রাষ্ট্র। এদের একদল যেখানে ঈর্ষায় পূর্ণ, অপরদল সেখানে ঘৃণায় পূর্ণ। যাকে আমরা সখ্য বা বন্ধুত্ব বলি এং পারস্পরিক অংশগ্রহণ যেখানে রাষ্ট্রের মূল অর্থ সেখানে এই অবস্থার চেয়ে রাষ্ট্রের প্রকৃতির অধিক বৈপরীত্য সূচক সম্পর্ক আর কিছু হতে পারে না। অংশগ্রহণ হচ্ছে বন্ধুত্বের সূচক। যাকে আমি পছন্দ করিনে তার সঙ্গে এক সঙ্গে পথ ভ্রমণেও আমার মন রাজী হবে না। রাষ্ট্রের লক্ষ্য হচ্ছে যত দূর সম্ভব সদৃশ এবং সম অবস্থার মানুষের সংস্থা হিসাবে গঠিত হওয়া। এমন সম অবস্থার সাক্ষাৎ মধ্যবিত্তের মধ্যেই পাওয়া যায়। এবং সে কারণে সর্বোত্তম সরকার আমরা এমন রাষ্ট্রের মধ্যেই পেতে পারি। এবং রাষ্ট্রের এমন গঠন চরিত্রই হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রকৃতিগত চরিত্র। তাছাড়া মধ্যশ্রেণীর মধ্যে স্থায়িত্বের প্রবণতাও আছে। তারা দরিদ্রের মত অপরের সম্পদ যেমন কামনা করে না, তেমনি অপরেও তাদের সম্পদ গ্রাস করে না। এ কারণে তাদের জীবনযাত্রায় ঝুঁকি কম। তারা যেমন ষড়যন্ত্র করে না, তেমনি তারা ষড়যন্ত্রের লক্ষ্য হয়েও দাঁড়ায় না। এদিক থেকে ফোকিলিডিস যে লিখেছিলেন : যারা মধ্য অবস্থানে অবস্থিত তাদের সুবিধা অনেক এবং সমাজে আমার অবস্থানটি যেন সেখানেই ঘটে, এই আমার কামনা, তাতে তাঁর যুক্তি ছিল।

এটা তাহলে পরিষ্কার যে, রাজনৈতিক যে-ব্যবস্থা মধ্য-শ্রেণীর মাধ্যমে কার্যকর থাকে সে ব্যবস্থা হচ্ছে সর্বোত্তম। এবং যে সব নগরীতে মধ্যশ্রেণীর আকার বৃহৎ, অপর দুটি শ্রেণীর তুলনায় কিংবা তাদের একটির চেয়ে যেখানে তারা সম্ভব হলে অধিকতর শক্তিশালী সেই নগরীগুলির সুশাসিত হওয়ার সম্ভাবনাও অধিক। কারণ, অপর দু'টি শ্রেণীর কোন একটির সঙ্গে মধ্যশ্রেণীর শক্তি যুক্ত হলে রাষ্ট্রের ভারসাম্য পরিবর্তিত হতে বাধ্য এবং তখন

বিরোধী পক্ষের দৌরাত্ম্য প্রতিরোধেও সে সক্ষম হবে। তাই রাষ্ট্রীয় কার্যে যারা অংশগ্রহণ করে তাদের সম্পদ মোটামুটি কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণের হলে বাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হয়। কারণ, রাষ্ট্রের একাংশের যদি অত্যধিক থাকে এবং অপর অংশের কিছু না থাকে তাহলে হয় চরম গণতন্ত্র কিংবা নির্ভেজাল কতিপয়তন্ত্র কিংবা দু'টি শ্রেণীরই দৌরাত্ম্যের ফলে স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। স্বৈরতন্ত্র অনেক সময়ে সৃষ্ট হয় গণতন্ত্র কিংবা কতিপয়তন্ত্রের অতি উৎসাহের কারণে। কিন্তু একটি মধ্যশ্রেণীর কিংবা তার খুব নিকটবর্তী কোন ব্যবস্থা থেকে স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভবের ঘটনা খুব কম দেখা যায়। শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের প্রসঙ্গ নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা কালে এর কারণগুলি আমরা উল্লেখ করব।

তাছাড়া মধ্যপ্রকার শাসনব্যবস্থার উত্তমতা এ ঘটনা থেকেও পরিষ্কার যে, একমাত্র এই শাসনব্যবস্থাই উপদলসমূহের আন্তঃসংঘর্ষের উপদ্রব থেকে মুক্ত। মধ্যশ্রেণী যেখানে বৃহৎ সেখানে নাগরিকদের মধ্যে উপদল এবং পাল্টা উপদলের উদ্ভব কম হয়। এবং এই একই কারণে বৃহত্তর রাষ্ট্রগুলির খণ্ডিত হয়ে যাওয়ার বিপদ কম। কেননা এসব রাষ্ট্র মধ্য উপাদানে বেশ শক্তিশালী। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির পক্ষে সমগ্র নাগরিকদের দু'ই চরমে বিভক্ত হয়ে পড়া সহজ। এই দু'এর মধ্যবর্তীতে অবস্থিত হওয়ার মত কেউ অবশিষ্ট থাকে না। এবং এই দু'শ্রেণী হয় ধনী কিংবা দরিদ্র। এদিকে থেকে কতিপয়তন্ত্রের চাইতে গণতন্ত্র অধিকতর নিরাপদ। এর মধ্যশ্রেণীর কারণে গণতন্ত্রের স্থায়িত্বও অধিকতর। কতিপয়তন্ত্রের চাইতে গণতন্ত্রে মধ্যশ্রেণীর মানুষের সখ্যা যেমন অধিক তেমনি রাজনৈতিকভাবে তারা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, সম্পত্তিহীন শ্রেণী যখন মধ্যশ্রেণীর সমর্থনবাদে সংখ্যায় অধিক হয়ে প্রধান শক্তি হয়ে দাঁড়ায় তখন অবস্থা খারাপ হয়ে পড়ে এবং শীঘ্রই সংকটের সৃষ্টি হয়।

আমাদের এই কথার স্যতার প্রমাণ এ থেকেও পাওয়া যায় যে, সর্বোত্তম বিধানাদাতাগণ এসেছেন মধ্যশ্রেণীর নাগরিকদের ভেতর থেকে। যেমন সলোন। সলোনের মধ্যশ্রেণীগত অবস্থানের কথা তাঁর কবিতার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। লাইকারগাস-এর ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য। লাইকারগাস স্পারটার রাজা ছিলেন না। চারনডাস কিংবা অপর সকলের ব্যাপারেই আমরা এ কথা বলতে পারি। এ সব থেকে এটাও বুঝা যায়, কি কারণে অধিকাংশ রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক কিংবা কতিপয়তান্ত্রিক চরিত্র ধারণ করেছে। এর মূলে হচ্ছে এই কারণ যে, মধ্যশ্রেণী অধিকাংশ সময়ে সংখ্যায় অল্প থাকে এবং সম্পদবান এবং সম্পদহীন—এই দুই চরম শ্রেণীর যে কেউ যখন ক্ষমতায় আসীন থাকে তখন তারা মধ্যশ্রেণীকে উপেক্ষা করে এবং নিজেদের ধারণা অনুযায়ী সরকার পরিচালনা করে। এর ফলেই গণতন্ত্র বা কতিপয়তন্ত্রের উদ্ভব হয়। আবার জনসাধারণ এং অর্থবান শ্রেণীর মধ্যে সার্বক্ষণিক সংঘর্ষ এবং আন্তঃযুদ্ধের ফলে যে পক্ষই শাসনক্ষমতা দখল করুক না কেন, তারা কেউই সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য এবং সুসঙ্গত কোন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে না। রাজনৈতিক প্রাধান্যকে বিজয়ের বরমাল্য হিসাবে গণ্য করে তারা গণতান্ত্রিক কিংবা কতিপয়তান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার প্রচেষ্টায় নিবদ্ধ হয়। তাছাড়া নগরগুলির মধ্যে বৃহৎ নগরগুলি যখন অন্য গ্রীক নগরগুলির উপর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতো তারাও তখন বিজিত নগরীর স্বার্থের বদলে নিজেদের স্বার্থকে সামনে রেখে এবং তাদের নিজেদের নগরব্যবস্থাকে মূল বলে বিবেচনা করে এই সকল নগরীতে গণতান্ত্রিক বা কতিপয়তান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। সুতরাং এই সকল কারণে একটি যথার্থরূপে মধ্যশ্রেণীর শাসন ব্যবস্থাকে বাস্তবে কোথাও প্রায় দেখা যায় না। কেবল একটি মাত্র দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যেখানে একদল রাজনীতিজ্ঞ নাগরিকদের সম্মতি সহকারে এরকম একটি সমাজব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এবং আজ পর্যন্ত যে কোন নগরীতে গেলে আমরা দেখি কারুর মধ্যে একটা ন্যায়সঙ্গত সমঝোতার মনোভাবও বিদ্যমান নাই। সকলেরই লক্ষ্য হচ্ছে অপরকে অতিক্রম করে উপরে ওঠা। এ চেষ্টায় জয় এবং পরাজয়ের মধ্যে কোন বিকল্প নাই। পরাজিত হলে পরাজয়ের অবস্থাকে এরা স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকে।

এ থেকে বুঝা যাবে কোন্ শাসনব্যবস্থাকে আমরা অধিকাংশের জন্য সর্বোত্তম বলে বিবেচনা করতে পারি এবং তার কারণগুলি কি। অপরগুলি তথা গণতন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্রের যে প্রকারভেদের কথা আমরা উল্লেখ করেছি সেগুলিকে এবার গুণের ভিত্তিতে অধিকতর ভাল কিংবা মন্দ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করার কাজটি কঠিন হবে না। সর্বোত্তমকে যখন আমরা নির্ধারিত করেছি তখন তার যেটি নিকটবর্তী হবে সেটিকে উত্তম এবং যেটি মধ্যম শ্রেণীর শাসনব্যবস্থা তথা পলিটি থেকে দূরবর্তী হবে সেটিকে অধম হিসাবে আমরা চিহ্নিত করতে পারব। অবশ্য আমাদের এই মানদণ্ড থেকে ভিন্নতর কোন মানদণ্ড কেউ গ্রহণ করলে ব্যাপারটি আলাদা হতে পারে। সে ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত ব্যবস্থার বদলে অধিকতর সুবিধাজনককে হয়ত কেউ গ্রহণ করতে চাইবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

আদর্শ শাসনব্যবস্থার প্রশ্ন

যে কথা বলা হয়েছে তারপরে আমাদের উচিত হবে কোন্ রাষ্ট্রের জন্য কোন্ শাসনব্যবস্থা তথা কোন্ মানুষের জন্য কোন্ সমাজব্যবস্থা সুবিধাজনক, সে প্রশ্ন আলোচনা করা। এক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে এমন একটি নীতিকে নির্দিষ্ট করতে হবে যে নীতি সার্বজনীনভাবে সকলের উপর প্রয়োগযোগ্য। যে শর্তটি এখানে অপরিহার্য সে হচ্ছে এই যে, শাসনব্যবস্থাকে যারা টিকিয়ে রাখতে চায় তাদের সংখ্যা যারা তাকে টিকিয়ে রাখতে চায় না তাদের চেয়ে অধিক হতে হবে। আমি মনে করি প্রত্যেক রাষ্ট্রকে স্বাধীনতা, সম্পদ, শিক্ষা, সুজন্ম, সংখ্যা কিংবা সংখ্যাগত শক্তি প্রভৃতি গুণগত কিংবা পরিমাণগতভাবে পরিমাপ করা চলে। যেমন, যারা অনভিজাত তারা অভিজাতদের চেয়ে সংখ্যায় অধিক হতে পারে। কিন্তু সংখ্যাগত শক্তি তার গুণগত দুর্বলতাকে নাকচ করে দিতে পারে না। এগুলির একটির সঙ্গে অপরটিকে আমাদের অবশ্যই ওজন করতে হবে। অবশ্য যেখানে দরিদ্রের সংখ্যা এত অধিক যে তাদের সংখ্যাগত শক্তি তাদের গুণগত দৌর্বল্যকে অতিক্রম করে যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট সেখানে স্বাভাবিক ভাবেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং এই গণতন্ত্রের প্রকৃতিও নির্ভর করবে কোন্ ধরনের মানুষের সংখ্যাগত প্রাধান্য রয়েছে তার উপর। যেমন, যারা মাটি কর্ষণ করে তাদের সংখ্যা যদি অধিক হয় তাহলে গণতন্ত্রটি তালিকার ঊর্ধ্বদিকে চরম প্রকারের হবে। অপরদিকে যারা দৈহিক শ্রমে নিযুক্ত থাকে এবং শ্রমের জন্য মাহিনা লাভ করে তারা যদি সংখ্যায় প্রধান হয় তাহলে ব্যবস্থাটি গণতন্ত্রের তালিকার নিম্ন দিকের চরম হবে। অপরগুলি এই দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী স্থান সমূহে অবস্থান করবে। অপর পক্ষে ধনবান এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের গুণের প্রাধান্য যদি তাদের সংখ্যাগত হীনতাকে অতিক্রম করে যায় তাহলে ব্যবস্থাটি হবে কতিপয়তান্ত্রিক। এবং এখানেও ব্যবস্থাটির প্রকৃতি নির্ভর করবে যারা এই কতিপয়তান্ত্রিক শাসনের নিয়ামক তাদের গুণগত উৎকর্ষের উপর।

কিন্তু বিধানদাতার কর্তব্য হবে অধিবাসীদের মধ্যবর্তী অংশকে সর্বদা শাসনব্যবস্থার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত রাখার চেষ্টা করা। তাঁর লক্ষ্য যদি কতিপয়তান্ত্রিক আইন তৈরি করা হয় তাহলে মধ্যশ্রেণীর উপর তার দৃষ্টি সর্বদা নিবদ্ধ রাখতে হবে। তার লক্ষ্য যদি গণতান্ত্রিক আইন তৈরি করা হয় তাহলেও এ আইনকে মধ্যশ্রেণীর জন্য আকর্ষণীয় করে রচনা করা তাঁর উচিত হবে। আবার যেখানেই মধ্যশ্রেণীর সংখ্যা দুই চরম শ্রেণীর সংখ্যার চাইতে কিংবা তাদের কোন একটির চাইতে অধিক হবে সেখানেই শাসনব্যবস্থাটির টেকসই হবার সম্ভাবনা উত্তম হবে। এখানে ধনী এবং দরিদ্র উভয়ের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিপদ থাকবে না। কারণ এদের একে অপরের অধিনতা স্বীকারে সম্মত হবে না। আর সমঝোতা বা আপোষের ক্ষেত্রে মধ্যশ্রেণীর 'পলিটি'র চাইতে উত্তম ব্যবস্থাও তারা

কোথাও লাভ করবে না। পারস্পরিক অবিশ্বাসের ফলে দুই চরমে শ্রেণীর একের পক্ষে অপরকে পালাক্রমে শাসক বলে গ্রহণ করা অসম্ভব হবে। কিন্তু মধ্যস্থতাকারীর উপর আস্থা সকল পক্ষই স্থাপন করে থাকে। এবং যার অবস্থান মধ্যবর্তী সেই হচ্ছে মধ্যস্থতাকারী। এবং একটি শাসনব্যবস্থা যত সুমিশ্রিত হবে সেটি তত বেশি দীর্ঘস্থায়ী হবে। অনেকে, এমন কি অভিজাততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা যারা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারাও ধনবানদের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেই শুধু নয়, জনসাধারণকে প্রতারিত করেও ভুল করে। পরিণামে ভ্রান্ত সৎ উদ্দেশ্য অভ্রান্ত অসৎ অবস্থার সৃষ্টি করে। কারণ ধনবানদের সকল ক্ষমতা গ্রাস জনতার মধ্যে ক্ষমতার জন্য বাসনার চাইতে সমাজের জন্য অধিক ক্ষতিকর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কোন্ ব্যবস্থা কিভাবে অধিকতর স্থায়ী হতে পারে

একটি শাসনব্যবস্থাকে নানাভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। কতিপয়তন্ত্রী যে শাসনব্যবস্থা, জনসাধারণের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পাঁচটি ধারা উল্লেখ করা যায়। এগুলি হচ্ছে পরিষদ, ক্ষমতাসম্পন্ন পদসমূহ, আইন-আদালত, অস্ত্র বহন করা এবং শরীর প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান সমূহ। প্রথমতঃ পরিষদের সদস্যপদকে সকলের জন্য উন্মুক্ত রাখা যায় এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে অনুপস্থিতির জন্য কেবলমাত্র ধনিকদের উপর জরিমানা ধার্য করা যায় কিংবা অপরের চাইতে তাদের জরিমানার পরিমাণ অধিক করা যায়। পদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তির উর্ধ্বের পদসমূহকে ব্যয়ের কারণে গ্রহণে অস্বীকার করার অনুমতি দেওয়া হয় না। এটি সম্পত্তিবানদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। দরিদ্রদের উপর নয়। তৃতীয়ত, বিচারালয় : ধনিকগণ বিচারের দায়িত্ব গ্রহণ না করলে তাদের উপর জরিমানা আরোপ করা হয়। কিন্তু দরিদ্রদের উপর এরূপ জরিমানা ধার্য করা হয় না কিংবা চারণডাস-এর আইনের ভিত্তিতে কারুর উপর অল্প এবং কারুর উপর অধিক পরিমাণ জরিমানা ধার্য করা হয়। অনেক সময়ে দেখা যায় যে, পরিষদ এবং বিচারালয়—উভয় প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদে যারাই তাদের নাম তালিকাভুক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। কিন্তু তালিকাবদ্ধ এরূপ ব্যক্তিগণ পরিষদে এবং বিচারালয়ে অনুপস্থিত থাকলে তাদের বৃহৎ পরিমাণে জরিমানা দিতে হয়। এর সচেতন প্রয়াসটি হচ্ছে নাগরিকদের তালিকাবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা নিরুৎসাহিত করা। এবং তালিকাবদ্ধ না হওয়ার অর্থ হচ্ছে পরিষদ কিংবা বিচারালয়ে উপস্থিত হওয়ার তাদের কোন অধিকার থাকে না। অস্ত্রবহন এবং শারীর প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও অনুরূপ শর্তাদি আরোপ করা হয়। দরিদ্রদের আইনগতভাবে অস্ত্র বহন করতে হয় না। কিন্তু ধনিকগণের অস্ত্র না থাকলে তাদের জরিমানা করা হয়। এবং শারীর প্রশিক্ষণাগার তথা কুস্তিশালায় অনুপস্থিত থাকলেও ধনিকদের জরিমানা করা হয় কিন্তু দরিদ্রদের জরিমানা থেকে রেহাই দেওয়া হয়। এর ফলে জরিমানার কারণে ধনিকগণ দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য হয় কিন্তু দরিদ্রদের কোন জরিমানা প্রদানের ভয় না থাকায় তারা এ সকল দায়িত্বের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকে।

আইন রচনার ক্ষেত্রে কতিপয়ী পদ্ধতি দেখা যায়। গণতন্ত্রী ব্যবস্থাতে পদ্ধতিগুলি এর বিপরীত। পরিষদ এবং বিচালায়ে উপস্থিতির জন্য দরিদ্রদের অর্থ প্রদান করা হয় কিন্তু ধনবানদের উপর অনুপস্থিতির জন্য জরিমানা ধার্য করা হয়। এ কারণে আমরা যদি কতিপয়তন্ত্র এবং গণতন্ত্রের একটি সুমিশ্রণের কথা চিন্তা করি তাহলে উভয় ব্যবস্থার উপাদান গ্রহণ করাই সঠিক হবে এবং সেজন্য দায়িত্বে উপস্থিতি অনুপস্থিতির ব্যাপারে জরিমানা ধার্য করা এবং অর্থ প্রদান করা এই উভয় উপাদানই আমাদের গ্রহণ করা উচিত। এর ফলে রাষ্ট্রীয় কার্যে সকলেরই অংশগ্রহণ ঘটবে। তা না হলে যে শাসনব্যবস্থা তৈরি হবে

তা কোন এক পক্ষের করতলগত হয়ে পড়বে। নীতিগতভাবে নাগরিকতা তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা সঙ্গত যাদের পক্ষে অস্ত্রবহন করা সম্ভব। এর অর্থ হচ্ছে সম্পত্তির শর্ত আরোপ করা। কিন্তু সম্পত্তির শর্ত নিরঙ্কুশ কিংবা স্থায়ীভাবে আরোপ করা চলে না। এক্ষেত্রে অর্থের পরিমাণটি অপরিহার্যরূপে প্রয়োজনের নিম্নে নামানো যাবে না। কারণ, নিশ্চিত হতে হবে যেন যোগ্যদের সংখ্যা অযোগ্যদের চাইতে অধিক হয়। সাধারণভাবে দরিদ্রগণের প্রতি খারাপ ব্যবহার না করা হলে এবং তাদের নিজস্ব কোন বিষয় থেকে তারা বঞ্চিত না হলে উচ্চ পদের জন্য যোগ্য হওয়ার জন্য সচেষ্ট না হওয়াতেই দরিদ্রগণ সন্তুষ্ট থাকে। কিন্তু এমন অবস্থাটি পাওয়া খুব সহজ নয়। যারা রাজনৈতিক ক্ষমতা ধারণ করে তারা সর্বদা যে ভদ্র মানুষের ন্যায় আচরণ করে, এমন নয়। যুদ্ধের সময়ে যাদের নিজস্ব কোন ধন সম্পদ থাকে না তাদের খাওয়ানো না হলে তারা সৈনিক হিসাবে কাজ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু এদেরকে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করা হলে এরা যুদ্ধ করতে আগ্রহের সঙ্গে রাজী থাকে। কোন কোন রাষ্ট্রে এরূপ দেখা যায় যে, নাগরিকদের মধ্যে যেমন ভারী অস্ত্রধারী পদাতিকগণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তেমনি যারা সাধারণ বাহিনীতে নিযুক্ত আছে তারাও রয়েছে। আমরা মালিস-এ এর সাক্ষাৎ পাই। অবশ্য এখানে যারা প্রকৃতই বাহিনীতে কর্মরত রয়েছে তাদেরকেই সরকারী পদে নির্বাচিত করা হয়েছে। পুরাকালে, রাজতন্ত্রের যুগের পরে সব চাইতে গোড়ার দিকে শাসনব্যবস্থা যোদ্ধাদের নিয়েই গঠিত হত। এদের মধ্যে অশ্বারোহী বাহিনীকে[১] সর্বাগ্রে বিবেচনা করা হত। পরবর্তীকালে নগরীগুলির আকার যখন বৃদ্ধি পেল এবং পদাতিক বাহিনী যখন অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠল তখন এদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হতে লাগল এবং নাগরিকদের সংখ্যা তখন অনেক বেশি হয়ে দাঁড়াল। এই কারণে আমরা যে ব্যবস্থাকে আজকাল 'পলিটি' বলে অভিহিত করি সেই ব্যবস্থাকেই পূর্বে গণতন্ত্র বলা হত। কিন্তু সেকালের পলিটিগুলো আমাদের নিকট স্বাভাবিকভাবেই কতিপয়ীতন্ত্রী বা রাজতন্ত্রী বলে বোধ হত। কারণ, তাদের লোকসংখ্যার স্বল্পতার জন্য মধ্যশ্রেণীর সংখ্যা অধিক ছিল না। এবং সংখ্যায় অধিক না হওয়ার কারণে এবং সুসংগঠিত না হওয়ার জন্য তারা অপরকে শাসন করতে দেওয়াতেই অধিক সন্তুষ্ট থাকত।

শাসনব্যবস্থা কি কারণে বিভিন্ন প্রকার হয় তা আমরা উল্লেখ করেছি। তাছাড়া সাধারণভাবে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তাদের অতিরিক্ত ব্যবস্থাসমূহকে কারণ কি তাও আমরা বলেছি। (গণতন্ত্র কেবল এক প্রকারের নয়, তা আমরা বলেছি। এ কথা অপর ব্যবস্থাগুলির ক্ষেত্রেও সত্য।) এবং এদের মধ্যকার পার্থক্যের কারণ এবং ভিত্তি কি সে কথা এবং সাধারণভাবে বললে কোন্ শাসনব্যবস্থাকে সর্বোত্তম বলা যায় এবং অবশিষ্টদের মধ্যে কোন্ ব্যবস্থা কোন্ ধরনের মানুষের উপযোগী এসব কথাও আলোচিত হয়েছে।

১. কারণ এই বাহিনী প্রথমে যোদ্ধাবাহিনী হিসাবে সংগঠিত হয়েছিল। এর ফলে এরা প্রধান শক্তিধর হয়ে ওঠে। গোড়াতে প্রাচীন গ্রিকদের কোন অভিজ্ঞতা বা সংগঠন ছিল না। এবং অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে পদাতিক বাহিনীর কোন মূল্য থাকে না। এব কারণেই অশ্বারোহী বাহিনীর হাতেই ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল।

চতুর্দশ অধ্যায়

সরকার কিভাবে কার্য সম্পাদন করে

[বর্তমান পুস্তকের ২য় অধ্যায়ে যে বিষয় সূচি দেওয়া হয়েছিল উপরের এই সংক্ষিপ্তসারের মধ্যে তাদের প্রথম তিনটি বিষয়ের উল্লেখ আমরা পাই। চতুর্থ পুস্তকের অবশিষ্ট অংশের মধ্যে বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার সরকার পরিচালনার প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনাটি স্বাভাবিকভাবে এর বাস্তব মূল্য থেকেই এসেছে। কারণ এই পুস্তকের শুরুতে এ্যারিস্টট্‌ল আলোচনার তাত্ত্বিক এবং বাস্তব উভয় মূল্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। এ্যারিস্টট্‌ল বলছেন : শাসনব্যবস্থা যাই হোক না কেন প্রত্যেক শাসনেরই তিনটি বিষয় প্রধান। যেমন ১. কি করণীয় তার বিষয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ ; ২. সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীবৃন্দ ; এবং ৩. একটি বিচারব্যবস্থা।]

আমাদের আলোচ্য পরবর্তী বিষয় হচ্ছে : সরকার কিভাবে কার্য সম্পাদন করে। এ বিষয়ের আলোচনাতে আমাদের আবার শাসনব্যবস্থার কথা যেমন সাধারণভাবে সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হিসাবে, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন ভাবেও বলতে হবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমাদের উপযুক্ত সূচনাটি নির্দিষ্ট করার আবশ্যক হবে। সকল শাসনব্যবস্থায় তিনটি বিষয়ের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রের উত্তম ব্যবস্থাপনার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। এই কাজটি সুসম্পাদিত হলে শাসন ব্যবস্থাটি সুরচিত হবে। শাসনব্যবস্থা সমূহের মধ্যকার পার্থক্য এই বিভাগগুলির ব্যবস্থাপনার পার্থক্যের মধ্যে নিহিত। এই তিনটি বিষয় হচ্ছে : প্রথম, বিবেচনাগত। জাতীয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ের আলোচনা। দ্বিতীয়, নির্বাহী প্রশাসন। সকল প্রকার কর্মচারী, তাদের ক্ষমতা, তাদের সংখ্যা এবং প্রকৃতি, তাদের ক্ষমতার সীমা এবং তাদের বাছাইএর পদ্ধতি। তৃতীয়, বিচার ব্যবস্থা।

আলোচনামূলক কিংবা নীতি নির্ধারক বিভাগের ক্ষমতার মধ্যে রয়েছে যুদ্ধ এবং শান্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, মৈত্রী করা এবং মৈত্রী বিলুপ্ত করা, আইন তৈরি করা, মৃত্যুদণ্ড, নির্বাসন, সম্পত্তির বাজেয়াপ্তকরণ, কর্মচারীদের নির্বাচন এবং তাদের কার্যকালের আচরণ বিষয়ে অনুসন্ধান—এ সবের ক্ষমতা। এ সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা হয় সকল নাগরিকদের উপর নয়ত কিছু সংখ্যকের উপর, সরকারী এক কিংবা একাধিক সংস্থার উপর অথবা কোন বিষয়ের দায়িত্ব কারু উপর এবং অপর দায়িত্ব অপরের উপর—অথবা কিছু বিষয় সকলের উপর এবং অপর কিছু বিষয় কিছু লোকের উপর ন্যস্ত করতে হবে। সকল বিষয়ের উপর সকল নাগরিকের ক্ষমতা হচ্ছে গণতান্ত্রিক। জনতার লক্ষ্য সর্বত্র এরূপ পূর্ণ সমতা।

'সবকিছু সকলের' এই নীতি প্রয়োগের বিভিন্ন উপায় আছে। যেমন : প্রথম, সকলেই

তাদের দায়িত্ব পালন করে। কিন্তু তাদের দায়িত্বের ভাগ থাকে।[১] এবং কেবলমাত্র আইন প্রণয়নের জন্য, শাসনতান্ত্রিক বিষয় আলোচনা এবং কর্মচারীদের পক্ষ থেকে বিবরণী শ্রবণ করার জন্যই সকলে সম্মিলিত হয়। দ্বিতীয় উপায়ের মধ্যেও সকলের যৌথ দায়িত্বের ব্যাপার রয়েছে। কিন্তু সকলের সম্মিলন ঘটে কেবলমাত্র কর্মচারীদের নির্বাচন, আইন রচনা, যুদ্ধ কিংবা শান্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তদন্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে। অবশিষ্ট কার্যাদি নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের সুপারিশের ভিত্তিতে নির্বাহ করা হয়। এই কর্মচারীদের লটারীর মাধ্যমে কিংবা বাছাইএর ভিত্তিতে নিযুক্ত করা হয়। তৃতীয় উপায়টিতে ব্যবস্থা থাকে যেন সকল নাগরিক দায়িত্ব বন্টন, তদন্ত অনুষ্ঠান, যুদ্ধ এবং মৈত্রীর ব্যাপারে আলোচনা—প্রভৃতি বিষয়ে সম্মিলিত হতে পারে। এ সকল কর্মচারীর জন্য বিশেষজ্ঞের জ্ঞান একটি অত্যাবশ্যক প্রয়োজন হিসাবে গণ্য করা হয়। চতুর্থ পদ্ধতিতে সকল নাগরিক সকল বিষয়ের আলোচনার জন্য মিলিত হয়। এ ক্ষেত্রে কর্মচারীগণ কেবল সাময়িক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নয়। আধুনিক চরম গণতন্ত্রের কার্যপদ্ধতিটি এরূপ। এ ব্যবস্থা যে কতিপয়তন্ত্র একটি ক্ষমতাধারী গোষ্ঠী দ্বারা শাসিত তার উপর এবং যে রাজতন্ত্র স্বৈরতান্ত্রিক, তার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এই চারটি পদ্ধতির সকলেই নীতিগতভাবে গণতান্ত্রিক। যেখানে কেবল কতিপয় সকল ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেখানকার নীতি হচ্ছে কতিপয়তান্ত্রিক। এই নীতিটিও বিভিন্নভাবে প্রয়োগ কর চলে : ১. যারা আলোচনায় অংশগ্রহণের যোগ্য তারা সম্পত্তির এমন একটি পরিমাণের ভিত্তিতে বাছাইকৃত হয় যে পরিমাণটি খুব বেশি নয়। তার ফলে এদের সংখ্যা বেশ পরিমাণেই অধিক হয়। এক্ষেত্রে এরা আইনকে মান্য করে এবং আইনে যা নিষিদ্ধ তা করার প্রয়াস পায় না। এমন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিমাণ সম্পত্তির শর্ত পূরণ করার মাধ্যমে এরা যখন পরিষদে আলোচনার যোগ্যতা অর্জন করে তখন ব্যবস্থাটি কতিপয়ী হলেও তার নমনীয়তার কারণে 'রাষ্ট্রজ্ঞ' বলে অভিহিত হওয়ার উপযুক্ত। ২. আলোনায় সকলে অংশগ্রহণ করে না। কেবলমাত্র পূর্ব থেকে বাছাইকৃত কতিপয় নাগরিক অংশ গ্রহণ করে। এমন ব্যবস্থায় পূর্ব পদ্ধতির ন্যায় আইনের ভিত্তিতে শাসন পরিচালিত হলেও ব্যবস্থাটিকে কতিপয়তন্ত্র বলে অভিহিত করা সঙ্গত। ৩. আবার যখন আলোচনাকারী সংস্থার সদস্যগণ নিজেরা তাদের নতুন সদস্যদেরও সংযুক্ত করতে পারে এবং পুত্র পিতার স্থানে আসীন হতে পারে এবং আইনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তাদের থাকে তখন ব্যবস্থাটি যথার্থভাবে এবং পরিপূর্ণরূপে কতিপয়তন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। ৪. সর্বশেষ : যুদ্ধ, শান্তি, অনুসন্ধানকার্য প্রভৃতি বিষয়ের উপর সকলেরই যেখানে নিয়ন্ত্রণ থাকে কিন্তু অবশিষ্ট বিষয়গুলি বাছাইকৃত ব্যক্তিদের কাছে ছেড়ে দেওয়া হয়, সেখানে শাসনব্যবস্থাটি অভিজাততান্ত্রিক। আবার কিছু বিষয় নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। অপর কিছু বিষয় লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিত কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণে থাকতে পারে। এদেরকে সকলের মধ্য থেকে কিংবা পূর্ব-নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যক থেকেও নেওয়া হতে পারে। কিংবা এমন হতে পারে যে, নির্ধারিত এবং লটারীর দ্বারা নির্বাচিত, উভয় একসঙ্গেই

১. এর দৃষ্টান্ত মাইলেটাস-এর টেলিক্লিস-এর শাসনব্যবস্থা। অন্যত্রও দেখা যায়, এরূপ ব্যবস্থা আছে যাতে সাময়িকভাবে কর্মচারীবৃন্দ আলোচনা করে, কিন্তু সকল নাগরিকই পালাক্রমে পদলাভ করে। শাসনের পদ লাভের এই প্রক্রিয়াটি গোত্র এবং ক্ষুদ্রতম অংশ থেকে শুরু করে যতক্ষণ পর্যন্ত না প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয় ততক্ষণ তা অব্যাহত থাকে।—এ্যারিস্টটল

কার্যরত থাকতে পারে। এর মধ্যে কতকগুলির হচ্ছে অভিজাততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, অপরগুলির হচ্ছে পলিটির নিজের বৈশিষ্ট্য।

আমরা এতক্ষণ শাসনব্যবস্থার সংসদীয় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। শাসনব্যবস্থার নির্বাহী বা প্রশাসনগত ব্যাপার আমাদের আলোচনার আর একটি বিষয়। পরিপূর্ণ অর্থে যেটি গণতন্ত্র, অর্থাৎ যেখানে জনসাধারণ আইনের উপরেও সার্বভৌম সে ব্যবস্থায় সংসদের ক্ষেত্রে কতিপয়তন্ত্রের বিচার ব্যবস্থার পদ্ধতি গৃহীত হলে, তা গণতন্ত্রের জন্য সুবিধাজনকই হবে। কতিপয়তন্ত্রের এই পদ্ধতি দ্বারা আমি বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালনের জন্য যাদের নির্দিষ্ট করা হয় তাদের সে দায়িত্ব পালন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে অনুপস্থিতির জন্য জরিমানা আরোপের বিষয়টির উল্লেখ করছি।[১] নাগরিক পরিষদের ক্ষেত্রে পদ্ধতিটি গ্রহণ করা হলে আমার মনে হয়, গণতন্ত্রের উপকার হবে। এর ফলে সাধারণ নাগরিক যেমন, তেমনি উচ্চতর শ্রেণীর উপস্থিতিও নিশ্চিত হবে। এই উভয় অংশ যখন সম্মিলিতভাবে আলোচনা করবে তখন সে আলোচনা অধিকতর উত্তম হবে। পরিষদের সদস্যদের বাছাই-এর ভিত্তিতে কিংবা লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিত করা উচিত। এ পদ্ধতিটিও উত্তম। লটারীর পদ্ধতি গৃহীত হলে জনসাধারণের সকল অংশ থেকে সমানসংখ্যক সদস্য নির্বাচিত করা উচিত। তাছাড়া জনপ্রিয় দল যদি রাষ্ট্রের অপর সদস্যদের চেয়ে সংখ্যায় বিশেষভাবে অধিক হয়ে দাঁড়ায় তাহলে উপস্থিতির ব্যাপারে সকলের জন্য অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা না করে উচ্চতর শ্রেণীর সদস্যদের সমসংখ্যক সদস্যের বেতন প্রদান করা উত্তম। এর ফলে অবশিষ্টগণ হয় কোন অর্থ লাভ করবে না কিংবা তারা পরিষদের সদস্যপদ থেকে একেবারেই বাদ পড়ে যাবে।

কতিপয়তন্ত্রে, অপরদিকে, জনসাধারণের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক অতিরিক্ত সদস্যগ্রহণ সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হতে পারে। অন্যথায় অনুসৃত নিয়ম অনুযায়ী একটি কমিটিও গঠন করা যায়। এই কমিটিকে সাধারণতঃ পারিষদ—পূর্বগণ[২] আইন-অভিভাবক প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়। এবং এদের মাধ্যমে সম্পাদিত বিষয়গুলি নিষ্পন্ন করাই সঙ্গত হবে। এভাবে জনসাধারণ যেমন আলোচনায় অংশ গ্রহণে সক্ষম হবে তেমনি শাসনতন্ত্রের বিধানসমূহকে লঙ্ঘন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে না। প্রস্তাব হিসাবে এদর এমন প্রস্তাব গ্রহণ করতে হবে যা একেবারে অভিন্ন না হলেও কমিটির সুপারিশ সমূহের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ হতে পারবে না। আর একটি বিকল্পের কথা ভাবা যায় যার ভিত্তিতে পুরো সংস্থার উপর কেবল উপদেষ্টামূলক ক্ষমতা অর্পন করা হবে এবং আলোচনার ক্ষমতা কমিটির কর্মচারীদের হাতে রেখে দেওয়া হবে। এ জন্য পলিটিতে অনুসৃত ব্যবস্থার বিপরীত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। জনসাধারণ সার্বভৌম হবে প্রত্যাখ্যানের ক্ষেত্রে, অপর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নয়। কারণ তখন অনুমোদনের জন্য প্রশ্নটিকে পুনরায় কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে। কিন্তু যে শাসনব্যবস্থা যথার্থভাবে পলিটি, সেখানকার পদ্ধতিটি বিপরীত ধরনের। ক্ষুদ্রতর সংস্থার ভেটো বা প্রতিরোধমূলক ক্ষমতা চূড়ান্ত। কিন্তু অপর কোন অর্থে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তার নয়। বিষয়টাকে তখন সর্বদাই বৃহত্তর সংস্থার নিকট পেশ করা হয়। যাহোক, আলোচনা প্রতিষ্ঠান এবং শাসনব্যবস্থার সার্বভৌম সংস্থার বিবরণটি আমরা এভাবে তৈরি করতে পারি।

---

১. আমরা দেখেছি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উপস্থিতির জন্য দরিদ্রদের বেতন প্রদান করে থাকে।—এ্যারিস্টট্ল।
২. Pre-councillors.

পঞ্চদশ অধ্যায়

শাসনব্যবস্থার নির্বাহী বিভাগ

[পরবর্তী আলোচনাটি নির্বাহী কার্যের। নির্বাহী সকল সংস্থার যে শাসনমূলক ক্ষমতা আছে এমন নয়। দেখা যাচ্ছে এ্যারিস্টট্‌ল এ সম্পর্কে কিছু আলোচনার পরে এর সংজ্ঞাদানের চেষ্টাটি পরিত্যাগ করছেন।]

পরের আলোচনাটিতে আসা যাক। শাসনব্যবস্থার নির্বাহী বা প্রশাসনিক উপাদানসমূহের কার্যব্যবস্থাতেও নানা বিভিন্নতা দেখা যায়। নির্বাহী বিভাগের নানাপ্রকার কর্মচারী এবং তাদের দপ্তর আছে। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন হচ্ছে তাদের সংখ্যা, তাদের ক্ষমতা এবং তাদের কর্মকাল নিয়ে। (কর্মকাল দেখা যায় কোথাও ছ'মাস, এমনকি তার কমও রয়েছে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এক বছর কিংবা তার চেয়ে দীর্ঘকাল হচ্ছে এদর দায়িত্বের মেয়াদ।) প্রশ্ন হচ্ছে, এই মেয়াদ কি আজীবন কিংবা একটি বেশ দীর্ঘ সময়ের জন্য হওয়া উচিত? এর কোনটি যদি গৃহীত না হয়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে, কারুর এরূপ দায়িত্ব গ্রহণ কি একবারের জন্য হবে, না দ্বিতীয়বারের জন্যও সে যোগ্য হতে পারবে? নির্বাহী ব্যবস্থা তৈরি করার প্রশ্নটিও রয়েছে। কাদের নিয়ে এ ব্যবস্থা গঠিত হবে এবং এদের নিযুক্ত করবে কে এবং কিভাবে? এ সকল প্রশ্নের ক্ষেত্রে আমাদের স্থির করতে হবে, কি কি উপায় রয়েছে। তা স্থির করে প্রয়োগের সময়ে লক্ষ্য রাখতে হবে, কোন্ শাসনব্যবস্থার জন্য কি ধরনের পদ এবং তার কর্মচারী সর্বোত্তম হবে।

আর একটি প্রশ্ন আছে এবং প্রশ্নটির জবাবও সহজ নয়। প্রশ্নটি হচ্ছে, 'ক্ষমতার পদ' কথাটিকে আমরা কিভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি? কোন্ ধরনের কর্মকর্তাদের আমরা মনে করতে পারি যে তারা শাসন করছে। যে সংস্থাকে আমরা রাজনীতিক সংগঠন তথা রাষ্ট্র বলি তার বিভিন্ন প্রকার কাজের জন্য বিরাট সংখ্যক লোকে আবশ্যক। তাদের সংখ্যা এত অধিক যে আমরা তাদের সকলকে শাসক বলে আখ্যায়িত করতে পারিনে। তারা লটারীর মাধ্যমে নির্ধারিত হোক কিংবা তারা বাছাই এর মাধ্যমে নিযুক্ত হোক, সকলের ক্ষেত্রে এই কথাটি সত্য। প্রথমে আমার মনে আসছে পুরোহিতদের কথা। তাদের দায়িত্ব এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দায়িত্ব এক নয়। পুরোহিততের কার্য বিশেষভাবে ভিন্ন প্রকৃতির কার্য। তারপরে ঘোষক এবং ঐক্যতানের প্রশিক্ষক রয়েছে। বিদেশে যে দূতদের প্রেরণ করা হয় তাদেরও নিযুক্ত করা হয় বাছাই এর মাধ্যমে। যে সব কার্য সম্পাদন করতে হয় তার কিছু হচ্ছে রাজনৈতিক এবং কিছু আছে যাদের অর্থনৈতিক বলা যায়। রাজনৈতিক কার্যের মধ্যে এমন কিছু আছে যার সঙ্গে সম্পর্ক আছে সকল নাগরিকের। যেমন সেনাধিপতির পদ। একজন সাধারণভাবে পরিচিত অর্থনৈতিক কর্মচারীর কথা বলা যায় যাকে সচরাচর নির্বাচিত করা হয়। এ হচ্ছে খাদ্য নিয়ন্ত্রক। দৈহিক শ্রমের কাজও রয়েছে। সম্পদের অভাব না হলে

এ জন্য দাসদের নিয়োগ করা হয়। মোটামুটি আমরা বলতে পারি ক্ষমতাধারী পদগুলি হচ্ছে এরূপ পদ যে পদের অধিকর্তাদের উপর নির্দিষ্ট বিষয়ে বিবেচনার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের ও আদেশ দানের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। এই শেষ বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। কারণ আদেশ দানই হচ্ছে শাসনের এবং ক্ষমতার মূল কথা। বাস্তবে এতে কোন পার্থক্যের সৃষ্টি হয় না। পদের ক্ষমতার প্রশ্নে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব হয় নি। তবে এই প্রশ্নটির আরো কিছু দার্শনিক তাৎপর্য রয়েছে।

অধিকতর বাস্তব প্রশ্ন হচ্ছে : কতগুলি এবং কোন্ পদগুলিকে আমরা অপরিহার্য বলব? অন্য কথায়, রাষ্ট্র হতে হলে কোন্ কর্মকেন্দ্রগুলি একেবারে অত্যাবশ্যক। তাছাড়া অত্যাবশ্যক না হলেও একটি উত্তম শাসনব্যবস্থার জন্য কোন্ পদগুলি ফলদায়ক। প্রত্যেক শাসনব্যবস্থার, বিশেষ করে ক্ষুদ্রকায় রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার আলোচনাকালে এই প্রশ্নগুলির বিবেচনা আবশ্যক। কারণ বৃহত্তর রাষ্ট্রে বিভিন্ন কর্মচারীর উপর, একজনের জন্য একটি দায়িত্বের ভিত্তিতে[১] কাজের বন্টন যেমন প্রয়োজন তেমনি সম্ভব। কিন্তু ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্রের কয়েকজন কর্মচারীর উপর বহুসংখ্যক দায়িত্ব অর্পণ না করে উপায় থাকে না।[২] আবার অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র নগরীর পদের সংখ্যা বৃহৎ নগরীর চেয়ে কম নয়। বৃহৎ রাষ্ট্রের মতই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রেরও একই প্রকার আইন এবং পদের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে একই ব্যক্তিকে যেখানে ঘন ঘন একই কাজ সম্পন্ন করতে হয় সেখানে বৃহৎ রাষ্ট্রে এরূপ প্রয়োজন দীর্ঘ বিরতিতে ঘটতে পারে। কাজেই একটি সংস্থার উপর একাধিক দায়িত্ব অর্পণ না করার প্রকৃত কোন কারণ নাই। বাস্তব ক্ষেত্রে এদেরকে ভিন্ন করে রাখা যায়। কিন্তু লোকসংখ্যার অল্পতার প্রতিবিধান হিসাবে কমিটিসমূহকে একাধিক কাজের জন্য গঠন করা আবশ্যক হয়। একটা আর-কাঠিতে শুঁটকী এবং একটা আলো দুটোকেই ঝুলিয়ে রাখা যায়। কাজেই আমরা যদি নির্দিষ্ট করতে পারি কোন পদগুলি অপরিহার্য এবং কোন্ পদগুলি অপরিহার্য না হলেও প্রয়োজনীয়, তাহলে কোন্ বিভাগগুলিকে এক সঙ্গে রাখা যায় তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ আমাদের পক্ষে সহজতর হবে।

অপর যে বিষয়টি উপেক্ষা করা উচিত হবে না তার উল্লেখ এখানে করা যায় : বিভিন্ন স্থানে কর্তৃত্বের কেন্দ্র স্থাপন করে কোন্ বিষয়গুলি সম্পাদন করা সঙ্গত, কোন্ বিষয়গুলিই বা একটি কেন্দ্র থেকে সম্পাদিত হওয়া উচিত এবং কার নির্দেশ সর্বত্র মান্য বলে বিবেচিত হবে? কর্মচঞ্চল কেন্দ্রগুলির শৃঙ্খলার কথা মনে করেই আমি কথাটা বলছি। যেমন বাজার নিয়ন্ত্রকের প্রশ্ন। প্রত্যেক স্থানে ভিন্ন ভিন্ন বাজার নিয়ন্ত্রক থাকবে, কিংবা সব স্থানের জন্য একজন নিয়ন্ত্রক থাকবে? কাজের বন্টনও কি দায়িত্বের প্রকৃতি অনুযায়ী হবে, না দায়িত্ব-প্রাপ্ত ব্যক্তির প্রকৃতি অনুযায়ী হবে? সুশৃঙ্খলার দায়িত্ব কি একজন কর্মকর্তার, কিংবাস্ত্রীলোক এবং শিশুদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন লোক নিয়োগ আবশ্যক? শাসনতন্ত্রে কি দায়িত্ব থেকে দায়িত্বে ভিন্নতার উল্লেখ থাকবে ? যেমন, গণতন্ত্র, কতিপয়তন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, এবং

১. সম্ভব, কারণ এরূপ রাষ্ট্রের লোকসংখ্যা অধিক। দায়িত্ব সম্পাদনের যোগ্য বহু লোক পাওয়া যায় এবং কোন একজনকে একই দায়িত্ব দু'বার গ্রহণ করতে হয় না—কিংবা গ্রহণ করতে হলেও দীর্ঘ বিরতির পরে তা করতে হয়। আবার 'একজনকে এক দায়িত্ব' আবশ্যক এ কারণে যে এতে বহুর বদলে একের উপর একটি দায়িত্ব ন্যস্ত হলে অধিকতর উত্তমরূপে সম্পাদিত হতে পারে।—এ্যারিস্টট্‌ল

২. লোকসংখ্যার অল্পতার কারণে এটি হয়। দায়িত্ব গ্রহণের উপযুক্ত বহুলোক পাওয়া সহজ নয়। কারণ মেয়াদ শেষে দায়িত্বের জন্য নতুন লোক কোথায় পাওয়া যাবে?—এ্যারিস্টট্‌ল

রাজতন্ত্র—এ সকল ব্যবস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ভিন্ন হলেও এক প্রকার কর্মচারী কি সকল ব্যবস্থায় এক রকম দায়িত্ব পালন করবে? কারণ, একই দায়িত্বের কর্মচারী অভিজাততন্ত্রে যেখানে শিক্ষিত হবে, কতিপয়তন্ত্রে সেখানে ধনবান এবং গণতন্ত্রে স্বাধীনজাত। অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি যেমন ভিন্ন দায়িত্বের, প্রকৃতিও তেমন ভিন্ন এবং অপর কোথাও দায়িত্বের প্রকৃতির অভিন্নতা অধিকতর কার্যকর। কারণ এমন হতে পারে যে, একটি বিশেষ রাষ্ট্রে যেখানে দায়িত্বটি ক্ষমতাসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক, অপর একটি রাষ্ট্রে সেখানে দায়িত্বটি অপ্রধান হওয়াই সর্বোত্তম।

এমন অনেক দায়িত্ব আছে যা হয়ত একটি বিশেষ স্থানেরই বৈশিষ্ট্য। অন্যত্র এমনটি পাওয়া যায় না। যেমন 'পরিষদ-পূর্ব কমিটি'। এর উল্লেখ আমরা পূর্বেই করেছি। এটি কোন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নয়। কিন্তু পরিষদটি গণতান্ত্রিক। কারণ সাধারণ সদস্যবৃন্দ পরিষদে তাদের কাজ যেন সুসম্পন্ন করতে সক্ষম হয় সে কারণে 'পূর্ব-পরিষদ কমিটি'র প্রয়োজন রয়েছে পরিষদের কাজের পূর্ব আলোচনা এবং শৃঙ্খলাকরণের জন্য। কিন্তু পূর্ব-পরিষদ যদি কয়েকজন নিয়ে গঠিত হয় তাহলে এর চরিত্রটি হবে কতিপয়তান্ত্রিক। আবার একথাও সত্য যে, পূর্ব-পরিষদ কমিটির আকার ক্ষুদ্র হতে হবে, কতিপয়কে নিয়েই সেটি গঠিত হতে হবে। ফলে এ কমিটির চরিত্র সর্বদাই কতিপয়তান্ত্রিক। যে ব্যবস্থায় পরিষদ এবং এই কমিটি—উভয়ের অস্তিত্ব থাকে, সেখানে পরিষদের সাধারণ সদস্যদের চাইতে কমিটির সদস্যদের ক্ষমতা অধিকতর হয়। কারণ পরিষদের পদ হচ্ছে গণতান্ত্রিক কিন্তু পূর্ব-পরিষদের পদ কতিপয়তান্ত্রিক।

আবার যে সব গণতন্ত্রে জনসাধারণ সরাসরি সকল কাজে হস্তক্ষেপ করে সেখানে পরিষদের ক্ষমতাও দুর্বল হয়ে পড়ে। এটা বিশেষ করে যেখানে গণপরিষদের যোগদানের জন্য সদস্যদের ভাল অর্থদানের ব্যবস্থা আছে সেখানেই দৃষ্ট হয়। কারণ এর ফলে জনসাধারণের পক্ষে নিয়মিত সভায় যোগদানের অবকাশ সংগ্রহ করা এবং সব সিদ্ধান্ত সরাসরি নিজেদের দ্বারা করা সম্ভব হয়। শিশু নিয়ন্ত্রক, স্ত্রীলোক-নিয়ন্ত্রক এবং এরূপ দায়িত্বের জন্য কর্মচারী নিয়োগ অভিজাততন্ত্রের বৈশিষ্ট্য, গণতন্ত্রের নয়। কারণ, নিম্নতর শ্রেণীর স্ত্রীলোক যদি বাইরে বার হতে চায় তাহলে তাদেরকে কে নিবৃত্ত করতে পারে? এবং এটা কতিপয়তান্ত্রিক তথা ধনিকতান্ত্রিকও নয়। কতিপয়তন্ত্রের শাসকগণের স্ত্রীগণ ধনিক এবং বিলাসিতাপরায়ণ হয়।

এ বিষয়গুলির ব্যাপারে বর্তমানে আর থাক। এর পরে বরঞ্চ আমার চেষ্টা হবে কাজের ক্ষেত্র বা দপ্তরগুলিকে কিভাবে গোড়া থেকে গঠন করা যায়, সে কথা বলা। যে বিভিন্ন উপায়ে এই কাজটি করা যায় তাকে তিনটি ভাগে নির্দিষ্ট করা চলে। এদের মিশ্রণ এবং সমন্বয়ের মধ্যে সবগুলি অন্তর্ভুক্ত হবে। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে : পদাধিকারীদের নিযুক্ত করবে কারা? দ্বিতীয়ত, কাদের মধ্য থেকে তাদের নিযুক্ত করা হবে এবং তৃতীয়ত, কী উপায়ে তা করা হবে? এই প্রশ্নের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তিনজোড়া বিকল্প জবাব তৈরি করা যায় : হয় সকল নাগরিক নিয়োগকর্তা অথবা মাত্র কয়েকজন নাগরিক ; নিয়োগ হয় সকল নাগরিকদের মধ্য থেকে করা হয় অথবা একটি নিদিষ্ট শ্রেণী থেকে এ নিয়োগ করা হয়। (এই নির্দিষ্ট করণের শর্ত হিসাবে সম্পত্তির পরিমাণ, সুজন্ম, গুণ অথবা ভিন্নতর কোন বৈশিষ্ট্যকে রাখা যেতে পারে।)[১] এবং নিয়োগের পদ্ধতি লটারী বা বাছাইকরণ। আবার তিনজোড়া

১. মেগারার দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর যায়। মেগারাতে কেবল তাদের যোগ্য বলে গ্রহণ করা হয় যারা প্রত্যাবর্তনকারী নির্বাসিতের অন্তর্ভুক্ত এককালীন যোদ্ধা। —এ্যারিস্টটল

জবাবের প্রত্যেকটিকে নিম্নোক্তভাবে যুক্ত করাও চলে : কতিপয় পদের নিয়োগকারী; সকলে অপর পদগুলির নিয়োগকারী; কিছু সংখ্যক পদ সকলের মধ্য থেকে পূরণ করা হয় ; অপরগুলি অপর কিছু সংখ্যক লোক দ্বারা পূরণ করা হয় ; কিছু সংখ্যক লটারীতে এবং কিছু সংখ্যক বাছাইএর ভিত্তিতে নিযুক্ত হয়। এর প্রত্যেকটির আবার চার রকম বিকল্প হতে পারে : সকলকে সকলের মধ্য থেকে বাছাই অথবা লটারীর মারফত গ্রহণ বা (সকলকে এক সঙ্গে কিংবা বিভিন্ন কিস্তিতে একজন করে : গোষ্ঠী, ডেমী, ভ্রাতৃবন্ধন—ইত্যাকার ভাবে সকল নাগরিককে বিভক্ত করে অথবা প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সকলের মধ্য থেকে গ্রহণ করে।) অথবা উভয়ের পালাক্রমও করা চলে। আবার নিয়োগকারী যদি সকলে না হয় কয়েকজন হয়, তাহলে সকলের মধ্য থেকে বাছাই বা লটারীর ভিত্তিতে নিয়োগ করা চলে কিংবা একটি শ্রেণীর মধ্য থেকেও বাছাই হতে পারে, কিংবা একটি শ্রেণী থেকে লটারীর মাধ্যমেও হতে পারে অথবা অংশত এভাবে কিংবা অন্যভাবে—অর্থাৎ অংশত লটারীর মাধ্যমে এবং অংশত বাছাইএর মাধ্যমে হতে পারে। এভাবে দুপ্রকার সমন্বয়ের বাইরে বারটি পদ্ধতি উল্লেখ করা চলে। এর মধ্যে দুটি তথা 'সকল থেকে সকল' এবং সকল থেকে সকল লটারী বা বাছাইএর মাধ্যমে—অর্থাৎ কিছু সংখ্যক পদে লটারীর মাধ্যমে নিয়োগ এবং কিছু সংখ্যক পদে বাছাইএর মাধ্যমে নিয়োগ পদ্ধতি দু'টি গণতান্ত্রিক। কিন্তু যেখানে সকলে নয়, কবল কতিপয় নিয়োগকারী এবং সে নিয়োগ হয় এক সময়ে লটারী বা বাছাইএর মাধ্যমে অথবা উভয় পদ্ধতিতে, অর্থাৎ কিছু লটারীতে এবং কিছু বাছাইতে করা হয়, সে পদ্ধতি 'রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ' তথা পলিটির চরিত্রানুগ। সকলের মধ্য থেকে লটারী বা বাছাইএর মধ্য থেকে নিযুক্ত করাকে রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ এবং অভিজাতসুলভ বলেও অভিহিত করা চলে। এটার চরিত্র অধিকতর কতিপয়ী হয়ে ওঠে যখন কয়েকটি পদকে সকলের মধ্য থেকে এবং বাকিগুলিকে কেবল একটি শ্রেণীর মধ্য থেকে নিযুক্ত করা হয়। এর চরিত্র একেবারে কতিপয়ী হয় যখন একটি শ্রেণী একটি শ্রেণী থেকেই : (লটারীর মাধ্যমে শ্রেণী থেকে শ্রেণী দ্বারা) এবং অপর পদ্ধতিতে শ্রেণী কর্তৃক শ্রেণী থেকে নিয়োগকার্য সাধিত হয় তখন। যখন কয়েকজন সকলের মধ্য থেকে বাছাই করে এবং তারপরে সকলে বাছাইকৃতদের মধ্য থেকে বাছাই করে তখন পদ্ধতিটি অভিজাততান্ত্রিক হয়।

এভাবে দপ্তরগুলি গঠনের শাসনব্যবস্থাগত বিভিন্ন পদ্ধতির উল্লেখ আমরা করতে পারি। এর মধ্যে কোন্ পদ্ধতিটি কোন্ রাষ্ট্রের জন্য সর্বোত্তম এবং কিভাবে এদের কার্যকর করা যায় সে প্রশ্নের জবাব কোন্ রাষ্ট্রে কোন্ দপ্তরগুলির অস্তিত্ব রয়েছে এবং তাদের ক্ষমতার পরিধি কি—এর সঙ্গে যুক্ত করে আমাদের দিতে হবে। 'ক্ষমতার পরিধি' বলতে আমি রাজস্ব এবং নিরাপত্তার উপর নিয়ন্ত্রণের কথা বুঝাচ্ছি। শেষের বিষয়টি সেনাধ্যক্ষের ক্ষমতার অন্তর্গত এবং সেদিক থেকে এর চরিত্র কেন্দ্রীয় ব্যবসায়গত কার্যক্রম এবং চুক্তি থেকে ভিন্নতর।

[এর পরবর্তীতে বিচার বিভাগের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেখা যায়। আলোচনা থেকে মনে হচ্ছে প্রধান বিরোধের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিচারালয়ের ব্যবস্থা থাকবে। এর প্রথমটি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে বিদায়ী কর্মকর্তাদের ছাড়পত্র প্রাপ্তির জন্য পরীক্ষা বা তদন্তের বিষয়কে। সম্পত্তি এবং উত্তাধিকার সম্পর্কে কোন্ বিরোধের উল্লেখ দেখা যায় না, এটি বিস্ময়কর। কারণ সমাজে এই বিরোধ ছিল সচরাচর সংঘটিত বিরোধ। এবং সমগ্র অধ্যায়টিকেই অপূর্ণ প্রতিশ্রুতি এবং আলোচনার টুকরা ব্যতীত অপর কিছু বলা যায় না।]

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

শাসনব্যবস্থার বিচার বিভাগ

তিনটি বিভাগের মধ্যে বিচারবিভাগের আলোচনাটি আমাদের বাকি আছে। অপর দুটি বিভাগের আলোচনা যে ভিত্তিতে করা হয়েছে সেই ভিত্তিতে এর বিভিন্ন প্রকারেরও বিশ্লেষণ করা চলে। আইনের আদালতের তিনটি সূচক আছে। আমরা এদের নিম্নোক্ত ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করতে পারি। ১. যাদের নিয়ে গঠিত ; ২. বিচার্য বিষয় ; ৩. নিয়োগের পদ্ধতি। প্রথমটি সম্পর্কে জিজ্ঞাস্য হচ্ছে : বিচারালয়ের সদস্যদের কি সকল নাগরিকদের মধ্য থেকে কিংবা একটি শ্রেণী থেকে নিযুক্ত করা হয়? দ্বিতীয়টি সম্পর্কে প্রশ্ন হচ্ছে, আদালতে উপস্থিত করা হয় এরূপ বিষয়ের প্রকারগুলি কি? তৃতীয়টির ব্যাপারে আমাদের জিজ্ঞাসা হচ্ছে : নিয়োগের পদ্ধতি কি লটারী অথবা বাছাইকরণ? দ্বিতীয়টি দিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করছি। আদালত কত রকমের হতে পারে? আমরা আটটিকে নির্দিষ্ট করতে পারি ১. তদন্ত, ২. জনস্বার্থের বিরোধী অপরাধ, ৩. শাসনতন্ত্রবিরোধী অপরাধ, ৪. জরিমানার বিষয়ে কর্মচারী এবং অন্যদের মধ্যকার বিরোধ, ৫. ব্যক্তিগত চুক্তিভঙ্গ সংক্রান্ত বিরোধ, ৬. হত্যা[১] ৭. বৈদেশিক সংক্রান্ত বিরোধ[২], এবং ৮. এক থেকে পাঁচ ড্রাকমা কিংবা কিছু অধিক পরিমাণ লেনদেন সংক্রান্ত সাধারণ বিরোধ। কারণ এ গুলির জন্যও বড় আদালতের না হলেও আইনগত সিদ্ধান্ত আবশ্যক হয়। এ গুলি সম্পর্কে অধিক বলার প্রয়োজন নাই। কিংবা হত্যার অপরাধ বা বৈদেশিক সংক্রান্ত ব্যাপারেও আমি অধিক কিছু বলতে চাইনে। আমি বরঞ্চ রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করব। এক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হলে শাসনব্যবস্থায় গুরুতর রকমের বিভেদ, এমনকি বিপ্লবেরও উদ্ভব হতে পারে।

যে সমস্ত বিষয়ের তালিকা তৈরি করা হয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রে সকলেই বিচারক হিসাবে কার্যরত থাকবে। এদের নিয়োগ ঘটবে লটারী অথবা বাছাইএর মাধ্যমে। অথবা অংশত একটি এবং অংশত অপর পদ্ধতিতে ঘটতে পারে অথবা একই প্রকার বিষয়ের বিচারে কিছুসংখ্যক লটারীর মাধ্যমে এবং অপর কিছু সংখ্যক বাছাইএর মাধ্যমে নিযুক্ত হতে পারে।

---

১. এ বিচার চার রকমের হতে পারে। এদের জন্য এক কিংবা বিভিন্ন বিচারকদল নিযুক্ত হতে পারে। ১. ইচ্ছাকৃত হত্যা, ২. অনিচ্ছাকৃত হত্যা, ৩. অপরাধ স্বীকৃত হলেও প্রমাণের যেখানে অবকাশ আছে, ৪. হত্যার দায়ে নির্বাসিত এবং বর্তমানে প্রত্যাবর্তিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যেখানে অভিযোগ আনীত হয়েছে। এর সুপরিচিত দৃষ্টান্ত হচ্ছে এথেন্স-এর ক্রিটোর আদালত। সাধারণত এরূপ আদালত খুব কম দৃষ্ট হয় এবং এদের কেবল বৃহত্তর নগরীতে দেখা যায়।—এ্যারিস্টটল

২. এর দু রকম আছে : একটি হচ্ছে বিদেশীর বিরুদ্ধে বিদেশীর অভিযোগের জন্য, অপরটি হচ্ছে নাগরিকদের সঙ্গে বৈদেশিকদের বিরোধ।—এ্যারিস্টট্‌ল

এভাবে চার রকমকে নির্দিষ্ট করা যায়। বাকি চারটিকে পাওয়া যায় যেখানে জুরিদের নিয়োগ সার্বজনীনভাবে না করে অংশভিত্তিতে করা হয়। এখানেও যারা সকল বিষয়ের বিচারক তাদের একটি মাত্র অংশ থেকে গ্রহণ করা হতে পারে (অথবা অংশত বাছাই এবং অংশত লটারীর ভিত্তিতে নেওয়া যেতে পারে) অথবা কিছুসংখ্যক বিষয়ের বিচারক হিসাবে কিছু সংখ্যক আদালতকে নির্বাচিত এবং লটারীর মাধ্যমে নিযুক্ত করা যেতে পারে। কাজেই রকম বা প্রকারভেদ বলতে এগুলিকেই আমরা বুঝাচ্ছি। কিন্তু বিচার ব্যবস্থায় নিয়োগের ক্ষেত্রেও একাধিক পদ্ধতির যোগ ঘটান চলে : বিচারালয়ের অংশ বিশেষকে সকলের মধ্য থেকে এবং অপর অংশকে কোন শ্রেণী কিংবা জনসাধারণের ভিতর থেকে নিযুক্ত করা যেতে পারে। অথবা উভয় অংশের ক্ষেত্রে এটি হতে পারে। এটা ঘটে যদি একই আদালতের সদস্যদের কাউকে সকলের মধ্য থেকে এবং কাউকে অংশ বিশেষের মধ্য থেকে বাছাই অথবা লটারী অথবা উভয় ভাবে নিযুক্ত করা হয়। আদালত গঠনের সম্ভাব্য উপায়গুলির কথা বলা হল। এদের মধ্যে প্রথমটির তথা সকলের মধ্য থেকে কিছু হচ্ছে কতিপয়তান্ত্রিক এবং তৃতীয়টি (অংশতঃ সকলের মধ্য থেকে এবং অংশতঃ কতিপয়ের মধ্যে থেকে) হচ্ছে অভিজাততান্ত্রিক এবং রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ।

পঞ্চম পুস্তক

প্রথম অধ্যায়

শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন তথা বিপ্লবের বিষয়ে

[পঞ্চম পুস্তকে ৪র্থ পুস্তকের দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রদত্ত একটি প্রতিশ্রুতির পূরণ দেখা যায়। এ্যারিস্টট্‌লের প্রতিশ্রুতি ছিল : শাসনব্যবস্থার রক্ষা এবং বিলোপ সম্পর্কে এবং এদের উভয়ের কারণ সম্পর্কে আলোচনা। বিলোপ ঘটায়না এমন অপ্রধান কারণগুলির একটি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ প্রথমে করা হচ্ছে। কিন্তু এ্যারিস্টট্‌লের চিন্তা হচ্ছে বিপ্লব তথা জোরের ভিত্তিতে সংঘটিত অবস্থা এবং তার ফলে উদ্ভূত নতুন শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে। সমসাময়িক নগররাষ্ট্রগুলির প্রধান উদ্বেগ ও আশঙ্কার বিষয় ছিল এরূপ হিংসাত্মক পরিবর্তন। এ কারণে সকল প্রকার পরিবর্তনকে পরিহার করা এবং স্থায়িত্ব বজায় রাখার প্রবণতাই ছিল প্রধান প্রবণতা। এ্যারিস্টট্‌লের অভিমত হচ্ছে : অসন্তোষ হচ্ছে স্থায়িত্বের প্রধান শত্রু। এবং অসাম্যের মধ্যে যেখানে অন্যায় সেখানে অসাম্য হচ্ছে অসন্তোষের সম্ভাব্য উৎস। আলোচনার এক স্থানে ৩য় পুস্তকের অধ্যায় ১২তে আলোচিত 'ন্যায়' এবং 'সাম্য প্রসঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। এ্যারিস্টট্‌ল এ কথাও বলছেন যে, গণতন্ত্রে সাম্যের ভাব কতিপয়তন্ত্রের চেয়ে অধিক হওয়ার কারণে কতিপয়তন্ত্রের চাইতে গণতন্ত্র অধিকতর স্থায়ী ব্যবস্থা। যদিও 'বিপ্লব' (রিভোল্যুশন) কথাটিকে অনুবাদে ব্যবহার করা হয়েছে—কিন্তু মূল গ্রিক শব্দ 'স্টাটিস'-এর এটি সঠিক ভাষান্তর নয়। স্টাটিস বলতে এমন একটা অস্থির অবস্থাকে বুঝান হয় যে-অস্থির অবস্থাতে হিংসাত্মক বিস্ফোরণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। আর একটি ব্যাপারও উল্লেখযোগ্য। এ্যারিস্টট্‌লের মতে অসাম্য সাধারণত গুণগত উচ্চতারই স্মারক।]

যে সকল বিষয়ে আলোচনা করার কথা আমরা বলেছিলাম, তার প্রায় সবটাই আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তনের কারণগুলি কি সে সম্পর্কে আমাদের আলোচনা এখনো বাকি আছে। আমাদের আলোচনা করতে হবে এই কারণগুলির প্রকৃতি কি, এদের সংখ্যা কত এবং প্রত্যেকটা শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলি কি এবং এগুলি কোন্ শাসনব্যবস্থাকে পরিবর্তন করে কোন্ শাসনব্যবস্থার উদ্ভব ঘটায়। অনুরূপভাবে আমাদের আলোচনা করতে হবে, শাসনব্যবস্থার রক্ষাকারী শক্তিগুলি সাধারণভাবে এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিশিষ্টভাবে কি এবং প্রত্যেক প্রকারের শাসনব্যবস্থাকে সর্বোত্তমভাবে কি উপায়ে রক্ষা করা যায়।

এ বিষয়ে আমাদের শুরু করা উচিত যে কোন রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি কি এবং কোন্ প্রকার ন্যায় এবং সাম্যকে সে অর্জন করতে চায়, তার আলোচনা দিয়ে। পূর্বেই বলা হয়েছে, বহু প্রকারের শাসনব্যবস্থা রয়েছে যার সদস্যবর্গ, ভুলভাবে হলেও, এরূপ মনে করে যে, তাদের শাসনব্যবস্থা হচ্ছে ন্যায় এবং আনুপাতিক সাম্যের ধারক এবং বাহক। গণতন্ত্র

প্রতিষ্ঠিত হয় এই মনোভাবের ভিত্তিতে যে, যারা কোন একটি ক্ষেত্রে সমান তারা সকল ক্ষেত্রে সমান। তাদের বক্তব্য যে, তারা সকলেই স্বাধীন নাগরিক। কাজেই তারা সকলে সমান। কতিপয়তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এই মনোভাবের উপর যে, যারা কোন একটি বিষয়ে অসমান তারা সর্ববিষয়ে অসমান,—অর্থের ক্ষেত্রে যখন তারা অসমান (অর্থাৎ উচ্চতর) তখন সর্বক্ষেত্রে তারা অসমান। আবার গণতন্ত্রীগণ এই সাম্যের কারণে সর্ববিষয়ে অংশগ্রহণের দাবি উত্থাপন করে। অপরদিকে যারা কতিপয়ী তারা অসম তথা উচ্চতর বলে রাষ্ট্রের অধিকতর অংশের উপর দাবি পেশ করে। কারণ তাদের কাছে 'অধিকতর' লাভ করা হচ্ছে অধিকতর অসমতা। একথা ঠিক যে তাদের প্রত্যেকের কথায় কিছু ন্যায়ের ব্যাপার রয়েছে। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের দাবি চূড়ান্তরূপে ন্যায়সঙ্গত—এরূপ ধারণা ভুল। এবং এই কারণে কোনো রাষ্ট্রের সদস্যগণ যখন তাদের পারস্পরিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের মূলনীতিকে লঙ্ঘন করে তখনি তাদের মধ্যে একটা বিপ্লবাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এমন অবস্থায় যারা গুণের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিশিষ্ট তারা মনে করে তাদের বিদ্রোহ করার যুক্তি রয়েছে সব চাইতে অধিক। কিন্তু তারা বিদ্রোহ খুব কম সময়েই করে থাকে এবং এদের ওপরই 'চরমরূপে অসম' (বিশিষ্ট) কথাটি যথার্থভাবে প্রয়োগ করা চলে। তাছাড়া এমন নাগরিক আছে যারা মনে করে, যেহেতু তাদের জন্ম উচ্চতর ঘরে সে কারণে তাদের উপর সমতার প্রয়োগ চলতে পারে না, কেননা জন্মের ক্ষেত্রে তারা অসম। এরূপ যারা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে গুণ এবং সম্পদ উভয়কে লাভ করেছে তাদের বলা হয় অভিজাত বংশের লোক। সাধারণভাবে বললে এগুলি হচ্ছে বিপ্লবের মূল। এই উৎসগুলি থেকেই বিপ্লবের উদ্ভব।

একটি শাসনব্যবস্থা থেকে একেবারে নতুন আর একটি শাসনব্যবস্থার উদ্ভব কিংবা প্রচলিত শাসনব্যবস্থার কোনো সংশোধন মাত্র—এর ভিত্তিতে পরিবর্তন হচ্ছে দু'প্রকারের। প্রথম প্রকারের দৃষ্টান্ত হচ্ছে গণতন্ত্র থেকে কতিপয়তন্ত্রের উদ্ভব, কিংবা কতিপয়তন্ত্র থেকে গণতন্ত্রের বা পলিটি থেকে অভিজাততন্ত্রের উদ্ভব। প্রক্রিয়াটি বিপরীতভাবেও ঘটতে পারে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যারা পরিবর্তনের চেষ্টা করে তারা প্রচলিত শাসনব্যবস্থা বজায় থাকুক, সেটি কামনা করে। তাদের ইচ্ছা শাসনব্যবস্থা বজায় থাকুক কিন্তু তারা তার পরিচালক হোক। একথা কতিপয়তন্ত্র বা রাজতন্ত্র—উভয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিংবা এমনও হতে পারে যে পরিবর্তনটা কেবল পরিমাণগত ব্যাপার হতে পারে। পরিবর্তন যারা কামনা করছে তাদের ইচ্ছা হতে পারে কতিপয়তন্ত্রকে অধিকতর কিংবা অল্পতর ভিত্তিসম্পন্ন করার, কিংবা গণতন্ত্রকে অধিকতর কিংবা অল্পতর গণতন্ত্রে পরিণত করার। অপরাপর শাসনব্যবস্থাকে শিথিল কিংবা দৃঢ় করার ইচ্ছা তারা পোষণ করতে পারে। আবার শাসনব্যবস্থার অংশবিশেষের পরিবর্তনেরও প্রশ্ন হতে পারে। ব্যবস্থার কোনো কোনো বিশেষ দপ্তর প্রতিষ্ঠা বা বিলোপ সাধন হতে পারে। এমন দৃষ্টান্ত হচ্ছে লাইসান্ডর কর্তৃক ল্যাসিডিমনীয় রাজতন্ত্রের কিংবা রাজা পসেনিয়াস-এর হাতে ইফর প্রতিষ্ঠান বিলোপের চেষ্টা। এপিডামনাস-এও শাসনব্যবস্থার আংশিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল। সেখানে গোষ্ঠীনেতাদের জায়গাতে তারা একটি পরিষদ গঠন করেছিল। এটি একটি কতিপয়তান্ত্রিক পরিবর্তন। কিন্তু এই পরিবর্তন সত্ত্বেও নিয়মটি এখনো প্রচলিত রয়েছে যে, কোনো পদাধিকারীর নির্বাচনকালে বর্তমান কর্মচারীদের ও নাগরিকদের সম্মেলনে উপস্থিত থাকতে হবে। একমাত্র 'আরকন' থাকার নিয়মটিও শাসনব্যবস্থার কতিপয়তান্ত্রিক একটি বৈশিষ্ট্য।

আমি বলছিলাম, রাষ্ট্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের মূলে সাধারণ কারণ হচ্ছে অসাম্য। কারণ, মানুষ যাকে ন্যায়সঙ্গত এবং সমান বলে বিবেচনা করে তার ভিত্তিতে তারা বিভক্ত হয়ে পড়ে।[১] দুই রকম সমতা আছে। এর একটি হচ্ছে সংখ্যাগত সমতা। অপরটি হচ্ছে মান তথা গুণগত সমতা। 'সংখ্যাগত সমতা' দ্বারা আমি আকার এবং পরিমাণ—উভয় প্রকার সমতাকে বুঝাতে চাচ্ছি। এবং 'আনুপাতিক সমতা' দ্বারা গুণের সমতাকে আমি বুঝাতে চাই। এদিক থেকে সংখ্যাগতভাবে ৩ এবং ২ এর মধ্যকার পার্থক্য ২ এবং ১ এর মধ্যকার পার্থক্যের সমান। এখানে পার্থক্যের পরিমাণ সমান। কিন্তু ৪ এবং ২ এর মধ্যকার যে সম্পর্ক তা আনুপাতিভাবে ২ এবং ১-এর মধ্যকার সম্পর্কের সমান। এক দুই-এর যে পরিমাণ অংশ দুই চার-এর ঠিক সেই পরিমাণ অংশ—অর্থাৎ উভয়ক্ষেত্রে পরিমাণ হচ্ছে অর্ধেক। কিন্তু মানুষ একদিকে যেখানে স্বীকার করে যে, যথার্থ ন্যায় হচ্ছে গুণের ভিত্তিতে আনুপাতিক ন্যায় সেখানে গুণ তথা মান সম্পর্কে তারা ভিন্নমত পোষণ করে। একথা পূর্বে বলা হয়েছে। একদল যেখানে মনে করে মানুষ একটি ক্ষেত্রে সমান হলে সর্বক্ষেত্রে তারা সমান হবে, অপর দলের দাবি হচ্ছে তারা কোনো ক্ষেত্রে সমান না হয়ে যদি উচ্চতরের হয় তাহলে সর্বক্ষেত্রে উচ্চতরের মর্যাদা দাবি করার তাদের অধিকার আছে। এবং এ কারণেই সাধারণভাবে বললে শাসনব্যবস্থার শ্রেণী হচ্ছে দুটি : জনসাধারণ তথা অধিকের শাসনব্যবস্থা এবং কতিপয়ের শাসনব্যবস্থা। গণতন্ত্র এবং কতিপয়ন্ত্র। সুজন্ম এং গুণসম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা খুবই অল্প। অসমতার অন্যান্য লক্ষণও অধিকতর সংখ্যক লোকের মধ্যে দেখা যায়। ফলে যেখানে সুজন্ম এবং উত্তম গুনের একশতটি লোক পাওয়া দুষ্কর সেখানে এরূপ সংখ্যক সম্পদবানকে অনেক রাষ্ট্রেই পাওয়া সম্ভব।

কিন্তু সাম্য কেবল এক প্রকারের হবে : হয় এ প্রকারের কিংবা অন্য প্রকারের—এটা উত্তম প্রস্তাব নয়। বাস্তবেই এটি দেখা যায়। এই নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত কোনো শাসনব্যবস্থাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এর কারণ হচ্ছে, শুরুতে এবং মূলে ভুল থাকলে পরিণামে বিপর্যয়কে রোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এ কারণে আমাদের সংখ্যাগত এবং আনুপাতিক উভয় প্রকার সমতাকে ব্যবহার করতে হবে। তবে এ কথা সত্য যে, গণতন্ত্র কতিপয়তন্ত্রের চাইতে অধিকতর স্থায়ী এবং বিপ্লবের প্রবণতা তার কম। কতিপয়তন্ত্রে দু'রকমের বিরোধ দেখা দিতে পারে। একটি বিরোধ হচ্ছে কতিপয়ী শাসক এবং অবশিষ্টের মধ্যকার বিরোধ, অপরটি হচ্ছে কতিপয়ী শাসকদের নিজেদের মধ্যকার বিরোধ। অপরদিকে গণতন্ত্রের বিপ্লবের একমাত্র সম্ভাবনা হচ্ছে কতিপয়তন্ত্রে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। গণতন্ত্রের নিজের মধ্যে স্টাসিস বা বিপ্লব প্রায় নাই বললেই চলে। তাছাড়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীসমূহের যে শাসনব্যবস্থা সেটিও 'কতিপয়ের শাসনব্যবস্থার' চাইতে 'জনসাধারণের শাসনব্যবস্থারই' অধিকতর নিকটবর্তী এবং এরূপ সকল শাসনব্যবস্থার মধ্যে এই শাসনব্যবস্থাই হচ্ছে সবচাইতে নির্ভরযোগ্য।

১. আমার বক্তব্য হচ্ছে সেই সব রাষ্ট্র সম্পর্কে যেখানে অসমতার জন্য আনুপাতিক কোনো ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নাই। সমানের উপর চিরস্থায়ী একটি রাজতন্ত্র সর্বদাই অসম শাসন।—এ্যারিস্টটল

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিপ্লবের সাধারণ কারণ

কোত্থেকে বিপ্লবের উদ্ভব এবং শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন কিভাবে সংঘটিত হয় তার আলোচনা আমাদের শুরু করতে হবে মূল কারণগুলি থেকে। এগুলির তিনটা বিভাগ এবং সেই হিসাবেই এগুলিকে আমাদের শ্রেণীবদ্ধ করতে হবে। প্রথমত, যে সকল অবস্থায় বিপ্লব উদ্ভূত হয়; দ্বিতীয়ত, বিপ্লবের লক্ষ্যগুলি কি এবং তৃতীয়ত, নাগরিকদের মধ্যে রাজনৈতিক অসন্তোষ এবং হিংসাত্মক বিভেদের বিভিন্ন প্রকার কারণগুলি কি?

প্রধানত এবং সাধারণভাবে যে কারণে পরিবর্তনের প্রবণতা সৃষ্টি হয় তার অর্থাৎ অসমতার কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। যারা সমতার জন্য উদগ্রীব তারা যদি বিশ্বাস করে যে, তারা যদিও অধিকতর যারা পাচ্ছে তাদের সমান তথাপি তারা কম পাচ্ছে তবে তারা বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটায়। আবার অনুরূপভাবে অসমতা এবং শ্রেষ্ঠতার জন্য যারা উদগ্রীব তারা যদি মনে করে যে, তারা অসমান তথা উচ্চতর হওয়া সত্ত্বেও অধিকতর পাচ্ছে না, তারা পাচ্ছে সমান কিংবা তার চাইতে কম তবে তারাও বিপ্লব শুরু করে। (এমন লক্ষ্য কোথাও যুক্তিসঙ্গত, কোথাও যুক্তিসঙ্গত না হতে পারে।) নিম্নতরগণ বিদ্রোহ করে সমান হওয়ার জন্য এবং 'সমানগণ' বিদ্রোহ করে উচ্চতর তথা অসমান হওয়ার জন্য। এগুলিকেই আমরা বলতে পারি বিপ্লবের অনুকূল অবস্থা। উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে আমরা সাক্ষাৎ পাই লাভ, মর্যাদা এবং তার বিপরীত ইচ্ছাসমূহের। তৃতীয়ত, যে সকল অবস্থায় মানুষ এমন কার্যক্রমে অগ্রসর হয় সেই বিশৃঙ্খলার উৎস এবং কারণ হিসাবে আমরা সাতটি কিংবা তার অধিক কারণের উল্লেখ করতে পারি। এদের দুটি লাভ এবং মর্যাদা হিসাবে যার উল্লেখ করা হয়েছে, ভিন্নরূপে হলেও তারই মত। ইতিপূর্বে যেরূপ বলা হয়েছে সেরূপ লাভের জন্য পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করা না হলেও এরা একটি ভূমিকা পালন করে। কারণ সঙ্গত কিংবা অসঙ্গত হোক, একজন দেখছে অপরজন তার চাইতে অধিক অংশ লাভ করছে। এইগুলির মধ্যে অপর পাঁচটি কারণ হচ্ছে : নির্যাতন, ভীতি, ক্ষমতার আধিক্য, ঘৃণামূলক মনোভাব, এবং বেপরিমাণ আগ্রাসন। এর সঙ্গে ভিন্নভাবে হলেও আরো আমরা যোগ করতে পারি তদবির ষড়যন্ত্র, নিছক অমনোযোগিতা, অদৃশ্য পরিবর্তন এবং বৈসাদৃশ্যকে।

তৃতীয় অধ্যায়

নির্দয়তা, মুনাফা, ঘৃণা—বিপ্লবের বিশেষ কারণসমূহ

নির্দয়তা এবং লাভের প্রবণতার কি ফল হয় এবং এগুলি বিপ্লবের কারণ হিসাবে কিভাবে কার্যকর হয় তার উল্লেখের প্রয়োজন পড়ে না। ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত তারা যখন নির্দয় এবং অত্যাচারী হয়ে ওঠে এবং যখন তারা নিজেরা মুনাফা অর্জন করতে থাকে তখন তারা যেমন পরস্পরের বিরুদ্ধে আঘাত করে, তেমনি যে শাসনব্যবস্থা তাদের ক্ষমতার উৎস তার বিরুদ্ধেও তারা আঘাত হানে। অতি মুনাফা যেমন অপর কোনো ব্যক্তির ক্ষতিতে, তেমনি রাষ্ট্রের ক্ষতিতেও অর্জিত হতে পারে। মর্যাদার গুরুত্ব কি এবং কিভাবে এটিও অসন্তোষের উৎস হতে পারে তা স্পষ্ট। যারা অপরকে সম্মানিত এবং নিজেদেরকে অসম্মানিত হতে দেখে তারা শীঘ্রই বিপ্লব-মনা হয়ে ওঠে। সম্মান কিংবা অসম্মান যখন প্রত্যাশার বিপরীত, তখন অবস্থাটা অবশ্যই অসঙ্গত হয়ে দাঁড়ায়। প্রত্যাশা অনুযায়ী হলেই ব্যাপারটাকে সঙ্গত বা ন্যায্য বলা চলে। এরপরে আসছে অত্যধিক ক্ষমতার কথা। যখন এক কিংবা একাধিক ব্যক্তি একেবারে অনুপাতহীনভাবে কিংবা নাগরিক সংস্থার সঙ্গে বিষমভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে থাকে তখন এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এমন অবস্থা থেকেই সাধারণত রাজতন্ত্র এবং কোনো বিশেষ ক্ষমতাধারী গোষ্ঠীর আধিপত্যের উদ্ভব হয়।[১] ভীতি কার্যকর হয় দুভাবে : যারা কোনো অপরাধমূলক কার্য করেছে তারা সরকারের পতন ঘটাতে চায়, কারণ তারা তাদের অপরাধের দণ্ডের জন্য ভীত; আবার যারা অপরের কাছ থেকে আঘাতের আশঙ্কা করে তারা পূর্ব-আঘাত দ্বারা তাদের নিরস্ত করার চেষ্টা করে। রোড্‌স্‌-এ এরূপ ঘটেছিল যখন উচ্চতর শ্রেণী তাদের বিরুদ্ধে আনীত মামলার কারণে জনসাধারণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল।

ঘৃণামূলক মনোভাবের কারণেও বিপ্লব এবং গৃহযুদ্ধ সংঘটিত হতে পারে। কতিপয়তন্ত্রে যখন শাসনে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিতদের সংখ্যা সর্বাধিক হয়ে দাঁড়ায় তখন তারা নিজেদেরকে কতিপয়ী শাসকদের চাইতে অধিক ক্ষমতাবান মনে করতে থাকে এবং তাদের প্রতি ঘৃণাসূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকে। এমন মনোভাব গণতন্ত্রের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যখন উচ্চতর শ্রেণী গণতন্ত্রের অব্যবস্থা এবং অদক্ষতার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করতে থাকে।[২]

১. কোনো কোনো জায়গায়, যেমন আরগস এবং এথেন্সে, ক্ষমতার অত্যধিক কেন্দ্রীকরণ নিবারনের জন্য রাষ্ট্রচ্যুতি বা নির্বাসন ব্যবস্থা গৃহীত হয়। কিন্তু এর চাইতে উত্তম হচ্ছে পূর্ব থেকে দৃষ্টিকে দূরগামী করে চূড়ান্তরূপে ক্ষমতাশালী কোনো ব্যক্তির উত্থানকে প্রতিরোধ করা। অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে গড়াতে দিয়ে পরবর্তীকালে প্রতিবিধান অন্বেষণ করা অর্থহীন—এ্যারিস্টট্‌ল

২. থিবিস-এ ইনো ফাইটার যুদ্ধের পরে অবস্থা এত শোচনীয় হয়ে পড়ে যে, গণতন্ত্রের পতন ঘটে। মেগারাতেও এরূপ ঘটেছিল। মেগারারও পতন ঘটেছিল বিশৃঙ্খলা এবং অরাজকতার কারণে। সাইরাকিউস-এর পতন ঘটেছিল স্বৈরনেতা গেলন-এর হাতে এবং রোড্‌স-এর গণসরকারের পতন ঘটিয়েছিল একটি অভ্যুত্থান।—এ্যারিস্টট্‌ল

সমাজের অপর অংশের তুলনায় বিষম বিকাশ কিভাবে বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের কারণ হতে পারে তার দৃষ্টান্ত আমাদের দেহের সঙ্গে তুলনাক্রমে দেওয়া চলে। দেহ বিভিন্ন অংশ নিয়ে গঠিত এবং যাতে সমগ্রের উপযুক্ত ভারসাম্য বিনষ্ট না হতে পারে এবং দেহ বিকল হয়ে না যেতে পারে সে জন্য সকল অংশের বৃদ্ধিকেই আনুপাতিক হতে হয়। বিষম অবস্থা দাঁড়ায় তখন, যখন এক ফুট উঁচু দেহতে এক গজ লম্বা পা গজিয়ে যায় কিংবা দেহের কোনো অংশে মানুষেতর পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ উদ্ভূত হতে থাকে। কারণ বৃদ্ধির পরিমাণের ক্ষেত্রে যেমন, বৃদ্ধির প্রকারের ক্ষেত্রেও বিষমতার প্রশ্ন আছে। রাষ্ট্রও তেমনি অংশসমূহ দিয়ে গঠিত সংস্থা। এর কোনো একটি অংশ দৃষ্টির আড়ালে অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া শুরু করতে পারে। যেমন গণতন্ত্র এবং পলিটিতে অসচ্ছল লোকের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে পারে। অনেক সময়ে ঘটনা পরম্পরায় অনুপাতহীন বৃদ্ধি ঘটতে পারে। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে টারেন্টাম। টারেন্টাম-এর বহু বিশিষ্ট নাগরিক আইয়াপিজীয়দের হাতে পরাজিত এবং নিহত হয়েছিল এবং পারস্যের সঙ্গে যুদ্ধের অব্যবহিত পরে পলিটির স্থানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। আরগস-এও দেখা যায় স্পারটার ক্লিওমেনিস-এর হাতে কথিত 'সপ্তম-দিবস শ্রেণীর' হত্যাকাণ্ডের পরে অধিকতর দরিদ্র লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর ফলে পার্শ্ববর্তী এলাকার কিছু সংখ্যক লোককে তারা নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করেছিল। এথেন্সে যুদ্ধের কারণে উচ্চতর শ্রেণীতে লোক সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। স্পারটার সঙ্গে তার যুদ্ধ যত চলতে থাকে তত তালিকার মধ্যে উচ্চশ্রেণীর লোকের সংখ্যা কমতে থাকে। গণতন্ত্রে সাধারণত না হলেও গণতন্ত্রেও এরূপ ঘটনা ঘটতে পারে। এখানে প্রক্রিয়াটি হবে বিপরীতমুখী। কারণ, ধনবানদের সংখ্যা কিংবা তাদের সম্পদ যখন বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন তাদের শক্তিও বৃদ্ধি পায় এবং পরিমাণে কতিপয়তন্ত্র বা শক্তিধর চক্রের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়।

> [এভাবে সাতটি কারণ পাওয়া গেল। এই সাতের সঙ্গে এ্যারিস্টট্‌লের মতে আরো চারটি যোগ করা যায়। এরা একেবারে সমান্তরাল নয়। কারণ, এদের কার্যপ্রণালী ভিন্নতর। এদের তিনটির মাধ্যমে হিংসাহীন বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে।]

হিংসা ব্যতীত অন্যপ্রকারেও শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে। তদবীর এবং ষড়যন্ত্র, সতর্কতার অভাব এবং অদৃশ্য-প্রায় ক্রমপরিবর্তন—এই তিন প্রকারে এমন পরিবর্তন সংঘটিত হতে পারে। হারিয়া-তে নির্বাচন থেকে লটারীতে যাওয়ার মাধ্যমে পরিবর্তন ঘটেছিল। এই পরিবর্তনের কারণ, নাগরিকগণ দেখতে পেল নির্বাচনে সকল প্রার্থী হচ্ছে তারা যারা সব চাইতে বেশি প্রচারে দক্ষ। সতর্কতার অভাবে অনেক সময়ে শাসনব্যবস্থার বৈরী ব্যক্তিরা শাসনের মূল পদসমূহ দখলের সুযোগ লাভ করে। অরিআস-এ এটাই ঘটেছিল। সেখানে কোন্ এক হিরাক্লিওডোরাস শাসনে প্রবেশ করে কতিপয়ী শাসনব্যবস্থার জায়গাতে পলিটি বা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাছাড়া একেবারে ক্রমপরিবর্তনের ব্যাপারও আছে। এমন অনেক সময়েই ঘটে যে, দেশের আইন কানুন এবং প্রথার মধ্যে দৃষ্টির অগোচরে বেশ পরিমাণ পরিবর্তন সংঘটিত হয়ে যায়। সামান্য পরিবর্তনগুলি লক্ষ্যের অগোচরে থেকে যায়। যেমন এ্যাম্ব্রাকিয়াতে নাগরিকতার জন্য যে শর্ত ছিল তার পরিমাণ ছিল সামান্য। এবং এ পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা হতে লাগল এবং পরিণামে এ এত কম হয়ে দাঁড়াল যে শার্তটি প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার অবস্থায় পৌঁছল।

তাছাড়া বর্ণ বা জাতিগত পার্থক্যের বিষয়ও উল্লেখ করতে হয়। এটি বিরোধের একটি উৎস। উভয়পক্ষ যতক্ষণ না একসঙ্গে জীবনযাপনের শিক্ষা লাভ করবে ততক্ষণ বিরোধের

এই উৎসটি ক্রিয়াশীল থাকবে। প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ হতে পারে। কারণ, রাষ্ট্র যেমন যে কোন প্রকারের জনসমষ্টিতে তৈরি হতে পারে না, তেমনি তাকে যে কোনো সময়ে ইচ্ছামাফিকও তৈরি করা যায় না। এ কারণে অধিবাসীদের মধ্যে বহিরাগতদের অন্তর্ভুক্ত করা হলে অন্তঃবিরোধ একেবারে সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এমন অধিবাসীরা নগরীর প্রতিষ্ঠাতে অংশগ্রহণ করেছে কিংবা পরবর্তীতে তারা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তাতে কিছু যায় আসে না। যেমন সাইবারিস-এর প্রতিষ্ঠায় ট্রোজিয়দের সঙ্গে একিয়দের যুক্ত করা হয়েছিল। কিন্তু কালক্রমে এরা সংখ্যায় অধিক হয়ে ট্রোজিয়দেরই বহিষ্কার করে দিয়েছিল। (সাইবারীয়দের পাপের মূল ছিল এখানে।) থুরীতেও দেখা যায় নগরীর অবশিষ্ট প্রতিষ্ঠাকারীদের সঙ্গে সাইবারীয়গণ বিরোধে লিপ্ত হয়েছিল। তারা যুক্তিহীনভাবে দাবি করলো যে, দেশটা তাদের। ফলে তাদের বহিষ্কার করে দেওয়া হয়। বাইজানটিয়াম-এ দেখা যায় নতুন উপনিবেশ স্থাপনকারীগণ একটি ষড়যন্ত্র করেছিল। তাদের ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে যায় এবং পরিণামে সংঘর্ষের পরে তাদের বহিষ্কার করা হয়। এ্যানটিসার লোকেরা চিয়া-র নির্বাসিতদের প্রথমে গ্রহণ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে এবং তারা বহিষ্কৃত হয়। জানক্ল্-এর লোকেরা কিছু সংখ্যক সামীয়দের গ্রহণ করেছিল, এবং পরিণামে নিজেরাই দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। কৃষ্ণ সমুদ্রের তীরে এ্যাপোলোনীয়ার লোকেরা নতুন বসতিস্থাপনকারীদের নিয়ে এসেছিল এবং পরে তাদের মধ্যে বিরোধ বেধেছিল। সাইরাকিউস-এ স্বৈরশাসনকালের পরে স্বৈরশাসকের বৈদেশিক ভাড়াটিয়া সৈন্যদের নাগরিক করা হয়েছিল। পরবর্তীতে এদের সঙ্গে অধিবাসীদের বিরোধ বাধে এবং সংঘর্ষ শুরু হয়। ক্যালসিডিয়গণ এ্যামফিপলিটিয়দের নিয়ে এসেছিল, তাদের অধিকাংশকে বহিষ্কার করেছিল।[১]

অনেক সময় ভৌগোলিক কারণেও অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। রাষ্ট্রের ভৌগোলিক বিন্যাস রাষ্ট্রের ঐক্যের অনুকূল না হতে পারে। যেমন ক্লাজোমেনিতে যারা প্রণালীর ওপর ছিল তাদের সঙ্গে বিরোধ ছিল দ্বীপের মধ্যে যারা ছিল তাদের সঙ্গে। অনুরূপভাবে বিরোধ ছিল ক্লোফনীয় এবং নোটীয়দের মধ্যে। এথেন্সে নগরীর মধ্যে যারা বাস করে তাদের সঙ্গে উত্তেজনা বিরাজ করছে পাইরিউস-এ যারা বাস করছে তাদের। পাইরিউস-এর লোকেরা তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে অধিকতর জোরালোভাবে গণতান্ত্রিক। একথা আমরা জানি যুদ্ধের মধ্যে অনেক সময়ে নদী কিংবা অপর কোনো জলস্রোত পারাপারের কারণে সৈন্যরা বিভক্ত হয়ে পড়ে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও সেরূপ। বিভিন্নতা থেকে বিভাগের সৃষ্টি হয়। অবশ্য এই ভৌগোলিক বিভাগগুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমার মতে প্রথমে আসবে উত্তম এবং অধমের মধ্যকার পার্থক্য, তারপরে ধনী এবং দরিদ্রের পার্থক্য। অন্যান্যগুলির ক্রমপরিমাণে স্থাপন ঘটবে এর পরে।

[আরো কিছু কারণ বা উপলক্ষ্যের বর্ণনা দেওয়া হচ্ছে পরবর্তী অধ্যায়ে। ঘটনাক্রম এবং অবস্থা : এগুলিও বিপ্লবের সৃষ্টি করতে পারে।]

১. স্থানটি ভুল হলেও এখানে এ্যারিস্টটলের একটি মন্তব্য পাওয়া যায় : "কতিপয়তন্ত্রে অধিকেরা বিদ্রোহ করে এই অভিযোগ যে, তাদের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। তাদের অভিযোগ, তারা সমান হওয়া সত্ত্বেও সমান ভাগ পাচ্ছে না। গণতন্ত্রের মধ্যে বিশিষ্টরা বিদ্রোহ করে। তাদের অভিযোগ তারা সমানের চেয়ে অধিক কিন্তু তারা ভাগ পাচ্ছে কেবল সমান।—এ্যারিস্টটল

চতুর্থ অধ্যায়

বিপ্লবের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক বিরোধগত কারণ

আর একটি কথা। বিপ্লব যদিও বৃহৎ ব্যাপার, তবু সামান্য কারণ থেকেও তার উৎপত্তি ঘটতে পারে। বিরাট পরিমাণ বিভিন্নতা মূলে অবশ্য নিহিত থাকে এবং ক্ষমতার কেন্দ্রসমূহে সংঘটিত হলে ক্ষুদ্রতম বিরোধগুলিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাড়ায়। গোড়ার দিকে সাইরাকিউস-এ এমনটি ঘটেছিল। দুজন তরুণের মধ্যকার বিরোধের কারণে পরিণামে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়েছিল। এরা উভয় ছিল শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এবং বিরোধটি ছিল প্রেম সম্পর্কিত। এদের একজন যখন তার গৃহ থেকে দূরে ছিল তখন অপরজন তার প্রেমাসম্পদ ছেলেটিকে প্রলোভিত করে নিয়ে গিয়েছিল। এর পাল্টা হিসাবে বিক্ষুব্ধ তরুণ তার ঘৃণা প্রকাশের জন্য অপর তরুণের স্ত্রীকে প্রলুব্ধ করে নিজের সঙ্গে বাস করতে সম্মত করেছিল। এর ফলে নাগরিকদের কেউ এ পক্ষ, কেউ অপর পক্ষ সমর্থন করতে লাগল এবং পরিণামে তারা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল। এ কারণে এ রকম ঘটনার ব্যাপারে প্রথম থেকেই সতর্ক হওয়া আবশ্যক। এবং গোড়াতেই নেতৃবৃন্দ এবং ক্ষমতায় যারা অধিষ্ঠিত তাদের মধ্যকার বিরোধের মীমাংসা করা প্রয়োজন। সূচনাতে একটি ভুল পদক্ষেপও মারাত্মক হতে পারে। কিন্তু প্রবাদের বাক্য অনুযায়ী সূচনা শুভ হলে অর্ধেক কার্যই সমাধা হয়ে যায়। অপরদিকে গোড়াতে একটি ছোট ভুলও পরবর্তীকালে এই আকারের দুটো ভুলের সমান হয়ে দাঁড়াতে পারে।

নেতৃস্থানীয় নাগরিকদের মধ্যে বিরোধ থাকলে সমগ্র নগরী তাতে জড়িত হয়ে পড়তে পারে। পারস্য যুদ্ধের পরে এমনটি ঘটেছিল হেসটিয়াতে। এখানে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে দুই পুত্রের মধ্যে বিরোধ বেঁধেছিল। এদের একজন ছিল দরিদ্র। কিন্তু তার ভাই যখন তাদের পিতার সম্পত্তির পরিমাণ এবং তার পিতার অর্জনকে প্রকাশ করতে চাইল না তখন দরিদ্র তথা গণতন্ত্রীগণ তার পক্ষ গ্রহণ করলো। অপর ভাই-এর বেশ পরিমাণ সম্পদ ছিল এবং ধনবানগণ তার পক্ষ গ্রহণ করলো।

ডেলফীতে একটি বিয়ের ব্যাপারে আত্মীয়গণের মধ্যকার বিরোধ পরিণামের রাজনৈতিক বিরোধের মূলে ছিল। স্থির করা পাত্র পাত্রীকে আনতে যাওয়ার সময়ে কুলক্ষণের সাক্ষাৎ পেয়ে পাত্রীকে বধু করে আনতে অস্বীকার করেছিল। ফলে কনের পরিবার মনে করলো তারা অপমানিত হয়েছে এবং তরুণ পাত্রটি যখন ধর্মানুষ্ঠানে বিসর্জন কার্যে নিযুক্ত ছিল তখন কন্যাপক্ষ তার দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে মন্দিরের জিনিসপত্র কিছু স্থাপন করে দিল। এর পরিণামে পাত্রটি ধর্মহানির অভিযোগে নিহত হলো।

মাইটিলেনীতেও উত্তরাধিকারের একটি বিরোধের কারণে নগরীর অনেক বিঘ্নের উৎপত্তি হয়েছিল। এই কারণেই এথেনীয়দের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ ঘটেছিল এবং প্যাচেস তাদের নগরী দখল করেছিল। বিরোধটি ছিল এরূপ : ধনবান শ্রেণীর লোক টিমোফ্যানিস-এর

মৃত্যু ঘটলো। তার ছিল দুটি বিবাহযোগ্য কন্যা। এক ডেকজানড্রস চাইল মেয়ে দুটিকে তার দুটি ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিবে। কিন্তু তার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা হলো এবং তাকে শূন্য হাতে ফিরে আসতে হলো। সে ছিল এথেন্স-এর ব্যাপারে স্থানীয় কমিশনার। সে এবার এথেনীয়গণকে খেপিয়ে তুললো। ফসিস-এও উত্তরাধিকারের ব্যাপারে প্রশ্ন উঠেছিল। এ বিরোধ ঘটেছিল নাসনের-এর পিতা মাসিয়াস এবং ওনোমারকাস-এর পিতা ইউথাইক্রাটিস-এর মধ্যে। ফসিয়দের 'পবিত্র যুদ্ধের' মূলে ছিল এই বিরোধ। এপিডাম্নাস্-এও বৈবাহিক বিরোধ থেকে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে যায়। একজন নাগরিক তার একটি মেয়ের বিয়ের বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল। ভাবী বরের পিতা যখন ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নিযুক্ত হলো তখন সে এই নাগরিকের উপর জরিমানা আরোপ করলো। মেয়ের পিতা তার উপর অন্যায় করা হয়েছে, এই অভিযোগে শাসনব্যবস্থার যারা শরীক ছিল না তাদের নেতৃত্ব দিয়ে একটা বিদ্রোহ ঘটালো।

আর এক ধরনের কারণ আছে যার ফলে যে কোনো দিকে পরিবর্তন ঘটতে পারে। এমন পরিবর্তন গণতন্ত্রে ঘটতে পারে, কতিপয়তন্ত্র কিংবা পলিটিতে ঘটতে পারে। এটা ঘটে যখন সরকারের কোনো একটি অংশ অন্য অংশের তুলনায় অধিকতর ক্ষমতাশালী বা জনপ্রিয় হয় ওঠে। যেমন, পারস্য যুদ্ধের সময়ে এথেন্সে এরিয়প্যাগাস-এর পরিষদ বিরাটভাবে মর্যাদা সম্পন্ন হয়ে উঠেছিল। শাসনব্যবস্থার দক্ষতার মূলে এই পরিষদ, এমন মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। আবার এথেন্সের গণতন্ত্রের দক্ষতার শক্তি বৃদ্ধি দেখি তখন, যখন একদিকে যেমন সালামিস যুদ্ধ বিজয়ীদের মধ্যে নৌবাহিনীর লোকের সংখ্যা ছিল অধিক তেমনি এথেন্সের গণতন্ত্রের ক্ষমতারোহনের মূলে ছিল তার সামুদ্রিক শক্তি। আরগস-এ অভিজাতগণ দাবি করলো ম্যানটিনিয়াতে স্পারটয়িদের উপর বিজয়ের মূলে তারা এবং সে সুযোগে গণতন্ত্রকে উচ্ছেদ করারও চেষ্টা করেছিল তারা। অপরদিকে সাইরুকিউসে দেখা যায়, এথেন্সের উপর তার বিজয়ের মূলে ছিল জনগণ। তারা তখন শাসনব্যবস্থা পরিবর্তিত করে পলিটির বদলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলো। চ্যালচিস-এ দেখি, জনসাধারণ উচ্চতর শ্রেণীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্বৈরশাসক ফোকসাস-কে বিতাড়িত করে বিনা বিলম্বে ক্ষমতা দখল করেছে। আবার এ্যামব্রাসিয়াতে জনসাধারণ আক্রমণকারীদের সঙ্গে যোগদান করে স্বৈরশাসক পেরিয়ানডারকে বিতাড়িত করে নিজেরা শাসনব্যবস্থাকে দখল করেছিল।

এখানে যে কথাটি স্মরণ রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে এই যে, যারা ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য দায়ী, তারা ব্যক্তি, সরকারের অঙ্গ, বা নাগরিক গোষ্ঠী, বড় কিংবা ছোট, যাই তুমি বলনা কেনো, তারাই গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটায়। এক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা পরোক্ষ হতে পারে, যখন অন্যরা তাদের ক্ষমতার কারণে ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে বিপ্লব শুরু করে। ভূমিকা প্রত্যক্ষও হতে পারে যখন তারা নিজেরা এত ক্ষমতাধারী হয়ে ওঠে যে অন্যদের সঙ্গে সমতার পর্যায়ে অবস্থান করে তারা আর সন্তুষ্ট থাকতে পারে না।

শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন তখনো ঘটে যখন অধিবাসীদের বিপক্ষগুলি ক্ষমতার সমপর্যায়ে পৌঁঠে যায়। যেমন অধিকতর ধনবান এবং জনসাধারণ—এদের মধ্যে মধ্যশ্রেণীর যখন কোনো অস্তিত্ব থাকে না কিংবা থাকলেও তাদের সংখ্যা নগণ্য। কারণ, জনসাধারণের একটি অংশ যখন, অংশটি যেই হোক না কেনো, অত্যধিক শক্তিশালী হয়ে পড়ে তখন অপর পক্ষ স্পষ্টতই অধিকতর শক্তিশালী অংশের বিরোধিতা করার ঝুঁকি নিতে চায় না।

এজন্য যারা উত্তমতায় অধিকতর শক্তিশালী তারা কখনো বিপ্লব শুরু করে না। কারণ অধিকের বিপরীতে তাদের সংখ্যা অল্প।

সাধারণভাবে, তাহলে, সকল প্রকার শাসনব্যবস্থায় বিপ্লবের কারণসমূহ এবং তার সূচনা, আমরা যেরূপ বর্ণনা করেছি, সেরূপ। এর পদ্ধতি হিসাবে বলা চলে যে হিংসা এবং চাতুরী—উভয় পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। হিংসা দিয়েই যে সব সময় শুরু হয়, এমন নয়। অনেক সময়ে হিংসা আসে পরবর্তী পর্যায়ে প্রয়োজন অনুসারে। চাতুরীর ব্যবহারও দু'প্রকারের হতে পারে। কোনো ক্ষেত্রে বিপ্লবীগণ তাদের প্রতারণায় সফল হয় এবং গোড়ার দিকে তাদের সহজে স্বাগত জানানো হয়। কিন্তু পরবর্তীতে তাদের ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য তাদের জোর প্রয়োগ করতে হয়।[১] অপর ক্ষেত্রে আবার দেখা যায় তারা গোড়া থেকে জোরের বদলে বুঝাবার পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং এটি এমনভাবে ব্যবহার করতে থাকে যে তাদের শাসনকে জনসাধারণ সেচ্ছামূলক ভাবেই স্বীকার করে নেয়।

আমরা উপরে যা বলেছি তাকে যে কোনো রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থার যে কোনো ধরনের পরিবর্তনের ঘটনার উপর প্রয়োগ করা চলে। কিন্তু আমাদের উচিত হবে এবার প্রত্যেক শাসনব্যবস্থাকে পৃথক পৃথকভাবে দেখা এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বিপ্লব কিভাবে সংঘটিত হয় তা স্থির করা।

১. এর একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে 'চারশতের শাসন।' (খ্রিঃ পূঃ ৪১১) এরা এথেনীয়দের এই বলে প্রতারিত করলো যে স্পারটার বিরুদ্ধে যুদ্ধে পারস্য সম্রাট অর্থ দ্বারা তাদের সাহায্য করবে। অথচ বাস্তবে একথা সত্য হলো না। কিন্তু চারশত তাদের কতিপয়তান্ত্রিক শাসনকে কব্জা করে রাখলো।—এ্যারিস্টট্‌ল।

পঞ্চম অধ্যায়

গণতন্ত্রের পতন ঘটে কেনো

[বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনার দ্বিতীয় ভাগ। কি প্রকারে শাসনব্যবস্থাসমূহের পতন ঘটে।]

গণতন্ত্রের মধ্যে বিপ্লবের সবচাইতে শক্তিশালী কারণ হচ্ছে জননেতাদের চরিত্রহীনতা। অনেক সময়ে তারা সম্পত্তির মালিকদের বিরুদ্ধে ঈর্ষাপ্রসূত অভিযোগ এক এক করে আনয়ন করে। এর ফলে সম্পত্তির মালিকগণ একতাবদ্ধ হয়। তাদের সকলের সাধারণ ভীতি তাদের নিজেদের মধ্যকার তিক্ততম শত্রুর সঙ্গেও সহযোগিতায় বাধ্য করে। অপর সময়ে এরা জনতাকে নিজেদের স্বার্থেও ব্যবহার করে। আমি এর দ্বারা যা বুঝাতে চাচ্ছি তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কস-এ গণতন্ত্রের পতন ঘটলো যখন জননেতাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ালো এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা তাদের বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হলো। রোড্স-এ একই ব্যাপার ঘটলো যখন গণতান্ত্রিক রাজনীতিকেরা নৌসেনাদের বেতনের ব্যবস্থা করলো কিন্তু নৌঅধিনায়কদের খরচপূরণ বন্ধ করে দিল। এর ফলে এরা বিরামহীন আইনগত মোকাদ্দমায় পরিশ্রান্ত হয়ে একটা সমিতি গঠন করতে বাধ্য হলো। এবং গণতন্ত্রের পতন ঘটালো। হেরাক্লিয়াতেও দেখা যায়, উপনিবেশটি প্রতিষ্ঠিত হবার পরেই গণতান্ত্রিক দল পর্যুদস্ত হলো। এরও কারণ তাদের নেতারা। উচ্চতর শ্রেণীর নাগরিকদের উপর এদের অন্যায় ব্যবহার তাদেরকে একের পর এক নগর পরিত্যাগে বাধ্য করলো। পরিশেষে নির্বাসিতরা শক্তি সংগ্রহ করলো। তারা নগরে প্রত্যাবর্তন করলো এবং গণতন্ত্রকে দমন করলো। মেগারাতেও গণতন্ত্রকে এভাবেই বিলোপ করা হয়। এখানে জনপ্রিয় রাজনীতিকগণ জনসাধারণকে খয়রাতি সাহায্য প্রদানের অর্থ সংগ্রহের জন্য বহু বিশিষ্ট নাগরিককে নির্বাসনে পাঠালো। ব্যাপারটা এভাবে চলতে থাকে এবং কালক্রমে নির্বাসিতদের সংখ্যা এত বেশী হয় যে তারা প্রত্যাবর্তন করে এবং একটা যুদ্ধে জনতাকে পরাজিত করে কতিপয়ী শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। কাইমিতেও গণতন্ত্রের আমলে একই ব্যাপার সংঘটিত হয়। কাইমির গণতন্ত্রের পতন ঘটান থ্রাসিমেকাস। অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরিবর্তন এমনি ভাবেই সংঘটিত হয়েছে।

অনেক সময়ে এমন হয় যে, জনতার সমর্থন আদায়ের জন্য শাসকগণ নেতৃস্থানীয় নাগরিকদের উপর অত্যাচার করে এবং তার ফলে তারা শাসনের বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়। এরূপ নির্যাতনের অন্তর্গত থাকে যেমন বাধ্যতামূলক সম্পত্তি-কর, তেমনি জনসেবার জন্য আয়ের উপর ধার্য ট্যাক্স। নির্যাতনের আর একটি পদ্ধতি হচ্ছে ধনবানদের বিরুদ্ধে মানহানিমূলক অভিযোগ আনয়ন করা। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে ধনবানদের অর্থ রাষ্ট্রীয় খাতে বাজেয়াপ্ত করা।

পূর্বকালে গণতন্ত্র থেকে স্বৈরতন্ত্রে পরির্তন ঘটতো যখন একই ব্যক্তি জনপ্রিয় নেতা

এবং সামরিক নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতো। বস্তুত আগের দিন বেশীরভাগ স্বৈরশাসকই প্রথমে বক্তৃতাবাগীশ হওয়ার চেষ্টা করতো। বর্তমানে যে এমনটি তত ঘটে না তার কারণ পূর্বে সেনাবাহিনী পরিচালনাকারীদের মধ্য থেকেই জনপ্রিয় নেতা আবির্ভূত হতো, বক্তৃতায় দক্ষ যারা তাদের মধ্য থেকে নয়। আসলে তখন বাগ্মী কেউ ছিল না। আজকাল বক্তৃতাদানের কলা-কৌশল যত বিস্তার লাভ করছে, দক্ষ বক্তাগণ তত জনপ্রিয় নেতায় পরিণত হচ্ছে। কিন্তু যুদ্ধের ব্যাপারে এরা অজ্ঞ থাকাতে গুরুত্বহীন কিছু পদ ব্যতীত সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে এমন বাগ্মীদের কেউ নিযুক্ত হয় না। বর্তমানের চাইতে পূর্বে যে স্বৈরশাসন অধিক প্রচলিত ছিলো তার একটা কারণ এই যে, পূর্বে কিছু কিছু লোকের উপর বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন পদ ন্যস্ত করা হতো। মিলেটাস-এ স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব ঘটলো প্রেসিডেন্টের দপ্তর থেকে। কারণ, সেখানে প্রেসিডেন্টের হাতে বহু এবং ক্ষমতাসম্পন্ন দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল। এর আর একটি কারণ, তখন নগরীসমূহের আয়তন বর্তমানের চাইতে ক্ষুদ্রতর ছিল। জনসাধারণ গ্রাম এলাকায় তাদের শ্রমের কাজে ব্যস্ত থাকত। এ কারণে এ সকল নগরীর নেতারা যুদ্ধবাজ হতে চাইলে স্বৈরশাসক হওয়াকে তাদের লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতো। এমন কার্যে তাদের কোনো অসুবিধা হতো না। কারণ, তাদের প্রতি জনতার আস্থা ছিল। এবং এই অবস্থার মূলে ছিল ধনিকদের প্রতি বৈরীভাব। যেমন এথেন্সে পিসিস্ট্রাটাস সমতলভূমির জমির মালিকদের বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়ে স্বৈরশাসক হয়ে দাঁড়ালো। মেগারাতে থিজেনিস যখন দেখলো ধনীদের গরুগুলি নদী তীরের চারণভূমিতে চরে বেড়াচ্ছে তখন সে তাদের হত্যা করলো; ডায়োনিসিয়াস স্বৈরশাসকের পদের উপযুক্ত হয়েছিল ডাফনিয়াস এবং ধনীদের বিরুদ্ধে জোরালো বক্তৃতার মাধ্যমে। সে ছিল জনতার পক্ষের লোক এবং ধনীদের প্রতি তার বৈরীতাই তাকে জনতার আস্থা অর্জন করে দেয়। আর এক দিকেও পরিবর্তন ঘটতে পারে। পুরাতন অথবা পূর্ব-পুরুষদের গণতন্ত্র থেকে আধুনিক তথা চরম গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটতে পারে। কারণ কর্মচারীদের যখন সম্পত্তির শর্ত ব্যতীত নির্বাচনের মাধ্যমে বাছাই করা হয় এবং জনসাধারণ যখন নির্বাচক তখন যারা নির্বাচনে জয়লাভ করতে আগ্রহী তারা জনতাকে কেবল উদ্বুদ্ধ করতে থাকে এবং পরিশেষে জনতা, এমনকি আইনের উপরও তারা সার্বভৌম হয়ে ওঠে। একে প্রতিরোধের বা একে হ্রাস করার উপায় হচ্ছে পদ নিয়োগে সমগ্র জনতাকে নির্বাচক না করে গোত্রগুলিকে নির্বাচক করা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কতিপয়তন্ত্রে পরিবর্তনের কারণ

সাধারণভাবে এগুলি হচ্ছে গণতন্ত্রের মধ্যে পরিবর্তনের কারণ। এবার কতিপয়তন্ত্রের পরিবর্তনে আসা যাক। এখানে দু'ধরনের পরিবর্তন প্রধান। এর একটির কারণ হচ্ছে কতিপয়তন্ত্রের প্রতি বিরোধিতা। অপরটির কারণ হচ্ছে এর অভ্যন্তরের দ্বন্দ্ব। কাজেই কতিপয়ী শাসকরা যদি জনতার উপর নির্যাতন করে তাহলে এই শাসনব্যবস্থার মধ্যে বিপ্লবের সম্ভাবনা সর্বক্ষণই বিদ্যমান থাকে। এমন অবস্থায় যে কেউই জনতার নেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। কিন্তু কতিপয়ী শাসকদের মধ্য থেকেই যখন কেউ এই ভূমিকা গ্রহণ করে তখন সে বিশেষভাবেই প্রভাবশালী হয়ে দাঁড়ায়। এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ন্যাকসস-এ লিগডামিস-এর মধ্যে, যে পরবর্তীকালে নিজেই স্বৈরশাসক হিসাবে ন্যাকসসকে শাসন করতে থাকে। তাছাড়া বিরোধী শক্তি বাইর থেকে চেষ্টা করেও একাধিক উপায়ে কতিপয়তন্ত্রে পতন ঘটাতে পারে। অনেক সময়ে বিপদটা আসে প্রকৃতপক্ষে ধনিক শ্রেণীর মধ্য থেকেই। বিশেষ করে ধনিকশ্রেণীর যারা সরকারের অন্তর্ভুক্ত হয় না তাদের কাছ থেকে। কারন, দেখা যায় কোনো কোনো সময়ে সরকার যারা চালাচ্ছে তাদের সংখ্যা খুব কম। এর দৃষ্টান্ত আছে মাসিলিয়া, ইসট্রাস এবং হেরাক্লিয়া এবং অন্যান্য নগরীতে। সরকারে যাদের অংশ ছিল না তারা আন্দোলন চালাতে থাকলো যতক্ষণ না তাদের জ্যেষ্ঠ এবং পরে কনিষ্ঠ পুত্রদের সরকারে গ্রহণ করা হলো। কারণ, কোনো কোনো রাষ্ট্রে এরূপ নিয়ম আছে যে পিতা এবং পুত্র একসঙ্গে সরকারে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। অন্যত্র নিয়ম আছে জ্যেষ্ঠ এবং কনিষ্ঠ ভাইএরা একসঙ্গে সরকারে থাকতে পারবে না। মাসিলিয়াতে দেখা যায়, কতিপয়ী ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে একপ্রকার পলিটি ব্যবস্থার রূপ ধারণ করলো। কিন্তু ইসট্রাস-এ ব্যবস্থাটি গণতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। এবং হেরাক্লিয়াতে কতিপয়ী শাসকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ছয়শত করা হয়েছিল। সিনিডাস-এ বিপ্লব ঘটেছিল উচ্চতর শ্রেণীগুলির মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে। এ রাষ্ট্রের শাসনে শাসকদের সংখ্যা ছিল খুব কম এবং যে নিয়মের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সে নিয়মে পিতা শাসনে থাকলে পুত্রের পক্ষে শাসনে থাকা চলতো না। এবং কয়েক ভাইএর মধ্যে কেবলমাত্র জ্যেষ্ঠ ভাই শাসনে থাকতে পারত। এমন অবস্থায় জনতা উদ্যোগ গ্রহণ করে অগ্রসর হয়ে এলো, উচ্চতর শ্রেণী থেকে একজনকে তাদের নেতা নির্বাচিত করল এবং সফলতার সঙ্গে ক্ষমতা দখল করল। উচ্চতর শ্রেণীর নিজেদের দ্বন্দ্বই তাদের জনতার সহজ শিকারে পরিণত করেছিল। আগের কালে এরিথ্রিতেও দেখা যায়, ব্যাসিলিডির উত্তম কতিপয়ী শাসনের আমলেও জনতা কতিপয় দ্বারা শাসিত হওয়া পছন্দ না করে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তিত করেছিল।

অপর ধরনের বিপ্লবের উৎস কতিপয়ী শাসনব্যবস্থা এবং তার অভ্যন্তরে নেতৃত্বের

দ্বন্দ্ব। এই নেতারাও গণ-বাগ্মীদের মত। গণবাগ্মীদের দুটি প্রকারের কথা বলা যায়। এদের একটিকে কতিপয়ীর মধ্যেই পাওয়া যায়। কোন কোন সময়ে এদের সংখ্যা একেবারেই কম। অপরটিকে দেখা যায় যখন কতিপয়ী ব্যবস্থার সদস্যগণ জনতার গণ বক্তার ভূমিকা গ্রহণ করে তখন। প্রথম ধরণটির দৃষ্টান্ত হচ্ছে এথেন্সের ত্রিশের শাসনের মধ্যকার ক্যারি-ক্লিস এবং তার সঙ্গীদের বাগ-বিস্তার। অনুরূপ অপর দৃষ্টান্ত হচ্ছে চারশতের শাসনে ফ্রিনিকাস এবং তার সঙ্গীদের বাগ্মীতা। দ্বিতীয় প্রকার বাগ্মীর একটি উত্তম দৃষ্টান্ত হচ্ছে লারিসা নগরীর দৃষ্টান্ত। এখানে 'নাগরিক—অভিভাবকবৃন্দ' বলে অভিহিত কতিপয়ী শাসকগণ জনতার দ্বারা তারা নির্বাচিত বলে তাদের সামনে বাক্যবাগীশের ভূমিকা গ্রহণ করে। এবং এমন ঘটনা যে কোনো কতিপয়ীব্যবস্থা, যেখানে দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য লোক দ্বারা শাসনব্যবস্থার শাসকগণ নির্বাচিত না হয়ে উচ্চ পরিমাণ সম্পত্তির শর্তে কিংবা রাজনৈতিক কোনো ক্লাবের সদস্য পদের ভিত্তিতে 'হপলাইটস' বা 'ডিমস' তথা জনতা দ্বারা নির্বাচিত হয় এবং যে ব্যবস্থায় জুরির আদালত সকল নাগরিক[১] দ্বারা পরিচালিত হয় না। এমনটি ঘটেছিল এ্যাবিডস-এ। তাছাড়া এক পক্ষ যদি কতিপয়ী ব্যবস্থার শাসকদের সংখ্যা অধিকতরভাবে হ্রাস করতে চায় তখনো ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। কারণ, তখন শাসন থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিরা নিজেদের সমতাকে অর্জনের জন্য তাদের সাহায্যে আসার আহ্বান জানায়।

তাছাড়াও এমন কতিপয়ী শাসনব্যবস্থার দৃষ্টান্ত আছে যার পতন ঘটেছে এই ব্যবস্থার সদস্যদের অমিতাচারী জীবন যাপনের কারণে। এই ধরণের ব্যক্তিরা কোনো অছিলার অন্বেষণে থাকে এবং তাদের লক্ষ্য থাকে, হয় তারা নিজেরা স্বৈরশাসক হবে কিংবা অপর কাউকে স্বৈরশাসক বানাবে। এবং এভাবেই আমরা দেখি সাইরাকিউস-এ হিপারিনাস, ডায়োনিসিয়াসকে স্বৈরশাসক বানিয়েছিল। এ্যামফিপলিস-এ ক্লিওটিমাস ক্যালসিডিয় বসতিস্থাপনকারীদের একটা বাড়তি সংখ্যাকে আনয়ন করেছিল। এবং এরা এসে ধনবানদের বিরোধিতা করেছিল। ইজিনাতে দেখা যায়, যে-ব্যক্তি ক্যারিস-এর সঙ্গে আলোচনা চালিয়েছিল সে তার অর্থাভাবের কারণে শাসনব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিল। অনেক সময়ে অর্থাভাব ঘটার পূর্বেই তারা শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন শুরু করে দেয়। এবং তারপরে হয় তারা নিজেরা নিজেদের তহবিল তসরূপের অপরাধকে গোপন করার জন্য গণ্ডগোলের উসকানী প্রদান করে কিংবা অপরে এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য গণ্ডগোল শুরু করে। এমনটি ঘটেছিল কৃষ্ণসাগরের এ্যাপোলোনিয়াতে।

কিন্তু যে কতিপয়তন্ত্রী শাসকদের নিজেদের মধ্যে ঐক্যমত থাকে তাদের পতন সহজে ভিতর থেকে ঘটে না। এর উত্তম দৃষ্টান্ত হচ্ছে ফারসালাস-এর শাসন ব্যবস্থা। এখানে বহুর উপর কতিপয় যে শাসন চালাচ্ছে তার সহজ কারণ হচ্ছে, তারা জানে পরস্পরের প্রতি উত্তম ব্যবহার কিরূপে করতে হবে। কিন্তু কতিপয়ী ব্যবস্থার ভিতরেই যদি কেউ কতিপয়ী ব্যবস্থা তৈরি করতে চায় তাহলে এ ব্যবস্থার পতন আসন্ন হয়ে ওঠে। এটি ঘটে যেখানে সমগ্র নাগরিক সংস্থা সংখ্যায় বৃহৎ নয় এবং কতিপয়ীদে সকলেও সর্বোচ্চ দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য নয়। এলিস-এর দৃষ্টান্তটিও এরূপ। এখানে শাসনব্যবস্থা ছিল কতিপয়ী। কিন্তু শাসনপরিষদে কিংবা প্রবীণ—পরিষদে খুব কম ব্যক্তিকেই যুক্ত করা হয়েছিল। কারণ শাসন পরিষদের

১. আইন সংক্রান্ত মামলায় বাগ্মীতার আশ্রয়গ্রহণও অনেক সময়ে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের কারণ হতে পারে। এ রকম ঘটেছিল কৃষ্ণ সাগরের হেরাক্লিয়াতে।—এ্যারিস্টট্ল

ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা আজীবন তাদের পদ দখল করে ছিল এবং তাদের মোট সংখ্যাও ছিল মাত্র নব্বই। তাছাড়া নির্বাচনের যে পদ্ধতি গৃহীত হয়েছিল তাতে স্পারটার প্রবীণ পরিষদের ন্যায় ক্ষমতাসীনদেরই সুবিধা হত।

যুদ্ধ কিংবা শান্তি, উভয় অবস্থাতে কতিপয়ী ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটতে পারে। যুদ্ধের সময়ে কতিপয়ী শাসকগণ জনতার প্রতি তাদের সন্দেহবশত ভাড়াটে সৈন্য ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। এর ফলে তাদের পতন ঘটতে পারে। কারণ যে ব্যক্তির হাতে তারা সৈন্য পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত করেছে সে নিজেই অনেক সময়ে স্বৈরশাসক হয়ে দাঁড়ায়। করিন্থ্-এ টিমোফ্যানিস তাই করেছিল। এমন অধিনায়কদের সংখ্যা যদি কয়েকজন হয় তাহলে তারা নিজেদের একটি শাসকগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করে ফেলে। অনেক সময়ে এই পরিণতির আশঙ্কায় শাসকগণ জনতাকে দেশরক্ষার কাজে নিয়োগ করতে এবং শাসনে তাদের একটা অংশ দিতে বাধ্য হয়। আবার শান্তির সময়ে দেখা যায়, কতিপয়ী শাসকগণ পারস্পরিক সন্দেহের কারণে দেশরক্ষার ভার একজন নিরপেক্ষ সেনাধ্যক্ষের অধীনে ভাড়াটে সৈন্যদের হাতে ছেড়ে দেয়। এবং তখন এই নিরপেক্ষ ব্যক্তিই উভয় দলের মাথার উপর তার ছড়ি ঘুরাতে সক্ষম ময়। এ্যালুডি-এর শাসনকালে লারিসাতে সিমাস তাই করেছিল। এ্যাবিডস্-এও ইফাডিস্ একটি ক্লাব-এর নেতৃত্ব দিয়ে অনুরূপ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

একদল কতিপয়ী শাসক অপর দলকে উচ্ছেদ করে, তখনো বিপ্লব ঘটে। এর কারণ, বৈবাহিক বিষয়ে বা আদালতে আনীত মোকদ্দমা থেকে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। বিবাহ সম্পর্কিত কিছু দ্বন্দ্বের উল্লেখ আমরা পূর্বে করেছি। এর সঙ্গে ইরিত্রিয়া-র বীরদের কতিপয়তন্ত্রের দৃষ্টান্ত যোগ করা যায়। এই ব্যবস্থার পতন ঘটিয়েছিল ডায়াগোরাস। বৈবাহিক ব্যাপারে একটা অন্যায়ের প্রতিশোধেই সে এরূপ করেছিল। হেরাক্লিয়া এবং থিবিস-এর বিপ্লবের কারণ ছিল আদালতের একটি সিদ্ধান্ত। ব্যাভিচারের এক অভিযোগে হেরাক্লিয়ার আদালত সঠিকভাবেই ইউক্শন্কে দণ্ডিত করেছিল। কিন্তু দণ্ডদানের উপায়টি দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল। থিবিস-এ এ্যারকিয়াস-এর বিরুদ্ধে আদালত সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু তাদের শত্রুপক্ষ প্রতিহিংসায় এত বদ্ধপরিকর ছিল যে, তারা তাদেরকে বাজারের মধ্যে একটা তেপায়া চৌকিতে আবদ্ধ করেছিল।

অনেক কতিপয়ীব্যবস্থার পতন ঘটেছে তাদের অত্যধিক পরিমাণের স্বৈরাচারী শাসনের কারণে। সিনিডাস এবং কিয়স-এর কতিপয়ী শাসন এর দৃষ্টান্ত। বিভিন্ন অবস্থার মিশ্রণেও পলিটি এবং যে সমস্ত কতিপয়ী ব্যবস্থার পরিষদের, আদালতের এবং অন্যান্য দপ্তরের সদস্যপদ কেবলমাত্র নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পত্তির মালিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাদের মধ্যে পরিবর্তন ঘটতে পারে। কারণ, অনেক সময়ে দেখা যায় সম্পত্তির পরিমাণ যা নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তা নির্দিষ্ট করার সময়োপযোগী ছিল,—অর্থাৎ তার ভিত্তিতে কমসংখ্যক লোক কতিপয়ী শাসনব্যবস্থাতে অংশগ্রহণ করতে পারতো। পলিটিতে সকল মধ্যবিত্তশ্রেণী অংশ নিত। কিন্তু কালক্রমে শান্তি এবং অন্যান্য সৌভাগ্যের কারণে লোকের অধিক সমৃদ্ধি ঘটতে থাকলো এবং এক সময়ে দেখা গেল যে, বর্তমানের সম্পত্তির পরিমাণ পুরনো নির্দিষ্ট পরিমাণকে বহুগুণে অতিক্রম করেছে এবং নগরীর সকলেই সকল কিছুর যোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থা দ্রুত কিংবা কালক্রমে মূল্যের পরিবর্তনের ভিত্তিতে ঘটতে পারে।

এগুলিই হচ্ছে কতিপয়ী শাসনব্যবস্থায় পরিবর্তন এবং বিপ্লবের কারণ। এর সঙ্গে এই সাধারণ মন্তব্যটি আমরা যোগ করতে পারি যে, যেমন কতিপয়ী ব্যবস্থা, তেমনি গণতন্ত্র

অনেক সময়ে বিপরীত ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হয় না, বরঞ্চ তাদের পরিবর্তন একই প্রকারের শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মধ্যে ঘটে। যেমন, যে গণতন্ত্র বা কতিপয়তন্ত্র আইন দ্বারা সীমাবদ্ধ তারা আইনের উপর ক্ষমতাধারী গণতন্ত্র বা কতিপয়তন্ত্রে পরিবর্তিত হতে পারে। এর বিপরীত ব্যাপাও ঘটতে পারে।

[পরবর্তী আলোচনা হচ্ছে অভিজাততন্ত্রে বিপ্লব। এ আলোচনার রকমটি আলাদা। কারণ অভিজাততন্ত্রের ভিত্তি, সংখ্যা নয় গুণ। তথাপি অভিজাততন্ত্রও একপ্রকার কতিপয়তন্ত্র—কারণ উত্তম গুণীদের সংখ্যা সর্বদাই কতিপয়। এ্যারিস্টট্‌লের প্রিয় যে ব্যবস্থা অর্থাৎ পলিটি তার ভিত্তিও গুণ। সে কারণে পলিটিও একপ্রকার অভিজাততন্ত্র। কিন্তু তাহলেও পলিটি চরিত্রগতভাবে কতিপয়তন্ত্রের চাইতে অধিক গণতান্ত্রিক। একারণে অভিজাততন্ত্র এবং পলিটিকে এখানে একসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে। কিন্তু তাতে যে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে এটি অস্বীকার করা চলে না।]

সপ্তম অধ্যায়

অভিজাততন্ত্রে বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার কারণ

অভিজাততন্ত্রে বিপ্লবের একটা কারণ হচ্ছে এই যে, এখানে কয়েকজন মাত্র শাসনের দায়িত্ব গ্রহণের যোগ্য। আমরা দেখেছি, একথা কতিপয়তন্ত্রী শাসনব্যবস্থা সম্পর্কেও সত্য। অভিজাততন্ত্র একপ্রকার কতিপয়তন্ত্র। কারণ উভয় ব্যবস্থাতে শাসক হওয়ার যোগ্যতা কতিপয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু তাই বলে সীমাবদ্ধতার ভিত্তি এক নয়। তবে সংখ্যার দিক দিয়ে অভিজাততন্ত্র অবশ্যই কতিপয়ের শাসন। কোনো একটি গোষ্ঠীর হাতে শাসনের এরূপ একচ্ছত্র অধিকারের বিরুদ্ধে আপত্তি নিম্নোক্ত অবস্থায় উঠতে বাধ্য : ১. জনতার মধ্যে কোনো অংশ যখন এরূপ বিশ্বাস করে যে, গুণের ক্ষেত্রে তারাও শাসকদের সমান, তখন তারা শাসকদের বিরুদ্ধতা করে। যেমন স্পারটার দৃষ্টান্ত। স্পারটায় পারথেণী নামে যারা পরিচিত ছিল অর্থাৎ যাদের জন্ম আইনানুগ নয় কিন্তু যারা শাসকদের সমান তারা একটা ষড়যন্ত্র শুরু করে। তাদের এ চক্রান্ত ধরা পড়ে যায় এবং বসতিস্থাপনকারী হিসাবে এদের সিসিলিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এরাই টারেন্টাম নগরী প্রতিষ্ঠা করেছিল। ২. আবার, যে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শাসকদের চেয়ে সামান্য পরিমাণ হীন নয় তাদের যখন ক্ষমতাসীনগণ অবদমিত করে রাখে তখন শাসকদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত হয়। স্পারটার রাজারা লাইসানডার-এর ন্যায় ব্যক্তিদের দমিত করে রেখেছিল। ৩. যখন কোনো সাহসী এবং গুণী সম্মান এবং শাসনের কোনো অংশ লাভ করে না, তখন ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এ্যাগেসিলস-এর সময়ে কিনাডন এরূপে বঞ্চিত হওয়ায় স্পারটার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করেছিল। ৪. শাসনের সদস্যদের নিজেদের সম্পত্তির পরিমাণে যখন বড় রকমের ব্যবধান থাকে তখনো বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। যুদ্ধের ফলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। মেসেনিয়ার যুদ্ধের ফলে স্পারটায় এই অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। 'ইউনোমিয়া' নামে অভিহিত টিরটিউস-এর কবিতার মধ্যে আমরা এর পরিচয় পাই। যুদ্ধে অনেকের এমন দুর্দশা ঘটে যে তারা জমির পুনর্বন্টনের দাবি তোলে। তাছাড়া ৫. যখন এক ব্যক্তি শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং সে অধিকতর ক্ষমতাবান হয়ে ওঠার উপক্রম করে তখন অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। পারস্যের যুদ্ধে যে পসেনিয়াস স্পারটার বাহিনীর নেতৃত্ব করেছিল এবং যে হ্যাননো কারথেজীয়দের নেতা ছিল তারা তাদের রাষ্ট্রে একক শাসকে পরিণত হতে চেয়েছিল।

কিন্তু পলিটি এবং অভিজাততন্ত্র—উভয়ের পতনের প্রধান কারণ হচ্ছে, শাসনতন্ত্রের নীতি থেকে তাদের বিচ্যুতি। পলিটির ক্ষেত্রে এই বিচ্যুতি হচ্ছে কতিপয়ীব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুমিশ্রণের ব্যর্থতা। অভিজাততন্ত্রের ব্যর্থতা হচ্ছে এ দুটির সঙ্গে গুণের মিশ্রণের এবং বিশেষ করে গণতন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্রের মিশ্রণের ব্যর্থতা। কারণ যাদের অভিজাততন্ত্র এবং যাদের পলিটি বলে অভিহিত করা হয় তাদের অধিকাংশেরই লক্ষ্য হচ্ছে

এই দুটি ব্যবস্থার মিশ্রণ ঘটানো। তাদের মধ্যকার পার্থক্যও এখানে নিহিত থাকে। অর্থাৎ এই মিশ্রণের গুণাগুণের ক্ষেত্রেই তাদের পার্থক্য। সুমিশ্রণের সাফল্য কিংবা ব্যর্থতাই কোনো ব্যবস্থাকে অধিক স্থায়ী এবং কোনো ব্যবস্থাকে কম স্থায়ী করে তোলে। যার মধ্যে কতিপয়ী প্রবণতা দেখা যায় তাদের পলিটি বলে অভিহিত করা হয়। এর ফলে অভিজাততন্ত্রের চাইতে পলিটির পতনের সম্ভাবনা কম হয়। এর একটা কারণ, রাষ্ট্রের আকার শক্তির একটি উপাদান। যেখানে অধিকতর সংখ্যক সমান অংশ ভোগ করে সেখানে অধিক পরিমাণে সন্তোষ বিরাজ করে। কিন্তু যেখানে সম্পদ এবং শাসনের সুযোগ একত্রীভূত হয় সেখানে ক্ষমতার অপব্যবহারের প্রবণতা আসে। শাসকরা তখন ক্ষমতা দ্বারা তাদের সম্পদকে বৃদ্ধি করতে চায়।

এ ক্ষেত্রে একটা সাধারণ নিয়ম এই যে, শাসনব্যবস্থায় যদি পরিবর্তনের একটা প্রবণতা দেখা যায় তাহলে যারা নিজেদের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করতে চায় তারা শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের এই প্রবণতার পক্ষই অবলম্বন করে। তখন পলিটি গণতন্ত্রের দিকে এবং অভিজাততন্ত্র কতিপয়তন্ত্রের দিকে পরিবর্তনের ঝোঁক দেখায়। অবশ্য বিপরীত প্রবণতাও দেখা যেতে পারে। অভিজাততন্ত্রও গণতন্ত্রের দিকে মোড় নিতে পারে। দরিদ্রগণ যদি নির্যাতিত হয় তাহলে তারা গণতন্ত্রের দিকে শাসনব্যবস্থাকে আকর্ষণ করতে পারে। এবং পলিটি যখন তার স্থায়ীত্বের গুণগুলিকে হারিয়ে ফেলে তখন পলিটিও কতিপয়তন্ত্রে পর্যবসিত হয়ে যায়। পলিটির স্থায়ী হবার গুণ হচ্ছে সম্পদের সমতা এবং ব্যক্তিগত স্বত্বভোগের স্বাধীনতা। থুরীতে এই ঘটনা ঘটেছিল। এখানে একদিকে পদের জন্য সম্পত্তির শর্ত যখন অধিক হয়ে দাঁড়ালো তখন তাকে হ্রাস করা হলো এবং পদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হলো। অপরদিকে উচ্চতর শ্রেণীগুলি বেআইনীভাবে সমস্ত জমি কব্জা করলো। শাসনব্যবস্থা অধিকতর কতিপয়ী হওয়াতে তাদের পক্ষে এরূপ করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধকালে অস্ত্রব্যবহারে শিক্ষিত জনতা এবার ছাউনীর সেনাদের চাইতে শক্তিশালী হয়ে উঠলো। ফলে যারা এতদিন তাদের অংশের অধিক দখল করেছিলো তাদের তা দিয়ে দিতে হলো।

অভিজাততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার নিয়ন্ত্রক যে কয়েকজন মাত্র, তার আর একটা ফল এই দাঁড়ায় যে, নেতৃস্থানীয় নাগরিকগণ অধিকতর মুনাফা অর্জন করে। স্পারটার দৃষ্টান্ত ধরা যায়। এখানে দেখা গেল মাত্র কয়েকজনের হাতে বিরাট পরিমাণ ভূসম্পত্তি এসে জমা হলো। কতিপয় এবং অভিজাততান্ত্রিক—এই উভয় ব্যবস্থায় নেতৃস্থানীয় নাগরিকদের আপন ইচ্ছা বিনৃষ্ট হয়েছিল। স্বৈরশাসক ডায়োনিসিয়াস-এর সঙ্গে একটি বৈবাহিক সম্পর্ক তৈরি করা হয়েছিল। গণতন্ত্রে এরূপ হওয়া কখনো সম্ভব ছিল না। এমনকি যে অভিজাততন্ত্রে উপাদানসমূহের সুমিশ্রণ ঘটে সেখানেও এটি সম্ভব হতো না।

অভিজাতন্ত্রে যে পরিবর্তনগুলি আসে তা সাধারণত দৃষ্টির অগোচরে আসে। কারণ এ ব্যবস্থার বিলোপ হচ্ছে একটা ক্রমিক প্রক্রিয়ার ব্যাপার। অবশ্য এ ব্যাপারটি যে সকল শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, তা আমরা পূর্বে বলেছি। কারণ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনো বিষয় থেকেও পরিবর্তন সংঘটিত হতে পারে। যেমন, নাগরিকগণ যদি প্রথমে শাসনব্যবস্থার ক্ষুদ্র কোনো অংশকে পরিবর্তন করতে পারে তাহলে পরবর্তীতে শাসনতন্ত্রের অপর কোনো বৈশিষ্ট্য, এমনকি অধিকতর গুরুতর কোনো বৈশিষ্ট্যকে পরিবর্তন করা সহজতর মনে করবে। এবং পরিশেষে দেখা যাবে ব্যবস্থাটি পুরোপুরিই পাল্টে গেছে। এখানেও থুরির দৃষ্টান্তের কথা আমরা বলতে পারি। থুরিতে আইন সঙ্গতভাবে সেনাধ্যক্ষের গুরুত্বপূর্ণ

পদটিকে পঞ্চম বর্ষের পরেই মাত্র একই ব্যক্তি অধিকার করতে পারতো। কিন্তু একবার দেখা গেল যে, তরুণদের মধ্যে অনেকে দক্ষ যোদ্ধা হয়ে উঠেছে। সাধারণ সেনাবাহিনীতে তাদেরকে বিশেষ সম্মানের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। সেনাধ্যক্ষদের এই দলটি রাজনীতিকদের কোনো পরোয়া করত না। তাদের ধারণা হল রাজনীতিকদের তারা সহজেই সরিয়ে দিতে পারে। এই মনোভাব থেকে তারা প্রথমে এই আইনটিকে বাতিল করার উদ্যোগ গ্রহণ করলো। তাদের উদ্দেশ্য হলো, একই ব্যক্তিকে ধারাবাহিকভাবে সেনাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত রাখা। তারা জানতো জনতা স্বেচ্ছায় তাদের নির্বাচিত করে দিবে। এ ব্যাপারে যাদের দায়িত্ব ছিল, যাদের পরিষদবৃন্দ বলা হতো তারা গোড়াতে এমন উদ্যোগের বিরোধিতা করার মনোভাব দেখালেও অবশেষে তারাও অপর সকলের সঙ্গে সেনাধ্যক্ষদের পক্ষ সমর্থন করলো। তাদের ধারণা ছিল, এই আইনের সংশোধন হলেও অবশিষ্ট শাসনতন্ত্র অপরিবর্তিত থাকবে। কিন্তু পরবর্তীতে আরো সংশোধনের যখন প্রস্তাব এলো এবং তাকে যখন পরিষদবৃন্দ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলো তখন তারা কোনো কিছু করার ক্ষেত্রে নিজেদেরকে ক্ষমতাহীন দেখতে পেলো। এভাবে সমগ্র শাসনব্যবস্থাটিই পরিবর্তিত হয়ে গেলো এবং শাসনের নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী সেই গোষ্ঠীর হাতে চলে গেলো যারা বিপ্লবের প্রক্রিয়াটি শুরু করেছিল।

শাসনব্যবস্থা যেমন ভিতর থেকে তেমনি বাইর থেকেও পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন প্রতিবেশী কোনো শাসনব্যবস্থা যদি বিপরীতধর্মী হয় এবং তার অবস্থা যদি তেমন দূরবর্তী না হয়, কিংবা দূরবর্তী হলেও যদি সে ব্যবস্থা বিশেষ ক্ষমতাশালী হয় তাহলে তার প্রভাব দুর্বলতরের উপর পড়তে বাধ্য। এথেনীয় এবং ল্যাসিডিমনীয় (স্পারটা)-দের ইতিহাস থেকে এ সত্যের আমরা দৃষ্টান্ত পাই। এথেনীয়গণ প্রত্যেক ক্ষেত্রে কতিপয়তন্ত্রী ব্যবস্থাকে এবং ল্যাসিডিমনীয়গণ গণতান্ত্রিক সরকারকে বিলুপ্ত করেছে।

শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন এবং বিপ্লবের কারণ সম্পর্কে অধিক আলোচনা আর থাক।

[বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনার তৃতীয়ভাগ : বিপ্লবকে প্রতিরোধের উপায়সমূহ। এবার প্রশ্ন হচ্ছে শাসনতন্ত্রের স্থায়িত্ব কিভাবে নিশ্চিত করা যায় এবং বিপ্লব প্রতিরোধেরই বা উপায় কি? এই বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যাচ্ছে পরবর্তী অধ্যায় দু'টি ৮ এবং ৯তে।]

অষ্টম অধ্যায়

শাসনব্যবস্থার সংরক্ষণ তথা বিপ্লব প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে

আমাদের আলোচনার পরবর্তী বিষয় হচ্ছে শাসনব্যবস্থার সংরক্ষণ। এক্ষেত্রে সাধারণভাবে এবং বিশেষভাবে কি বলা যায়, তা দেখতে হবে। স্পষ্টত এ বিষয়ে প্রথম কথা হচ্ছে, আমরা যদি শাসনব্যবস্থার ধ্বংসের মূলে কি কারণগুলি থাকে তা ধরতে পেরে থাকি (আমার তো মনে হয় আমরা তাদের নির্দিষ্ট করতে পেরেছি) তাহলে কিসের দ্বারা শাসনব্যবস্থাকে রক্ষা করা যায় তাও আমরা জানি। কারণ, বিপরীত বিপরীতকে উৎপাদন করে এবং ধ্বংস সংরক্ষণের বিপরীত।

প্রথম কথা হচ্ছে, যে-শাসনব্যবস্থা সুমিশ্রিত সেখানে শাসনতন্ত্রের বিরোধী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে সামান্য লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ আইন বিরুদ্ধতা সঙ্গোপনেই প্রবেশ করে। এটা আমাদের খরচের সামান্য বিষয়গুলির মতো। সামান্য খরচগুলি যদি বারংবার করা হয় তাহলে তার সবটাতে কোনো ব্যক্তির সমগ্র সম্পদই নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। খরচটা নজরে পড়ে না। কারণ টাকাটা এক চোটে খরচ করা হচ্ছে না, আর এতে মনের দৃষ্টিও অন্যত্র নিবদ্ধ হয়। এটা প্রায় সফিস্টদের যুক্তির মতো : 'ক্ষুদ্রের সমগ্র ক্ষুদ্র'। কথাটার মধ্যে সত্যতা এবং অসত্যতা—উভয়ই থাকতে পারে। কারণ সব বা সমগ্রটা ক্ষুদ্র দিয়ে তৈরি হয়েও ক্ষুদ্র না হতে পারে। সূচনাতে এরূপ ভুলের বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। তেমনি জনতাকে বিভ্রান্ত করার জন্য যে সব রাজনৈতিক চাতুরী ব্যবহার করা হয় সেগুলির উপর বিশ্বাস স্থাপন করাও আমাদের উচিত হবে না। (রাজনৈতিক চাতুরী বলতে আমি কি বুঝাতে চাচ্ছি তার ব্যাখ্যা আমি ইতিপূর্বে করেছি।)

আমাদের দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, অনেক অভিজাততন্ত্র (এবং কতিপয়তান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাও) যে চালু থাকে তার কারণ শাসনতন্ত্রের নিজস্ব শক্তি যত নয়, তার চেয়ে অধিক হচ্ছে এই সত্য যে, ক্ষমতাসীনরা নাগরিক সংস্থার অন্তর্গত সদস্যবর্গের প্রতি যেমন, তেমনি যারা তার বাইরে রয়েছে তাদের প্রতিও উপযুক্ত আচরণ করতে জানে। অন্য কথায়, তারা বাইরের লোকদের প্রতি যেমন অন্যায় আচরণ করে না, তেমনি তাদের নেতৃবৃন্দকে শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণেরও অধিকার প্রদান করে। তারা উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের অবদমিত কিংবা হীনতাগ্রস্ত করে না কিংবা অর্জিত সম্পদ থেকেও তাদের বঞ্চিত করা হয় না। তাছাড়া শাসনে যারা অংশগ্রহণ করে তাদের এবং নিজেদের মধ্যে আচরণে তারা গণতান্ত্রিক মনোভাব প্রদর্শন করে। গণতান্ত্রিক মনোভাবে অর্থ সমতার মনোভাব কারণ সকল নাগরিকদের সমভাব দেখানোই গণতন্ত্রীদের লক্ষ্য এবং সমানের মধ্যে সমভাব যেমন ন্যায়সঙ্গত তেমনি সুফলদায়ক। কাজেই নাগরিকদের সংখ্যা যদি অধিক হয় তাহলে ব্যবস্থার মধ্যে গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য সন্নিবিষ্ট করা বিশেষ সুবিধাজনক বলে বিবেচিত হয়।

কার্যকালের মেয়াদ ছ'মাস করা একটি গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য। এর উদ্দেশ্যটি হচ্ছে, সকলে যখন সমান তখন সকলে যেন সমান সুযোগ লাভ করে। তাদের সমতাই তাদেরকে জনতায় রূপান্তরিত করে এবং অনেক সময়ে এদের মধ্য থেকেই জনপ্রিয় নেতার উদ্ভব ঘটে। তাছাড়া এধরনের কতিপয়তন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্রের ক্ষমতাধর গোষ্ঠীর করতলগত হওয়ার আশঙ্কা কম। কারণ দীর্ঘ মেয়াদী পদের তুলনায় স্বল্প মেয়াদী পদে অন্যায় সাধনের সুযোগ কম থাকে। এর অর্থ হচ্ছে, যেমন গণতন্ত্র তেমনি কতিপয়তন্ত্রে স্বৈরশাসনের উদ্ভবের সম্ভাবনা থাকে। কারণ এর উভয় ব্যবস্থায় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা নিজেদের জন্য একচ্ছত্র শাসনের কামনা করে। এক ব্যবস্থায় এরূপ কামনা করে জনপ্রিয় নেতারা; অপর ব্যবস্থায় কামনা করে ক্ষমতাধর গোষ্ঠী অথবা উচ্চতম পদে দীর্ঘকাল যাবৎ অধিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ।

সম্ভাব্য বিপদ দূরে অবস্থিত হলেই যে শাসনব্যবস্থার স্থিতি স্পষ্টতর হয় এমন নয়। কোনো কোনো সময়ে বিপদ সন্নিকট হলেও শাসনব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। কারণ লোকের মনে ভয় থাকলে লোকে নিজেদের শাসনতন্ত্রকে দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে। কাজেই শাসনব্যবস্থার স্বার্থরক্ষা করা যাদের আন্তরিক উদ্দেশ্য তাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় শাসনব্যবস্থার পক্ষ থেকে ভয় উৎপাদন করা। এর ফলে সকলে সতর্ক হবে এবং রাত্রিকালে প্রহরীদের ছড়িয়ে পড়ার মত তাদের সতর্কতা বিত্রস্ত হয়ে পড়বে না। যে ভীতি দূরবর্তী ছিল তাকে নিকটবর্তী করতে হবে। তাছাড়া শাসনকর্তাদের আইনের মাধ্যমে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বীতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার ব্যাপারেও অধিকতর সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে। এবং এরূপ ক্ষেত্রে যারা জড়িত নয় তাদেরও জড়িত হওয়ার পূর্বে সংযত করতে হবে। সূচনাতেই যে ক্ষতি সাধিত হচ্ছে তাকে ধরতে পারা একজন প্রকৃত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ব্যতীত সকলের পক্ষে সম্ভব নয়।

আমরা দেখেছি, কতিপয়তন্ত্রী ব্যবস্থা এবং পলিটিতে পরিবর্তন আসে নাগরিকতার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পত্তির শর্ত থেকে। শর্তের পরিমাণটি নির্দিষ্ট থাকে কিন্তু সঞ্চালিত অর্থ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ অবস্থার মোকাবেলার উত্তম উপায় হচ্ছে, এই বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে কর ধার্যযোগ্য সমগ্র সম্পদের মূল্যায়ন করা। এতে পুরোন পরিমাণের সঙ্গে নতুন সমগ্র সম্পদের তুলনা বুঝতে পারা যাবে। অনেক নগরীতে এই মূল্যায়ন প্রতি বৎসরই করা হয়। বৃহত্তর নগরীতে করা হয় প্রতি তিন বৎসর কিংবা পাঁচ বছর অন্তর। এবং মূল্যায়নে যদি দেখা যায় সম্পদের মূল্য নাগরিকতার শর্ত প্রথমে ধার্য করার তুলনায় বৃদ্ধি কিংবা হ্রাস পেয়েছে তাহলে নতুনভাবে তাকে অধিকতর কিংবা অল্পতরে নির্ধারিত করাই হবে আইনসঙ্গত ব্যাপার। মূল্য যদি বৃদ্ধি পেয়ে থাকে তবে শর্তের পরিমাণ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি করা হবে। মূল্য হ্রাস পেয়ে থাকলে হ্রাসের পরিমাণের অনুপাতে তাকে ধার্য করা হবে। এভাবে যদি সাধিত না হয় তাহলে মূল্য হ্রাসের ফলে পলিটি থেকে কতিপয়তন্ত্রে এবং কতিপয়তন্ত্র থেকে ক্ষমতাধর গোষ্ঠীর আধিপত্যের দিকে পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। মূল্য বৃদ্ধি পেলে পরিবর্তন হবে পলিটি থেকে গণতন্ত্রের দিকে এবং কতিপয়তন্ত্র থেকে পলিটি বা গণতন্ত্রের দিকে।

[শাসনব্যবস্থার স্থিতি ব্যক্তির আচরণেও বিপন্ন হতে পারে। এরূপ হচ্ছে অতি-উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং অর্থগৃধ্নু ব্যক্তি। দায়িত্বের জন্য রাষ্ট্র থেকে বেতন গ্রহণ এবং দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ উপার্জন, এ দু'এর মধ্যে যে পার্থক্য আছে, এ্যারিস্টটল তা জানতেন। (৪র্থ পুস্তক : অধ্যায় ৬ দ্রষ্টব্য) কিন্তু নীচের আলোচনাটিতে সেই পার্থক্যটি স্পষ্ট থাকছে না।]

গণতন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্র এবং অপর সব শাসনব্যবস্থারই একটি সাধারণ নীতি হচ্ছে কারুর ক্ষমতাকে মাত্রাধিকভাবে বৃদ্ধি না করা। সকল ব্যবস্থারই নীতি হচ্ছে এককালীন কোনো বৃহৎ পদোন্নয়ন না করে দীর্ঘ বিরতিতে কোনো ব্যক্তির পদোন্নয়ন করা উত্তম। কারণ বিরাটভাবে এককালীন পদোন্নতি উদ্দিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিকর। সফলতার নেশার ঘোর কাটানো সকলের পক্ষে সহজ নয়। এমনটি যদি করা সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত কারু উপর একচোটে বিরাট পরিমাণ সম্মান আরোপ করা এবং তারপরে আকস্মিকভাবে এক চোটে সে সম্মান প্রত্যাহার করার ব্যাপার পরিহার করতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই প্রক্রিয়াটিকে ক্রমিক হতে হবে। এই শাসনব্যবস্থার রক্ষাকারীগণ আইনের মাধ্যমে এরূপে নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করে যাতে কোনো নাগরিকই তার অর্থ বা পারিবারিক সম্পর্কের কারণে অত্যধিক প্রভাবশালী হয়ে উঠতে না পারে। তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে এরূপ লোককে নির্দেশ দেওয়া হয় তারা যেন স্বেচ্ছায় দেশত্যাগ করে চলে যায়। কিন্তু দেখা গেছে মানুষ বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের সূচনা ঘটায় নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে জড়িত কোনো কারণে। এজন্য এমন একটা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন যে ব্যবস্থার দায়িত্ব হবে যাদের কার্যক্রম রাষ্ট্রের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় তাদের উপর খবরদারী করা। এ পরামর্শ কতিপয়তন্ত্র, গণতন্ত্র এবং অপর সব শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। এই একই কারণে সমাজের কোনো একটি অংশের অতি সমৃদ্ধির বিরুদ্ধেও সতর্ক থাকতে হবে। এ বিপদের মোকাবেলা করা যায়, রাষ্ট্রের কোনো একটি অংশকে তা প্রদান করার মাধ্যমে। (আমি শিক্ষিত অংশকে সাধারণের এবং সম্পদবানদের দেশীদের পরস্পর বিরোধী হিসাবে বিবেচনা করছি।) অধিকতর দরিদ্রদের অধিকতর সম্পদবানদের অঙ্গীভূত করা কিংবা সম্পদের ক্ষেত্রে মধ্যমশ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার একটা চেষ্টাও করা যেতে পারে। এতে অসমতার কারণে যে অসন্তোষ তা বিদূরিত হবে।

সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, সব শাসনব্যবস্থার আইন এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন হতে হবে যে, রাষ্ট্রীয় কোনো পদে অধিষ্ঠিত হওয়া লাভের উৎস বলে যেন বিবেচিত হতে না পারে। যে সব শাসন কতিপয়ী ধরনের সে শাসনব্যবস্থায় এ বিষয়ে বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কারণ, অধিকাংশ মানুষ সরকারি পদের বাইরে থাকাতে মনঃক্ষুণ্ণ হয় না। বরঞ্চ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের বদলে নিজেদের কার্যাদিতে সময়দানের সুযোগে তারা সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু সরকারি পদ—কর্তাগণ রাষ্ট্রীয় অর্থে নিজেদের সমৃদ্ধি ঘটাবে, এটি তারা পছন্দ করে না। এতে সাধারণ মানুষের বিক্ষোভ দুটি রূপ গ্রহণ করে। তারা মনে করে তারা সরকারী পদ থেকে যেমন বঞ্চিত হচ্ছে তেমনি অর্থ লাভ থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। তাছাড়া সরকারি পদকে লাভ-মুক্ত রাখার নীতিতেই মাত্র গণতন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্রের সমন্বয়ে একটি রাষ্ট্র তৈরি করা সম্ভব। এর ফলে উচ্চতর শ্রেণী এবং জনতা উভয়ের পক্ষেই নিজেদের প্রকৃত ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভব হবে। কারণ গণতান্ত্রিক দাবি হচ্ছে, কেবলমাত্র উচ্চতর শ্রেণীই রাষ্ট্রীয় পদগুলি পূরণ করবে। এবং সরকারি পদ যখন কোনো লাভের উৎস হবে না তখন অবস্থাটি এমনই হবে। কারণ যারা সচ্ছল নয় সরকারি পদে অর্থকরী লাভ না থাকলে তাকে দখল করার তারা চেষ্টা করবে না। তারা নিজেদের কার্যাদির তদারক করাই অধিকতর পছন্দ করবে। অপরদিকে ধনবান যারা তারা সরকারি পদ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। কারণ সরকারি পদ থেকে অর্থপ্রাপ্তির তাদের প্রয়োজন পড়ে না। এর ফল এই হচ্ছে যে, দরিদ্রগণ সন্তুষ্ট হবে, কারণ তারা তাদের নিজেদের কাজে অধিক সময় প্রদান করার সুযোগ পেয়ে সচ্ছল হতে পারবে এবং ধনিকগণও সন্তুষ্ট হবে,

কারণ সাধারণ মানুষের শাসন তাদের ভোগ করতে হবে না। রাষ্ট্রীয় তহবিলের তসরূপ বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্রীয় তহবিল কোনো নতুন পদকর্তার নিকট হস্তান্তর কার্য সকল নাগরিকদের সম্মুখে করতে হবে। রাষ্ট্রীয় সম্পদের বিবরণী এবং তালিকা তৈরি করতে হবে এবং তা সকল ভ্রাতৃসংঘ, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং গোত্রের গোচরীভূত করতে হবে। তাই বলে লাভশূন্য সরকারি পদ যাতে অপূর্ণ না থাকে সেজন্য রাষ্ট্রীয় পদে প্রশংসনীয় সেবার জন্য সম্মান এবং সুযোগ প্রদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

গণতন্ত্রে ধনিকদের প্রতি সুবিবেচনা প্রদর্শন করতে হবে। ধনিকদের সম্পত্তি পুনর্বন্টনের উপর কোনো কর ধার্য করা উচিত হবে না, কিংবা আয়ের যে পুনর্বন্টন কোনো কোনো নগরীতে অপ্রকাশ্যভাবে চলে তাকেও করযোগ্য করা ঠিক হবে না। এবং মশাল-দৌড়, কিংবা এক্য-তানের প্রশিক্ষণ কিংবা অনুরূপ ব্যয়বহুল কিন্তু জনস্বার্থে প্রয়োজনীয় নয় এমন ক্রিয়াকর্ম ধনিকগণ পরিচালনা করতে চাইলেও তাদের সেরূপ অনুমতি না দেওয়া উত্তম হবে। কতিপয়তন্ত্রে অপরদিকে যারা সচ্ছল নয় তাদের মঙ্গলের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। যে সব পদে বেতন দানের ব্যবস্থা আছে সেগুলি অসচ্ছলদের মধ্যেই বিতরণ করা সঙ্গত হবে। তাদের বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের দণ্ড ধনিকদের নিজেদের মধ্যে চুক্তিভঙ্গের দণ্ডের চাইতে অধিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্বাধীনভাবে উত্তরাধিকার ঘোষণার অধিকার থাকা উচিত নয়। নিকট আত্মীয়ই মাত্র উত্তরাধিকারী হবে। এবং এক ব্যক্তিকে একাধিক সম্পত্তির মালিক হতে দেওয়া উচিত হবে না। এভাবে সম্পদের ক্ষেত্রে বৈষম্য অনেক কম হবে এবং দরিদ্রগণের মধ্যে অধিকতর সংখ্যক সচ্ছলদের কাতারে যুক্ত হতে সক্ষম হবে। গণতন্ত্র কিংবা কতিপয়তন্ত্র সর্বত্রই শাসনে অংশগ্রহণ যাদের কম তাদের প্রতি সমতার আচরণ কিংবা বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান লাভজনক হয়। এর অর্থ এই নয় যে, তাদের ক্ষমতাসম্পন্ন পদগুলি প্রদান করতে হবে। এ সকল পদকে অবশ্যই প্রধানত কিংবা সাধারণত শাসনতান্ত্রিক সংস্থার সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

নবম অধ্যায়

শাসকদের তিনটি গুণের আবশ্যকতা

সরকারি ক্ষমতা যারা ধারণ করে তাদের তিনটি গুণ অত্যাবশ্যক : ১. প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থার প্রতি আনুগত্য, ২. সংশ্লিষ্ট দায়িত্বের যোগ্যতা, এবং ৩. প্রচলিত সমাজের উত্তমতা এবং সততা। (ন্যায়ের ক্ষেত্রে পার্থক্য সৃষ্টি হওয়া অনিবার্য। কারণ নীতির মান সকল শাসনব্যবস্থার এক নয়।) কিন্তু এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে : এই সকল গুণের সাক্ষাৎ যদি একই ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া না যায় তাহলে শাসক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে কি প্রকারে? কারুর যদি সামরিক দক্ষতা থাকে কিন্তু মানুষ হিসাবে তার মান উচ্চ না হয়, শাসনব্যবস্থার প্রতিও তার মনোভাব অনুকূল নয়, এবং অপর একজন এমন যে সৎ এবং অনুগত—এমন অবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপায় কি? এখানে দুটো জিনিসের প্রতি আমাদের অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে : কোন্ গুণ সাধারণভাবে সকল মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় এবং কোন্ গুণ সাধারণভাবে তত পাওয়া যায় না। সেনাধিনায়কতা নির্ভর করে সততার চাইতে অধিক পরিমাণে অভিজ্ঞতার উপর। কারণ সততার চাইতে সামরিক দক্ষতা কম লোকের মধ্যে পাওয়া যায়। কিন্তু সরকারি যে দায়িত্বের করণীয় হচ্ছে লোকের উপর খবরদারী এবং সম্পদের রক্ষা সেখানে ব্যাপারটা এর বিপরীত। এখানে সাধারণের চাইতে অধিক পরিমাণে আবশ্যক সততার, কিন্তু যে গুণ সকলের মধ্যে দৃষ্ট হয় না তেমন গুণের নয়। আর একটা প্রশ্নও উঠতে পারে : আনুগত্য এবং দক্ষতা—এ দুটো যদি পাওয়া যায় তাহলে ন্যায়ের আর প্রয়োজন কি? এ দুটো গুণ থাকলে বাকি যা প্রয়োজন তাও কি সৃষ্টি হবে না? এর জবাবে আমরা বলতে পারি, কোনো মানুষের এই দুটি গুণ থাকা সত্ত্বেও নৈতিকভাবে সে অযোগ্য হতে পারে। এবং এমন মানুষ যদি যা সর্বোত্তম এবং ঠিক তা সম্পাদনে অক্ষম হয়, যদি সে নিজের, তথা যাকে সে জানে এবং ভালোবাসে তার মঙ্গল সাধনে অসমর্থ হয়, তাহলে দেশের সর্বোত্তম মঙ্গল সাধনের ক্ষেত্রেও সে কি অক্ষম হবে না? মোট কথা, যাকে আমরা একটি নগরীর শাসনব্যবস্থার জন্য উত্তম আইনসমূহের নীতি বলে বিবেচনা করি, প্রতিটি ক্ষেত্রে, তা হচ্ছে তার শাসনতান্ত্রিক রক্ষা কবচ বিশেষ। এবং এরই অন্তর্গত হচ্ছে প্রায়শ ব্যক্ত এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ নীতিটি অর্থাৎ এ অবস্থার নিশ্চয়তা যে, শাসনব্যবস্থাটিকে যারা বজায় রাখতে চায় তাদের সংখ্যা যারা তাকে বজায় রাখতে চায় না তাদের চাইতে অধিক হতে হবে।

এর সঙ্গে আর একটি বিষয় আছে যেটিকে উপেক্ষা করা মোটেই উচিত হবে না। বিষয়টি হচ্ছে, মধ্যপন্থার নীতি। যে শাসনতন্ত্র তার নীতি থেকে বিচ্যুত হয় নীতিটি তার মধ্যেও অনেক সময় উক্ত থাকে। অনেক সময়ে এমন সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় যাকে আপাতঃদৃষ্টিতে গণতান্ত্রিক বলে বোধ হয়, কিন্তু, এসব পদক্ষেপই গণতন্ত্রের পতনের কারণ হয়। কতিপয়তন্ত্রের ক্ষেত্রেও এমনটি হতে পারে। অনেকে তাদের নিজেদের

অভিমতকেই সব চাইতে ঠিক বলে গণ্য করে এবং সেই অভিমতকেই চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত ঠেলে নিয়ে যায়। তারা একথাটি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে, যে নাকটি একটু বাঁকা বা বোঁচা হওয়ার কারণে আদর্শ নাক নয়, সে নাকটিও একটি উত্তম নাক এবং দেখতেও সে নাক বলেই বোধ হয়। কিন্তু বিচ্যুতির প্রক্রিয়াটি যদি চরমে নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে দেহের এই নির্দিষ্ট অঙ্গের সঙ্গে এই প্রত্যঙ্গের যে অনুপাত সেটি বিনষ্ট হবে এবং সর্বশেষে একে আর নাক বলেই বোধ হবে না। এর কারণ নাকটির 'বাঁকাত্ব' কিংবা বোঁচা অবস্থা তথা থ্যাবড়াত্বকে তার চরমে ঠেলে নেওয়া হয়েছে। একথা আমাদের দেহের অপর অঙ্গগুলি সম্পর্কেও যেমন সত্য, তেমনি এটি শাসনব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কেও সত্য। কতিপয়তন্ত্র এবং গণতন্ত্র—উভয়ই মোটামুটি ভালো হতে পারে, যদিও এরা আদর্শ মানদণ্ড থেকে বিচ্যুত ব্যবস্থা। কিন্তু কেউ যদি এদের কোনো ব্যবস্থাকে চরমে নিয়ে যায়, তাহলে প্রথমত, ব্যবস্থাটির অবনতি ঘটবে এবং পরিশেষে এটি যে একটি শাসনব্যবস্থা এরূপই বোধ হবে না। কাজেই যেমন আইনদাতা তেমনি কার্যরত রাজনীতিকদের কোন্ পদক্ষেপ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করে এবং কোন্ পদক্ষেপ তাকে ধ্বংস করে—এদের মধ্যকার পার্থক্য অনুধাবন করতে হবে। কারণ, কতিপয়তন্ত্র বা গণতন্ত্র—এদের কারুর পক্ষেই অর্থবান এবং জনসাধারণ এদের কাউকে বাদ দিয়ে অস্তিত্বমান হওয়া এবং তার অস্তিত্ব রক্ষা করা, এর কোনোটিই সম্ভব নয়। এই দুই শ্রেণীর মধ্যকার পার্থক্য যদি সম্পত্তির সমতা দ্বারা বিলোপ করা হয় তাহলে উদ্ভূত শাসনব্যবস্থা উভয় প্রকার থেকে পৃথক হয়ে যাবে। এর অর্থ দাঁড়াবে শাসনতন্ত্রকে আইন দ্বারা ধ্বংস করে দেওয়া। এই ভুল গণতন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্র—উভয়ক্ষেত্রে করা হয়। গণতন্ত্রে এটি সাধিত হয় জনপ্রিয় নেতাদের দ্বারা যখন জনতার ক্ষমতা আইনকেও অতিক্রম করে যায়। তখন তারা ধনিকদের উপর সার্বক্ষণিক আক্রমণ দ্বারা একটি নগরীকেই দুইটি নগরীতে পরিণত করে ফেলে। অথচ স্থিতির স্বার্থে তাদের এর বিপরীতভাবেই আচরণ করা উচিত। তাদের উচিত সর্বদা এরূপ দেখানো যে তারা ধনিকদের পক্ষ থেকেই কথা বলছে। তেমনি কতিপয়তন্ত্রেও এই ব্যবস্থার সদস্যদের সর্বদা এরূপ দেখানো উচিত যে, তারা জনতার পক্ষেই কথা বলছে। এবং দায়িত্ব গ্রহণে যে শপথবাক্য তারা পাঠ করে তা বর্তমানে অনেকে যে শপথ পাঠ করে তার একেবারে বিপরীত হওয়া উচিত। আজ যেখানে তাদের শপথ হয় "জনতাকে আমি আমার শত্রুতে পরিণত করব এবং তাদের বিরুদ্ধে আমার সাধ্যমত কাজ করব", সেখানে শপথের ঘোষণাটি হওয়া উচিত "জনতার প্রতি আমি কোন অন্যায় সাধন করব না"।

> [শিক্ষা দ্বারা যদি স্থিতি বৃদ্ধি করতে হয় তাহলে যে সমাজব্যবস্থা তৈরী করার আমরা ইচ্ছা করছি সেই সমাজব্যবস্থার লক্ষ্য দ্বারা শিক্ষাকে পরিচালিত হতে হবে। এই লক্ষ্যটি যে বিস্মৃত হচ্ছে, এটিকে এ্যারিস্টট্‌ল উত্তম বলে বিবেচনা করেন না।]

কিন্তু শাসনব্যবস্থার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য যে সব নিরাপত্তামূলক উপায়ের কথা শোনা যায় তার মধ্যে যেটি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ এবং সবচাইতে অবজ্ঞাত তা হচ্ছে শিক্ষা। অন্যকথায় প্রত্যেকটি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে শাসনব্যবস্থার নিজস্ব জীবনপদ্ধতির জন্য নাগরিকদের শিক্ষিত করা। একটি শাসনব্যবস্থা রক্ষার জন্য কোনো উত্তম উপায়ের ক্ষেত্রে সকলে মিলে ঐক্যমত হওয়া বড় কথা হয় যদি এই শাসনব্যবস্থার জীবনপদ্ধতি অনুযায়ী সকল ব্যক্তিকে শিক্ষিত করে তোলা না নয়। তার অর্থ, শাসনব্যবস্থাটি যদি গণতান্ত্রিক হয় তাহলে নাগরিককে গণতান্ত্রিক জীবনপদ্ধতিতে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। ব্যবস্থাটি যদি

কতিপয়তান্ত্রিক হয় তাহলে কতিপয়তান্ত্রিক জীবন পদ্ধতির লক্ষ্যে সকলকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। কারণ শিক্ষার অভাবে একটি ব্যক্তি যেমন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে, একটি সমগ্র নগরীও তেমনি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যেতে পারে। অবশ্য শাসনব্যবস্থায় শিক্ষিত করা বলতে আমি কেবল তরুণদেরকে কতিপয়তান্ত্রিক কিংবা গণতান্ত্রিক মানুষ যা পছন্দ করে তাতে শিক্ষিত করে তোলাকে বুঝাতে চাইনে। আমি বলছি, শিক্ষা যেন তাদের একটি কতিপয়তন্ত্রে কতিপয়তান্ত্রিক হিসাবে এবং গণতন্ত্রে গণতান্ত্রিক হিসাবে জীবনধারণে শিক্ষিত করে তোলে। কিন্তু আসলে কি হয়? বাস্তবে কতিপয়তন্ত্রে শাসকদের সন্তানদের আয়েশ এবং আরাম উপভোগের জন্য পালন করা হয় এবং দরিদ্রগণের সন্তানগণ প্রশিক্ষণ এবং পরিশ্রমে রপ্ত হওয়ার ফলে বিপ্লবের সূত্রপাতে যেমন আগ্রহী তেমনি দক্ষ হয়ে ওঠে। গণতন্ত্রেও তেমনি গণতান্ত্রিক মনাদের জন্য যেটি উত্তম বলে গণ্য করা হয় ঠিক তার বিপরীতটি সংঘটিত হয়। এর কারণ হচ্ছে স্বাধীনতার উপযুক্ত সংজ্ঞাদানে ব্যর্থতা। কারণ গণতন্ত্র দুটি বৈশিষ্ট্য দ্বারা পরিচিত হয় : 'সংখ্যাধিকের সার্বভৌমত্ব' এবং 'স্বাধীনতা'। এখানে ন্যায়কে সমতার সমার্থক মনে করা হয়। এবং সমতা কাকে বলা হবে সে সম্পর্কে সংখ্যাধিকের সিদ্ধান্তকেই চূড়ান্ত এবং সঠিক বলে বিবেচনা করা হয় এবং স্বাধীনতার সংজ্ঞা দেওয়া হয় 'ব্যক্তির ইচ্ছামত কার্য করা' বলে। এর ফলে গণতন্ত্রে প্রত্যেকে নিজের ইচ্ছামতো, কিংবা ইউরিপিডিস যেমন বলেছেন, নিজের মুহূর্তের খেয়ালমতো জীবনযাপন করে। এটি খারাপ। সংবিধান অনুযায়ী জীবনযাপনকে স্বাধীনতার অস্বীকৃতি বলে বিবেচনা করা উচিত নয়, তাকে বিবেচনা করা উচিত নিজেদের অস্তিত্বেরই রক্ষা হিসাবে।

শাসনব্যবস্থার মধ্যে ক্ষয় এবং পরিবর্তনের কারণগুলি এবং শাসনব্যবস্থাকে রক্ষা করার উপায়গুলিও প্রধানত আমরা যেরূপ বিবৃত করেছি, সেরূপ।

দশম অধ্যায়

স্বৈরতন্ত্রের পতন ঘটে কেন

এরপরে অবশিষ্ট রয়েছে রাজতন্ত্র বা এক ব্যক্তির শাসন সম্পর্কে আলোচনা। আমাদের আলোচনা করতে হবে যেমন এর পতনের কারণ সম্পর্কে, তেমনি একে রক্ষা করার উপায় সম্পর্কে। রাজতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র উভয় ব্যবস্থাতে এক্ষেত্রে যা ঘটে তা অপর ব্যবস্থাসমূহ সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার বেশ নিকটবর্তী। কারণ অভিজাততন্ত্রের যেটি ভিত্তি, রাজতন্ত্রেরও সেটি ভিত্তি অর্থাৎ গুণের শ্রেষ্ঠতা। আবার স্বৈরতন্ত্র হচ্ছে চরম কতিপয়তন্ত্র এবং গণতন্ত্রেরই এক প্রকার মিশ্রণ। এর ফলেই শাসিতের জন্য স্বৈরতন্ত্র সবচেয়ে নিপীড়ণমূলক হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, এটা গঠিত হয় দু'টি অধম ব্যবস্থার মিশ্রণে এবং এর অন্তর্ভুক্ত হয় এই দুই ব্যবস্থার বিচ্যুতি এবং ভ্রান্তিসমূহ। উদ্ভবের দিক থেকে রাজতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র উভয়ই উদ্ভূত হয় এদের বিপরীত ব্যবস্থা থেকে। রাজতন্ত্রের প্রত্যেকটি প্রকার অপর প্রকারের বিরোধী। রাজতন্ত্রের লক্ষ্য থাকে উত্তম ব্যক্তিদের পেছনে জনতার সমর্থনকে সংগ্রহ করার। উত্তম ব্যক্তিরাই একজন রাজাকে রাজা বানায় তার গুণের শ্রেষ্ঠতা, সাহসিক কাজ অথবা তার ন্যায়বান পরিবারের খ্যাতির কারণে। স্বৈরশাসকের উদ্ভব জনসাধারণ তথা জনতার মধ্য থেকে। সে তার উদ্যোগসমূহকে উদ্যত করে উচ্চতর শ্রেণীসমূহের বিরুদ্ধে। তার ঘোষিত লক্ষ্য থাকে জনতা যেন এই সমস্ত শ্রেণী দ্বারা অত্যাচারিত হতে না পারে। ঘটনা এরূপই বলে। একথা সাধারণ সত্য হিসাবে বলা যায় যে, স্বৈরশাসকদের প্রায় সকলে জনপ্রিয় নেতা হিসাবেই যাত্রা শুরু করেছিলেন। জনতা তাদের উপর আস্থা স্থাপন করেছিল, কারণ উচ্চতর শ্রেণীকে তারা পছন্দ করেছে।[১]

১. যে সব নগরী আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে সে সকল নগরীতে স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভব এভাবেই ঘটেছে। অবশ্য স্বৈরশাসকের উদ্ভবের অন্য উপায়ের কথাও বলা যায়। গোড়ার দিকের কোনো কোনো স্বৈরতন্ত্র সেই সব রাজতন্ত্র থেকে উদ্ভূত হয়েছিল যারা তাদের পূর্ব-পুরুষদের ঐতিহ্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে পারে নি। তারা তাদের শাসনকে অধিকতর অত্যাচারমূলক শাসনে পরিণত করেছিল। আবার এমন কিছু ছিল যারা উচ্চতম দায়িত্বে নির্বাচিত হয়েছিল। কারণ খুব গোড়ার দিকে প্রশাসনিক, ধর্মীয় প্রভৃতি দায়িত্বে লোকদের দীর্ঘ মেয়াদের জন্য নির্বাচিত করা হতো। স্বৈরতন্ত্র আবার সৃষ্টি হয়েছে যখন কতিপয়তন্ত্রী ব্যবস্থা কোনো এক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করেছে এবং তাকে সর্বাধিক ক্ষমতায় ভূষিত করেছে। এ সকল অবস্থাই ছিল স্বৈরতন্ত্রের আবির্ভাবের অনুকূল অবস্থা। কেবল প্রয়োজন ছিল ইচ্ছার। কারণ ক্ষমতার মূল ছিল রাজকীয় শাসন বা উচ্চ দফতরে। বিভিন্ন প্রকারে উদ্ভূত স্বৈরতন্ত্রের কয়েকটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে : ১. প্রতিষ্ঠিত রাজতন্ত্র থেকে : আরগস-এর ফিডন এবং অপরাপর; ২. উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পদ থেকে : ফালারিস এবং আয়োনিয়ার স্বৈরশাসক; ৩. জনপ্রিয় নেতা থেকে : লিওনটিনি-র প্যানেটিয়াস, কোরিন্থ-এর সিপসেলাস, এথেন্স-এর পিসিস্ট্রাটাস, সাইরাকিউস-এর ডায়োনিসিয়াস এবং অন্যান্য।—এ্যারিস্টটল

রাজতন্ত্র, আমরা পূর্বে বলেছি, অভিজাততন্ত্রের অনুরূপনীতির উপর নির্ভর করে। এর ভিত্তি হচ্ছে গুণ। সে গুণ ব্যক্তিগত ন্যায় বা সুজন্ম কিংবা বিশিষ্ট সেবা অথবা এ সব কিছুর সমন্বয়সহ কর্মের দক্ষতা হতে পারে। কারণ কোনো নগরী বা জাতির যারা উত্তম সেবা করেছে কিংবা যাদের এরূপ সেবা করার ক্ষমতা আছে তারাই সম্মানজনক 'রাজা' আখ্যায় ভূষিত হয়েছে। এরূপ দৃষ্টান্তের মধ্যে রয়েছে কডরাস। সে তার জনতাকে যুদ্ধের পরাজয় থেকে রক্ষা করেছিল। তাছাড়া রয়েছে সাইরাস এবং ল্যাসিডিমনীয়দের এবং মলোসীয়দের এবং ম্যাসিডনীয়দে রাজাগণ যারা হয় তাদের জনতাকে স্বাধীন করেছিল কিংবা নতুন ভূখণ্ড জয় করেছিল এবং নগরীর প্রতিষ্ঠা করেছিল।

রাজার লক্ষ্য থাকে জনতার রক্ষক হবার। সে সম্পত্তির মালিকদের অন্যায় ক্ষতি থেকে এবং জনতাকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে চায়। কিন্তু স্বৈরশাসক সম্পর্কে একথাই সব সময়ে বলা হয়েছে যে, নিজের ইচ্ছার সঙ্গে অভিন্ন না হলে সে জনতার ইচ্ছার প্রতি কোনো দৃকপাত করে না। রাজার সন্তোষ যেখানে তার কর্তব্য পালনে, স্বৈরশাসকের সন্তোষ সেখানে নিজের আনন্দ উপভোগে। এ কারণে উভয়ের অভাব এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার মধ্যেও পার্থক্য বিদ্যমান। স্বৈরশাসকের লোভ হচ্ছে অর্থের, রাজার কামনা হচ্ছে সম্মানের। রাজার দেহরক্ষী গঠিত হয় নাগরিকদের দ্বারা, স্বৈরশাসকের দেহরক্ষী তৈরি হয় বৈদেশিক ভাড়াটে সৈন্য দ্বারা।

কাজেই স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে যে গণতন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্র—উভয় ব্যবস্থার দোষের দিকগুলি রয়েছে, তা বুঝতে কষ্ট হয় না। কতিপয়তন্ত্র থেকে স্বৈরতন্ত্র লাভ করে দু'টি জিনিস : ১. অর্থকে চরম লক্ষ্য হিসাবে গণ্য করার ধারণা। তাছাড়া অর্থ বাদে স্বৈরশাসকের চলে না। অর্থ দিয়েই তার দেহরক্ষী পোষিত হয়। অর্থের উপরই তার বিলাসবহুল জীবন যাপন। ২. দ্বিতীয় হচ্ছে জনতাকে তার অবিশ্বাস। এ কারণেই সে জনসাধারণকে নিরস্ত্র করে। নিম্নতর শ্রেণীসমূহের উপর সে দুর্ব্যবহার করে এবং রাজধানীর অভ্যন্তরে তাদের আবাসকে নিষিদ্ধ করে। এগুলি হচ্ছে কতিপয়তন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। গণতন্ত্র থেকে স্বৈরতন্ত্র লাভ করে উচ্চতর শ্রেণীসমূহের প্রতি বৈরীভাব। প্রকাশ্য বা গোপন কৌশলে সে তাদের অবদমিত করে। তাদের সে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করে নির্বাসনে প্রেরণ করে। যাদের সে সরকারের প্রতিবন্ধক বিবেচনা করে তাদেরও সে নির্বাসিত করে। তখন আবার এদের মধ্যেই স্বৈরশাসকের উৎখাতের চক্রান্তের সূত্রপাত ঘটে। তারা তখন নিজেরাই শাসক হওয়ার কিংবা দাসদের ন্যায় আত্মসমর্পণ না করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। আমাদের এখানে আবার থ্রাসিবুলাসকে দেওয়া পেরিয়ানডার-এর উপদেশ স্মরণ করতে হয় : বড়গুলোর মাথা ছেঁটে ফেলো। তাঁর পরামর্শের অর্থ ছিল, স্বৈরশাসকের উচিত সর্বদা শ্রেষ্ঠ নাগরিকদের অপসারিত করা।

আমরা যা বলেছি কিংবা অন্তত আমাদের আলোচনার যে তাৎপর্য তাতে বুঝা যায় যে, অন্যসব শাসনব্যবস্থায় বিপ্লবের যে কারণ বিদ্যমান, রাজতন্ত্রের মধ্যেও সেই একই কারণ বিদ্যমান। কারণ, রাজতন্ত্রেও শাসকের বিরুদ্ধে অন্যায়ের অভিযোগ, ভয় এবং ঘৃণাই অনেক সময়ে বিপ্লবের কারণ হিসাবে কাজ করে। নির্যাতনের অভিযোগের মধ্যে যেমন দৈহিক নির্যাতন, তেমনি সম্পত্তির বাজেয়াপ্ত অন্তর্ভুক্ত হয়। রাজা কিংবা স্বৈরশাসক,—একক শাসকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিরাট সম্পদ এবং সুযোগ ভোগ। যে কোনো মানুষই অবশ্য এই সকল সুযোগ লাভ করতে চায়। শাসকের বিরুদ্ধে আক্রমণ তার দেহের উপর আক্রমণ এবং তাদের উপর আক্রমণ হতে পারে। স্বৈরশাসকের হাতে লোকে যদি ব্যক্তিগতভাবে নির্যাতিত হয়ে থাকে তাহলে তার জীবনের উপর আক্রমণ হতে পারে। কারণ স্বৈরশাসকের নির্দয়তা নানা প্রকারের হতে পারে। প্রত্যেকটিই ক্রোধ এবং ক্ষোভের সঞ্চার করতে পারে। এবং যারা নিজেরা ক্ষুব্ধ তারা প্রতিশোধ গ্রহণে অধিকতর আগ্রহী হয়।

ব্যক্তিগত ক্রোধের মধ্যে যে সকল বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটেছে তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া গেল। পেসিসট্রাটিডি-এর পতন। এর হাতে হারমোডিয়াস-এর ভগ্নী নিগৃহীতা হওয়াতে হারমোডিয়াস ক্ষুব্ধ হয়েছিল। আবার এ্যারিসটোগিটন ক্ষুব্ধ হয়েছিল হারমোডিয়াস-এর কারণে। এ্যামেব্রেসিয়ার পেরিয়ানডার-এর উপর আক্রমণের হেতু ছিল এই যে, যখন সে তার প্রেমাস্পদ বালককে সঙ্গী করে মদ্যপানে রত ছিল তখন তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ছেলেটি তার জাত কিনা। ফিলিপের উপর পসেনিয়াস-এর আক্রমণ ঘটেছিল, কারণ ফিলিপের অনুমতিক্রমে এ্যাট্টালাসের অনুসারীগণ তাকে নির্যাতন করেছিল। ক্ষুদ্র এ্যামিনটাসকে ডেরডাস আক্রমণ করেছিল কারণ সে তারুণ্যসূচক এক প্রেম-প্রলোভের উপর বাগাড়ম্বর প্রকাশ করেছিল। সাইপ্রাস-এর ইভাগোরাসকে হত্যা করেছিল জনৈক অ-পুরুষ, কারণ রাজার ছেলে তার স্ত্রীকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে গিয়েছিল। প্রজাদের উপর রাজার যৌন অপরাধের কারণে অনেক ক্ষেত্রে শাসকরা আক্রান্ত হয়েছে। যেমন এ্যারকেলাস-এর উপর ক্র্যাটিউস-এর আক্রমণ। ক্র্যাটিউস বাধ্যতামূলক সম্পর্কের কারণে সর্বদা ক্ষুব্ধ থাকত এবং সামান্য উপলক্ষেই তা বিস্ফোরিত হতো। তাছাড়া রাজার বিরুদ্ধে তার বিশ্বাস ভঙ্গেরও অভিযোগ ছিল। তার কথা ছিল তার সঙ্গে তার দুটি কন্যার একটিকে বিয়ে দেবে। কিন্তু সে কথা সে রক্ষা করেনি।[১] তাদের সম্পর্কের শীতলতার পেছনে সর্বদাই একটা বৈরী মনোভাব বিদ্যমান ছিল এবং এ মনোভাবের মূলে ছিল প্রেম সম্পর্কিত বিষয়। এই রকম একটি কারণেই লারিসার হেলেনোক্রাটিস এই আক্রমণে যোগ দিয়েছিল। আরকেলাস তার সুকুমার দেহকে ভোগ করেছিল কিন্তু তার প্রতিশ্রুতিমত আর তাকে নিজের গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে দেয়নি। হেলেনাক্রাটিস-এর ধারণা হয়েছিল, যে এ যৌনভোগের পেছনে তার প্রেম ছিল না, ছিল কেবল নির্যাতনের ইচ্ছা। ইনাস-এ পাইথন এবং হিরাক্লিডিস কটিসক তাদের পিতার প্রতি তার আচরণের প্রতিশোধের জন্য অপহরণ করেছিল। আবার দেখা যায়, এ্যাডামাস বিদ্রোহ করেছিল কটিস-এর বিরুদ্ধে। কারণ, নিজের কিশোর বয়সে কটিস তাকে নির্বীজ করে দিয়েছিল। আবার এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে ক্রোধের কারণ যৌন অপরাধ নয়, ক্রোধের কারণ দৈহিক নির্যাতন। এমন ক্ষেত্রে নির্যাতিত নির্যাতনকারীকে হত্যা করেছে কিংবা হত্যা করার চেষ্টা করেছে। এরূপ নির্যাতনকারীদের মধ্যে স্বৈরশাসক এবং রাজপরিবার উভয় প্রকার লোকই পাওয়া যায়। যেমন, মাইটিলেনিতে পেনথিলাস-এর পুত্রগণ দলবদ্ধভাবে সশস্ত্র হয়ে জনসাধারণকে যখন প্রহার করতে শুরু করল তখন মেগাক্লিস তার সাথীদের সাহায্যে তাদের দমন করেছিল। পরবর্তীকালে স্মারডিস পেনথিলাসকে হত্যা করেছিল।

কারণ পেনথিলাস একবার তাকে স্ত্রীর শয্যা থেকে টেনে এনে প্রহার করেছিল। ডেকামনিকাস-এর প্ররোচনা ও নেতৃত্বে আরকলাস-এর উপর আক্রমণের কথাও আমরা জানি। তার ক্রোধের কারণ ছিল এই যে, আরকেলাস তাকে কবি ইউরিপিডিস-এর কাছে চাবুক মারার জন্য দুর্গন্ধ নিয়ে কি এক পরিহাস কেরেছিল। ইউরিপিডিস-এর রাগের কারণ ছিল, সে কবির মুখের দুর্গন্ধ নিয়ে কি এক পরিহাস করেছিল। এই ধরনের নানা অভিযোগে

১. সিরা এবং এ্যারিচিউস-এর সঙ্গে যুদ্ধে জড়িত হওয়ার কারণে তার জ্যেষ্ঠ কন্যাটিকে সে এলিমিয়ার রাজার কাছে এবং কনিষ্ঠ কন্যাকে এ্যামিনটাস-এর পুত্রের কাছে বিয়ে দিয়েছিল। তার ধারণা হয়েছিল এটি হচ্ছে উত্তম উপায় যার দ্বারা ক্লিওপেট্রাকে নিয়ে তার পুত্রের সঙ্গে তার বিরোধকে সে পরিহার করতে সক্ষম হবে।—এ্যারিস্টট্‌ল

চক্রান্ত এবং হত্যা অনুষ্ঠিত হওয়ার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে যখন মানুষের মনে ভয় থাকে তখনো বিপ্লব ঘটে। ভয় বিপ্লবের অন্যতম কারণ। এটা শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং এক ব্যক্তির শাসন,—উভয়ক্ষেত্রে সত্য। যেমন, এ্যারটাবানাস জারাক্‌জিসকে হত্যা করেছিল। কারণ, সে তাকে ভয় করতো। সে ভয় করতো তার নিজের বিরুদ্ধে আনীত এই অভিযোগকে যে, সে এ্যারিয়াসকে ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করেছিল জারাকজিস-এর হুকুমে নয়। সে হত্যা করেছিল এই চিন্তা থেকে যে, জারাকজিস মদ্য পানে মত্ত থাকার কারণে ঘটনাকে বিস্মৃত হয়ে তার কাজকে অনুমোদন করবে।

তৃতীয়ত, আছে ঘৃণার প্রশ্ন। সারডানাপালাস মেয়েদের সঙ্গে পশম বাছাই করছিল। এমন দৃশ্যে তার প্রতি মানুষের মনে ঘৃণার সঞ্চার হয়েছিল এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের একজন তাকে হত্যা করেছিল।[১] কনিষ্ঠ ডায়োনিসিয়াস-এর উপর ডায়োনের আক্রমণের কারণও ছিল ঘৃণা। স্বৈরশাসক কখনো শান্ত থাকতোনা। এবং এ কারণে নগরবাসীরাও ডায়োনের ঘৃণার শরীক হয়ে উঠেছিল। অনেক সময়ে রাজার সুহৃদগণই তাকে হেয় চোখে দেখে এবং তারাই তাকে আক্রমণ করে। তাদের উপর তার নির্ভরতাই তাকে অবজ্ঞা করার সূত্র হয় এবং তাদের এরূপ আত্মবিশ্বাস জন্মে যে রাজা কিছুই খেয়াল করবেনা। এবং যারা নিজেরা ক্ষমতা দখল করত চায় তারাও কিছু পরিমাণে ঘৃণা দ্বারা পরিচালিত হয়। তারা মনে করে তারা যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। তখন তারা বিপদের ঝুঁকি নেয় এবং তাদের শক্তির ফলে আক্রমণে তাদের বেগ পেতে হয়না। স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর অধিনাকরাও এভাবেই আক্রমণ করে। এক্ষেত্রে সাইরাস একটি দৃষ্টান্ত। সাইরাস এ্যাসটাইগসকে ঘৃণা করতো। ঘৃণা করতো তার শক্তি এবং জীবনযাপনের পদ্ধতি—উভয়কে। ক্ষমতায় সে অথর্ব হয়ে পড়েছিল এবং তার জীবন আত্মরতিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এমনিভাবে থ্রেসের সিউথিস-এর আক্রমণ ছিল এ্যামাডোকাস-এর উপ। অথচ এ্যামাডোকাস-এর অধীনে সে সেনাপতি ছিল। অনেকে বিভিন্ন কারণের মিশ্রণে তাদের প্রভুদের উপর আক্রমণ হানে। মিথরাডেটিস এ্যারিওবারজেনিসকে আক্রমণ করেছিল। কারণ, সে যেমন তাকে ঘৃণা করতো, তেমনি তার অর্থ সে আত্মসাৎ করতে চেয়েছিল।

স্বৈরশাসকের উপর যে-আক্রমণের অনুপ্রেরণা আসে ঘৃণা থেকে সে আক্রমণ সাধারণত পরিচালিত হয় এমন লোকদের দ্বারা যারা স্বভাবগতভাবে সাহসী এবং যারা একই সঙ্গে উচ্চ সামরিক পদেরও অধিকারী। কারণ স্বভাবগত সাহসের সঙ্গে দৈহিক শক্তি যুক্ত হয়ে মানুষকে যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণে প্রস্তুত করে তুলে এবং এই দুটো কারণে তারা আক্রমণের পূর্বেই তাদের আঘাতের সহজ সাফল্য সম্পর্কে বিশ্বাসী হয় দাঁড়ায়। কিন্তু অনুপ্রেরণা যেখানে উচ্চকাঙ্ক্ষা সেখানে উপরোক্ত কারণের চাইতে ভিন্নতর কারণসমূহ কার্যকর হয়। একথা বলা ঠিক নয় যে, অনেকে যখন স্বৈরশাসককে আক্রমণ করে তার অগাধ সম্পদ এবং সম্মানের দিকে নজর দিয়ে তখন উচ্চাকাঙ্ক্ষীগণও এমন আক্রমণে যে কোনো ঝুঁকি গ্রহণে রাজী থাকে। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এরূপ যে, উচ্চাকাঙ্ক্ষীগণ অন্য একটি বিশেষ ক্ষেত্রে বিখ্যাত এবং বিশিষ্ট হওয়ার সুযোগে যেরূপ চিন্তা করে, স্বৈরশাসককে আক্রমণের ক্ষেত্রেও সেরূপই চিন্তা করে। এমন লোক একজন রাজাকে

১. গল্পটি এরূপই। আর এর সম্পর্ক এ গল্প যদি সত্য নাও হয় তবু এরকম সত্য ঘটনার অভাব নেই।—এ্যারিস্টট্‌ল

আক্রমণ করে নিজে রাজা হওয়ার জন্য নয়, আক্রমণ করে নিজের জন্য গৌরব অর্জনের বাসনা থেকে। অবশ্য কেবল এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাদের কাজে অগ্রসর হয় এমন লোকের সংখ্যা বেশি নয়। এই কারণের সঙ্গে, পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে নিজের উপর যে বিপদ আসবে সে সম্পর্কে একটা অবজ্ঞাও থাকে। এরকম লোকদের ডায়োনের নীতিটিকে অনুসরণ করা কঠিন হলেও তাকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়। ডায়োন যখন ডায়োনিসিয়াস-এর উপর আক্রমণে অগ্রসর হয়েছিল তখন সে কয়েকজন মাত্র সাথীকে সঙ্গে নিয়েছিল। এর কারণ হিসাবে সে বলেছিল, এর ফলে সাফল্য যা অর্জিত হবে তাকে অর্জন করার গৌরব তারই হবে। অর্থাৎ কয়েক পা অগ্রসর হওয়ার পরে যদি সে নিহত হয় তাহলে তার মৃত্যু মহৎ মৃত্যু বলে বিবেচিত হবে।

অপর যে কোনো শাসনব্যবস্থার মতো স্বৈরতান্ত্রিক ব্যবস্থা যেমন ভিতর থেকে, তেমনি বাইর থেকেও ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে পারে। বাইর থেকে বিপদ আসে যখন স্বৈরতন্ত্রের বিরোধী কোনো অধিকতর শক্তিশালী রাষ্ট্র অধিষ্ঠিত থাকে। প্রকৃতিগত বৈপরীত্যের কারণে এটাকে ধ্বংস করে দেবার ইচ্ছা অবশ্যই জাগবে। এবং ইচ্ছার সঙ্গে শক্তির যখন যোগ ঘটে তখনি মানুষ কার্যসাধনে অগ্রসর হয়। গণতন্ত্র মূলগতভাবেই স্বৈরতন্ত্রের বিরোধী। এটা হিসিয়ডের 'একই পেশার দুই লোকের ঐক্য ঘটনা' নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, গণতন্ত্র হচ্ছে স্বৈরতন্ত্রেরই চরম। আবার রাজতন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্রও মূলগতভাবে স্বৈরতন্ত্রের বিরোধী। এবং এ কারণেই ল্যাসিডিমনীয়গণ বহু স্বৈরতন্ত্রের পতন ঘটিয়েছে। সাইরাকিউস-এর অধিবাসীদের যখন একটি উত্তম শাসনব্যবস্থা ছিল তখন তারাও এরূপ কাজ করেছে। ভিতর থেকে ধ্বংস আসে যখন স্বৈরশাসকের দরবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যারা যুক্ত তাদের মধ্যেই বিভেদ শুরু হয়। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে গেলন এবং অধিকতর সাম্প্রতিককালে ডায়োনিসিয়াস। প্রথমোক্ত শাসকের ক্ষেত্রে হিয়েরন-এর ভ্রাতা থ্রাসিবুলাস গেলন-এর পুত্রের উপর তার প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং তাকে ইন্দ্রিয়জ ভোগবিলাসে লিপ্ত করেছিল। এর পেছনে তার উদ্দেশ্য ছিল নিজের জন্য উত্তরাধিকারের পথটি তৈরি করা। কিন্তু পরিবারের সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নাগরিকদের উত্তেজিত করে থ্রাসিবুলাস-এর পতন ঘটাবার উদ্দেশে আক্রমণ চালালো। তাদের আঘাতের লক্ষ্য, ব্যবস্থা হিসাবে স্বৈরতন্ত্র ছিলনা। কিন্তু তাদের সমর্থকবৃন্দ সুযোগটিকে গ্রহণ করে তাদের সকলকেই বিতাড়িত করেছিল। অপরদিকে ডায়োন ডায়োনিসিয়াস-এর বিরুদ্ধে একটি বাহিনী পরিচালিত করেছিল। ডায়োনিসিয়াস-এর সঙ্গে তার বিবাহগত সম্পর্ক ছিল এবং তার জনসমর্থনও ছিল। সে ডায়োনিসিয়াসকে উচ্ছেদ করেছিল বটে, কিন্তু পরবর্তীতে নিজেও নিহত হয়েছিল।

স্বৈরতন্ত্রের উপর আক্রমণের দুটি প্রধান কারণ হচ্ছে ঘৃণা এবং অবজ্ঞা। স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে ঘৃণার উপস্থিতি সর্বদা প্রয়োজন। কিন্তু স্বৈরশাসকের পতন হয় তখন যখন ঘৃণার সঙ্গে যুক্ত হয় অবজ্ঞা। এটা আমরা এ ঘটনা থেকে বুঝতে পারি যে, যে-সকল মানুষ তাদের অবস্থানকে অর্জন করেছে তারা তাদের শাসনকে রক্ষাও করেছে। কিন্তু যারা সে আসনকে কোনো পূর্বগামীর নিকট থেকে লাভ করেছে তাদের প্রায় সকলের সে আসন তাদের হাত থেকে হৃত হয়েছে। আনন্দকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য নির্ধারিত করাতে তাদের মূল্য শীঘ্র বিনষ্ট হয়ে যায় এবং তার দ্বারা ভবিষ্যৎ শত্রুদের আক্রমণের প্রচুর সুযোগ তারা তৈরি করে দেয়। ঘৃণার একটি অংশ হিসাবে ক্রোধকেও হয়তো আমাদের উল্লেখ করা আবশ্যক। কারণ, বেশ পরিমাণেই ক্রোধ একই প্রকার কার্যের অনুপ্রেরণা যোগায়। তবে ঘৃণার চাইতে ক্রোধের কার্যকারিতা অধিক। ক্রোধান্বিত ব্যক্তি অধিকতর তীব্রতা

সহকারে আক্রমণে অগ্রসর হয়। কারণ এই প্রবৃত্তি যুক্তির উর্ধ্বে। ঘৃণার ক্ষেত্রে যুক্তির অবকাশ থাকতে পারে। ক্রোধের সহগামী হচ্ছে বেদনা।[১] এবং এই বেদনার কারণে যুক্তির প্রয়োগ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। বৈরীতাকে আমরা বেদনাজনক বলিনে। সে যা হোক, মোদ্দাকথা যে কারণগুলিকে আমরা অবিমিশ্র এবং চরম প্রকারের কতিপয়তন্ত্র এবং গণতন্ত্রের মধ্যে কার্যরত দেখেছি ঠিক সেগুলির সাক্ষাৎই আমরা স্বৈরতন্ত্রের মধ্যেও পাই। কারণ চরম এই ব্যবস্থাগুলি আসলে স্বৈরতন্ত্রেরই গুণফল বা বিস্তারিত রূপের প্রকাশ।

বাইর থেকে রাজতন্ত্রের ধ্বংসের আশঙ্কা সবচাইতে কম। এ কারণে এ ব্যবস্থাকে টেকসই বলা চলে। এর পতনের কারণগুলির অধিকাংশের উদ্ভব ভিতর থেকে। এগুলিকে দুই ভাগ করা চলে : ১. যখন রাজকীয় শাসনে অংশগ্রহণকারীগণ নিজেদের মধ্যে বিবাদে রত হয়। ২. রাজারা যখন অধিকতর স্বৈরতান্ত্রিকভাবে শাসন করার চেষ্টা করে। এভাবে আইনসঙ্গত অধিকারের চাইতে অধিক তারা দাবি করে। বর্তমানে যথার্থরূপে রাজতন্ত্র তত দেখা যায়না। যেগুলির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তারা রাজতন্ত্রের চাইতে স্বৈরতন্ত্র বা একব্যক্তির স্বেচ্ছা শাসনেরই অনুরূপ। কারণ রাজতন্ত্র বলতে শাসিতের সম্মতির ভিত্তিতে শাসন এবং অধিকাংশ বিষয়ের উপর সার্বভৌমত্ব বুঝায়। রাজতন্ত্রে সমতাভিত্তিক নাগরিকদের সংখ্যা অধিক এবং তাদের কেউ তেমন বিশিষ্ট হয়ে দাঁড়ায় না। বা কারুর মধ্যে শাসনের প্রয়োজনীয় উচ্চ দক্ষতা থাকেনা। এমন সাধারণ লোকের দ্বারা শাসিত হতে সাধারণত মানুষ চায়না এবং কেউ যদি প্রতারণা বা জরবদস্তির মাধ্যমে ক্ষমতার আসন দখল করে তাহলে সে ব্যবস্থা আর রাজতন্ত্র থাকেনা। সে ব্যবস্থা স্বৈরতন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়।

যে সব কারণে কথা আমরা উল্লেখ করেছি তার সঙ্গে পতনের আর একটি কারণ যোগ করা আবশ্যক। এটা প্রধানত বংশগত রাজতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য। এমন হতে পারে, যারা উত্তরাধিকারসূত্রে রাজা হয়েছে তাদের কোনো গুণ নেই। এদের সম্মান করা শক্ত। এবং তাদের হাতে যে ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে সে ক্ষমতা রাজকীয়, স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা নয়। তথাপি এ ক্ষমতার তারা অপব্যবহার করতে পারে। এমন হলে রাজতন্ত্রের অবসান আসন্ন। কারণ প্রজাবৃন্দ যখন সম্মতি দানে বিরত হয়, রাজারও সেখানে আর অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু যে স্বৈরশাসক সে সর্বদাই স্বৈরশাসক। প্রজাবৃন্দ যখন তাকে চায়না তখনো সে স্বৈরশাসক।

এই কারণগুলি এবং অনুরূপ অন্যান্য কারণে রাজতন্ত্রের পতন ঘটে।

১. অপমানিত হলে মানুষ প্রকৃতি বা আবেগ দ্বারা চালিত হয়, যুক্তি দ্বারা নয়। এবং এর ফলেই পিসিসট্রাটিডি এবং আরো অনেকের পতন ঘটেছে।—এ্যারিস্টটল

একাদশ অধ্যায়

স্বৈরশাসকের বাঁচার উপায়

[রাজতন্ত্রের বিপ্লব প্রতিরোধের উপায় কি তার আলোচনায় এ্যারিস্টট্‌ল পুনরায় রাজতন্ত্র সম্পর্কে যত না বলেন, স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কে তার অধিক বলেন। এ্যারিস্টট্‌লের মতে রাজতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রজাদের সম্মতি থাকে এবং সে কারণে সে অধিকতর স্থিতিশীল। কিন্তু স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তি জোর এবং সর্বদাই জোরের ভিত্তিতেই তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়। তবে এ্যারিস্টট্‌ল মনে করেন, স্বৈরশাসক যদি রাজার কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করার চেষ্টা করে তবে সে তার অস্তিত্বকে অধিকতর স্থায়ী করে রাখতে পারে।[১]]

বিপ্লবের প্রতিরোধ এবং পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের যে সাধারণ নীতির কথা আমরা উল্লেখ করেছি তা রাজতন্ত্র রক্ষার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তবে ক্ষমতা ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাজাদের যে সর্বদা অধিকতর নমনীয় হওয়া আবশ্যক তাকে একটি বিশেষ নীতি হিসাবে এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক। চরম ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্র যত কম হবে শাসনব্যবস্থাটির অধিকতর স্থায়ী হওয়ার নিশ্চয়তা তত বৃদ্ধি পাবে। এমন ব্যবস্থায় রাজাদের স্বৈর চরিত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। আচরণ এবং চরিত্রে প্রজাবৃন্দের সঙ্গে তাদের সাদৃশ্য বৃদ্ধি পায় এবং এর ফলে প্রজাদের মধ্যে রাজা সম্পর্কে ঈর্ষার উদয় কম হয়। মলোশীয় রাজতন্ত্র যে দীর্ঘজীবন লাভ করেছে, তার গোপনসূত্র এখানে। ল্যাসিডিমনীয়দের (স্পারটা) ব্যাপারে প্রথম কথা হচ্ছে যে, গোড়া থেকেই শাসন দু'জন রাজার মধ্যে বিভক্ত ছিল এবং দ্বিতীয়ত, অন্যান্য নমণীয় ব্যবস্থাদির মধ্যে থিওপমপাস ইফরদের পদটিও তৈরি করেছিলেন। রাজাদের ক্ষমতার এরূপ হ্রাসকরণ পরিণামে রাজতন্ত্রকে শক্তিশালীই করেছিল। এক অর্থে থিওপমপাস রাজতন্ত্রের শক্তি হ্রাস করেননি, বরঞ্চ তাকে বৃদ্ধি করেছিলেন। এরূপ কথিত আছে যে থিওপমপাসের স্ত্রী যখন তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন তিনি কি তাঁর পিতার হাত থেকে প্রাপ্ত রাজ্যকে দুর্বলতর করে তাঁর পুত্রদের হাতে ন্যস্ত করে যাওয়াতে লজ্জিত বোধ করেন না, তখন তিনি জবাবে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই না। আমার উত্তরাধিকীদের হাতে যে রাজ্য আমি রেখে যাচ্ছি তার স্থায়িত্ব অনেক বেশি।

স্বৈরশাসনকে দীর্ঘস্থায়ী করার দু'টি উপায় বা নীতির কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। উপায় দু'টি বিভিন্ন। আমি বরঞ্চ প্রথমে সনাতন উপায়টি নিয়েই আলোচনা করবো। কারণ শাসনের এই নীতিই অধিকসংখ্যক স্বৈরশাসকই অনুসরণ করেছে। করিন্‌থ্‌-এর পেরিয়ানডার নাকি এর প্রয়োগের বেশ কিছু কৌশল প্রবর্তন করেছিলেন। তবে পারস্য

১. স্বৈরশাসকের জন্য এ্যারিস্টট্‌লের পরামর্শ আমাদের 'অর্থশাস্ত্রে' প্রদত্ত রাজার প্রতি কৌটিল্যের (খ্রিঃ পূঃ ৪র্থ শতক) উপদেশকে বেশ পরিমাণে স্মরণ করিয়ে দেয়।—স.ফ.ক.

সরকারের নিকট থেকেও এর অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এখানেই আমরা স্বৈরশাসনকে রক্ষা করার পুরাতন সকল কৌশলের ইঙ্গিত পাই। এদের অন্তর্গত নীতিমালাগুলো হচ্ছে এরূপ : মাথাগুলোকে ছেটে ফেলো এবং স্বাধীনচেতাদের সরিয়ে দাও এবং সামাজিক বা সাংস্কৃতিক কোন উপলক্ষে সম্মেলন বা সমিতিতে জনতাকে মিলিত হতে দিও না : কারণ এই স্থলগুলো স্বাধীনচিত্ততা এবং আত্মবিশ্বাসের জন্মকেন্দ্র এবং এই দুটি ব্যাপারেই স্বৈরশাসককে সতর্ক থঅকতে হবে; বিদ্যালয় কিংবা শিক্ষালাভের প্রতিষ্ঠানও তৈরি হতে দিওনা এবং এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করো যেন প্রজাবৃন্দ পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে জ্ঞাত হতে না পারে। কারণ পরিচয়ের মধ্যেই তারা আত্মবিশ্বাস তৈরি করে। স্বৈরশাসকের জন্য আর একটি সনাতন উপদেশের কথাও শোনা যায়। এর দ্বারা স্বৈরশাসককে বলা হয় যেন সে নগরবাসীদের সর্বদা নিজের নজরের মধ্যে রাখে এবং তাদের সময়ের সিংহভাগ যেন তারা স্বৈরশাসকের প্রাসাদের দ্বারে অতিবাহিত করে। এর সার্থকতা এখানে যে, এর ফলে নাগরিকদের কোনো কার্যকলাপ আর গোপন থাকবেনা এবং স্বৈরশাসনের প্রতি সতত দাস সুলভ আনুগত্য প্রদর্শনের মাধ্যমে তারা নিজেদের কোনো স্বাধীন চিন্তা না থাকার অবস্থাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। পারস্য এবং বৈদেশিক অন্যান্য রাজাদের মধ্যে এই উদ্দেশ্যে এরূপ এবং ভিন্নতর উপায়সকল অনুসৃত হতে দেখা যায়। অনুরূপভাবে স্বৈরশাসকের উচিত হবে তার প্রজাবৃন্দ কি বলছে কিংবা করছে তার প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়ার চেষ্টা করা। সাইরাক্যুস-এ স্ত্রীলোকদের মুখরা বলা হয়। এই স্ত্রীলোকদের মধ্যে তার গুপ্তচর থাকা আবশ্যক। হিয়ারো যেরূপ যে কোনো জনসমাগমে 'আড়াল শ্রোতাদের' প্রেরণ করতো, তেমনিভাবে স্বৈরশাসদের আড়াল শ্রোতাদের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক। গুপ্তচরদের সামনে নাগরিকগণ নিঃসঙ্কোচে কথা কম বলে। কিন্তু আড়াল থেকে শ্রবণের ব্যবস্থা থাকলে নাগরিকদের নিঃসঙ্কোচ আলাপ শ্রবণ করা সহজতর হয়।

আর একটি সনাতন উপায় হচ্ছে স্বৈরশাসনের সম্ভাব্য সকল বিরোধীদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি করে দেওয়া। এমন কলহ সৃষ্টির উপায় হচ্ছে কুৎসার প্রচার দ্বারা বন্ধুর বিরুদ্ধে বন্ধুকে লাগিয়ে দেওয়া, শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণীকে একং এক অর্থবানকে অপর অর্থবানের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করা। তাছাড়া স্বৈরশাসক যদি তার প্রজাদের দারিদ্র্যের অবস্থাতে রাখতে পারে তাহলে তাও তার স্বার্থ সাধন করে। কারণ তেমন অবস্থাতে প্রজাবৃন্দ আত্মরক্ষার জন্য সশস্ত্র হওয়ার অর্থ বহন করতে সক্ষম হয়না এবং দৈনন্দিন কর্মে তারা এরূপ আবদ্ধ থাকে যে স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কোনো অবসর পায় না। প্রজাবৃন্দকে বিরামহীনভাবে কাজ এবং দারিদ্রের মধ্যে আবদ্ধ রাখার জন্য গৃহীত কর্মকাণ্ডের দৃষ্টান্ত হিসাবে মিশরের পিরামিড সমূহের নির্মাণ, সিপসেলিডদের বহুসংখ্যক পিণ্ডদান, পিসিসট্রাটিডাইর অনুসারীদের দ্বারা অলিম্পিয়াস জিউসদেবের মন্দির তৈরি এবং সামোস-এর পলিক্রাটিস-এর অধীনে কৃত কার্যাবলীর আমরা উল্লেখ করতে পারি। প্রজাবৃন্দের উপর করের বোঝা চাপিয়েও তাদের দরিদ্র করে রাখা হয়। ডায়োনিসিয়াস-এর অধীনে সাইরাক্যুস-এ এই নীতি গৃহীত হয়েছিল। এখানে সমগ্র ব্যক্তিগত সম্পত্তির মূল্য পাঁচ বৎসরের মধ্যে পরিশোধ করা হয়েছিল। স্বৈরশাসকদের আর এক একটি প্রবণতা হচ্ছে যুদ্ধ করার প্রবণতা। যুদ্ধ করার জন্য সর্বদাই স্বৈরশাসক প্রস্তুত। এর কারণ, যুদ্ধ হলে প্রজাবৃন্দ যুদ্ধের মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং তাদের একজন নেতা আবশ্যক, এই বোধ তাদের আচ্ছন্ন করে রাখে। রাজার সুহৃদ রাজাকে রক্ষা করে কিন্তু স্বৈরশাসকের ক্ষেত্রে

ব্যাপারটি তা নয়। স্বৈরশাসকের নীতির একটি অংশ হচ্ছে অপর সকলের চাইতে সুহৃদদের অধিকতর বিপজ্জনক মনে করে তাদের অবিশ্বাস করা।

চরম গণতন্ত্রের কিছু বৈশিষ্ট্যও একজন স্বৈরশাসককে তার অবস্থান রক্ষায় সাহায্য করে। এমন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গৃহের মধ্যে স্ত্রীলোকের প্রাধান্য এবং দাসদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে শৈথিল্য। স্বৈরশাসক এই উপায়ে তার বিরুদ্ধে নাগরিকদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত হওয়ার আশা করে। কারণ স্বৈরশাসক জানে স্ত্রীলোক এবং দাসগণ স্বৈরশাসকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেনা। একথা জানা যে, এদের সন্তুষ্ট রাখলে এরা স্বৈরশাসন এবং গণতন্ত্র—সকলেরই সমর্থক থেকে যাবে। সাধারণের মধ্যেও স্বৈরাচারের প্রবণতা আছে। তোষামোদকারীদেরও একই চরিত্র। এবং উভয় ব্যবস্থার কাছেই এ কারণে এদের কদর। গণতন্ত্রে জনপ্রিয় নেতা জনতাকে তোষামোদ এবং স্বৈরশাসকের দরবারে তোষামুদেগণ দাসের মত আচরণ করে। এজন্য স্বৈরশাসকের কাছে নিকৃষ্টেরই আদর। স্বৈরশাসক পছন্দ করে তাদেরকে যারা তার সামনে দাসের মত ভূলুণ্ঠিত হয়। যে মানুষ স্বাধীনচেতা সে এরূপ আচরণকে অস্বীকার করবে। যারা মর্যাদাবান তারা তোমাকে সৌহার্দ্য প্রদান করবে, তোষামোদ নয়। এবং প্রবাদেই আছে, অধম কাজের জন্য অধম লোকেরই প্রয়োজন, উত্তম লোকের নয়।

আসল স্বৈরশাসক গুরুতর এবং উদারচেতা মানুষকে অপছন্দ করে। সে নিজেকেই একমাত্র ক্ষমতাধর বলে গণ্য করে। কেউ যদি তার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায় এবং সাহসের সঙ্গে তার অভিমত প্রকাশ করে তাহলে স্বৈরশাসক নিজের একচ্ছত্র ক্ষমতা এবং শাসনের ঘাটতি হলো বলে মনে করে। এভাবে দেখা যায় অন্যের বুদ্ধিমত্তার প্রতি তার বিরাগের মূল হচ্ছে তার ভয়। কারণ এরূপ লোককে সে নিজের শাসনের সম্ভাব্য ধ্বংসকারী হিসাবে বিবেচনা করে। স্বৈরশাসকের প্রবণতা হচ্ছে বৈদেশিকদের সঙ্গে কাল কাটানো এবং নিজের রাষ্ট্রের নাগরিকদের বদলে বৈদেশিকদের সঙ্গে আহার-বিহার সম্পন্ন করা। কারণ নাগরিকদের সে সম্ভাব্য শত্রু হিসাবে গণ্য করে। বৈদেশিকগণ তার কোনো সক্রিয় বিরোধী শক্তি নয়।

উপরের এগুলি হচ্ছে স্বৈরশাসনের লক্ষণ এবং এভাবেই স্বৈরশাসন বহাল থাকার চেষ্টা করে। এর বাইরেও নানা উপায় আছে এবং সেগুলিও একইভাবে নিন্দনীয়। এগুলিকে আমরা প্রজাবৃন্দের ব্যাপারে স্বৈরশাসকের তিনটি উদ্দেশ্যের দিক থেকে তিনটি ভাগে সন্নিবদ্ধ করতে পারি, যথা : ১. প্রজাবৃন্দের নিজেদের কোনো অভিমত থাকতে পারবেনা ; ২. তাদের নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের সম্পর্ক থাকবেনা ; ৩. কোনো পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করার তাদের ক্ষমতা থাকবে না। এই তিনটির মধ্যে প্রথমটি ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা। কারণ যারা ক্ষুদ্রমন তথা অভিমতহীন মানুষ তাদের পক্ষে কোনো প্রতিরোধের পরিকল্পনা করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়টির ব্যাপারে এই বলা যায় যে, কিছু পরিমাণ আত্মবিশ্বাস ব্যতিরেকে কোনো স্বৈরাচারেরই পতন ঘটানো সম্ভব নয়। এ কারণে যাদেরই কোনো গুণ আছে তাদেরকেই স্বৈরশাসক বিপজ্জনক বলে গণ্য করে। এর কারণ, এরূপ লোক যেমন নিজেদের মধ্যে তেমনি অপরের মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাসের সৃষ্টি করে। এরা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক অভিযোগের পন্থাকে পরিহার করে। তৃতীয় বিষয়টিও বোধগম্য : কেউ নিজের সাধ্যের অতিরিক্তের জন্য চেষ্টা করেনা। এ কারণে কারুর যদি স্বৈরশাসনকে ধ্বংস করার ক্ষমতা না থাকে তবে সেরূপ করার চেষ্টা থেকেও সে বিরত থাকে। এই তিনটি ভাগে আমরা শাসিতের প্রতি স্বৈরশাসকের উদ্দেশ্যকে বিভক্ত করতে পারি। স্বৈরশাসকের সকল কর্মকাণ্ডকে আমরা এই তিন প্রকার নীতির ভিত্তিতে উল্লেখ

করতে পারি। স্বৈরশাসকের কামনা হচ্ছে তার অধীনে শাসিত মানুষের নিজস্ব মন, আত্মবিশ্বাস কিংবা ক্ষমতা কিছুই থাকতে পারবে না।

['স্বৈরশাসনকে রক্ষা করার দুটি উপায়ের পার্থক্য হচ্ছে এই যে, এর প্রথমটির বিশ্বাস হচ্ছে, শাসিত মানুষ অবশ্যই শাসকের বিরোধী এবং সে কারণে এমন ব্যবস্থা করতে হবে যেন শাসিতগণ শাসকের বিরুদ্ধে আদৌ কোনো ষড়যন্ত্র করতে সক্ষম না হয়। অপরদিকে দ্বিতীয়টির লক্ষ্য হচ্ছে শাসিতগণের মন থেকে শাসকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কারার ভাবটি দূর করা'—ডব্লিউ. এল. নিউম্যান।]

স্বৈরশাসনকে রক্ষা করার সনাতন এই পদ্ধতিগুলি সম্পর্কে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এর ভিন্নতর পদ্ধতির ফলটি ভিন্নরূপ। রাজতন্ত্রের দৃষ্টান্ত দিয়ে আমরা কথাটি বলতে পার। একটি রাজ্যের নিশ্চিত ধ্বংসের পথ যেখানে সে রাজ্যের রাজার শাসনকে স্বৈরাচারী করা তেমনি বিপরীতভাবে স্বৈরশাসক অধিকতর রাজা হলে তার শাসন রক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে শাসকের শাসন করার ক্ষমতা রক্ষিত হয়। এবং এ ক্ষমতা দ্বারা সে কেবল যে ইচ্ছুক প্রজাদেরই শাসন করতে সক্ষম হয় তাই নয়। অনিচ্ছুক প্রজাদের উপরও তার শাসন বলবৎ করতে সে সক্ষম হয়। কারণ স্বৈরতা পরিত্যাগ দ্বারা সে স্বৈরাচারী শাসকের চরিত্রই পরিত্যাগ করে। তার শাসন রক্ষার ক্ষেত্রে এটি হওয়া উচিত মূল নীতি। বাকি সব বিষয়ে সে রাজার মতো অথবা বুদ্ধির সঙ্গে রাজার ভূমিকা পালনের নীতি গ্রহণ করতে পারে।

এই নীতিতে প্রথমত, তাকে সাধারণের মঙ্গলের কথা চিন্তা করতে হবে। কোনো উপঢৌকন প্রদানে সে অধিক অর্থ ব্যয়ের দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেনা। কারণ, তাতে মানুষের মনে ঘৃণার সঞ্চার হয়। সাধারণের পরিশ্রমের উৎপাদিত সম্পদকে সে যদি অকাতরে তার প্রেমের পাত্রীদের কিংবা বৈদেশীক এবং তার দক্ষ কারিগরদের মধে বিতরণ করে দেয় তাহলে সাধারণের মনে তার প্রতি ঘৃণার সঞ্চার হওয়ার কারণ ঘটে। এ সকল ক্ষেত্রে অতীতে বেশ কয়েকজন স্বৈরশাসক যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে তেমনিভাবে স্বৈরশাসক তার রাজস্ব এবং সে রাজস্বের ব্যয়ের হিসাব প্রদান করবে। এর দ্বারা একজন স্বৈরশাসকের পক্ষে স্বৈরশাসক হিসাবে নয়, বরঞ্চ রাষ্ট্রীয় সম্পদের ব্যবস্থাক হিসাবে নিজেকে প্রকাশ করা সম্ভব হবে। এবং সে যখন রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদের মালিক তখন অর্থের অভাব হবে, এমন আশঙ্কারও তার কারণ থাকবেনা। বস্তুত কোনো শাসক যদি অধিকবার বিদেশে গমনাগমণ করে তাহলে বিপুল পরিমাণ সম্পদ সংগ্রহ করে পুঞ্জীভূত করার চাইতে তার হিসাব প্রকাশ করা অধিকতর নিরাপদ। এর ফলে তার আর্থিক বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের পক্ষে রাষ্ট্রীয় অর্থ আত্মসাৎ করার সম্ভাবনা হ্রাসপ্রাপ্ত হবে। তাছাড়া এটা দেখা যায় যে, স্বৈরশাসকগণ যখন যুদ্ধে লিপ্ত থাকে তখন তারা নাগরিকদের নিরপত্তার চাইতে নিজেদের সম্পদের নিরাপত্তার চিন্তায় অধিক শঙ্কিত থাকে। নাগরিকগণ তার সঙ্গে যুদ্ধে গমন করে কিন্তু আর্থিক বিষয়ের কর্মচারীবৃন্দ পশ্চাতে অবস্থান করে। তদুপরি শাসক যখন নাগরিকদের নিকট তেকৈ রাজস্ব সংগ্রহ কিংবা কোনো সাহায্য দাবি করবে তখন তাকে এরূপ দেখাতে হবে যে, এই অর্থ সে দেশের কল্যাণ তথা কোনো সঙ্কট সময়ে সামরিক প্রয়োজনের কারণে দাবি করছে। মোট কথা তাকে নিজের নয়, জাতির সম্পদের রক্ষক এবং প্রতিপালক হিসাবে নিজেকে দেখাতে হবে।

তার আচার আচরণে তাকে সর্বদা এই ভাবটি প্রকাশ করতে হবে যে, সে একজন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি, সে অত্যাচারী নয়, সে এমন একজন মানুষ যার সাক্ষাতে সাক্ষাৎকারীগণ অনুপ্রাণিত হয়, ভীত নয়। অবশ্য একাজটি সহজ নয়। যে স্বৈরশাসক সে সাধারণত মানুষের মনে ঘৃণা ও পরিত্যাজ্যতার ভাব সৃষ্টি করে। কাজেই এমন শাসক অপর কোনো গুণের চর্চা যদি নাও করতে পারে, তাহলে তাকে অন্তত যুদ্ধক্ষেত্রে পারদর্শীতা অর্জনকে তার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে এবং নিজের জন্য একটা সামরিক সুখ্যাতি তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সে নিজে কিংবা তার অনুগামী বাহিনী কেউ কোনো তরুণ বা তরুণীর উপর যৌনবল প্রয়োগ করেছে—এমন দৃশ্য যেন কেউ কখনো দর্শন না করে, সেদিকে তাকে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। এ নির্দেশ অপর মহিলাদের প্রতি তার দরবারের মহিলাদের আচরণের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। মেয়ে সম্পর্কিত যৌন কলঙ্ক অনেকক্ষেত্রে স্বৈরশাসনের পতনের কারণ হয়েছে। পানাহারের ক্ষেত্রেও তার আচরণকে সাধারণ স্বৈরশাসকের আচরণ থেকে ভিন্ন হতে হবে। আমরা অনেক স্বৈরশাসকের কথা জানি যারা কেবল যে দিনের সূচনা করে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তাই নয়। তারা দিনের পর দিন এমন অবস্থায় অতিবাহিত করে এবং এরূপ ইচ্ছাকৃত লক্ষ্য নিয়েই তারা এরূপে দিন যাপন করে যেন অপরে দেখতে পায় তারা কত সুখী এবং সৌভাগ্যবান। এ সমস্ত ব্যাপারে পরিমিতই হচ্ছে সর্বোত্তম। অন্তত স্বৈরশাসককে প্রকাশ্যে নেশাগ্রস্ত হওয়াটাকে পরিহার করতে হবে। সুস্থ মানুষকে কেউ অবজ্ঞা করে না, অবজ্ঞা করে নেশাগ্রস্তকে। সজাগ ব্যক্তিকে কেউ আঘাত করেনা, আঘাত করে নিদ্রাচ্ছন্নকেই। কাজেই স্বৈরশাসকদের স্বভাবগত বলে যে সকল আচরণের আমরা উল্লেখ করেছি তার বিপরীত আচরণই এই শাসককে করতে হবে। এবং সে কারণে নগরীর কোনো নির্মাণ এবং শোভাবর্ধন কর্মের ক্ষেত্রে তার ভূমিকা হবে ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির ভূমিকা, স্বৈরশাসকের ভূমিকা নয়। ধর্মের ক্ষেত্রেও তাকে অপরের চাইতে অধিক নিষ্ঠার প্রকাশ দেখাতে হবে। অবশ্য সে জন্য সে নির্বোধ, এমন পরিচয় দেওয়াও ঠিক হবেনা। সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে, যে-শাসক ধর্মভীরু এবং দেবতাদের মান্য করে তার হাতে তাদের নির্যাতনের আশঙ্কা কম। এবং দেবতারা শাসকের পক্ষে আছে এমন ধারণা থাকলে শাসকের বিরুদ্ধে লোকদের ষড়যন্ত্র করার সম্ভাবনাও কম হবে। তাছাড়া স্বৈরশাসকের রাজ্যে কোনো নাগরিক যদি কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে পারদর্শীতা প্রদর্শন করে তবে শাসকের উচিত হবে তাকে এমনভাবে সম্মানিত করা যেন তার বিশ্বাস জন্মে, স্বাধীন মানুষের রাজ্যেও এর চাইতে উত্তম ব্যবহার সে আশা করতে পারতোনা। এবং দণ্ডদানের ব্যাপার অপর কর্মচারী বা বিচারকদের হাতে ন্যস্ত রেখে এমন সম্মানদানের ব্যাপার শাসক নিজ হাতে সম্পাদন করবে। তবে এক্ষেত্রে একটা রক্ষাকবচের কথা খেয়াল রাখতে হবে। এটি সকল প্রকার রাজকীয় শাসনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শাসকের উচিত হবেনা, কোনো ব্যক্তিকে এককভাবে বড় করে তোলা। প্রয়োজন হলে একাধিক ব্যক্তিকে বড় করতে হবে। তাহলে তারাই একে অপরের ওপর নজর রাখবে। কিংবা কোনো এক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করার যদি আবশ্যক হয় তাহলে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এরূপ ব্যক্তি তার চরিত্রের সাহসিকতার জন্য বিশিষ্ট না হয়। কারণ এরূপ ব্যক্তি সাহসী হলে, দায়িত্ব তার যাই হোকনা কেন, আক্রমণের জন্য সে সদা প্রস্তুত থাকে। আবার এমন পদোন্নত ব্যক্তির ক্ষমতাকে হ্রাস করার যদি প্রয়োজন হয় তাহলে এ কাজটি ক্রমান্বয়ে সম্পন্ন করতে হবে। একটি মাত্র আঘাতে তার সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া শাসকের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।

শাসককে সর্বপ্রকার দুরাচার, বিশেষ করে দুটি ক্ষেত্রে দুরাচার থেকে দূরে থাকতে হবে। ক্ষেত্র দুটি হচ্ছে বলপ্রয়োগ এবং তরুণদের উপর বলাৎকার। উচ্চাকাঙ্খীদের ব্যাপারে এই সতর্কতা বিশেষভাবে আবশ্যক। কারণ যারা অর্থগৃধ্ণু তারা যেখানে প্রধানত তাদের সম্পদের উপর আক্রমণে ক্রুদ্ধ হয়, তেমনি যারা উচ্চাকাঙ্খী এবং মর্যাদাসম্পন্ন তারা তাদের পদমর্যাদা এবং সম্মানের উপর আঘাতে ক্ষিপ্ত হয়। কাজেই কোনো স্বৈরশাসক এরূপ লোকের বিরুদ্ধে আদৌ কোনো ব্যবস্থ গ্রহণ করবেনা। অথবা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও সেটির প্রকাশ পিতৃসুলভ হতে হবে, ইচ্ছাকৃত পদাবনয়ন হিসাবে নয়। তরুণদের সঙ্গে তার সম্পর্কের ভিত্তি হতে ক্ষমতা নয়, ভালবাসা। এবং সাধারণভাবে মর্যাদার হানিকর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হলেও বিনিময়ে তাদের উপর অধিকতর সম্মানদান করা সঙ্গত হবে। শাসক যাদের নিকট থেকে আক্রমণের আশঙ্কা করতে পারে তাদের মধ্যে যারা তার জীবননাশের জন্য নিজেদের জীবনের পরোয়া করেনা, তাদের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। কাজেই শাসককে সতর্ক থাকতে হবে যেন এরূপ লোক তাদের নিজেদের কিংবা তাদের পক্ষীয় কোনো লোকের উপর দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উত্থাপনের কারণ প্রাপ্ত হতে না পারে। মানুষের কোনো কার্যক্রমের উৎস যদি ক্রোধ হয় তাহলে তারা বেপরোয়া হয়ে ওঠে। এজন্যই হিরাক্লিটাস একবার বলেছিলন : ক্রোধের মতো শত্রু নাই। ক্রোধ নিজের জীবনের বিনিময়ে তার কার্য সাধন করে।

একটি নগরী যেহেতু দুটি অংশ দিয়ে গঠিত হয়, সে কারণে যাদের সম্পদ আছে এবং যাদের সম্পদ নাই, সম্ভব হলে তার উভয়ই যেন এরূপ বিশ্বাস পোষণ করতে পারে যে, তাদের উভয়ের নিরাপত্তার জন্য তারা শাসকের নিকট ঋণী এবং সে কারণে তাদের উচিত হবেনা পরস্পরের প্রতি বিরোধিতায় রপ্ত হওয়া। কিন্তু এই দুই-এর কোনো এক পক্ষ যদি অধিকতর শক্তিশালী হয়ে ওঠে তাহলে এ পক্ষের সদস্যদের শাসনের সঙ্গে যুক্ত করাই সঙ্গত হবে। কারণ তাহলে সঙ্কটের সময়ে স্বৈরশাসকের পক্ষে দাসদের মুক্ত করে দেওয়া এবং তাদের অস্ত্রাদি বাজেয়াপ্ত করার মতো ব্যবস্থা পরিহার করা সম্ভব হবে। কারণ নগরীর বিভক্ত পক্ষের কোনো একটিকে শাসনের সঙ্গে যুক্ত করে অভ্যুত্থানকে দমন করা শাসকের পক্ষে সহজ হয়।

এ সমস্ত বিষয়ের অধিকতর বিস্তারিত বিবেচনা নিষ্প্রয়োজন। এর সাধারণ উদ্দেশ্যটি পরিষ্কার : স্বৈরশাসককে দেখতে হবে যেন প্রজাদের চোখে সে স্বৈরশাসক বলে প্রতিভাত না হয়। তাকে দেখাতে হবে, সে হচ্ছে রাজার মতো এবং গৃহের অভিভাবকের মতো। তাকে দেখাতে হবে লুণ্ঠন করার চরিত্র তার নয়, সে হচ্ছে অপর সকলের পক্ষ থেকে দায়িত্ব প্রাপ্ত রক্ষক। তার লক্ষ্য জীবনযাপনে অনাচারী হওয়া নয়, তার লক্ষ্য মিতাচারী হওয়া। তাকে দেখাতে হবে, সে যেমন নেতৃস্থানীয় নাগরিকদের বন্ধু তেমনি জনতার সে নেতা। শাসক যদি এই সকল নিয়মকে মান্য করে তাহলে তার শাসন কেবল যে অধিকতর উত্তম হবে, তাই নয়। তার শাসন অধিককাল স্থায়ী হবে। তখন তার শাসনে মানুষ ভীত হবে না এবং তার শাসন প্রযুক্ত হবে অধিকতর উত্তমের উপর, অক্ষম দাস্যভাবের আনুগত্যে পর্যবসিত মানুষের উপর নয়। এমন হলে ভাল-মন্দের ব্যাপারে স্বৈরশাসকের নিজের দৃষ্টিও সঠিক, অন্তত অর্ধ-সঠিক বলে প্রতিপন্ন হবে এবং তাকে প্রজাবৃন্দ অর্ধ-অধম বলে বিবেচনা করলেও পুরো অধম বলে বিবেচনা করবেনা।

দ্বাদশ অধ্যায়

কতিপয়তন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্রের আয়ুষ্কাল অল্প

[বাস্তবক্ষেত্র অবশ্য স্বৈরশাসন এবং কতিপয়ের শাসন কদাচিতই দীর্ঘস্থায়ী হয়। অধ্যায় ১২তে এ্যারিস্টট্‌ল কিছুটা অধিক স্থায়ী এরূপ শাসনের দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন।]

তথাপি একথা সত্য যে, অপর কোনো শাসনব্যবস্থা থেকে কতিপয়তন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্রের আয়ুষ্কাল অল্প। সবচাইতে দীর্ঘজীবী স্বৈরতন্ত্রের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সাইকাইওনীয় অরযাগোরাস এবং তার পুত্রদের স্বৈরশাসন। এ শাসন একশত বছর স্থায়ী হয়েছিল। এই শাসকগণ যে দীর্ঘজীবন লাভ করেছিল তার একটা কারণ, তারা প্রজাবৃন্দের সঙ্গে আচরণে নমণীয় ছিল এবং অনেক বিষয়ে তারা নিজেদেরকে আইনের শাসনের অধীনে ন্যস্ত করেছিল। ক্লিয়েসথেনিস-এর দৃষ্টান্তে দেখা যায়, সে তার চরিত্রে যুদ্ধংদেহী ছিল এবং তাকে কারুর পক্ষে তুচ্ছভাবে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। মোটকথা এই সব স্বৈরশাসক জনসাধারণের জন্য তাদের যত্ন দ্বারা জনসাধারণকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করতে পেরেছিল। এমনও কথিত আছে যে, একটি দ্বন্দ্বে বিচারক তাকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করতে অস্বীকার করায় ক্লিয়েসথেনিস বিচারকের মাথায় পুষ্পস্তবক অর্পণ করেছিল। অনেকে বলে সাইকিয়নের উদ্যানে উপবিষ্ট যে মূর্তিটিকে দেখা যায় সেটি সেই বিচারকেরই মূর্তি। স্বৈরশাসক পিসিসট্রাটাস সম্পর্কেও এরূপ কাহিনী আছে যে, একবার এরিওপাগাস-এর বিচারালয়ে তাকে উপস্থিত হওয়ার জন্য সমন দেওয়া হলে সে সমনকে সে মান্য করেছিল। এর পরবর্তী দৃষ্টান্ত হিসাবে করিনথ্‌-এর সাইপসেলিড বর্গের নাম করতে হয়। এদের শাসন তিয়াত্তরকে অতিক্রম করে অর্ধ-বৎসর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সাইপসেলাস শাসন করেছিল ত্রিশ বৎসর। পেরিয়ানডার করেছিল চল্লিশ এবং আরো অর্ধবৎসর। গরগস-এর পুত্র সামেটিকাস শাসন করেছিল তিন বৎসর। এদের সাফল্যের কারণ সমূহের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। সাইপসেলাস জনতার একজন নেতা বিশেষ ছিল এবং তার সমগ্র শাসনকালই সে সশস্ত্র প্রহরী ব্যতিরেকেই দিন যাপন করেছে। পেরিয়ানডারের চরিত্র স্বৈরশাসকের মতোই ছিল, তবে তার যুদ্ধংদেহী একটা ব্যক্তিত্ব ছিল। তৃতীয় পর্যায়ের দৃষ্টান্ত হচ্ছে পিসিসট্রাটিডাই-এর স্বৈরশাসন। অবশ্য এর শাসন নিরবচ্ছিন্ন ছিল না। কারণ শাসনকালে সে দুবার নির্বাসিত হয়েছিল। এবং এ কারণে তেত্রিশ বছরের মধ্যে তার স্বৈরশাসন স্থায়ী হয়েছিল সতের বছর। তার পুত্রগণ আঠার বছর শাসন করেছিল। এ নিয়ে তাদের মোট শাসনকাল হয়েছিল পঁয়ত্রিশ বৎসর। বাকি সকলের মধ্যে সাইকুস-এর হিরণ এবং গেলনদের কথা উল্লেখ করা যায়। কিন্তু এদের শাসনও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। গেলন সাত বছর শাসন করে অষ্টম বছরে মারা গিয়েছিল এবং হিরণ শাসন করেছিল দশ বৎসর। থ্রাসিবুলাস তার শাসনের একাদশ মাসেই বিতাড়িত হয়েছিল। মোটকথা স্বৈরশাসন কোথাও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়নি।

[উপসংহারে আমরা দেখছি, এ্যারিস্টটল প্লেটোর 'রিপাবলিক'-এর অষ্টম এবং নবম পুস্তকের উল্লেখ করছেন। প্লেটো এই দুটি খণ্ডে শাসনব্যবস্থার একটি থেকে অপরটিতে রূপান্তরের একটি কল্পচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। কিন্তু এ্যারিস্টটল-এর উদ্দেশ্য এবং প্লেটোর উদ্দেশ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্লেটোর বর্ণনার মূলে ছিল সর্বোত্তম তথা অভিজাত শাসন থেকে সব চইতে অধম শাসন স্বৈরতন্ত্রে রূপান্তরের একটি মানসিক চিত্র অঙ্কন করা। তাঁর সে বর্ণনা কোনো ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনা কিংবা শাসনের ক্ষেত্রে কোনোরূপ ব্যবস্থাপত্র দানের ব্যাপার ছিলনা। এ্যারিস্টটল প্লেটোর বর্ণনার এদিকটিকে নজরে রাখছেন বলে আমাদের মনে হচ্ছে না। এ কারণে প্লেটোর বর্ণনাকে তিনি শাসনব্যবস্থার একটি চক্র এবং তত্ত্ব হিসাবে উল্লেখ করছেন। কিন্তু 'রিপাবলিক'-এ প্লেটো এরূপ কোনো তত্ত্ব উপস্থিত করেন নি। তাছাড়া শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের যে গাণিতিক রহস্যময় কারণকে প্লেটো উল্লেখ করেছেন[১] তার গূঢ়ার্থ এ্যারিস্টটল বুঝে থাকলেও তিনি যে ব্যাপারটি আমাদের জন্য ব্যাখ্যা করেন নি, এটি দুঃখজনক।]

রাজকীয় শাসন এবং অপর সকল শাসনব্যবস্থার বিনষ্টির কারণ সম্পর্কে এবং যে উপায়ে তাদের রক্ষা করা যায় সে সম্পর্কেও আমার বক্তব্য আমি শেষ করেছি। তবে 'রিপাবলিক'-এর একটি উল্লেখ আমার এখনো অবশিষ্ট আছে। এই অশংটিতে দেখা যায় সক্রেটিস শাসনব্যবস্থার পরিবর্তনের বিষয়ে আলাপ করছেন। অবশ্য তাঁর সে আলাপ সন্তোষজনক নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি সক্রেটিস বিষয়টি শুরু করেছেন, একটি আদর্শগতভাবে সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা থেকে। কিন্তু এই ব্যবস্থার মধ্যে যে পবিবর্তনকে তিনি নির্দিষ্ট করেছেন সে পরিবর্তন কেবল একটি সাধারণ বিবরণের পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রয়েছে, কোনো বিশিষ্টতা সে অর্জন করেনি। কারণ, তাঁর কথা হচ্ছে, কোনো কিছুই অপরিবর্তিত থাকেনা এবং একটা সময়ে ব্যবস্থার মধ্যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এবং এই পরিবর্তনের সময়কাল নির্দিষ্ট হয় চার এবং তিনের একটি মূলগত অনুপাতের ভিত্তিতে পাঁচের সঙ্গে মিশ্রণে সৃষ্ট দু'টি সঙ্গতির মাধ্যমে। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, হিসাবের ক্ষেত্রে গণনার একক হচ্ছে ত্রিমাত্রিক। এর তাৎপর্য দাঁড়ায় যে, প্রকৃতি কোনো কোনো সময়ে এমন অধম শাসকদের উদ্ভব ঘটাতে পারে যারা কোনো প্রকার শিক্ষারই আয়ত্তাধীন নয়। এ কথাটি যে অগ্রহণযোগ্য, এমন নয়। এমন লোক অবশ্যই পাওয়া যাবে যাদের কোনোপ্রকারেই শিক্ষিত করে তোলা চলেনা এবং তাদেরকে উত্তমে আদৌ পরিণত করা যায়না। কিন্তু যাকে তিনি সর্বোত্তম শাসন বলেছেন তার মধ্যে এই বিশেষ পরিবর্তনটি কেনো সংঘটিত হবে, সে কারণটি বোধগম্য নয়। এ পরিবর্তনতো অপর কোনো জনগোষ্ঠী বা শাসনের ক্ষেত্রেও সংঘটিত হতে পারে। তাছাড়া পরিবর্তনের যে কালসীমার কথা বলা হয়েছে সে কালসীমায় বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত অবস্থা কি একই কালে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আমি বলতে চাচ্ছি, পরিবর্তনের নির্দিষ্ট ক্রান্তিকালের পূর্ব-মুহূর্তটিতে যার উদ্ভব ঘটেছে তার পরিবর্তনও কি অপর সকলের সঙ্গে একই মুহূর্তে সংঘটিত হয়?

আমার দ্বিতীয় আপত্তি হচ্ছে : আদর্শ শাসনব্যবস্থাটি পরিবর্তিত হয়ে স্পারটীয় শাসনব্যবস্থার রূপটি কেনো ধারণ করবে? যে কোনো শাসনব্যবস্থা সদৃশ অপর কোনো ব্যবস্থায় পরিবর্তিত হওয়ার চাইতে বিপরীত ব্যবস্থাতে পরিবর্তিত হওয়ার প্রবণতাই তো অধিক প্রদর্শন করে। এই যুক্তি স্পারটীয় থেকে কতিপয়তন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্র থেকে গণতন্ত্র এবং সেখান থেকে স্বৈরতন্ত্রের উদ্ভবের যে কথা সক্রেটিস এর পরে উল্লেখ

১. প্লেটোর রিপাবলিক : সরদার ফজলুল করিম : দ্বিতীয় সংস্করণ। পৃ. ৩৮৭-৩৮৮ : অষ্টম পুস্তক।

করেছেন তার ওপরও প্রযোজ্য।[১] বস্তুত পরিবর্তন বিপরীতক্রমেও হতে পারে—অর্থাৎ গণতন্ত্র থেকে একব্যক্তির স্বৈরশাসনের চাইতে কতিপয়তন্ত্রে পরিবর্তন আসার প্রবণতাই অধিক হতে পারে। তাছাড়া, সক্রেটিস স্বৈরশাসনে এসে দাঁড়ি টানছেন। এ ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটবে কিনা এবং যদি ঘটে তাহলে তার কারণ কি হবে এবং কোন্ ব্যবস্থাতে এটি রূপান্তরিত হবে—একথা সক্রেটিস বলছেন না। এই না বলার কারণ হচ্ছে এই যে, এটি বলা কঠিন। কারণ স্বৈরশাসন কিভাবে পরিবর্তিত হবে, তার কোনো নিশ্চয়তা নাই। সক্রেটিসের তত্ত্ব অনুসারে স্বৈরশাসনের পরে আদর্শ শাসনব্যবস্থাটিই পুনরায় ফিরে আসা আবশ্যক ; অর্থাৎ সূচনার এবং সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থাটির উদ্ভব হওয়া আবশ্যক। এমন হলে পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি যেমন নিরবচ্ছিন্ন হতো তেমনি তার একটি বৃত্ত আমরা কল্পনা করতে পারতাম। কিন্তু স্বৈরশাসন থেকে স্বৈরশাসনেরও উদ্ভব ঘটতে পারে। মাইরণ-এর স্বৈরশাসন থেকে এমনিভাবে সাইকিয়নের ক্লিয়েসথেসিন-এর স্বৈরশাসনের উদ্ভব ঘটেছিল। কিবা কতিপয়তন্ত্রেরও উদ্ভব হতে পারে। এমন ঘটেছিল চ্যালচিস-এ এ্যানটিলিয়ন-এর স্বৈরশাসন থেকে। আবার গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটাও অসম্ভব নয়। এটি ঘটেছিল সাইরাক্যুসে। গেলন-এর পারিবারিক শাসন পরিবর্তিত হয়েছিল গণতন্ত্রে। আবার অভিজাততন্ত্রও আসতে পারে, যেমনটি ঘটেছিল ল্যাসিডিমনে ক্যারিলস-এর শাসনে কিংবা কার্থেজে। পরিবর্তন কতিপয়তন্ত্র থেকে স্বৈরতন্ত্রেও ঘটতে পারে। পূর্বকালের সিসিলির অধিকাংশ কতিপয়ী শাসনে এমনটি ঘটেছিল : লিয়নটিনিতে প্যানটিয়াস-এ স্বৈরশাসন এবং গেলাতে ক্লিয়ানড্রস, রেজিয়ামে এ্যানাকজিলাস-এর স্বৈরশাসন এবং অনুরূপভাবে আরো অনেক নগরীতে কতিপয়তন্ত্র থেকে স্বৈরশাসনের উদ্ভব ঘটেছিল।

তাছাড়া সক্রেটিসের এই অভিমতটিকেও আমি গ্রাহ্য মনে করিনে যে, কতিপয়তন্ত্রের পরিবর্তনের কারণ, কতিপয়ী শাসকবৃন্দ অর্থকে প্রিয় মনে করে এবং টাকা অর্জনেই তারা নিবদ্ধ থাকে। বরঞ্চ এই শাসনের পরিবর্তনের কারণ হচ্ছে, অতি-সম্পদবান একথা ভাবতে পারে না যে যাদের আদৌ কোনো সম্পদ নাই, নিঃস্ব, তারাও তাদের সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করবে। অনেক কতিপয়ী শাসন আছে যেখানে অর্থ অর্জন সম্ভব নয়। আইনগভাবে এমন কার্য নিষিদ্ধ। অথচ গণতান্ত্রিক কার্থেজে টাকা অর্জনে কোনো নিষেধ নাই। শাসকরা সেখানে টাকা উপার্জন করছে। তাই বলে তাদের শাসনব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তদুপরি কতিপয়ী রাষ্ট্র ধনী এবং দরিদ্র হিসাবে দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত—এ অভিমতও গ্রহণ করা চলে না। বস্তুত যে কতিপয়ী শাসন সম্পর্কে সক্রেটিস বলছেন সে শাসন ল্যাকোনীয় শাসন থেকে কোনো পৃথক শাসন নয়। কিংবা অপর কোনো শাসনব্যবস্থা যেখানে সকলেরই সমান পরিমাণে সম্পদ নেই কিংবা সকলেই সমান পরিমাণে উত্তম নয়—এমন কোনো ব্যবস্থা থেকেও সক্রেটিসের উল্লেখিত শাসনব্যবস্থা পৃথক নয়। কারুর পক্ষে অধিকতর দরিদ্র না হয়েও কতিপয়ী থেকে গণতন্ত্রে পরিবর্তিত হওয়া সম্ভব। দরিদ্রদের সংখ্যা অধিক হলেই এই ব্যাপারটি ঘটতে পারে। আবার গণতন্ত্রও কতিপয়তন্ত্র হিসাবে পরিবর্তিত হতে পারে যদি ধনবানগণ জনসাধারণের চাইতে অধিকতর ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। ব্যাপারটি ঘটে যায় যখন এক পক্ষ একদিকে যেখানে সচেতন, অপর পক্ষ সেখানে ব্যাপারটির তাৎপর্য সম্পর্কে অচেতন থাকে। অর্থাৎ শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন তথা বিপ্লবের যেখানে একাধিক কারণ থাকতে পারে সেখানে সক্রেটিস কেবল এই কারণটিই

১. প্লেটোর রিপাবলিক : প্রাগুক্ত : পৃ. ৩৮৯-৩৯৪

উল্লেখ করেছেন যে, কতিপয়তন্ত্রে শাসকগণ অমিতাচারী জীবন যাপনের মাধ্যমে ঋণগ্রস্ত এবং দরিদ্র হয়ে পড়ে। অন্য কথায় এই ব্যবস্থার শাসকদের সকলে কিংবা অধিকসংখ্যক সূচনাতে ধনবান ছিল। কিন্তু এ কথা যথার্থ নয়। এ কথা অবশ্য ঠিক যে শাসনব্যবস্থার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ আকস্মিকভাবে সম্পদবিহীন হয়ে পড়লে তারা শাসনব্যবস্থার ব্যাপকতর পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা করে। কিন্তু গুরুত্বহীন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে এমন ঘটলে ব্যাপারটা খুব উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়ায় না। কিংবা এমন অবস্থায় বিপ্লব যদি সংঘটিত হয় তাহলে সে যে অপর কোনো ব্যবস্থার বদলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার রূপ নিবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। একটি বিপ্লবী পরিস্থিতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি এই নয় যে, সকল অর্থ নিঃশেষিত হয়ে গেছে। গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে সম্মান এবং সৌভাগ্যের অংশীদার সকলে কিংবা সকলে নয়। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জনসাধারণের প্রতি সুবিচার করা হচ্ছে কিংবা তাদের প্রতি অবিচার করা হচ্ছে।

যার যা ইচ্ছা তা করতে পারা স্বাধীনতার আধিক্যেই সম্ভব, সক্রেটিস এমন কথাও বলেছেন। কিন্তু কতিপয়তন্ত্র কিংবা গণতন্ত্র, তারও নানা প্রকারভেদ আছে। কিন্তু সক্রেটিস এদের পরিবর্তনের কথা যেরূপভাবে বলেছেন তাতে মনে হয় যেন এদের প্রত্যেকের একটিই মাত্র রূপ বা প্রকার আছে।

ষষ্ঠ পুস্তক

প্রথম অধ্যায়

শাসনব্যবস্থাসমূহকে কার্যকর করার বিষয়ে

[ষষ্ঠ পুস্তকে আসরা ৪র্থ এবং ৫ম পুস্তকের আলোচনার বারংবার উল্লেখ দেখতে পাই। বর্তমান পুস্তকে এ্যাসিস্টট্‌লের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে কি উপায়ে কার্যকর করা যেতে পারে। কিন্তু আলোচনা অসমাপ্তভাবে শেষ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।]

এ পযর্ন্ত আমরা আলোচনা করেছি, একটি শাসনব্যবস্থায় আইন প্রণয়ণ এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে বিভিন্নতার সংখ্যা এবং চরিত্রের বিষয়ে। আলোচনা করেছি এক্ষেত্রে পদসমূহে নিয়োগ এবং আইনের প্রণালী বিষয়ে। আমাদের চিন্তা ছিল, কোন্ শাসনব্যবস্থার জন্য এদের কোন্‌টি উপযুক্ত তা নির্ধারণ করা। একটি শাসনব্যবস্থায় ধ্বংস কি ভাবে আসতে পারে, তাকে রক্ষা করাই বা যায় কি প্রকারে, ধ্বংসের কারণ এবং উপলক্ষ্যগুলি কি তা আমরা বলেছি। কিন্তু বাস্তবে যখন দেখি যে, গণতন্ত্র কিংবা অপর শাসনব্যবস্থা কেবল এক প্রকারের নয়, তারা বহু প্রকারের, তখন আমাদের পূর্বকার আলোচনার সূত্র ধরে আর একটু অগ্রসর হওয়া অনুচিত হবে না। আমাদের আলোচনা করা আবশ্যক কোন্ ভাবে একটি শাসনব্যবস্থা তৈরি করা যায়। কোন্ উপায়টি কার জন্য উপযুক্ত। তাছাড়া যে সকল উপায়ের কথা আমরা বলেছি সেগুলির সম্ভবপর সকল মিশ্রণের কথাও আমাদের আলোচনা করা আবশ্যক। কারণ একটি ব্যবস্থার সঙ্গে অপর একটি ব্যবস্তার মিশ্রণ ঘটালে যে ব্যবস্থাটি তৈরি হয় তার চরিত্রটি একেবারে ভিন্ন হতে পারে। এমন মিশ্রণে একটি অভিজাততন্ত্র, চক্রতন্ত্র তথা ধনিকতন্ত্রে এবং একটি পলিটি অধিকতর পরিমাণে গণতন্ত্রে রূপান্তরিত হতে পারে। শাসনব্যবস্থাসমূহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণের ব্যাপারটি নিয়ে কখনো আলোচনা করা হয় নি। এ আলোচনাটি আমাদের করা আবশ্যক। মিশ্রণের ব্যাপারে নিম্ন মিশ্রণগুলির আমরা উল্লেখ করতে পারি : যেমন, শাসনব্যবস্থার সংসদের গঠনে কিংবা তার অফিসারবৃন্দের নিয়োগে যদি একদিকে ধনিকতন্ত্রের প্রবণতা থাকে কিন্তু অপরদিকে আইন ব্যবস্থায় অভিজাততন্ত্রের প্রবণতা থাকে—তাহলে এটি এক প্রকারের মিশ্রণ হবে। আবার আইন প্রণয়ন এবং সংসদীয় কার্যগুলি যদি ধনিকতন্ত্রের ভিত্তিতে নিষ্পন্ন করা হয়, কিন্তু নির্বাচনের ব্যাপার অভিজাততান্ত্রিক হয় তাহলে এমন মিশ্রণ ভিন্নতর হবে। এ ছাড়াও শাসনব্যবস্থার বিভিন্ন রকম বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিভিন্ন রকম বিশ্রণ হতে পারে। তা ছাড়া, আমরা যদিও বলেছি কোন্ ধরনের গণতন্ত্র নির্দিষ্টভাবে কোন্ ধরনের নগরীর জন্য উপযুক্ত হবে, এবং কোন্ ধরনের ধনিকতন্ত্র বা কতিপয়তন্ত্র কোন প্রকারের নাগরিকদের জন্য উপযুক্ত এবং অপর ব্যবস্থাগুলির মধ্যেও কোন্‌টি কাদের জন্য সুবিধাজনক,—তথাপি এক্ষেত্রে আরো কিছু আলোচনা আবশ্যক। কারণ, কোন্ ধরনের শাসনব্যবস্থা কোন্ প্রকারের নগরীর

জন্য উত্তম,—একথা বলাই যথেষ্ট নয়। আমাদের বলা প্রয়োজন আলোচিত ব্যবস্থাগুলি কিংবা অপর ব্যবস্থাগুলিকেও কিভাবে কার্যকর করা যায়। এই শেষের বিষয়টি নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করব। প্রথমে আমরা গণতন্ত্রের কথা কলব। এর দ্বারা আমরা এর বিপরীত ব্যবস্থা অর্থাৎ যাকে অনেকে চক্রতন্ত্র বলে অভিহিত করে তার চরিত্রও বুঝতে পারব।

এ আলোচনার জন্য আমাদের গণশাসনের সকল বৈশিষ্ট্য—অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার যেগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য সে গুলিকে বিবেচনা করতে হবে। কেননা এই বৈশিষ্ট্যগুলির মিশ্রণের ফলেই সর্বপ্রকার গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে এবং এদের একটি অপরটি থেকে পৃথক হয়ে দাঁড়ায়। প্রধানত দুটি কারণে একটি গণতন্ত্র অপর একটি গণতন্ত্র থেকে পৃথক হতে পারে। প্রথম কারণটি হচ্ছে, অধিবাসীদের চরিত্রের পার্থক্য। এ কারণের কথা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। এক রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ কৃষিজীবী হতে পারে। অপর একটি রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ শ্রমজীবী হতে পারে। অপর একটির লোকেরা ভাড়ার ভিত্তিতে শ্রমে নিযুক্ত হতে পারে। এদের মধ্যে প্রথমটি দ্বিতীয়টির সঙ্গে যুক্ত হলে, কিংবা তৃতীয়টি যদি অপর দুটির সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলে কেবল যে গণতন্ত্রের গুণেরই পরিবর্তন ঘটে তাই নয়। ব্যবস্থাটিও পরিবর্তিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় কারণটি নিয়েই আমরা এবার আলোচনা করব। গণতন্ত্রের যে সকল বৈশিষ্ট্যের আমরা উল্লেখ করেছি, যেগুলি গণতন্ত্র থেকে অবিচ্ছেদ্য বা যেগুলিকে তার স্বকীয় বলে চিহ্নিত করা হয় সেগুলির মিশ্রণে তথা তাদের বিভিন্ন প্রকার মিশ্রণে বিভিন্ন প্রকার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা তৈরি হতে পারে। এদের কোনো একটি কেউ যদি প্রতিষ্ঠা করতে চায় কিংবা কোনো একটির উন্নতি সাধন করতে চায় তবে এদের প্রত্যেকটির নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকে নির্দিষ্ট করা আবশ্যক। যাঁরা শাসনব্যবস্থা গঠন করেন তারা ভিত্তিতেই সকল প্রকার বৈশিষ্ট্যের নির্বিচার মিশ্রণ ঘটান। কিন্তু এরূপ করা ঠিক নয়। একথা আমরা শাসনব্যবস্থা কি প্রকারে ধ্বংস হয় এবং কি প্রকারে তাদের রক্ষা করা যায়, সে আলোচনার সময়ে বলেছি। বর্তমানে আমরা আলোচনা করব যারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাদের লক্ষ্য এবং তাদের নৈতিক মানগুলির বিষয়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নাগরিকগণের স্বাধীনতা সম্পর্কে

স্বাধীনতা হচ্ছে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ভিত্তি। নাগরিকগণ সর্বদাই এই কথাটি বলে থাকে। তাতে মনে হয়, কেবলমাত্র এই শাসনব্যবস্থাতেই নাগরিকবৃন্দ স্বাধীনতায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হয়। তাদের কথা হচ্ছে, প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষ্য হচ্ছে স্বাধীনতা। স্বাধীনতার একটি উপাদান হচ্ছে 'পর্যায়ক্রমে শাসন করা এবং শাসিত হওয়ার' অবস্থা। তাছাড়া গুণের ভিত্তিতে নয়, সংখ্যার সাম্যগত ন্যায়ের ধারণাও গণতন্ত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। ন্যায়ের এই ধারণা যখন প্রধান হয়ে দাঁড়ায় তখন জনসাধারণ সার্বভৌম হয়। এবং তখন সংখ্যাধিকগণ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেটাই শেষ এবং ন্যায্য সিদ্ধান্ত হয়ে দাঁড়ায়। এর সমর্থকদের কথা হচ্ছে, নাগরিকদের মধ্যে অবশ্যই সমতা থাকতে হবে। ফল হিসেবে দেখা যায়, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় দরিদ্রগণই ধনবানদের চাইতে অধিক সার্বভৌম। কারণ দরিদ্রগণই সংখ্যায় অধিক এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই মান্য হয়। স্বাধীনতার এই একটি দিক। এই দিকটিকে সকল গণতন্ত্রীই তাঁদের সংবিধানের সংজ্ঞার অংশ বলে গণ্য করেন। এর আর একটি নীতি হচ্ছে 'তোমার যেমন ইচ্ছা তেমন ভাবেই তুমি জীবন যাপন করবে'। কারণ এটা স্বাধীন ব্যক্তির একটি বৈশিষ্ট্য, যেমন এর বিপরীতে যে দাস তার জীবনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যেমন ইচ্ছা তেমন ভাবে জীবনযাপন করতে না পারা। গণতন্ত্রের এই বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতেই 'শাসিত না হওয়ার' নীতিটিকে প্রকাশ করা হয়। নীতিটি হচ্ছে আদৌ কারু দ্বারা শাসিত না হওয়া—অথবা শাসিত হলেও পর্যায়ক্রমে শাসিত হওয়া। স্বাধীনতার এই উপাদানটি সমতার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

এই মূলনীতি কয়টি, বিশেষ করে শাসন এবং শাসিত হওয়ার নীতি থেকে গণতন্ত্রের নিম্নের বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমরা নির্দিষ্ট করতে পারি : (১) নির্বাচন : সকল নাগরিক ক্ষমতার সকল পদের জন্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হবে; (২) শাসন : এক্ষেত্রে সকলে প্রত্যেকের উপর এবং প্রত্যেকে সকলের উপর পর্যায়ক্রমে শাসক হবে; (৩) পদ : সকল পদ কিংবা যে সকল পদের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা অথবা প্রশিক্ষণের প্রয়োজন পড়ে না সেগুলিকে লটারীর ভিত্তিতে পূর্ণ করা হবে; (৪) ক্ষমতার কোন পদ গ্রহণ সম্পত্তি থাকার উপর নির্ভর করে না—কিংবা সম্পত্তি বা ধনের শর্ত থাকলে তার পরিমাণ খুব সামান্য হতে হবে; (৫) ক্ষমতার কোন পদে একই ব্যক্তি দ্বিতীয়বার নিযুক্ত হবে না। এবং ব্যতিক্রম কেবল যুদ্ধসংক্রান্ত পদের ক্ষেত্রে হতে পারে; (৬) পদের মেয়াদ সকল পদের জন্য কিংবা যতো অধিক সংখ্যক সম্ভব তত অধিক সংখ্যক পদের জন্য স্বল্পকাল হবে; (৭) জুরি বিচার ব্যবস্থা গঠিত হবে সকল নাগরিকদের নিয়ে এবং তার এক্তিয়ার থাকবে সকল বিষয়ের উপর। কিংবা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং দূরগামী বিষয়ের উপর। এরূপ দৃষ্টান্ত হচ্ছে : সংবিধান সংক্রান্ত প্রশ্ন, তদন্ত-কার্য, ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির চুক্তি প্রভৃতি; (৮) এক্লেসিয়া

অথবা গণসংসদ হবে সকল বিষয়ে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। গুরুত্বহীন বিষয় ব্যতীত অপর কিছুর উপর কর্মচারীগণ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবে না। অথবা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে কাউন্সিলের। (সকল নাগরিককে যদি যদৃচ্ছা বেতন দান না করা হয় তাহলে সকল পদের মধ্যে কাউন্সিলই হচ্ছে সবচাইতে গণতান্ত্রিক। কারণ অত্যধিক পরিমাণে বেতন দান কালক্রমে এই পরিষদকেও ক্ষমতাহীন করে তুলে। জনসাধারণ যখন প্রচুর পরিমাণে বেতন লাভ করে তখন তারা সকল প্রশ্নেই হস্তক্ষেপ করার জেদ ধরে। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।) এর পরের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে (৯) সেবা দানের জন্য সংসদে, বিচারালয়ে এবং দপ্তরসমূহে সকলের জন্য নিয়মিত বেতন দানের ব্যবস্থা (অন্তত যে সমস্ত দপ্তর, যথা বিচারালয়, কাউন্সিল এবং সার্বভৌম পরিষদে যৌথ ভোজন বাধ্যতামূলক, সে সমস্ত প্রতিষ্ঠানে এরূপ বেতনের ব্যবস্থা থাকবে।) তাছাড়া (১০) উচ্চবংশে জন্ম, ধন এবং সংস্কৃতিকে যেমন স্বল্পসংখ্যকের বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচনা করা হয়, তেমিন এর বিপরীতে নীচু বংশে জন্ম, স্বল্প আয় এবং নিম্নমানের সংস্কৃতিকে জনতার শাসনের বৈশিষ্ট্য বলে চিহ্নিত করা হয়। (১১) কোন পদে চিরস্থায়ী নিয়োগকে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পছন্দ করে না। এ কারণে কোন ত্বরিত বিপ্লবের পরে যখন কোন স্থায়ী পদকে বজায় থাকতে দেখা যায় তখন সে পদের ক্ষমতা হ্রাস করা হয় এবং পদের অধিকারীগণকে নির্দিষ্ট প্রার্থীদের মধ্যে থেকে লটারীর মাধ্যমে নির্বাচিত করা হয়।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলিকে আমরা গণতন্ত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বলে নির্দিষ্ট করতে পারি। এবং যাকে সকলে গণতান্ত্রিক ন্যায়ব্যবস্থা বলে অভিহিত করেন অর্থাৎ যার ভিত্তি হচ্ছে সংখ্যাগত সমতা, তা থেকেই উদ্ভূত হয় জনতার সর্বাধিক গণতান্ত্রিক গণতন্ত্র। এখানে এরূপ সমতা প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সরকারের মধ্যে ধনবান এবং দরিদ্র—উভয়েরই সমান প্রভাব থাকে এবং কোনো ব্যক্তিরই সার্বভৌম ক্ষমতা থাকে না। বরঞ্চ সংখ্যার ভিত্তিতে সকলেই সমান সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়। গণতন্ত্রের সমর্থকগণ মনে করেন, এভাবে তাঁরা শাসনব্যবস্থার মধ্যে সমতা এবং স্বাধীনতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবেন।

তৃতীয় অধ্যায়

ন্যায়পরায়ণতার বিভিন্ন ধারণা সম্পর্কে আলোচনা

আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে : এই সমতাকে তারা কি প্রকারে রক্ষা করবে? পন্থাটি কি এরূপ হবে যে, পাঁচশত জনের যে সম্পদ আছে সে সম্পদ এক সহস্রের মধ্যে বন্টন করা হবে এবং পাঁচশতের যে ক্ষমতা ছিল, এক সহস্রের সে ক্ষমতা থাকবে? অথবা, সমতার এই পন্থাটি বাদ দিয়ে পূর্বের ন্যায় বন্টন করা হবে, কিন্তু এক সহস্রের মধ্য হতে যত সংখ্যক নগরিককে বাছাই করা হবে পাঁচশতের মধ্যে থেকেও তত সংখ্যককে নির্দিষ্ট করে তাদের হাতে নির্বাচন এবং আইন-আদালতের দায়িত্ব ন্যাস্ত করা হবে? এমন করা হলে গণতান্ত্রিক ন্যায্যতার যে ধারণার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে সেই ধারণা অনুসারে এই শাসনব্যবস্থা কি সর্বাধিক ন্যায়পরায়ণ বলে বিবেচিত হবে? অথবা আমরা বলব, এটি হবে ন্যায় সম্পর্কে সংখ্যাগরিষ্ঠের ধারণানুযায়ী ব্যবস্থা? কারণ গণতন্ত্রের যারা প্রচারক তাঁরা বলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই হচ্ছে সঠিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু কতিপয়ী ব্যবস্থার ধারকগণ বলেন, অধিকতর সম্পদ যাদের আছে, তাদের সিদ্ধান্তই সঠিক। কারণ তাঁদের মতে সম্পদের পরিমাণই তার উপযুক্ত ব্যবহারকে নির্দিষ্ট করে। কিন্তু এ দুটো অভিমতের মধ্যেই কিছু পরিমাণ অসমতা এবং অন্যায়ের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কারণ, আমরা যদি বলি যে, কতিপয়ের সিদ্ধান্ত সঠিক তাহলে স্বৈরতন্ত্রের সৃষ্টি হয়। কেননা, ধরা যাক কেবল একজন নাগরিকের সম্পদ অপর ধনবানদের সকল সম্পদের চাইতে অধিক। তাহলে কতিপয়ী—ন্যায়বোধের ভিত্তিতে এই একজনেরই মাত্র শাসন করার অধিকার থাকবে। অপরদিকে আমরা যদি বলি, সংখ্যাগরিষ্ঠের স্থির করা সিদ্ধান্ত ন্যায়, তাহলে তারা সংখ্যায় যারা অল্প সেই ধনবানদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করবে এবং তার দ্বারা অন্যায় কার্য সাধিত হবে একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু সকলেই যে—সমতার ক্ষেত্রে ঐক্যমত হবে তেমন সমতাকে আবিষ্কর করার জন্য আমাদের তাদের প্রত্যেকের ন্যায়ের ধারণা বিশ্লেষণ থেকে আরম্ভ করতে হবে। একটি দাবি হচ্ছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ নাগরিকদের নিকট যা সঠিক বলে বোধ হয় তাকেই যথার্থ এবং মান্য বলে গ্রহণ করা উচিত। কথাটা হয়ত সত্য। তবু একে সর্বসময়ের জন্য এবং প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে গ্রহণ করা চলে না। ধনী এবং দরিদ্র,—একটি রাষ্ট্র সাধারণত এই দুটি অংশ নিয়ে গঠিত হয়। এবং এমন রাষ্ট্রে উভয় অংশ অথবা উভয় অংশের সংখ্যাধিকেরা যাকে উত্তম মনে করবে, তাকেই মান্য করা উচিত। একথা আমরা বলতে পারি। কিন্তু যদি তারা একমত না হয় তাহলে সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপায় হবে সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত বটে, তবে সে অভিমতের মধ্যে অধিকতর সম্পদবানদের বিবেচনা অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। ধরা যাক, এই দুই অংশের একটি অংশের রয়েছে দশজন, অপর অংশের বিশজন। একটি প্রস্তাবের ক্ষেত্রে দেখা গেল প্রস্তাবটির সমর্থনে রয়েছে সম্পদবানদের অবশিষ্ট চারজন এবং দরিদ্রগণের অবশিষ্ট পনের জন। এমন ক্ষেত্রে ধনী

এবং দরিদ্র উভয়ের সম্পদকে বিবেচনা করে যাদের সম্পদ অধিক হবে তাদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। এবং তাকেই গ্রহণ করতে হবে। এমন ক্ষেত্রে উভয়ের সংখ্যা যদি সমান হয় তথাপি তার মীমাংসা সংসদ কিংবা বিচারালয়ে সমসংখ্যার ভোটের মীমাংসার চাইতে কঠিন বলে বিবেচিত হওয়া উচিত নয়। সমস্যাটির মীমাংসা অবশ্যই লটারী কিংবা অপর কোনো স্বীকৃত পন্থায় করতে হবে। তাছাড়া সমতা এবং ন্যায় সম্পর্কে সত্য নির্ধারণ যতো কষ্টসাধ্য হোক না কেন, সে চেষ্টা মুনাফার নিশ্চিত লাভের মুখে কাউকে মুনাফার কিছু পরিমাণ পরিত্যাগ করতে সম্মত করানোর চাইতে কম কষ্টসাধ্য হবে। বস্তুত যারা দুর্বলতর তারাই ন্যায় এবং সমতার দাবী উত্থাপন করে। শক্তিমানের এ নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই।

চতুর্থ অধ্যায়

গণতন্ত্রের প্রকারভেদের পুনরুল্লেখ

[অধ্যায় ৪—এ আমরা গণতন্ত্রের চার প্রকার শ্রেণী বিভাগকে দেখতে পাই। চতুর্থ পুস্তকের ৪র্থ এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে এরূপ বিভাগের সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি। পূর্ববর্তী সেই শ্রেণী বিভাগ যে সঠিকভাবে এখানে অনুসরণ করা হয়েছে, এমন নয়। এখানে দেখা যায় এ্যারিস্টট্‌ল বেশ জোরের সঙ্গে নগরের অধিবাসীদের নয়, গ্রামীণ জনতার গণতন্ত্রের পক্ষে মত প্রকাশ করছেন। তার কারণ হচ্ছে গ্রামীণ জনতার গণতন্ত্রের গ্রামবাসীগণের পক্ষে সংসদের সভায় উপস্থিত হয়ে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ব্যবহার করা সম্ভব হবে না। কৃষি—গণতন্ত্রে নাগরিকের যোগ্যতার শর্ত সম্পদের নিম্ন পরিমাণেই নির্ধারিত হয়। এর ফলে দরিদ্রগণও নাগরিক হতে পারে। জমির মালিকানার পরিমাণ বিরাট হলে এতে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। সে কারণেই নিম্নের অধ্যায়ে নানা নিষেধের কথা বলা হয়েছে।]

চার রকমের গণতন্ত্র আছে। একথা আমরা পূর্বের আলোচনাতে বলেছি। এই চার রকম গণতন্ত্রের মধ্যে প্রথমটিকেই সর্বোত্তম বলা যায়। এটি অধিক পুরাতনও বটে। আমি জনতার বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শাসনব্যবস্থার শ্রেণীকরণের কথা বলছি। আমি বলব, কৃষিজীবী জনতাই সর্বোত্তম জনতা। একারণে যেখানকার অধিবাসীগণ কৃষিকার্য, পশুপালন বা পশু চারণের উপর জীবনধারণ করে তাদের নিয়ে গণতন্ত্র তৈরি করা সহজতর। কারণ তাদের সম্পদের কোনো প্রাচুর্য না থাকাতে তারা সর্বদাই কর্মে নিযুক্ত থাকে এবং সংসদে তারা খুব কম সময়ই উপস্থিত হতে পারে। আবার ক্ষেতে খামারে সর্বদা কর্মরত থাকাতে তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যসাগ্রীর অভাবও ঘটে না। তার ফলে অপরের দ্রব্যসামগ্রীর প্রতি তাদের লোভ থাকে না। এবং সরকারীপদ মুনাফার বড় রকমের উৎস না হলে তারা সরকারি এবং নাগরিক দায়িত্ব পালনের চাইতে জমির কাজেই অধিক আনন্দ লাভ করে। অধিক সংখ্যকের প্রবণতা লাভ অর্জন করা, জনসম্মান লাভ করা নয়। এর পরিচয় এথেকেও পাওয়া যায় যে সংখ্যাধিকগণ অতীতে যেমন স্বৈরতন্ত্রকে সহ্য করেছে, বর্তমানেও তারা কতিপয়তন্ত্রকে মান্য করছে। যতক্ষণ তারা তাদের জীবীকা কিংবা দ্রব্যসামগ্রী থেকে বঞ্চিত না হচ্ছে ততক্ষণ শাসনের ব্যাপারে তাদের কোনো আপত্তি থাকে না। এদের কিছু সংখ্যককে দ্রুত সম্পদবান হতে দেখা যায়। তবে অবশিষ্টগণও নিঃস্ব হয়ে পড়ে না। তাছাড়া এদের মধ্যে যাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে তারা নির্বাচনে ভোটের অধিকার প্রয়োগ করে এবং বিদায়ী কর্মচারীদের জবাবদিহী করে ক্ষমতার ক্ষেত্রে ক্ষতির পূরণ তারা করতে পারে। কারণ যে সকল গণতন্ত্রে সংখ্যাধিকেরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অধিকার পায় না, কিন্তু পরিষদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে সেখানেও জনতার মনে বেশ পরিমাণ সন্তোষই বিরাজ করে। (ম্যানটিনিতে দেখা যায় নির্বাচক মণ্ডলীকে পালাক্রমে

সকল নাগরিকদের মধ্যে থেকে বাছাই করা হয়।) ম্যানটিনির ন্যায় এই ব্যবস্থাটিকেও গণতান্ত্রিক বলে বিবেচনা করা হয়।

একারণে কৃষিজীবীদের যে গণতন্ত্রকে আমরা সর্বোত্তম বলেছি তার পক্ষে সুবিধাজনক এবং প্রচলিত ব্যবস্থা হচ্ছে সকল নাগরিককে কর্মচারীদের নির্বাচনের অধিকার দেওয়া, কর্মচারীদের জবাবদিহী করতে দেওয়া এবং বিচারালয়ে আসন লাভের অধিকার দেওয়া। তবে এ ব্যবস্থায় এরূপ শর্ত থাকা আবশ্যক যে, সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি পূরণ করা হবে কিছু পরিমাণ সম্পদের মালিকদের মধ্য থেকে লোক বাছাই এর ভিত্তিতে। এর নিয়মটি এরূপ হওয়া উচিত যে, পদটি যতো বড় হবে, সম্পদের পরিমাণ তত অধিক হবে। এর বিকল্প হিসেবে সম্পদের পরিবর্তে যোগ্যতাকেও কোনো পদে নির্বাচনের শর্ত হিসেবে নির্দিষ্ট করা যায়। এর ফলে শাসনের দিকটি উত্তমভাবে পরিচালিত হবে। কারণ শাসনকার্য সম্পাদিত হবে সর্বোত্তম নাগরিকদের দ্বারা। কিন্তু জনতার ইচ্ছার ভিত্তিতে। এতে উত্তম ব্যক্তিদের ঈর্ষাবোধ করার কোনো কারণ থাকবে না। তাছাড়া এমন শাসনব্যবস্থা সংস্কৃতিবান এবং বিশিষ্ট নাগরিকদেরও সন্তুষ্টি বিধান করতে সক্ষম হয়। কারণ তারা নিকৃষ্টদের দ্বারা শাসিত হচ্ছে, এমন মনোবেদনা তাদের থাকে না এবং শাসকদের ওপর জবাবদিহীর ব্যবস্থা থাকাতে শাসকগণও ন্যায়বানই হবেন। এরূপ পারস্পরিক নির্ভরতা এবং কোনো এক ধরনের অধিবাসীদের কেবল নিজেদের সুখের ব্যবস্থা করার উপায় না থাকার ব্যবস্থাটি উত্তম। যার যেমন ইচ্ছা করার স্বাধীনতা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অধমতার যে উপাদান রয়েছে তাকে সংবরণ করতে পারে না। কাজেই শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই সর্বাধিক মূল্যবান নীতিটি নিশ্চিত করার প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক : সরকারকে হতে হবে জনতার ক্ষতিসাধন না করে ভ্রান্তি থেকে মুক্ত উত্তমের সরকার।

এটাকেই বলা চলে সর্বোত্তম গণতন্ত্র। এর কারণটি পরিষ্কার। এর কারণ হচ্ছে, এই ব্যবস্থা অধিবাসীদের গুণের উপর নির্ভর করে। এর পরবর্তী বিষয় হচ্ছে অধিবাসীদের কৃষিজীবীতে পরিণত করা যায় কি প্রকারে। এক্ষেত্রেও দেখা যায়, প্রাচীনেরা যে সকল প্রথা এবং বিধানকে পালন করতেন সেগুলি এক্ষেত্রেও বেশ ফলদায়ক। যেমন, একটা বিশেষ পরিমাণের অধিক জমির মালিকানাকে একেবারেই নিষিদ্ধ করে দেওয়া। অথবা নির্দিষ্ট কোনো এলাকাতে জমির মালিক হওয়া যাবে না কিংবা সরকারের কর্মকেন্দ্র থেকে একটা দূরত্বেই মাত্র কেউ জমি ক্রয় করতে পারবে—এমন নিয়মও রাখা উত্তম। পূর্বকালে অনেক নগরীতে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, জমির মূল খণ্ডগুলিকে বিক্রয় করা চলত না। অকজিলাস-এর বিধানেও এরূপই উদ্দেশ্য ছিল। এই বিধানে একটি পরিমাণের অধিক কোনো জমি বিক্রি করে অর্থ অর্জন করার উপর নিষেধ জারি করা হয়েছিল। বর্তমান অবস্থাতেও এফিটিয়ানদের বিধান অবলম্বন করেও অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য এফিটিয়ানদের বিধান বিশেষভাবেই ফলপ্রদ। কারণ এফিটিয়ানদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাদের জমির পরিমাণ কম এবং জনসংখ্যা অধিক হওয়া সত্ত্বেও তারা সকলেই জমির কর্ষণকারী। সম্পদের মূল্যায়ণের ক্ষেত্রে সমগ্র সম্পদ নয়, বরঞ্চ সমগ্র সম্পদের যে অংশ একজন বর্ষণ করছে তাকেও ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। ফলে খুব দরিদ্র নাগরিকও সম্পদের শর্তটি সহজে অতিক্রম করতে পারে। কৃষিজীবীর পরে সর্বোত্তম হচ্ছে পশু পালক ও পশুচারকগণ, যারা পশু চারণ ও পশু পালন করে জীবীকা নির্বাহ করে। কৃষিকার্যের সঙ্গে এদের কার্যের বেশ কিছু সাদৃশ্য আছে। বস্তুত যুদ্ধের সময়ে এই ব্যবস্থার বিশেষ সুবিধার দিকটি প্রকাশিত হয়। লড়াই করার জন্য এদের প্রশিক্ষণে কোন অসুবিধা

হয় না। এরা শারীরিকভাবে সুস্থ থাকে। এরা খোলা আকাশের নীচে জীবন যাপনেও অভ্যস্ত।

অপর যে ধরনের জনতা দ্বারা বাকি দুই প্রকার গণতন্ত্র তৈরি হয় তাদের মান এই দুই প্রকারের চাইতে অনেক নিম্ন। তাদের জীবন নিকৃষ্টতম এবং তাদের সম্পাদিত কাজকেও উত্তম বলা চলে না। তারা একেবারেই শ্রমিক, ভাড়াটে এবং মানুষের মধ্যে সব চাইতে সাধারণ প্রকৃতির। আর এই ধরণের লোক যারা সর্বদাই নগরীর কেন্দ্রে, চারিপাশে এবং বাজারে ঘুরে বেড়ায় তারা বিনা আয়াসেই সংসদে উপস্থিত হতে পারে। কিন্তু কৃষিজীবী অধিবাসীগণ গ্রামের এলাকায় ছড়ানো থাকে। নগরীর জনস্রোতের ন্যায় এরা সভা সমাবেশে যোগদান করে না এবং এরূপ যোগদানের উপর কোনো গুরুত্ব আরোপ করে না। আবার রাষ্ট্রের জমির গঠন যদি এরূপ হয় যে, কৃষি-জমি নগরী থেকে বেশ দূরে অবস্থিত, তাহলে এমন রাষ্ট্রকে একটি উত্তম গণতন্ত্র বা পলিটি হিসেবে তৈরি করা সহজ হয়। কারণ এখানে সাধারণ মানুষকে নগর ছেড়ে গ্রামে বসতি স্থাপন করতে হয়। কাজেই কথা হল নগর—জনতা যদি তেমন থাকেও তথাপি গ্রাম-বাসীদের বাদ দিয়ে তাদের হাতে সংসদ গুলির নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। সর্বপ্রধান বা সর্বোত্তম গণতন্ত্র সম্পর্কে এবং তাকে কিভাবে গঠিত করতে হবে সে বিষয়ে এর অধিক বলার দরকার নেই। আমাদের এই আলোচনা অপর ব্যবস্থাগুলির গঠনকেও আলোকিত করবে। অপরগুলির নিকৃষ্টতা নির্ভর করবে তাদের অধিবাসীদের নিকৃষ্টতার পরিমাণের উপর।

একেবারে চরম যে গণতন্ত্র, অর্থাৎ যেখানে সকলেই সব কিছুর অংশীদার তেমন গণতন্ত্র সকল রাষ্ট্রের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। আর এমন গণতন্ত্র যদি বিধানসমূহ এবং নৈতিক মান দ্বারা সুরক্ষিত না হয় তাহলে তার টিকে থাকার সম্ভাবনাও কম। (এরূপ কিংবা অপর সকল শাসনব্যবস্থা কি প্রকারে ধ্বংস হতে পারে সে সম্পর্কে আমি পূর্বে যা বলেছি তার উপর অধিক কিছু বলার প্রয়োজন নেই।) আলোচ্য গণতন্ত্রের গঠন এবং তার অধিবাসীদের ক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, এই ব্যবস্থার নেতাগণ নিজেদের অনুসারীদের সংখ্যা যতো বেশি সম্ভব বৃদ্ধি করেন। এজন্য তারা বিবাহজাত কিংবা অবৈধভাবে জাত সকলকে এবং যারা পিতা বা মাতা একটি দিক দিয়েই মাত্র যোগ্য তাদের সকলকে নাগরিকে পরিণত করে। চরম গণতন্ত্রের এটিই হচ্ছে বৈশিষ্ট্য। এই পদ্ধতিতে জনপ্রিয় নেতাগণ তাদের সমর্থকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। কিন্তু এই পদ্ধতিটি সঙ্গত নয়। নতুন নাগরিক করার প্রক্রিয়াটি কেবল উচ্চতর এবং মধ্যশ্রেণীর নাগরিকদের সংখ্যা অতিক্রম না করা পর্যন্ত চলতে পারে। কিন্তু এর অধিক যাওয়া ঠিক নয়। এর অধিক অগ্রসর হলে শাসনব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলার উদ্ভব ঘটে এবং বিশিষ্ট নাগরিকগণ এত অধিক পরিমাণে বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠেন যে তাঁরা আর গণতন্ত্রের অস্বিত্বকে বরদাসত করতে চান না। (সাইরেনতে এ কারণেই বিদ্রোহ ঘটেছিল।) নাগরিকদের মধ্যে নিম্নতর শ্রেণীর লোকদের কিছু অল্প পরিমাণে মিশ্রণ ঘটলে কারুর দৃষ্টিতে আসে না। কিন্তু মিশ্রণ অধিক পরিমাণে হলে তা বিশেষভাবেই দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। এই ধরনের গণতন্ত্রের স্বার্থে কিছু পদক্ষেপ ফলদায়কভাবেই গ্রহণ করা চলে। এর দৃষ্টান্ত হিসেবে ক্লিথেনিস এবং সাইরেন-এর গণতন্ত্রের সমর্থকদের কথা উল্লেখ করা যায়। ক্লিসথেনিস এথেন্স নগরীর গণতন্ত্রকে এভাবে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। যে সকল পদক্ষেপের কথা আমি বলছি তার মধ্যে আছে, গোত্র এবং জ্ঞাতির সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং বেসরকারী ধর্মীয় শাখায় এবং যাজকীয় আচারের সংখ্যা হ্রাস করে কিছু সংখ্যক রাষ্ট্রীয় অথবা জাতীয় সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করা।

এক্ষেত্রে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক যেন পুরাতন জোটগুলির যথাসম্ভব বিলোপ ঘটে এবং অধিবাসীদের মধ্যে সামাজিক লেনদেন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাছাড়া স্বৈরতন্ত্রের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যেও গণতন্ত্রের কিছু চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে, দাসদের উপর নিয়ন্ত্রণের অভাব (কিছু পরিমাণে এটি প্রয়োজনীয় হলেও তার অধিক নয়); স্ত্রী জাতি এবং শিশুদের উপরও খবরদারির অভাব এবং যার যেমন ইচ্ছে সেভাবে জীবনযাপন করার স্বাধীনতা। যে শাসনব্যবস্থার কথা আমরা বলছি তার মূল কাঠামো হচ্ছে এটি; আসলে বেশির ভাগ লোকই নিয়ন্ত্রণহীন জীবন অধিক পছন্দ করে। কোনো কর্তৃপক্ষের বাধ্য হওয়ার চাইতে নিয়ন্ত্রণহীন স্বাধীনতাকেই তারা অধিকতর আনন্দদায়ক বলে গণ্য করে।

পঞ্চম অধ্যায়

বিধানদাতার দায়িত্ব : শাসনব্যবস্থাকে রক্ষা করার চিন্তা করা

[শাসনব্যবস্থায় অস্থিরতার যেসকল উৎস তাকে পরিহার করতে পারলে শাসনব্যবস্থার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পাবে। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে ৫ম পুস্তকের ১১ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেই আলোচনাতে স্বৈরতন্ত্রের স্থায়িত্বের ক্ষেত্রেও বলা হয়েছিল যে, স্বৈরশাসনব্যবস্থার স্থায়িত্বের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে স্বৈরশাসন যতো কম পরিমাণে স্বৈরশাসন বলে বোধ হয় তার ব্যবস্থা করা। বর্তমান পুস্তকে ৫ম এবং ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে গণতন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্রের জন্য এ্যারিস্টটলের পরামর্শ একইরূপ। যে কোনা ব্যবস্থার নিজ চরিত্রের উপর অত্যধিক জোর অনেক সময়ে ক্ষতির কারণ হয়। এই দুটো অধ্যায়ে আমরা এ্যারিস্টটলের একটি পরিচিত মানসিকতার পুনঃপ্রকাশ দেখতে পাই। এ্যারিস্টটল যে কোনো শাসনব্যবস্থাকে অমিশ্র হিসেবে গঠিত হওয়ার চাইতে তাকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের মিশ্রণের ভিত্তিতে গঠিত হওয়াটাই অধিক পছন্দ করেন। এই মিশ্র ব্যবস্থাকেই এ্যারিস্টটল অনেক সময়ে পলিটি বলে অভিহিত করেছেন। এ বিষয়ে ২য় পুস্তকের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের শেষাংশ এবং ৪র্থ পুস্তকের ৯ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য।]

একজন বিধানদাতা কিংবা যারাই একটি বিশেষ প্রকারের শাসনব্যবস্থা গঠন করতে চান তাদের একমাত্র কিংবা প্রধান দায়িত্ব কেবলমাত্র একটি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করা নয়। তাঁদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে ব্যবস্থাটিকে কার্যকর রাখা। (এটি দু' একদিনের কথা নয়। যে কোনো ব্যবস্থাকেই দু' একদিন কার্যকর রাখা যায়) এ কারণে আমাদের আবার পুরাতন সেই আলোচনাতে ফিরে যাওয়া আবশ্যক যেখানে আমরা একটি শাসনব্যবস্থার অব্যাহত নিরাপদ অস্তিত্ব এবং একটি ব্যবস্থার ধ্বংসের কারণগুলি নিয়ে কথা বলেছিলাম। এই আলোচনা থেকেই আমরা সংরক্ষণের একটি তত্ত্ব তৈরি করতে সক্ষম হব। এ ক্ষেত্রে আমাদের সেই সব কারণের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে যে কারণগুলি একটি ব্যবস্থার ধ্বংস সাধন করে। অপরদিকে যে সব লিখিত অলিখিত বিধানের মধ্যে ব্যবস্থাকে রক্ষা করার উপাদান রয়েছে সেগুলি আমাদের গ্রহণ করতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, যে—কারণে একটি গণতন্ত্র বা কতিপয়তন্ত্র চরমভাবে গণতন্ত্র বা কতিপয়তন্ত্র বলে বোধ হতে পারে সে কারণগুলি ব্যবস্থাটির নিজের জন্য উত্তম নয়। উত্তম হবে সেই কারণ বা উপায় যার মাধ্যমে একটি গণতন্ত্র বা কতিপয়তন্ত্র যতো অধিককাল সম্ভব তত অধিকাল স্থায়ী হতে পারে।

জনপ্রিয় নেতাদের একটি প্রবণতা এই দেখা যায় যে, তাঁরা জনতার সমর্থন লাভ করার জন্য আইন-আদালতকে খুব বেশি ব্যবহার করতে চান। তাঁরা আইনগত বাজেয়াপ্তকরণ দ্বারা জনতার অর্থ তহবিলকে স্ফীত করেন। কিন্তু যারা শাসনব্যবস্থার মঙ্গল নিজেদের

অন্তরে কামনা করেন তাঁদের উচিত এরূপ চেষ্টাকে প্রতিরোধ করা। আইন দ্বারাই এটি নির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত যে, জরিমানা এবং বাজেয়াপ্ততকরণের মাধ্যমে অর্জিত অর্থ ব্যয়িত হবে ধর্মীয় কাজে। এ অর্থ দ্বরা জনতার কিংবা রাষ্ট্রের তহবিল ভারী করা চলবে না। এতে সম্ভাব্য অপরাধীদের যে অধিক সুযোগ হবে, তা নয়। এমন আইনেও জরিমানা পূর্বের ন্যায়ই আদায় করা যাবে। কিন্তু জনতা যদি বুঝতে পারে বাজেয়াপ্ত অর্থ তাদের হাতে আসবে না, তাহলে বিচারে সোপর্দ ব্যক্তির বিরুদ্ধে তারা ক্ষমাহীন হবে না। তাছাড়া গণআদালতে পেশ করা অভিযোগের পরিমাণও সর্বনিম্নে হ্রাস করা আবশ্যক এবং মামলার খরচের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ভিত্তিহীন অভিযোগকে সংযত করা প্রয়োজন। কারণ গণতন্ত্রী জনতা অভিযোগ উত্থাপন করে ধনবান এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে, তাদের সহযোগী গণতন্ত্রীদের বিরুদ্ধে নয়। আলোচ্য শাসনব্যবস্থাকে যেমন, তেমনি অপর সকল শাসনব্যবস্থারই সম্ভবমত সমস্তশ্রেণীর নাগরিকদের আস্থাভাজন হওয়া উচিত। অন্তত যারা শাসন পরিচালনা করে তাদেরকে শত্রু হিসেবে গণ্য করা উচিত নয়।

এরূপ সর্বাত্মক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় অধিবাসীদের সংখ্যা যেমন বিপুল তেমনি বেতনদানের বিধান না থাকলে সংসদের সভায় তাদের অংশগ্রহণ কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এবং সরকারী রাজস্ব থেকে এরূপ বেতনদানের অর্থ যোগান সম্ভব না হলে উচ্চতর শ্রেণীর মধ্যে বিরোধিতার উদ্ভব ঘটে। কারণ তখন এই অর্থ কর আরোপ, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ এবং মামলা-মোকদ্দমার অবাঞ্ছিত ব্যবহারের মাধ্যমে সংগ্রহ করার চেষ্টা করা হয়। আর এগুলির কারণে পূর্বেও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পতন ঘটেছে। কাজেই প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দেওয়া সম্ভব না হলে সংসদের সভার সংখ্যা অবশ্যই হ্রাস করা আবশ্যক এবং বিচারালয় বহু লোকের দ্বারা গঠিত হলেও অল্প সংখ্যক দিনে মিলিত হবে এরূপ নিয়ম করা প্রয়োজন। এর ফলে ধনীকশ্রেণীর মধ্যে অতিরিক্ত করপ্রদানের ভীতি কম সৃষ্টি হবে এবং সম্পত্তিশূন্য সাধারণ নাগরিক সংসদের অধিবেশনে যোগ্যদানের জন্য যদি অর্থ প্রাপ্ত হয় এবং সম্পত্তিবানগণ কোনো অর্থ প্রাপ্ত না হয় তাহলেও মনে কম বিরূপতা সৃষ্টি হবে। তাছাড়া এর দ্বারা আইনগত মামলার পরিচালনাও উন্নত হবে। কারণ ধনবানগণ সাধারণত বিচারকার্যে বিচারালয়ে অল্প সময় দানই অধিক পছন্দ করে। তারা তাদের আপন বৈষয়িক ব্যাপারের তত্ত্বাবধান পরিত্যাগ করে অপর কোনো কাজে অধিক সময় নষ্ট করার ইচ্ছা পোষণ করে না। অপরদিকে অর্থ যোগানো সম্ভব হলেও, জনপ্রিয় নেতাগণ বর্তমানে যে প্রবণতা দেখিয়ে থাকেন সেরূপে সমগ্র উদ্বৃত্ত অর্থকে বিনামূল্যে বিতরণ করা ঠিক হবে না। কারণ জনতা এভাবে একবার অর্থ পেলে পুনর্বার সেরূপেই পেতে চায়। এরূপ কল্যাণমূলক সাহায্য আসলে প্রবাদের সেই ফুটো কলসীতে পানি ঢালারই মতো। কারণ যথার্থভাবে যারা গণতান্ত্রিক রাজনীতিবিদ তাদের দেখতে হবে যেন জনতা নিঃস্ব হয়ে না পড়ে। কারণ নিঃস্বতা গণতন্ত্রের অবনতির একটি কারণ। কাজেই সমৃদ্ধি রক্ষার সর্বপ্রকার চেষ্টাই করা আবশ্যক। এবং সমৃদ্ধি যেমন দরিদ্রের জন্য সুবিধাজনক, ধনীদের জন্যও তেমনি লাভজনক। কাজেই রাজস্ব থেকে অর্থ যা সংগৃহীত হবে তা একটি তহবিলে সংরক্ষিত করে যাদের যথার্থ প্রয়োজন থাকবে তাদের মধ্যে তা বন্টন করতে হবে। সম্ভব হলে এক খণ্ড জমি ক্রয়ের জন্য, কিংবা কোনো ব্যবসায় বা জমিতে কোনো কাজ শুরু করার মতো অর্থ প্রদান করা প্রয়োজন। এবং সকলকে ব্যক্তিগতভাবে এরূপ সাহায্য প্রদান যদি সম্ভব না হয় তবে অর্থসাহায্যের বন্টন গোত্র কিংবা অপর কোনো ভিত্তিতে পালাক্রমে করা যেতে পারে। ধনবানগণ এসময়ে ন্যূনতম সংখ্যক সভা আহ্বানের জন্য প্রয়োজনীয়

বেতনদানের অর্থযোগান দিবে এবং এজন্য তাদের অপ্রয়োজনীয় সরকারী দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। কারথেজের অধিবাসীগণ তাদের শাসনব্যবস্থা এই প্রকারে পরিচালন করে তাদের জনতার সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। সময়ে সময়ে তারা তাদেরকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও বসবাসের জন্য প্রেরণ করে এবং এর দ্বারা তাদের অর্থবান করে তোলে। উচ্চতর শ্রেণীর লোকেরা বিজ্ঞ এবং দানশীল হলে অনেক সময়ে দরিদ্রদের তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের এক এক দলের জন্য কাজ এবং জীবনধারণের একটা ব্যবস্থা করে দেবার দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে টারেনটামে যা করা হয় সে দৃষ্টান্তও অনুসরণ করা চলে। সেখানে সম্পদের যৌথ মালিকানা অবশ্য নেই। কিন্তু যাদের নিজেদের কোনো সম্পত্তি নেই তাদের যৌথ মালিকানার ব্যবস্থা আছে। এর দ্বারা জনতাকে সন্তুষ্ট রাখা যায়। তাছাড়া এরা শাসনের সকল পদকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে। একভাগের নিযুক্তি ঘটে বাছাই এর মাধ্যমে; অপর ভাগের নিয়োগ ঘটে লটারীর মাধ্যমে। এই শেষের ব্যবস্থাটির ফলে জনতার পক্ষে পদের পূরণে অংশগ্রহণ সম্ভব হয় এবং প্রথম ব্যবস্থাটিতে দক্ষ শাসনের একটা নিশ্চয়তা ঘটে। এ ব্যবস্থা অবশ্য একটি দপ্তরের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা চলে। এর ফলে দপ্তরটিকে দুভাগ করে তার একভাগের লোককে লটারীর মাধ্যমে এবং অপর ভাগের কর্মীদের বাছাইএর মাধ্যমে নিয়োগ করা চলে। যাই হোক, গণতন্ত্রকে সংগঠিত করার উপায় সম্পর্কে আলোচনা এ-পর্যন্ত থাক।

ষষ্ঠ অধ্যায়

কতিপয়তন্ত্রী শাসনব্যবস্থাসমূহের তালিকা

কতিপয় বা ধনীকতন্ত্রের ক্ষেত্রে ব্যাপারটি কিরূপ হবে তা যে নীতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকেই স্পষ্ট হয়েছে। গণতন্ত্রী ব্যবস্থার যে তালিকা আমরা তৈরি করেছি তার বরাবর কতিপয়তন্ত্রের একটি তালিকাও আমরা তৈরি করতে পারি। এ ক্ষেত্রে আমাদের শুরু করতে হবে প্রথমটি তথা সর্বোত্তমটি নিয়ে। এটিকে আমরা সর্বোত্তম ভাবে মিশ্রিত ব্যবস্থা বলতে পারি এবং সে হিসেবে ব্যবস্থাটি আমরা যাকে 'পলিটি' বলছি তার খুব নিকটবর্তী হয়ে উঠবে। এ ব্যবস্থাতে বিভিন্ন ভিত্তিতে পরিমাপের প্রয়োজন হবে। বলা চলে দু'টি মাপের আবশ্যক। এর দ্বারা আবশ্যকীয় কিন্তু নিম্নমানের পদার্থ পূরণের শর্তকে নিম্নপর্যায়ে রাখা হবে। কিন্তু উচ্চতর পদগুলির শর্ত উচ্চতর হবে। ফলে যে নাগরিকই প্রয়োজনীয় পরিমাণ সম্পদের মালিক হতে পারবে সেইই শাসনব্যবস্থার কোনো একটি ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করার ক্ষমতার অধিকারী হবে। এই ব্যবস্থা দ্বারা নিঃস্বদের সংখ্যা অতিক্রম করার মতো প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোককে জনতার শ্রেণী থেকে নাগরিকদের শ্রেণীভুক্ত করা সম্ভব হবে। তবে এই নতুন সদস্যদের অবশ্যই জনতার উত্তম অংশ থেকেই সর্বদা সংগ্রহ করা আবশ্যক। ধনিকতন্ত্রের পরবর্তী প্রকার সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। এক্ষেত্রে কেবল এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে, এর কতিপয়তন্ত্রী বা ধনিক চেহারাটি অধিকতর প্রকট হয়ে উঠেছে। কিন্তু সর্বশেষে আসছে সেই ব্যবস্থা যাকে চরম গণতন্ত্রের বরাবরেই নির্দিষ্ট করা যায়। এটি হচ্ছে সব চাইতে প্রকট ধনিকতন্ত্র বা কতিপয়তন্ত্র এবং এর সাদৃশ্য স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গেই সর্বাধিক। তাছাড়া ব্যবস্থা হিসেবে এটি নিকৃষ্টতম। এবং যেহেতু নিকৃষ্ট সে কারণে একে রক্ষা করতে হলে অধিকতর যত্নের আবশ্যক। কারণ আমাদের নিজেদের শরীরের ক্ষেত্রে যেমন, শরীর যদি সুস্থ থাকে অথবা একটা নৌকার কথা যদি বলি, নৌকাটি যদি মালিকের দ্বারা পানিতে ভাসাবার জন্য সবদিকে ঠিক থাকে, তাহলে যেমন এদের পক্ষে ধ্বংসের আশঙ্কাবিহীনভাবে কিছু আঘাত সহ্য করা সম্ভব তেমনি আবার অসুস্থ দেহ কিংবা নাজুক নৌকা সামান্য ত্রুটিতেই বিধ্বস্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম করে। একথা রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কেও সত্য। যে শাসনব্যবস্থা সবচাইতে বেশি অসুস্থ তারই সবচাইতে বেশি যত্ন আবশ্যক।

যাইহোক, সাধারণভাবে বললে, একটি গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে বড় আকারের জনসংখ্যা একটি রক্ষাকবচ। কারণ সংখ্যার ভার গণতন্ত্রী ন্যায়কে রক্ষা করে এবং কোনো বিশেষ ব্যক্তির উপর জোর দেওয়ার প্রবণতা রোধ করে। কিন্তু একটি ধনিকতন্ত্র নিজের নিরাপত্তা কেবল সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমেই রক্ষা করতে পারে।

সপ্তম অধ্যায়

জনসাধারণের মধ্যে জীবিকাগত শ্রেণীভাগ

জনসধারণের মধ্যে আমরা চারধরনের লোক দেখতে পাই : জমি কর্ষণকারী, দৈহিক-শ্রমজীবী, ব্যবসায়ী এবং অপরের দ্বারা নিযুক্ত লোক। সৈন্যবাহিনীকেও চারভাগে ভাগ করা যায় : অশ্বারোহী বাহিনী, অস্ত্রধারী পদাতিক বাহিনী বা 'হপলাইট' হাল্কা অস্ত্রধারী বাহিনী এবং নৌবাহিনী। কাজেই যে রাষ্ট্র অশ্বপালনের উপযুক্ত সে রাষ্ট্রে ধনিক বা কতিপয়তন্ত্র যে মজবুত থাকে, এ কথা বলা যায়। কারণ, এমন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নির্ভর করে অশ্বারোহী বাহিনীর শক্তির উপর। এবং অশ্বপালনও কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব যাদের বৃহৎ আকারের চারণ ক্ষেত্র আছে। আর একপ্রকার ধনিকতন্ত্র আছে যার বিস্তার ঘটে হপলাইটদের ভূখণ্ডে। এখানে দরিদ্র লোকের চাইতে ধনবানগণের হাতেই অস্ত্র রক্ষিত থাকে। কিন্তু হাল্কা অস্ত্রধারী বাহিনী এবং নৌবাহিনীর কথা বললে বলতে হয় যে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই এদের বৈশিষ্ট্য। এবং বাস্তবে যেখানে জনতার এই অংশই প্রধান হয়ে দাঁড়ায় সেখানে লড়াই বাঁধলে ধনবানরাই বেকায়দায় পতিত হয়। (এরূপ দেখা গেছে হাল্কা অস্ত্রের ব্যবস্থার দ্বারাই জনতা ধনবানদের উপর প্রাধান্য লাভ করেছে। তাদের হাল্কা অস্ত্রপাতি এবং দ্রুতগতির কারণে তারা অশ্বারোহী এবং ভারী অস্ত্রধারী বাহিনীর চাইতে সুবিধাজনক অবস্থা তৈরিতে সক্ষম হয়েছে।) এই অবস্থার মোকাবেলা করতে হলে সেনাবাহিনীর অধিনায়কদের সাহায্যে অশ্বারোহী, হপলাইট এবং হাল্কা-অস্ত্রধারীদের উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করা প্রয়োজন। হাল্কা অস্ত্রধারীদের এভাবে সংগঠিত করতে অবশ্য সশস্ত্রবাহিনী বিজ্ঞ হয়ে পড়ে। কিন্তু বয়সের ক্ষেত্রে যে পার্থক্য বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বয়োকনিষ্ঠদের মধ্যে ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে তার ভিত্তিতে ধনিকদের সন্তানদের তরুণ বয়সেই হাল্কা পদাতিক বাহিনীতে শিক্ষিত করা যায় এবং পরবর্তীতে তাদের তরুণদের নিকট থেকে পৃথক করে রণক্ষেত্রের উপযুক্ত করে তোলা যায়। সরকার পরিচালনায় জনসাধারণকে অংশ দানের ক্ষেত্রে যা করা যায় তা হচ্ছে, প্রথমত : যাদের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ আছে তারা এর যোগ্য হবে (একথা পূর্বে বলা হয়েছে); দ্বিতীয়ত : থিবিস-এর অনুসরণে দৈহিক শ্রমের জীবিকা থেকে অবসর গ্রহণের একটি নির্দিষ্ট কাল পরে এরূপ লোককে সুযোগ প্রদান এবং তৃতীয়ত : মাসিলিয়ার দৃষ্টান্তের ভিত্তিতে নাগরিক এবং অনাগরিকের মধ্য থেকে সবচাইতে উপযুক্ত ব্যক্তিদের বাছাই করে শাসনে অংশ গ্রহণের সুযোগদান। আবার এটাও দেখা প্রয়োজন যে, সর্বোচ্চপদে যেমন তারাই থাকবে যারা শাসনতন্ত্রের পূর্ণ সদস্য, তেমনি এ পদকে দায়িত্ব হিসেবে তাদের গ্রহণ করতে হবে এবং এর প্রয়োজনীয় অর্থের যোগানও তাদেরই দিতে হবে। এর ফলে সাধারণ লোকেরা সরকারের সর্বোচ্চপদ লাভ না করাতে যেমন ক্ষুব্ধ হবে না তেমনি যারা নিজেরা বিরাটভাবে অর্থের যোগান দিয়ে উচ্চ পদে আসীন হয়েছে তাদের প্রতিও তাদের একটা সহানুভূতির

ভাব বজায় থাকবে। তাছাড়া এ প্রস্তাবও গ্রহণযোগ্য যে, সরকারী পদে নবাগত যারা তাদের তরফ থেকে বড় রকম ভোজদানের ব্যবস্থা করা উচিত এবং গণস্বার্থে কোনো নির্মাণ কার্যও তাদের নিজেদের অর্থের ভিত্তিতে শুরু করা আবশ্যক। কারণ, ভোজের উৎসবে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এবং তাদের নগরীতে আকর্ষণীয় স্মৃতি সৌধমালার নির্মাণকার্য দর্শন করে জনসাধারণ মুগ্ধ হবে এবং উদ্যোগী সরকারের স্থায়িত্ব তারা কামনা করবে। এর আর একটি উত্তম দিক এই যে, নির্মাণকার্যগুলি প্রখ্যাত ব্যক্তিদের বদান্যতার স্মারক হয়েও বিরাজ করবে। কিন্তু অধুনা ধনিকদের নিকট থেকে এরূপ বদান্যতার পরিচয় আর পাওয়া যায় না। বরঞ্চ এর বিপরীত দৃষ্টান্তই দেখা যায়। কারণ ধনিকগণ এখন, কেবল মুনাফার পেছনেই ছুটে চলে, সম্মানকে তারা অন্বেষণ করে না। এরূপ ধনিকতন্ত্রকে 'গণতন্ত্রের ক্ষুদ্রাকার' দৃষ্টান্ত হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

যা হোক, বিভিন্ন প্রকার গণতন্ত্র এবং ধনিকতন্ত্রকে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে এই উপায়গুলির উল্লেখ করা যায়।

অষ্টম অধ্যায়

সরকারের বিভাগসমূহের বিষয়ে

আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গেই সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যকার পার্থক্যের প্রশ্নটি আসে। প্রশ্ন হচ্ছে সরকারের কতগুলি বিভাগ প্রয়োজন এবং তাদের মধ্যে সঠিক বৈশিষ্ট্যগুলি কি? কোন্ ক্ষেত্রে এদের কার করণীয় কি হবে? এ সম্পর্কে পূর্বেও আলোচনা করা হয়েছে। একথা অবশ্য পরিষ্কার যে, নূন্যতম কিছু বিভাগ ব্যতীত কোনো রাষ্ট্রেরই অস্তিত্ব সম্ভব নয়। এবং রাষ্ট্রে উত্তম শৃঙ্খলা এবং উত্তম আচরণের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ বাদেও রাষ্ট্র চলতে পারে না। একথা ঠিক যে ক্ষুদ্রতর রাষ্ট্রে শাসনের বিভাগগুলির আকার ক্ষুদ্র হবে এবং বৃহত্তর রাষ্ট্রে এদের আকার বৃহৎ হবে। একথাও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কাজেই এদের কোন্‌টিকে কোন্‌টির সঙ্গে উপযুক্তরূপে যুক্ত করা যায় এবং কোন্ কোন্‌টিকে পৃথক রাখা আবশ্যক—এ প্রশ্নের আলোচনাও আমাদের উপেক্ষা করা উচিত নয়।

১. প্রাথমিকভাবেই যেগুলোর বিশেষ আবশ্যক সে হচ্ছে বাজারের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। এক্ষেত্রে একটা কর্তৃত্ব অবশ্যই গঠন করতে হবে যার দায়িত্ব হবে বাজারের সদাচরণ এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখা। কারণ একথা তো আমরা জানি যে রাষ্ট্রের অন্যতম আবশ্যকীয় কার্যাদির মধ্যে একটি হচ্ছে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রকার চাহিদা পূরণের জন্য দ্রব্যাদির ক্রয় এবং বিক্রয়। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্থাৎ যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ একটা যৌথ সমাজে সংঘবদ্ধ হয় সেই অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের এটাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট উপায়।

২. এর সঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রয়েছে নগরীর অভ্যন্তরে সরকারি এবং বেসরকারি পূর্তকর্ম। এ বিভাগের লক্ষ্য হবে সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা তৈরি এবং সড়ক এবং গৃহাদি নির্মাণ এবং তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। প্রয়োজনে এগুলির পুনর্নির্মাণেরও ব্যবস্থা করতে হবে। নাগরিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির সীমানাকে বিরোধ-শূন্যভাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং নগরীর শাসন বলতে আমরা যা বুঝি তার প্রয়োজনীয় সব কাজই সম্পাদন করতে হবে। এর অন্তর্গত শাখাগুলির কথাও চিন্তায় রাখা আবশ্যক। অধিবাসীদের সংখ্যা খুব অধিক হলে শাখাগুলির প্রশাসন ভিন্নভাবে করা সঙ্গত। যেমন ভিন্ন ভিন্ন দপ্তরের, ভিত্তিতে প্রাকার, পোতাশ্রয়, পানি সরবরাহ প্রভৃতি কাজগুলি নিষ্পন্ন করার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। এখানে যা বলা হল এগুলির প্রয়োজন প্রধানত নগরীর।

৩. রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বা গ্রাম অঞ্চলে অনুরূপ কর্মের জন্য পৃথক কর্মচারীদের নিযুক্ত করা যায়। এদের কাউকে আমরা কৃষিবিদ এবং কাউকে বনকর্মী বলে আখ্যায়িত করতে পারি।

৪. এই তিন প্রকার ব্যতীত রাষ্ট্রের রাজস্ব গ্রহণকারী, তার সংরক্ষণ এবং শাসনের বিভিন্ন অংশে তা বন্টনকারী দপ্তরের কথা আসে। এই দপ্তরের কর্মচারীকে আদায়কারী বা কোষাধ্যক্ষ বলে অভিহিত করা হয়।

৫. পঞ্চমত : আইনগত দলিলপত্রাদি রক্ষাকারী বিভাগেরও প্রয়োজন রয়েছে। এই দপ্তর দলিলপত্রাদিসহ নাগরিকদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিপত্র এবং আইন-আদালতের সিদ্ধান্তসমূহকেও রক্ষা করে। এই দপ্তরের উপর সকল প্রকার বিচার, দণ্ড এবং অমীমাংসিত মোকদ্দমা নথিপত্র রক্ষণের দায়িত্বও অর্পণ করা হয়। কোনো কোনো সময়ে এ দায়িত্ব বিভক্তভাবে ন্যস্ত করা হয়, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক দপ্তরের মাধ্যমেই সকল কাজ সম্পাদিত হয়। এর কর্মচারীদের মূল্যবান দলিলের রক্ষক, নিবন্ধক, লিখক প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়।

এর পরবর্তীতে আইনের সঙ্গে সম্পর্কিত আর একটি বিভাগের কথা আসে। এটি হচ্ছে নির্বাহী বিভাগ। এই বিভাগের কর্মচারীদের দায়িত্ব যেরূপ প্রয়োজনীয়, তেমনি কঠিন। বিচারালয় ঘোষিত দণ্ডকে যেমন এদের কার্যকর করতে হয় তেমনি, রাষ্ট্রের প্রাপ্য বলে ঘোষিত অর্থকে এদের আদায় করতে হয় এবং কয়েদী তথা দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দীদের আটক রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। এ কাজ অপ্রিয়। এ দায়িত্ব অসন্তোষের উৎসও বটে। এ কারণে এ দায়িত্বের কর্মচারীদের উত্তম অর্থদানের ব্যবস্থা না করা হলে লোকে হয় এ দায়িত্ব পালন করতে চাইবে না, নয়ত পালন করতে চাইবে যদি তারা স্বাধীনভাবে এবং আইনকে উপেক্ষা করে কাজ করতে পারে। অথচ এই বিভাগের কাজ খুবই প্রয়োজনীয় কাজ। অধিকার এবং ন্যায়ের ক্ষেত্রে আইনগত সিদ্ধান্ত যদি পালিত না হয় তাহলে তেমন সিদ্ধান্ত অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। আইনবিহীন সমাজে বাস করা যেমন মানুষের পক্ষে অসম্ভব, তেমনি যে সমাজে আইনকে প্রয়োগ করা হয় না সে সমাজও বাসের অযোগ্য। এ কারণে বরঞ্চ উত্তম হবে এই দায়িত্ব কোনো একক কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত না করা। দায়িত্ব দেওয়া প্রয়োজন বিভিন্ন বিচারালয়ের বিভিন্ন কর্মচারীদের উপর। এবং আদায়যোগ্য জরিমানা প্রকাশ্যে ঘোষণা করার দায়িত্বও বন্টন করে দেবার চেষ্টা করা কর্তব্য। কয়েকটি মাত্র ক্ষেত্রে, বিশেষত নতুন নিযুক্ত কর্মচারীদের পক্ষে উচিত হবে তাদের পূর্ববর্তীদের আমলে জারিকৃত জরিমানাকে আদায় করা। এবং জরিমানা ধার্যকারী এবং আদায়কারী দপ্তরের মধ্যেও পার্থক্য থাকা প্রয়োজন। বাজার দপ্তরের জরিমানা নগর পূর্ত দপ্তরের কর্মচারীগণ এবং পূর্তদপ্তরের জরিমানা ভিন্নতর কোনো দপ্তর উশুল করতে পারে। কারণ আদায়কারীদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ যতো কম হবে জরিমানা পূর্ণতর ভাবে আদায় হওয়ার তত সম্ভাবনা থাকবে। যদি একই ব্যক্তি জরিমানা ধার্য করে এবং তা আদায় করে তবে অসন্তোষ দ্বিগুণ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। মোটকথা, এক লোক সব কাজ করলে, সব লোকই, তার শত্রু হয়ে দাঁড়ায়।

এথেন্সের ন্যায় আবার এমনও দেখা যায় যে অনেক সময়ে বন্দীদের রাখার দায়িত্ব এবং দণ্ড প্রয়োগ করার দায়িত্ব একই হাতে ন্যস্ত করা হয়। এথেন্সে এই দায়িত্ব প্রাপ্তদের 'একাদশ' বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও এই দুটি দায়িত্বকে ভাগ করাই শ্রেয়। কারণ এই দায়িত্ব সর্বোত্তমভাবে নিষ্পন্ন করার দিকেই দৃষ্টি দেওয়া উচিত। কারণ যে গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা আমরা বলে আসছি বন্দীদের রাখার ব্যাপারটা সেই সকল কাজের মতোই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু উত্তম ব্যক্তিরা এরূপ দায়িত্ব বিশেষভাবে পরিহার করার চেষ্টা করে। কিন্তু অধমদের হাতে এ দায়িত্ব ন্যস্ত করা বিপজ্জনক। কারণ যে অধমদের উপর নজর রাখা অধিক আবশ্যক সে অধম অপরের উপর নজর রাখার দায়িত্বের উপযুক্ত হতে পারে না। কাজেই বন্দীদের দায়িত্বে কোনো একটি এবং স্থায়ী কর্তৃপক্ষ নিযুক্ত হওয়া উচিত

নয়। বরঞ্চ যেখানে সম্ভব সেখানে নির্দিষ্ট বছরের মেয়াদে তরুণদের উপর সামরিক কার্য এবং পাহারাদানের দায়িত্ব ন্যস্ত করা সঙ্গত। তাছাড়া এই কাজে বিভিন্নপ্রকার কর্মচারীও নিযুক্ত করা যেতে পারে।

উপরে যে দপ্তরগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে এ গুলির প্রয়োজন এবং গুরুত্ব হচ্ছে প্রথম এবং প্রধান। তেমনি আবার রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার সঙ্গে যুক্ত দায়িত্বসমূহ এবং যুদ্ধের সময়ে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে এদের সংগঠিত করার কার্য যেমন অনুরূপভাবে অত্যাবশ্যকীয় এবং মর্যাদা সম্পন্ন তেমনি এ দায়িত্ব পালনে অনেক অভিজ্ঞতা এবং বিশেষ রকমের বিশ্বাস-যোগ্যতারও প্রয়োজন। যুদ্ধ এবং শান্তি—উভয় সময়েতে নগরের প্রাকার এবং দ্বার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং সেনাবাহিনীতে আহ্বান জানানো এবং সামরিক সংগঠনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত লোক থাকা আবশ্যক। কিছু সংখ্যক রাষ্ট্রে দেখা যায় যে, এই সব দায়িত্বের জন্য পৃথক পৃথক দপ্তর সংগঠিত করা হয়। আবার অন্যসব রাষ্ট্রে এরূপ দপ্তরের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। যে রাষ্ট্রের আকার খুবই ক্ষুদ্র সে রাষ্ট্রে একটি দপ্তরই সব কাজ সমাধা করে। এই সমস্ত দপ্তরের অধিকর্তাদের প্রধান অধিনায়ক এবং সমর নায়ক প্রভৃতি আখ্যাতে অভিহিত করা হয়। যেখানে অশ্বারোহী বাহিনী, হাল্কা অস্ত্রধারী, তীরন্দাজ, নাবিক রয়েছে সেখানে এদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন অধিনায়ক তৈরি করা হয়। যেমন, 'নউআরক্ হিপারক, টেকসিআরক্ এবং প্রত্যেক পদের অধঃস্থন পর্যায়ে ক্যাপ্টেন, কর্ণেল, স্কোয়াড্রন—নেতা' ইত্যাদি ক্রমে শেষ স্তরের বাহিনী পর্যন্ত। তবে এদের সকলের দায়িত্ব দেশরক্ষার কাজেরই অন্তর্গত।

এ বিষয়টি সম্পর্কে আর থাক। পরবর্তী কথা হচ্ছে, সকল দপ্তর না হলেও যেহেতু বেশ কিছু দপ্তরকে বেশ পরিমাণ সরকারি মালিকানার সম্পদের তদারকি করতে হয় সে কারণে কোষাগার হিসাবে আর একটি দপ্তরও আবশ্যক। এর দায়িত্ব হবে ব্যয়ের বিবরণ গ্রহণ এবং তার নিরীক্ষাকরণ। অর্থগত ব্যতীত অপর কোন দায়িত্ব এ দপ্তরের থাকবে না। এই দপ্তরের কর্মচারীদের নিরীক্ষক (অডিটর) হিসাবকারী (এ্যাকাউন্ট্যান্ট) নির্ধারক (এ্যাসেসর) সংগ্রাহক (প্রোকিউরেটর) প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যে সকল দপ্তরের কথা আমরা উল্লেখ করেছি সে সকলের উপর সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী থাকবে সরকার। সরকারেরই সকল অর্থাৎ প্রথম এবং শেষ কর্তৃত্ব। অন্যকথায় যেখানে জনতা সার্বভৌম সেখানে এই সরকারই জনতার অধিবেশন আহ্বান করে এবং তাকে পরিচালনা করে। কারণ আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষকেই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে হয়। এই দপ্তরকে কোন কোন সময়ে 'পূর্ব-পরিষদ' বলেও আখ্যায়িত করা হয়। কারণ পূর্ব—ভাগে এ পরিষদ আলোচনা করে থাকে। কিন্তু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একে কেবল 'পরিষদ' বলেই অভিহিত করা হয়।

আমাদের আলোচনাতে রাজনৈতিক দপ্তরগুলোর আলোচনা সমাপ্ত হয়েছে, একথা বলা যায়। কিন্তু এর পরে ধর্মীয় ব্যাপারের প্রশ্নটি রয়েছে। তার জন্যও একটি দপ্তর আবশ্যক। এই দপ্তরের কর্মচারীবৃন্দ হচ্ছে পুরোহিত এবং পবিত্র সম্পত্তির জিম্মাদার। তাদের দায়িত্ব হচ্ছে ধর্মীয় গৃহাদির রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংস্কার সাধন। এছাড়াও দেবতাদের পূজাদানের প্রয়োজনীয় কার্যাদিও এদের করতে হবে। নগরী ক্ষুদ্র হলে এ সকল দায়িত্ব একজন কর্মচারীর পক্ষেও করা সম্ভব। কিন্তু অনেক সময়ে পুরোহিতের দায়িত্ব থেকে পৃথক করে একাধিক কর্মচারী, যথা বলিদানকারী, মন্দির-অভিভাবক, ধর্মীয় তহবিলের কোষাধ্যক্ষ প্রভৃতির উপরও বিভিন্ন দায়িত্ব ন্যস্ত করতে দেখা যায়। এই সঙ্গে সম্পর্কিত হচ্ছে সাধারণ

বলিদান অর্থাৎ সমগ্র রাষ্ট্রের বেদিতে উৎসর্গজনিত মর্যাদার প্রতিষ্ঠিত এবং সরকারিভাবে পুরোহিতদের উপর যে দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় নি তেমন সাধারণ বলিদান অনুষ্ঠানের তদারকী দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনকারীদেরও রাজা, আরকণ, প্রাইটেনি—প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করা হয়।

সরকারের পক্ষে অবশ্য-করণীয় দায়িত্বসমূহের একটি তালিকা এভাবে তৈরি করা যায়। এগুলিকে পুনরায় আমরা নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করতে পারি : ধর্ম, প্রতিরক্ষা, আয় এবং ব্যয়, ব্যবসায়, নগরী এবং নগরীর বন্দর, গ্রামাঞ্চল, আইনগত ব্যবস্থাপনা, চুক্তির রেজিস্ট্রীকরণ, কারাগার, এবং বিচারালয়ের রায় কার্যকরকরণ হিসাব নিরীক্ষণ এবং পর্যালোচনা, দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের জবাবদীহি এবং সর্বশেষে রাষ্ট্রীয় সকল বিষয়ে আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ। যে সকল নগরীর রুচি এবং সংস্কৃতির মান সাধারণ মানের উর্ধে এবং যেখানে সুশৃংখল আচরণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয় সে সকল নগরীর কিছু কিছু দায়িত্ব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে মেয়েদের উপর নিয়ন্ত্রণ, শিশুদের পালন, আইন অনুসরণের প্রতি দৃষ্টি দান এবং স্বাস্থ্যাগারের পরিচালনা। এ ছাড়াও এর সঙ্গে যুক্ত করা যায় ক্রীড়া এবং নাট্য প্রতিযোগিতা এবং অপর কোনো গণপ্রদর্শনীকে। এদের মধ্যে কিছু কিছু দপ্তর বা দায়িত্ব, যথা শিশুদের উপর এবং মেয়েদের উপর নিয়ন্ত্রণ—এগুলি মোটেই গণতান্ত্রিক নয়। কারণ দরিদ্রদের দাস না থাকাতে তারা শিশু এবং মেয়েদের তাদের পরিচারক হিসেবে ব্যবহার করতে বাধ্য হয়। যে তিনটি প্রধান বিভাগের কথা বলা হয়েছে, যেগুলিকে অনেকে সার্বভৌম ক্ষমতার বন্টনের জন্য ব্যবহার করে, তাদের মধ্যে আইন তদারকের কর্মচারীগণ, পূর্ব-পরিষদ, পরিষদ এবং আইনকর্মচারীগণকে অভিজাততান্ত্রিক, পূর্ব-পারিষদগণকে ধনিক বা কতিপয়তন্ত্রী এবং পরিষদকে গণতান্ত্রিক বলা যায়। যা হোক, সকল প্রকার দপ্তরেরই একটি বিস্তারিত ধারণা আমরা দেবার চেষ্টা করেছি।

সপ্তম পুস্তক

প্রথম অধ্যায়

সর্বোত্তম রাষ্ট্রের প্রশ্নে বিবেচ্য বিষয়

[পরবর্তী সপ্তম এবং অষ্টম—দুটি পুস্তক যেমন সম্পর্কযুক্ত তেমনি পূর্ববর্তী ছ'টি পুস্তক থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন বলে বোধ হয়। গ্রীসীয় চিন্তাবিদদের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল : আদর্শ রাষ্ট্র কি? এই বিষয়টির উপরই এই পুস্তক দু'খানিতে আমরা একটি আলোচনা পাই। কিন্তু আলোচনাটি অসমাপ্ত। আলোচনাটির সূচনা ঘটেছে সর্বোত্তম জীবনের আলোচনা দিয়ে। কারণ সর্বোত্তম শাসন ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য হবে নাগরিকদের জন্য সর্বোত্তম জীবনব্যবস্থা তৈরি করা। বিষয়টি যেমন বহুল আলোচিত তেমনি এর কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়াও সম্ভব নয়। এ্যারিস্টট্ল-এর 'নীতিশাস্ত্র' এবং 'রাজনীতি' তথা 'পলিটিক্স' গ্রন্থদ্বয় এই আলোচনাতেই পূর্ণ। শুধু তাই নয়, এর 'অতিরিক্ত আলোচনা' হিসেবে এ্যারিস্টট্ল যে সকল আলোচনার উল্লেখ করেছেন তার মধ্যেও এর আলোচনা রয়েছে। এক্ষেত্রে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, এ্যারিস্টট্ল একটি আদর্শ কিংবা ত্রুটিহীন রাষ্ট্রের সংজ্ঞা দানের চেষ্টা করলেও, তিনি তাঁর আলোচনাকে সম্ভবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখারই আভাস দেন। প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক'-এ এবিষয়ে যে পদ্ধতি এবং দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন, এ্যারিস্টট্ল-এর পদ্ধতি এবং দৃষ্টিভঙ্গী তা থেকে বিশেষভাবেই ভিন্ন। বরঞ্চ এ আলোচনার অধিকতর সাদৃশ্য রয়েছে প্লেটোর 'আইন' বা 'লজ' গ্রন্থের সঙ্গে। নিম্নের তিনটি অধ্যায়কে আলোচনার ভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করা যায়।]

সর্বোত্তম রাষ্ট্রের বিষয়টিকে যদি আমরা যথার্থই উপযুক্তভাবে আলোচনা করতে চাই তাহলে আমাদের প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে, কাকে আমরা সব চাইতে কাম্য জীবন বলে গণ্য করব। কারণ এটি যদি আমরা না জানি, তাহলে আমাদের অন্বেষণের যেটি লক্ষ্য অর্থাৎ সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা, সেটি দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠবে। এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে, যারা আপন সম্পদের ভিত্তিতে একটি সুশৃংখল সমাজে বাস করে, কিছু ব্যতিক্রম বাদে, তাদের জীবনই সর্বোত্তম। কাজেই প্রথম আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে হবে যে, সকল মানুষের জন্য কিংবা প্রায় সকল মানুষের জন্য সবচাইতে কাম্য জীবন আমরা কাকে বলব। তারপর আমাদের ঠিক করতে হবে যে, এই জীবন কিংবা অপর কোন জীবন সাধারণভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবে মানুষের জন্য সর্বোত্তম কিনা।

আমার বিবিধ রচনাসহ অন্য রচনাতে আমি উত্তম জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। বর্তমানে সেই আলোচনাকে ব্যবহার করা যায়। একটা বিষয়ে অবশ্যই কারুর আপত্তি হবে না যদি আমরা বলি যে, জীবনকে সুখী করার জন্য তিনটি উপাদান অত্যাবশ্যকীয়। এগুলি হচ্ছে, আমাদের দৈহিক অস্তিত্ব, আমাদের বুদ্ধিগত এবং নৈতিক

গুণাবলি এবং এর বহির্ভূত বিষয়াবলী। যে লোকের আদৌ সাহস অথবা আত্মসংযম অথবা সততা বা বুদ্ধি নেই, যে একটি মক্ষিকার গুঞ্জনেও আতঙ্কিত হয়, যে পানাহারে নিজের কামনার তৃপ্তি বিধানে অসংকোচ, যে সামান্য লাভের বিনিময়েও ঘনিষ্ঠতম বন্ধুর ধ্বংস সাধনে দ্বিধাহীন এবং যার মন শিশুর মনের মত অস্থির কিংবা পাগলের মনের মত বিভ্রান্ত তেমন লোককে নিশ্চয়ই কেউ সুখী বলে গণ্য করবে না। কিন্তু এই তিনটি বিষয়ে একটি সাধারণ ঐক্যমত থাকলেও এদের পারস্পরিক গুরুত্ব কিংবা এদের কোন্ গুণটির পরিমাণ কি হওয়া উচিত এবং কোন্ পরিমাণকে আধিক্য বলা হবে,—এ বিষয়ে মতপার্থক্যের অভাব নেই। এজন্য অনেকে মনে করে যে, দক্ষতা, চরিত্র এবং উত্তমতার ক্ষেত্রে কিছু পরিমাণই যথেষ্ট, কিন্তু অর্থ সংগ্রহ, ক্ষমতা, সম্পদ, খ্যাতি—প্রভৃতির ক্ষেত্রে আর সীমা বলে কিছু থাকার প্রয়োজন নেই।

এদের কাছে কেবল জবাব দুভাবে দেওয়া যায় : প্রথমত এ সকল বিষয়ে আমরা কেবল যদি বাস্তব সত্যকে পর্যবেক্ষণ করি তাহলেই একটি স্থির সিদ্ধান্তে আসা আমাদের পক্ষে সহজ হয়। কারণ, মানুষ দ্রব্যসামগ্রীর দ্বারা উত্তম গুণকে অর্জন কিংবা রক্ষা করতে পারে না। বরঞ্চ ব্যাপারটি এর বিপরীত। এবং সুখী জীবনযাপনের ক্ষেত্রেও, মানুষ তাকে আনন্দ ভোগ কিংবা গুণের অর্জন,—যে হিসাবেই দেখুক না কেন, একথা সত্য যে, সুখী জীবন অধিকতর সহজে লাভ করে তারাই যারা বুদ্ধি এবং চরিত্রের গুণে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। এবং যাদের আর্থিক সম্পদ প্রয়োজনের অধিক আছে কিন্তু অপরাপর গুণে যাদের ঘাটতি রয়েছে তাদের চাইতে যারা মিতপরিমাণে সম্পদবান তারাই যে অধিকতর সহজভাবে সুখী হতে পারে, একথাও সত্য। দ্বিতীয়ত বিষয়টিকে তত্ত্ব এবং অভিজ্ঞতা—উভয় দিক থেকেই দেখা যায়। এবং সেভাবেও একই সিদ্ধান্তে আমাদের উপনীত হতে হবে। যেগুলিকে আমরা বৈষয়িক দ্রব্যসামগ্রী বলি সেগুলিকে কতগুলি হাতিয়ারের সঙ্গে তুলনা করা চলে। হাতিয়ার যেমন কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার এবং সে কারণেই তার সার্থকতা তেমনি সম্পদ হচ্ছে হাতিয়ার বিশেষ এবং হাতিয়ারের মতোই তার একটা সীমা আছে। কেউ অবশ্য প্রচুর পরিমাণে সম্পদ সংগ্রহ করতে পারে—কিন্তু সেই প্রাচুর্য তার কোন উপকার সাধন না করে বরঞ্চ এ সম্পদ তার মালিকের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। কিন্তু মনের গুণাবলি তার প্রত্যেকটিই আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় এবং যে কোন গুণের যত অধিক আমরা অর্জন করতে পারব, সে গুণ ততই আমাদের সার্থক করে তুলবে। (এক্ষেত্রে আমরা সার্থক বা 'প্রয়োজনীয়' উভয় কথাই ব্যবহার করতে পারি।) কাজেই সাধারণভাবে বললে আমাদের বলতে হয় যে, একটি বিষয়ের সঙ্গে অপর একটি বিষয়ের সর্বোত্তম সম্পর্কটি নির্ধারিত হয় উভয় বিষয়ের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক দ্বারা। কাজেই দ্রব্যসামগ্রী এবং দেহ, এদের উভয়ের চাইতে যেহেতু আমাদের মন হচ্ছে শ্রেয়, সে কারণে এর উত্তম অবস্থা অবশ্যই দেহ এবং বৈষয়িক দ্রব্য থেকে অধিকতর উত্তম হবে। তাছাড়া আমাদের মনের জন্যই এই সকল গুণের যেমন প্রয়োজন, তেমনি সুস্থ মনের সকল মানুষের পক্ষে উচিত হচ্ছে এই গুণের কামনা করা। গুণের নির্বাচনে অগ্রাধিকারের এই ক্রমটি পরিবর্তন করা ভুল হবে।

গোড়াতে এ ব্যাপারে তাহলে আমরা একমত হতে পারি যে, আমরা যে কেউ সুখী হই সে পরিমাণেই যে পরিমাণে আমরা অর্জন করতে পারি নৈতিক এবং মনের গুণসমূহকে এবং যে পরিমাণে এই গুণের ভিত্তিতে আমরা আমাদের কার্যসমূহকে নিষ্পন্ন করতে সক্ষম হই। বিধাতার নিজের মধ্যেই আমরা এই সত্যের সাক্ষাত পাই। বিধাতা যে শান্ত এবং

স্থির সে এ কারণে নয় যে তিনি বৈষয়িক সম্পদে সমৃদ্ধ—সে তাঁর আপন প্রকৃতির কারণেই। আর এ জন্যই আমরা বলব, সৌভাগ্য এবং সুখ অভিন্ন বিষয় নয়। কারণ মনের বাইরের জগতের যে দ্রব্যনিচয় তার অর্জন নির্ভর করে বাইরের জগতের ঘটনা এবং সৌভাগ্যের উপর। কিন্তু কোন মানুষই ন্যায়বান এবং নীতিবান হতে পারে না কোন দৈব ঘটনা বা সৌভাগ্যের কারণে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন একথা সত্য, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তেমনি একথা সত্য। উত্তম জীবনাচরণের রাষ্ট্র হচ্ছে সুখী রাষ্ট্র। যারা উত্তমকার্য সাধন করে না তাদের পক্ষে উত্তম হওয়া সম্ভব নয়। এবং ব্যক্তি বা নগরী কেউই ন্যায় ও বুদ্ধি ব্যতীত উত্তমকার্য সাধন করতে পারে না। সাহস, ন্যায়বোধ, এবং প্রজ্ঞার পরিমাণের ভিত্তিতেই যেমন কোন ব্যক্তিকে আমরা ন্যায়বান, প্রাজ্ঞ এবং বুদ্ধিমান বলে গণ্য করি তেমনি একটি জাতিও তার সাহস, ন্যায়বোধ এবং প্রজ্ঞার কারণে সাহসী, ন্যায়বান কিংবা বুদ্ধিমান বলে পরিচিত হয়।

ভূমিকাতে এই মন্তব্যগুলিই যথেষ্ট। কিছু না বলে যেমন আমরা শুরু করতে পারছিলাম না, তেমনি প্রয়োজনীয় সবকিছু বলাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সে কাজ ভিন্নতর সময়ের কাজ। বর্তমানে আমাদের মূল ভিত্তি হবে এই যে, ব্যক্তি এবং রাষ্ট্র উভয়ের জন্য উত্তম জীবন হচ্ছে সেই জীবন যে জীবনে যেমন ন্যায় তেমনি সেই ন্যায়কে বাস্তবে প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয় সম্পদগত সঙ্গতি রয়েছে। আমাদের এ অভিমতের যারা প্রতিবাদী আছেন তাঁদের বক্তব্যের জবাব ভবিষ্যতের জন্য মুলতবী রেখে আমরা বর্তমানের আলোচনাটি নিয়ে অগ্রসর হতে চাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যক্তির সুখ এবং রাষ্ট্রের সুখের প্রশ্ন

[কিন্তু এটি লক্ষণীয়, গোড়াতে যে প্রশ্নটি তোলা হয়েছিল—অর্থাৎ সবচাইতে কাম্যজীবন কি, সে প্রশ্নের কোন বিস্তারিত জবাব এখনো আমরা পাইনি। বরঞ্চ আলোচনার মুখবন্ধটিই চলছে এবং বর্তমান পুস্তকের ৩য় অধ্যায় পর্যন্ত এই ভূমিকামূলক আলোচনারই আমরা সাক্ষাৎ পাচ্ছি। কিন্তু ব্যক্তির জীবনে যেটি কাম্য, রাষ্ট্রের জীবনে সেটি কাম্য কিনা এ প্রশ্নের জবাব নির্দিষ্টভাবেই দেওয়া হয়েছে। ন্যায় তথা উত্তম জীবন থেকে সুখ যে অবিচ্ছেদ্য—সে কথা এ্যারিস্টট্‌ল স্পষ্টভাবেই বলছেন। এথিকস বা নীতিশাস্ত্রের মধ্যেও মূল আলোচ্য বিষয় ছিল সুখ। নীতিশাস্ত্রের গোড়াতেই সুখের সংজ্ঞা হিসেবে বলা হয়েছিল যে, 'সুখ হচ্ছে ন্যায়ের ভিত্তিতে মনের কর্ম।' কিন্তু আরো প্রশ্ন করা হচ্ছে, সুখী জীবন কি কর্মময় কিংবা সে ধ্যানমগ্ন? এবং এমন মানুষও আছে যারা সীমাহীন ক্ষমতার জীবনের প্রশংসায় অকৃপণ—ব্যক্তির জীবনে না হলেও রাষ্ট্রীয় জীবনে এটাকেই তারা আরাধ্য বলে বিবেচনা করে।]

এবার আমাদের আলোচনা করতে হয়, ব্যক্তি এবং নগরী (রাষ্ট্র)—এদের উভয়ের ক্ষেত্রে সুখের অর্থ কি এক? এখানেও জবাবটিতে দ্বিধা নেই যে, সকলে স্বীকার করে, এদের উভয় ক্ষেত্রে সুখের অর্থ এক। কারণ, ব্যক্তি হিসেবে যারা মনে করে উত্তম জীবন সম্পদের উপর নির্ভর করে তারা অনুরূপভাবে বলবে, সমগ্র নগরীটি যদি সম্পদবান হয় তাহলে নগরীটি সুখী হবে। এবং যারা একজন স্বৈরশাসকের জীবনকেই সব চাইতে সুখী মনে করে তারা বলবে এরূপ শাসক যত বড় রাষ্ট্রের শাসক হবে সে তত বেশি সুখী হবে। তেমনি যে ন্যায়কে সুখের ভিত্তি বিবেচনা করে সেও অধিকতর ন্যায়বান একটি নগরীকে অধিকতর সুখী নগরী বলে গণ্য করবে। এরূপ অভিমতের পরেও দুটি প্রশ্নের জবাবের আবশ্যক হয় : (১) কোন্ জীবনকে কাম্য বলা হবে : নগরীর সকল কার্যে অংশগ্রহণকারী একজন নাগরিকের জীবন কিংবা নগরীতে বাসকারী তেমন একজন বৈদেশিকের জীবন যে নগরীর রাজনৈতিক জীবন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছে? (২) দ্বিতীয়ত : কোন্ শাসনব্যবস্থাকে আমরা কাম্য বলব এবং রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থার মধ্যে কোন্‌টি শ্রেয় : রাষ্ট্রের সকলে কিংবা কোন অধিকসংখ্যকই শাসনের সকল কার্যে অংশ গ্রহণ করবে? এই প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম প্রশ্নটি ছিল ব্যক্তির ইচ্ছার প্রশ্ন। কিন্তু এই প্রশ্নটির সম্পর্ক রয়েছে রাজনৈতিক তত্ত্ব এবং নীতির সঙ্গে। এই প্রশ্নটি সম্পর্কে আমরা এবার আলোচনা করতে চাই। অপর প্রশ্নটি প্রসঙ্গক্রমে এসেছিল। কিন্তু এটি হচ্ছে আমাদের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়।

একথা অবশ্য বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা আমরা তাকেই বলব

যে ব্যবস্থায় যে কোন ব্যক্তি সুখী জীবন যাপন করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে—নাগরিকের জীবন দায়-দায়িত্বহীন, যার জীবন ধ্যান তথা দর্শনে নিমগ্ন তার জীবন কি একজন সক্রিয় নাগরিকের জীবনের চাইতে শ্রেয়? এক্ষেত্রে দ্বিমতের অবকাশ রয়েছে। যারা ন্যায়ের জীবনকে সবচাইতে কাম্য বলেন তারাও হয়ত জবাবটিতে একমত হবেন না। প্রাচীন কিংবা আধুনিক কাল—সবকালেই দেখা যায় যে, যারা ন্যায়কে অর্জন করতে চেয়েছে তারা রাজনৈতিক এবং দার্শনিক—এই দুই প্রকার জীবনকেই মাত্র সম্ভব জীবন বলে গণ্য করেছে। এবং এ দুই এর কোন্টি যথার্থ সে জবাব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এ দুইএর যেটিকে আমরা যথার্থ মনে করব, সুস্থ মানুষ হিসেবে সেই শ্রেয়কে লাভ করার জন্য আমাদের অবশ্যই তৎপর হতে হবে। কথাটি যেমন ব্যক্তি তেমনি নাগরিক—সমাজ তথা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সত্য। অনেকে মনে করে, অপর রাষ্ট্রের উপর স্বৈরশাসন কায়েম করা অন্যায়। কিন্তু কাজটি যদি দক্ষতার সঙ্গে সমাধা করা যায় তবে তাতে অন্যায়ের কিছু থাকে না। অবশ্য এমন দক্ষতার অর্থ শাসকের অবকাশ এবং আরামের ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি পড়া। আবার অনেকে মনে করে, এটি কিছু খারাপ নয়। কারণ কর্ম নয়, রাজনীতিকের জীবনই হচ্ছে একমাত্র সার্থক জীবন। এবং উত্তম কাজের সুযোগ যেমন ব্যক্তির থাকে তেমনি রাষ্ট্রীয় কার্যে যারা অংশগ্রহণ করে তারাও উত্তম জীবন যাপন করতে পারে। এ অবশ্য একটি অভিমত। কিন্তু এমন মানুষও আছে যারা মনে করে, চরম সুখের জীবন হচ্ছে চরম স্বৈরশাসকের জীবন। এবং অনেক নগরীর আইন এবং শাসনের বিঘোষিত লক্ষ্য হচ্ছে সেই নগরীকে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের উপর অধিপত্য বিস্তারে সক্ষম করে তোলার লক্ষ্য।

বেশিরভাগ রাষ্ট্রর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাদের শাসনগত আইন কোন নির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে গঠিত না হলেও তাদের সকল আইনের মূল লক্ষ্য থাকে অপরের উপর অধিপত্য বিস্তারের। যেমন স্পারটা এবং ক্রিটের শিক্ষাব্যবস্থা এবং আইনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যুদ্ধের লক্ষ্যে একটি সামরিক শক্তি হিসেবে দেশকে তৈরি করা। এবং গ্রীসীয় জাতিসমূহের বাইরে সীদিয়, পারসীয়, থ্রেসীয় এবং কেল্ট—প্রভৃতি যেসব সমৃদ্ধিপূর্ণ বলশালী রাষ্ট্র আছে তারা সব সময়েই সামরিক শক্তির উপর বিশেষ জোর স্থাপন করেছে। কার্থেজের ন্যায় এমন রাষ্ট্র দেখা যায় যেখানে আইন রচিত হয় সামরিক সাহস বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্য নিয়ে। কার্থেজের অধিবাসীগণ এমন হস্তবেষ্টনী ধারণ করে যাতে কত সংখ্যক সামরিক অভিযান তারা অংশগ্রহণ করেছে সে সংখ্যা উৎকীর্ণ থাকে। ম্যাসিডনিয়াতে একটি নিয়ম ছিল যে, তার নাগরিকদের প্রথম শত্রুসেনা হত্যা না করা পর্যন্ত একটি গলাবন্ধ ধারণ করতে হবে। সিদিয়াতে ভোজের উৎসবে বিতরিত সুরার পাত্র থেকে কেবল তারাই পান করতে পারত যারা অন্তত একজন শত্রুসেনাকে হত্যা করেছে। আইবেরিয়ার (স্পেন) অধিবাসীগণ একটি সামরিক জাতি। তাদের যোদ্ধাদের সমাধির উপর এমন লৌহফলক প্রোথিত থাকত যার গায়ে নির্দেশ থাকত কত সংখ্যক শত্রুসেনাকে এই যোদ্ধা হত্যা করেছে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে আমরা এরূপ বিভিন্ন আইন এবং প্রথার সাক্ষাৎ পাই।

কিন্তু ব্যাপারটিকে যদি আমরা কিছুটা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করি তাহলে অবশ্যই আমরা বুঝতে পারব যে, কোন রাষ্ট্র-শাসকের লক্ষ্য কেবল যদি অপরকে শাসন এবং অধীনস্থ করার চিন্তাতে সীমাবদ্ধ থাকে তবে তা একেবারেই যুক্তিহীন হয়ে দাঁড়ায়। যে কাজ আদতেই আইনসঙ্গত নয় তাকে আমরা কেমন করে রাষ্ট্রীয় প্রজ্ঞা কিংবা বিধান বলে অভিহিত করতে পারি? যে কোন প্রকারে, ন্যায়গতভাবে নয়, অন্যায়ভাবে শাসন করা

আদপেই বেআইনি। কারণ কেবল শক্তি থাকলেই অধিকার থাকে না। জীবিকার অন্যান্য ক্ষেত্রে শক্তির উপর এই জোরদানের প্রবণতা দেখা যায় না। যেমন চিকিৎসক কিংবা জাহাজের ক্যাপ্টেন—এদের কারুর উদ্দেশ্য থাকে না রুগী কিংবা যাত্রী কারুর উপর শক্তি প্রয়োগের কিংবা তাদের প্রভাবিত করার। এটা অবশ্য ঠিক যে, অধিকাংশ মানুষই শাসন এবং আধিপত্যকে এক বলেই গণ্য করে। তারা ব্যক্তি হিসেবে নিজেদের উপর যে আচরণকে কাম্য মনে করে না তাকেই অপরের উপর জবরদস্তি চাপিয়ে দিতে বিবেকের কোন দংশন বোধ করে না। নিজেদের স্বার্থের ক্ষেত্রে এবং নিজেদের মধ্যে আলাপে তারা ন্যায্য শাসনের কথা বলে। কিন্তু অপরের সঙ্গে আচরণের ক্ষেত্রে কোন্‌টি ন্যায্য এবং কোন্‌টি অন্যায্য—এ চিন্তায় তারা আর মোটেই বিব্রত হয় না। অবশ্য এ কথা স্বীকার করা যেতে পারে যে, প্রকৃতি কাউকে হয়ত জোরের ভিত্তিতে শাসিত হওয়ার জন্য তৈরি করেছে আবার কাউকে ভিন্নতরভাবে তৈরি করেছে। তাই যদি হয় তাহলে আমাদের স্বৈরশাসনের লক্ষ্য তেমন মানুষই হওয়া উচিত প্রকৃতি যাদের তেমন করে তৈরি করেছে। পশুর ক্ষেত্রেও আমরা শিকার করি সেই পশুকেই যারা যেমন বন্য তেমনি শিকারের উপযুক্ত এবং আমাদের খাদ্য হওয়ার যোগ্য। একটি নগরীর অভ্যন্তরীণ শাসন যদি উত্তম হয়, তাহলে অবশ্যই সে নিজের আইনের ভিত্তিতে সুখী হতে পারে। নিজের উত্তম আইনের ভিত্তিতে, অপর থেকে বিচ্ছিন্নভাবেও, একটি নগরী তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে। নিজেদের বিরুদ্ধে কোন শত্রুর যখন পরিকল্পনা নেই তখন এর শাসনের লক্ষ্য যুদ্ধ কিংবা শত্রুর পরাজয় হবারও কোন কারণ নেই। কাজেই এখানে সিদ্ধান্ত হচ্ছে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি খারাপ নয়। কিন্তু সে প্রস্তুতির লক্ষ্য হবে আত্মরক্ষা, আক্রমণ নয়। যিনি উত্তম আইনবিদ, তাঁর কর্তব্য হচ্ছে নগরী, তার গোত্র এবং অন্যান্য প্রত্যেকটি জনসংস্থাকে পর্যবেক্ষণ করা। তাঁর চিন্তা হবে, কি প্রকারে সকলকে নগরীর উত্তম জীবনে অংশগ্রহণ করানো যায় এবং তাদের সুখের ব্যবস্থা করা যায়। এজন্য সর্বত্র যে এক নিয়ম প্রযুক্ত হবে, এমন নয়। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নিয়ম গ্রহণ করা সম্ভব। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের যদি অস্তিত্ব থাকে তবে আইনগত একটি কাজ হবে স্থির করা বিশেষ কোন্ প্রতিবেশীর প্রতি নগরীর দৃষ্টিভঙ্গী কি হবে এবং প্রত্যেকের জন্য উপযুক্ত আচরণবিধি কি হবে। তবে সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থার আসল লক্ষ্য কি হবে, এ প্রশ্নটির উপযুক্ত আলোচনা পরবর্তী পর্যায়ে করা যাবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ন্যায়বানকে কি দায়িত্বপালন করতে হবে না?

আমরা এবার তাঁদের কথা বলব যাঁরা ন্যায়যুক্ত জীবনকে সব চাইতে কাম্য গণ্য করলেও কি উপায়ে সে জীবন অর্জন করা হবে সে সম্পর্কে পৃথক মত পোষণ করেন। অনেকে আছেন যাঁরা জনজীবনে কোন দায়িত্ব পালনের প্রস্তাবকে একেবারেই নাকচ করে দেন। তাঁরা মনে করেন স্বাধীন নাগরিকের সবচাইতে কাম্য জীবনের সঙ্গে রাজনীতিকের জীবন সঙ্গতিপূর্ণ নয়। আবার অনেকে আছেন যাঁরা মনে করেন সক্রিয় রাজনীতিক জীবন হচ্ছে সর্বোত্তম জীবন কারণ যে লোক কোন কর্তব্য সম্পাদন করে না সে কোন কিছু উত্তম সাধন করতে পারে না। এঁদের মতে সুখ এবং সৎকার্য সমার্থক। এঁদের উভয়ের কাছে আমাদের জবাব হচ্ছে : 'আপনারা উভয়েই যেমন কিছুটা ঠিক, তেমনি কিছুটা বেঠিক।' একথা যথার্থ যে, একজন স্বৈরশাসকের জীবনের চাইতে একজন স্বাধীন নাগরিকের জীবন শ্রেয়। একজন দাসকে দাস হিসেবে গণ্য করতে এবং তাকে নির্দিষ্ট কোন কাজের আদেশ দানে মহৎ বা ন্যায়গত কাজের কিছু নেই। কিন্তু আদেশ দান মাত্রই স্বৈরাচার হবে, এমন মনে করার কারণ নেই। যাঁরা এরূপ মনে করেন, তাঁরা ভুল করেন। স্বাধীন নাগরিকের উপর শাসন এবং দাসের উপর শাসনের মধ্যকার পার্থক্য স্বাধীনতা এবং দাসত্বের মধ্যকার প্রকৃতিগত পার্থক্যের মতই বৃহৎ। এ পার্থক্যের কথা জোরের সঙ্গেই ইতিপূর্বে একস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে কর্মহীনতাকে আমরা কর্মময়তার চাইতে মূল্যবান বিবেচনা করতে পারিনে। কিছু না করা কিছু করার চাইতে মূল্যবান, এমন কথা বলা যায় না। কারণ সুখ বলতে কিছু করাকেই বুঝায়। এবং যারা উত্তম এবং জ্ঞানী তাঁদের কাজের লক্ষ্য হচ্ছে কিছু ফল হিসেবে তৈরি করা।

এখানে অবশ্য একথা বলা হতে পারে যে, বিষয়টির সংজ্ঞা এভাবে দাঁড় করাবার অর্থ দাঁড়াবে, সর্বাধিক ক্ষমতাকে সর্বোত্তম বলা। কারণ সর্বাধিক ক্ষমতাই সর্বোত্তম কাজ করতে পারে। কাজেই শাসনের ক্ষমতা যার আছে তার পক্ষে সে ক্ষমতা অপরের কাছে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। তার প্রতিদ্বন্দ্বী, পিতা কিংবা বন্ধু কিংবা অপর যেই হোক না কেন তার বিবেচনা না করে তার উচিত হবে ক্ষমতাকে ধারণ করে রাখা। সর্বাধিক যখন সর্বোত্তম তখন সর্বাধিকের কামনা দূষণীয় নয়। কথাটার মধ্যে কিছু সত্য থাকতে পারে। তেমন ক্ষেত্রে আমাদের মনে করতে হবে যে, সর্বোত্তম অবস্থা হচ্ছে বলপ্রয়োগ এবং দস্যুতার অবস্থা। কিন্তু এমন চিন্তা করা ঠিক নয়। এবং এ অনুমান ভুল। কারণ, নাগরিক হিসেবে যে মানুষের ক্ষমতা অপরের উপর স্ত্রীর উপর স্বামীর ক্ষমতা কিংবা সন্তানের উপর পিতার ক্ষমতার কিংবা দাসের উপর প্রভুর ক্ষমতার অধিক নয়, তার কার্য সর্বদাই উত্তম হবে, এমন নিশ্চয়তা কি আছে? কাজেই উত্তমের পথ থেকে যে ভ্রষ্ট হবে, তার পক্ষে তার ভুলের পুরো প্রতিবিধান করা কখনো সম্ভব হবে না। কাজেই যারা সমান তাদের জন্য উত্তম

হচ্ছে পর্যায়ক্রমে দায়িত্বের বদল করা। সমানের ক্ষেত্রে অসাম্য এবং প্রভুত্ব প্রদান করা সদৃশ মানুষদের বিষদৃশ দায়িত্ব প্রদানের মতোই প্রকৃতির স্বভাববিরুদ্ধ। এবং প্রকৃতির যা স্বভাববিরুদ্ধ তা কখনো উত্তম হতে পারে না। কেবলমাত্র কোন লোক যখন ন্যায় এবং দক্ষতার ক্ষেত্রে অপরের চাইতে শ্রেষ্ঠ তখনি মাত্র অপরের পক্ষে তাকে মান্য করা এবং তাকে সেবা করা ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু যে কথাটি স্মরণ রাখা আবশ্যক সে হচ্ছে এই যে, উত্তমতাই যথেষ্ট নয়। উত্তমতাকে কার্যে পরিণত করার ক্ষমতারও আবশ্যক।

আমাদের এই কথা যদি যথার্থ হয় এবং সুখকে যদি আমরা উত্তম কার্যের সমার্থক বলে মনে করি তাহলে রাষ্ট্র হিসেবে সমগ্র সমাজ যেমন, তেমনি ব্যক্তির জন্য কর্মময় জীবনই হচ্ছে সর্বোত্তম জীবন। কিন্তু অনেকে যেরূপ মনে করে, কর্মময় জীবন হচ্ছে অন্য লোকের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করার ব্যাপার কিংবা কর্মের ফলাফল সম্পর্কে চিন্তাই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ—তেমনটি আমাদের ভাবা উচিত নয়। বরঞ্চ আমরা বলব, যে চিন্তা এবং ভাবনার লক্ষ্য চিন্তা, অপর কিছু নয় সে চিন্তাই অধিক ফলপ্রসূ। কারণ এখানে চিন্তাই হচ্ছে লক্ষ্য এবং চিন্তাই হচ্ছে কর্ম। এ কারণে যারা চিন্তার সৌধ তৈরি করেন তাদেরকে যথার্থই জগতের কর্মের স্রষ্টা বলে অভিহিত করা হয়। এদের বরাবর আমরা যদি রাষ্ট্রের কথা বলি তাহলে বলব, যে নগরী নিজেকে অপর নগরী থেকে বিচ্ছিন্নভাবে স্থাপিত করেছে, সে নগরীর সেই বিচ্ছিন্নতার কারণে কর্মহীন জীবনযাপনের কোন কারণ নেই। কর্ম কেবল বহির্মূলক নয়, কর্ম অন্তর্মূলকও হতে পারে। নগরীর অভ্যন্তরেই তার বিভিন্ন অংশ তথা নাগরিকদের সংস্থাসমূহ পারস্পরিক সম্পর্কে যুক্ত। একথা ব্যক্তির ক্ষেত্রেও সত্য। এ না হলে বিধাতা কিংবা বিশ্বকে আমাদের কর্মহীন বলতে হত। কারণ নিজেদের অভ্যন্তরে কর্মময় হওয়া ব্যতীত তাদের পক্ষে বহির্মূলক কোন কর্মের কথা চিন্তা করা চলে না। কাজেই আমরা বলব, সর্বোত্তম জীবন বলতে সকলের ক্ষেত্রেই এক : সে রাষ্ট্র, কিংবা ব্যক্তি কিংবা মানব সমাজ যেই হোক।

চতুর্থ অধ্যায়

সর্বোত্তম বাস্তব রাষ্ট্রের মূল প্রয়োজনের বিষয়ে

[ভূমিকাটি শেষ হয়েছে, বলা চলে। এরপরের আলোচ্য বিষয় হবে আদর্শ রাষ্ট্রের রূপ-তথা তার বর্ণনা প্রদান। এ্যারিস্টট্‌ল এ আলোচার শুরুতে দ্বিতীয় পুস্তকে অন্যদের রচিত আদর্শ রাষ্ট্রের যে সমালোচনা করেছিলেন তার উল্লেখ করেছেন। সেখানে প্লেটোর 'লজ' এর চাইতে তাঁর 'রিপাবলিক'ই তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছিল। বর্তমান আলোচনার বিস্তারিত ক্ষেত্রে মিল না থাকলেও পদ্ধতির ক্ষেত্রে 'লজ' বা 'আইন' গ্রন্থের সঙ্গেই সাদৃশ্য অধিক। প্রথমে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে আদর্শ রাষ্ট্রের বস্তুগত অবস্থা, তার জনসংখ্যা, রাষ্ট্রের আকার, অবস্থান এবং আবহাওয়ার বিষয়ে। (বর্তমান পুস্তকের অধ্যায় ৪-৭) তারপরে আসছে নাগরিকতা, সম্পদের মালিকানা এবং ধর্মীয় বিভিন্ন সংগঠনের কথা। (অধ্যায় ৮-১০) পরবর্তীতে আদর্শ নগরীর একটি নক্সা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এগুলি সবই বস্তুগত বা বাইরের বিষয়গত। 'পলিটিয়া' বা আদর্শ শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা শুরু হচ্ছে অধ্যায় ১৩তে। এবং তার প্রথমে আছে শিক্ষাব্যবস্থার কথা। ৭ম পুস্তক এবং ৮ম পুস্তকের বাকি অংশ জুড়ে আমরা শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনা পাচ্ছি।]

আমাদের মুখবন্ধ যখন শেষ হয়েছে এবং পূর্বে যখন আমরা বিভিন্ন শাসনব্যবস্থা নিয়ে আলোচনাও করেছি তখন আমাদের জন্য যে প্রশ্নটির আলোচনা অবশিষ্ট রয়েছে সে হচ্ছে এই যে, আমরা যদি মনের মত একটি রাষ্ট্র তৈরি করতে সক্ষম হই, সর্বোত্তম রাষ্ট্র হওয়ার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার সবই যদি থাকে, তবে সর্বোত্তম সেই মূলনীতিগুলি কি হবে? কাজেই নীতির ক্ষেত্রেও আমরা আমাদের উচ্ছানুযায়ী নীতি নির্দিষ্ট করব। কেবল আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যেন তা সম্ভাব্যের সীমা অতিক্রম করে না যায়। এখানে আমি রাষ্ট্রের ভূখণ্ড এবং জনসংখ্যার কথা ভাবছি। এগুলি রাষ্ট্রর অবশ্য প্রয়োজনীয় বস্তুর অংশ। একজন তন্তুবায় কিংবা নৌযান প্রস্তুতকারকের কাজের জন্য আবশ্যক হবে তার প্রয়োজনীয় মালমশলার সরবরাহ। এবং তার এই মালমশলা যত অধিক উত্তম হবে তার দক্ষতার ভিত্তিতে উৎপাদিত কাজও তত উত্তম ফল প্রদান করবে। ঠিক অনুরূপভাবে রাষ্ট্রনীতিক কিংবা আইনদাতা, এদের প্রয়োজন হবে তাদের আবশ্যকীয় মালমশলার উপযুক্ত পরিমাণে সরবরাহ।

একটি রাষ্ট্র তৈরির জন্য সর্বপ্রথমে আবশ্যক মানুষ। এখানে আমাদের বিবেচনার বিষয় হবে, মানুষের সংখ্যা কত হবে এবং কত প্রকারের মানুষ হবে। রাষ্ট্রের জন্য দ্বিতীয় প্রয়োজন হচ্ছে, ভূখণ্ড। এখানেও আমাদের ভূখণ্ডের পরিমাণ এবং গুণকে নির্দিষ্ট করতে হবে। অনেকেই মনে করে নগরীকে সুখী হতে হলে তাকে বৃহৎ হতে হবে। কথাটার মধ্যে সত্যতা থাকতে পারে, কিন্তু কাকে আমরা বৃহৎ বলব এবং কাকে ক্ষুদ্র বলব, তা স্থির

করতে হবে। কিন্তু বৃহৎ এবং ক্ষুদ্রকে পরিমাপ করা হবে কিসের ভিত্তিতে, সেটিই এরা জানে না। তারা নগরীর মধ্যে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা দ্বারা বৃহৎকে পরিমাপ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে সংখ্যাটিই আসল নয়। লোকের ক্ষমতা এবং দক্ষতার দিকেই নজর দেওয়া উচিত। নগরীর কিছু করণীয় আছে। এবং যে নগরী তার করণীয়কে সম্পদন করার ক্ষেত্রে সবচাইতে দক্ষ তাকেই সর্ববৃহৎ বলা আবশ্যক। যেমন আমরা বলি, হিপপোক্রাটিস বৃহৎ আকারের মানুষের চাইতে বৃহত্তর ছিলেন। তিনি বৃহত্তর ছিলেন মানুষ হিসেবে নয়, বৃহত্তর ছিলেন চিকিৎসাবিদ হিসেবে। সে যা হোক, লোকের সংখ্যাকেও যদি গ্রাহ্য করতে হয় তাহলেও সেটি নির্বিচারে করা ঠিক নয়। রাষ্ট্রের মধ্যে দাস, বৈদেশিক এবং পর্যটক এদেরও একটা ব্যবস্থা রাখতে হবে। আমাদের বিবেচনা হচ্ছে কারা রাষ্ট্রের অংশ অর্থাৎ কাদের দ্বারা যথাযথভাবে রাষ্ট্র গঠিত হয়। এদের সংখ্যা অধিক হলে সেটি একটি বৃহৎ নগরীর বৈশিষ্ট্য বটে। কিন্তু যে নগরী সমরক্ষেত্রে কতিপয় নাগরিকসেনার সঙ্গে বিপুল সংখ্যার জনতা তথা নিকৃষ্টতর মানুষের সমাবেশ ঘটায় তাকে অবশ্যই বৃহৎ বলা চলে না। একটি বৃহৎ নগরী এবং বহু মানুষের নগরী—এক কথা নয়। তাছাড়া অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, অত্যধিক জনসংখ্যা অধ্যুসিত নগরীকে আইনগতভাবে সুশাসন করা একেবারে অসম্ভব না হলেও কঠিন বটে। অন্তত আমি জানিনে যে, কোন সুসংগঠিত নগরী তার জনসংখ্যাকে সীমাবদ্ধ করে দেয় না। ভাষাগত সীমাবদ্ধতার দিকটি তো থাকেই। কারণ আইনবদ্ধ জীবন হচ্ছে সুশৃঙ্খল জীবন এবং উত্তম আইনের অধীনে বাস করার মাধ্যমেই মানুষ উত্তম শাসনে বাস করতে পারে। কিন্তু অধিকসংখ্যক মানুষ সুশৃঙ্খল হতে পারে না। তাদের সুশৃঙ্খল রাখার জন্য ঐশ্বরিক শক্তির প্রয়োজন হয়। কারণ বিধাতা সমগ্র বিশ্বকে তার বৃহৎ আকার ও বৈচিত্র্য নিয়েই তাকে সুন্দরভাবে সুশৃঙ্খল রাখেন। কাজেই আমরা বলব, সেই নগরী সর্বোত্তম হবে যে বৃহৎ হয়েও উপরোক্ত সীমার মধ্যে থাকে। এবং এক্ষেত্রে এটিও বলা যায় যে, পশু, উদ্ভিদ, হাতিয়ার প্রভৃতি সবকিছুর ক্ষেত্রে পরিমাণের যেমন একটা স্বাভাবিক আকার আছে, তেমনি নগরীর জন্যও আকারের একটা আদর্শ থাকতে হবে। যে সকল বস্তুর কথা বলা হল তাদের প্রত্যেকেই তার জন্য নির্ধারিত কার্যকে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে কেবল যদি সে আকারে অত্যধিক বৃহৎ কিংবা অত্যধিক ক্ষুদ্র না হয়। এর ব্যতিক্রম হলে এদের প্রত্যেকের অস্তিত্বের যুক্তিসঙ্গতি হয় বিনষ্ট কিংবা গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেমন একটি নৌকা : সে যদি কেবলমাত্র কয়েক ইঞ্চি দীর্ঘ হয় তাহলে সে আদৌ একটি নৌকা হবে না, আবার যদি সে অর্ধমাইল দীর্ঘ হয় তাহলেও তাকে নৌকা বলা যাবে না। অতি ছোট কিংবা অতি বড় যাই হোক, নৌকা হিসেবে তাকে চালানো যাবে না। একটি নগরীর ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। নগরীর লোকসংখ্যা যদি অতি অল্প হয় তাহলে যেমন নগরী হিসেবে নিজের চাহিদাকে পুরণ করতে সক্ষম হবে না, তেমনি যদি তার লোকসংখ্যা অত্যধিক হয় তাহলেও এদের সকলের প্রয়োজনকে সে পূরণ করতে পারবে না। এমন অবস্থায় সে একটি জনসমষ্টি বলে পরিচিত হতে পারে—কিন্তু নগরী নয়। এমন আকারের ক্ষেত্রে কোনো শাসনব্যবস্থা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ এমন অত্যধিক সংখ্যার যে নগরী তার সামরিক অধিনায়ক কে হতে পারবে? এদের ঘোষকের কাজই বা কে সমাধা করতে সক্ষম হবে, যদি সে হোমারের যুগের কিম্বদন্তীর উচ্চকণ্ঠ ঘোষক না হয়? কাজেই জনসংখ্যা যখন এমন একটি পর্যায়ে পৌঁছে যেখানে সে একটি উত্তম জীবনসম্পন্ন নগররাষ্ট্রীয় সমাজের প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম তখনই আমরা সেটিকে রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। এটিকে আদর্শ ধরে আমরা অগ্রসর হতে

পারি। এর চাইতে যে নগরীর লোকসংখ্যা অধিক হবে, সেটি একটি বৃহত্তর নগরী হবে। কিন্তু তাই বলে এমন বৃদ্ধিও সীমাহীনভাবে চলতে পারে না। আকারের সীমা কি হবে তা বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করেই নির্দিষ্ট করা যায়। একটি নগরীর কর্মসমূহ শাসক এবং শাসিত হিসেবে বিভক্ত। শাসকের কাজ হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং নির্দেশদানের। ন্যায়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং আবেদনকারীদের কর্মদক্ষতা অনুযায়ী যেমন পরস্পরকে চিনতে হবে তেমনি তাদের কার কি দক্ষতা তাও জানতে হবে। এই অবস্থার যদি অভাব ঘটে তাহলে যেমন নির্বাচন, তেমনি আইনগত সিদ্ধান্তগ্রহণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে বাধ্য। এ দুইএর কোনো ক্ষেত্রেই নির্বিচার ভোটপ্রদান আশংকাজনক। অথচ জনসংখ্যা অধিক হলে ব্যাপার এমনি ঘটে। এর আর একটি ত্রুটি হচ্ছে এই যে, এমন অবস্থায় অ-নাগরিক এবং রাষ্ট্রের মধ্যে বাসরত বৈদেশিকদের পক্ষে নাগরিকতা সংগ্রহ করা সহজ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ লোকসংখ্যার বৃহৎ পরিমাণের জন্য এমন লোকদের সনাক্ত করা কঠিন হয়। কাজেই এভাবে একটি নগরীর সর্বোত্তম সংজ্ঞার ব্যাপারটির আমরা সমাধান করতে পারি। আমরা বলতে পারি : একটি নগরীর এমন একটি বড় সংখ্যক অধিবাসী থাকতে হবে যাদের পক্ষে স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাপনের সকল চাহিদা যেমন পূরণ করা সম্ভব হবে, তেমনি সে সংখ্যা এত অধিক হবে না যে, তাদের উপর তদারকীর কাজটি কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। একটি নগরীর আকারকে আমরা এভাবে সংজ্ঞায়িত করতে পারি।

পঞ্চম অধ্যায়

ভূখণ্ডের গুণাগুণের কথা

ভূখণ্ডের প্রশ্নেও একই ব্যাপার। ভূখণ্ড অর্থাৎ জমির গুণের কথা উঠলে বলা চলে, সকলেই স্বয়ংসম্পূর্ণ জমিকেই নির্বাচন করবে—তার অর্থ, যে জমি সব চাইতে উৎপাদানশীল সে জমিই সব চাইতে উপযুক্ত। স্বয়ং সম্পূর্ণতার কথা হচ্ছে সব কিছুই সহজে পাওয়া যায় এবং কোনো কিছুরই অভাব নেই। রাষ্ট্রের আকার এবং বিস্তার এমন হবে যাতে স্বাধীন নাগরীকগণ বিলাস-পূর্ণ নয়, কিন্তু শারীরিক পরিশ্রম ব্যতীত তাদের জীবন যাপন করতে পারবে। (বর্তমানের এই সংজ্ঞা ভাল কিংবা মন্দ, এ বিষয়ে পরবর্তীকালে সম্পদ এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে সম্পদের প্রাচুর্যের প্রশ্নটি আলোচনাকালে বিস্তারিতভাবে করা যাবে। তখন মালিকানা এবং সম্পদের ব্যবহারের মধ্যকার সঠিক সম্পর্কের প্রশ্নটিও উঠবে। এ প্রশ্নটি বেশ জটিল এবং এখানে নানা মতপার্থক্যের অবকাশ থাকবে। কারণ মানুষের মধ্যে আধিক্যের একটি প্রবণতা রয়েছে। কেউ চলে যায় অমিত ব্যয়ের দিকে, আবার কারুর মধ্যে প্রবণতা দেখা যায় চরম কার্পণ্যের।) জমির সাধারণ প্রকৃতির বর্ণনা কঠিন নয়। অবশ্য এর কোন কোন বিষয়ে যুদ্ধ পরিচালনায় যাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে তাদের পরামর্শ আমাদের গ্রহণ করতে হবে। কারণ রাষ্ট্রের ভূখণ্ডকে এমন হতে হবে যেন শত্রুর পক্ষে আক্রমণ করা এবং আক্রমণকারীর পক্ষে হটে যাওয়া কঠিন নয়। তাছাড়া জনসংখ্যার তদারকীর ব্যাপারে আমরা যা বলেছি ভূখণ্ডের ক্ষেত্রেও আমরা তাই বলব। যে-রাষ্ট্রের সবটাকে সহজে দেখা যায় তার যে কোন স্থানে সহজে সামরিক সাহায্য সরবরাহ করা চলে। এর পরে আসে নগরীর অবস্থানের কথা। কোন্‌খানটিতে নগরীকে প্রতিষ্ঠিত করা সর্বোত্তম। আমরা যদি আমাদের ইচ্ছামত সর্বোত্তম স্থানে তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি তাহলে বলব যে, এর তিনটি সুবিধা : (১) প্রথমত একথা পূর্বেই বলা হয়েছে যে, এর ফলে সবদিকে নগরীর কার্যক্রম বিস্তারিত করা যাবে; (২) দ্বিতীয়ত খাদ্য দ্রব্যাদি আমদানীর জন্য এই অবস্থানটি উত্তম হবে এবং (৩) তৃতীয়ত কাষ্ঠ কিংবা অন্যপ্রকার কাঁচামাল যা নগরীর প্রয়োজন হবে, সে সকল দ্রব্য এমন অবস্থান থেকে লাভ করা সহজ হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সামুদ্রিক যোগাযোগের প্রশ্ন

[মালিকানা এবং সম্পত্তির বিষয়ে যে আলোচনার কথা বলা হয়েছিল সে আলোচনার সাক্ষাৎ প্রথম পুস্তকের বাইরে অপর কোথাও 'পলিটিকস'-এ পাওয়া যায় না।
পরবর্তী অধ্যায়ে দেখা যাচ্ছে, নগরীর সমুদ্রতীরে অবস্থানের সুবিধার বিষয় নিয়ে অধিকতর বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে। এর একটা কারণ হয়ত এই যে, এটাকে এ্যারিস্টট্‌ল প্লেটোর একটি জবাব হিসেবে দেখেছেন। কারণ প্লেটো প্রায়শ সমুদ্রবন্দর, নৌবাহিনী, বৈদেশিক বাণিজ্য এবং বিদেশ ভ্রমণ প্রভৃতি সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। এ্যারিস্টাট্‌ল তাঁর এই আলোচনাতে প্রথমে এ প্রশ্নে কয়েকটি নির্দিষ্ট সুবিধার উল্লেখ করেছেন এবং পরে অসুবিধাসমূহ দূর করারও প্রস্তাব করছেন। কারণ, প্লেটোর সঙ্গে একটা ব্যাপারে তিনি অভিন্নমত পোষণ করেন। এ্যারিস্টাট্‌লও মনে করেন যে নিম্নশ্রেণী অর্থাৎ যাদের মধ্য থেকে নৌবাহিনীর দাঁড়িদের সংগ্রহ করা হত তাদেরকে নাগরিকতা প্রদান এথেন্সের জন্য বিপর্যয়মূলক ছিল।]

সামুদ্রিক পথে যোগাযোগের প্রশ্নে নানা মতামত রয়েছে। রাষ্ট্রের সুশাসনের ক্ষেত্রে এরূপ যোগাযোগ কি কোন উপকার সাধন করে, না এতে বাধার সৃষ্টি হয়? কেউ কেউ বলেন, বৈদেশিকদের জন্য নগরীকে উন্মুক্ত করে দেওয়া সুশৃঙ্খলার জন্য ক্ষতিকর। বিদেশীগণ ভিন্নতর আচার আচরণে অভ্যস্ত। তাদের আগমণ নগরীর জনসংখ্যার ভীড় বৃদ্ধি করে। এঁদের কথা হল, সমুদ্রপথের ব্যবহার নগরীতে বিরাট সংখ্যক ব্যবসায়ীদের যাতায়াতের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে নাগরিকদের উত্তম জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু এই ক্ষতিকর ফলগুলি পরিহার করা সম্ভব হলে নগরীর অর্থনীতি এবং আত্মরক্ষা—উভয় দিক থেকে নগরীর সঙ্গে সমুদ্রের যোগাযোগ কাম্য। শত্রুকে প্রতিরোধ করার অন্য নগরীর দক্ষ প্ররিক্ষা ব্যবস্থার স্বার্থে সমুদ্র এবং স্থলভাগ—উভয়ের ব্যবহারই আবশ্যক। এমন যদি হয় যে, প্রতিরক্ষার তরফ থেকে উভয়দিকে আঘাত হানা সম্ভব নয়, তথাপি উভয় পথের সুযোগ থাকলে একটির উপর আঘাত হানাও সহজতর হবে। অর্থনীতির ক্ষেত্রেও কথাটি প্রযোজ্য। রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ যে সকল দ্রব্য উৎপাদন করে না সে সকল দ্রব্যকে আমদানি করা আবশ্যক। অপরদিকে যে সকল দ্রব্যে নগর উদ্বৃত্ত, সে সকল দ্রব্য রপ্তানি করা প্রয়োজন। নগরী যখন একটি ব্যবসাকেন্দ্রে পরিণত হয় তখন অপরের চাইতে নিজের স্বার্থই সাধিত হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় নগরীকে সকল বহিরাগতের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এর প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বহিরাগতদের দ্বারা নিয়ে আসা অর্থ। কিন্তু যে নগরী অর্থে এরূপ মুনাফা অর্জনকে আইনসঙ্গত মনে করে না, তার পক্ষে এরকম কোনো উন্মুক্ত বাজার তৈরি করা আদৌ উচিত হবে না।

আধুনিক সময়ে আমরা এমনও দেখছি যে, নগরী এবং অঞ্চল যাদের পোতাশ্রয় এবং জাহাজ মেরামতী ব্যবস্থা আছে তারা সমুদ্রের অদূরবর্তী এলাকায় অবস্থিত হয়। তাদের দূরত্ব বা নিকটবর্তীতা এমন হয় না যাতে নগরীর কোন ক্ষতি সাধিত হয়। এদের চারদিকে প্রাকার এবং অন্য রক্ষামূলক ব্যবস্থাই তৈরি করা হয়। কাজেই একথা বলা যায় যে, সমুদ্র পথের এরূপ আন্তঃযোগাযোগ উত্তম হলে নগরীর তাতে উপকার সাধিত হয়। কিন্তু ফল অবাঞ্ছিত হলে নগরী বা এলাকাতে যাতায়াতের নিয়মকানুন লিপিবদ্ধ করে একে নিয়ন্ত্রিত করা এবং অবাঞ্ছিত ফল রোধ করাও সহজ হবে। নৌসেনাদের কথাটিও বলা আবশ্যক। এটা অবশ্য পরিষ্কার যে, কিছু সংখ্যক নৌসেনা থাকা আবশ্যক। কারণ জল এবং স্থল উভয় ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীন ভাবে এবং প্রয়োজন হলে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করে রাষ্ট্রের শক্তি প্রতিপন্ন করা আবশ্যক। অবস্থা এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের জীবন যাপন পদ্ধতির ভিত্তিতেই অবশ্য জাহাজ এবং নৌবাহিনীর প্রয়োজনীয় সংখ্যা নির্দিষ্ট করতে হবে। একটি নেতৃস্থানীয় রাষ্ট্রের ভূমিকা যদি তাকে পালন করতে হয় তাহলে রাষ্ট্রটির এই কার্যের উপযোগী নৌ এবং স্থলবাহিনীর আবশ্যক হবে। নৌসেনা তৈরি করতে যে লোকের আবশ্যক সে লোক সংগ্রহ করার কারণে নগরিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা উচিত হবে না। তাদের সেনাবাহিনী হিসেবে গণ্য করে রাষ্ট্রশাসনের অংশ দেওয়া সঙ্গত হবেনা। জাহাজে যে সৈন্য বহন করা হয় তারা স্বাধীন নাগরিক এবং তারা পদাতিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের মর্যাদা জাহাজের নাবিকদের মর্যাদার চাইতে অধিক। জাহাজের যারা দাঁড়ী তাদের নগরীর সদস্য বলে গণ্য করার প্রয়োজন নেই। নগরীর শহরতলীর বাসিন্দা এবং কৃষিক্ষেত্রের মজুরগণের সংখ্যা অধিক থাকলে এখান থেকেই লোক সংগ্রহ করা সম্ভব হবে। এর দৃষ্টান্ত হেরাক্লিয়াতে পাওয়া যায়। এই নগরীটির আকার বড় না হলেও তিন সারি দাঁড়ীর জাহাজের সংখ্যা এর অনেক। নগরীর ভূখণ্ড, বন্দর, শহর, সমুদ্র, নৌশক্তি-প্রভৃতি সম্পর্কে আমাদের আলোচনা এখানে সমাপ্ত করা যায়। আমাদের পরবর্তী আলোচনা হবে নাগরিক এবং জনসংখ্যা নিয়ে।

সপ্তম অধ্যায়

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন

নাগরিকদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করার বিষয়ে আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। আমাদের এখন আলোচনা করা আবশ্যক, নাগরিকদের স্বাভাবিকভাবে কি গুণ থাকা প্রয়োজন। এর জবাবের একটি উত্তম ধারণা আমরা পেতে পারি যদি প্রথমে আমরা প্রখ্যাত গ্রীক রাষ্ট্রগুলির দিকে দৃষ্টি দিই এবং তার পরে পৃথিবীর জাতিগত বিভাগগুলিরও আলোচনা করি। আমরা দেখি, যে সকল জাতির বাস ঠাণ্ডা এলাকায় এবং যাদের বাস ইউরোপে তারা চরিত্রগতভাবে সাহসী। তাদের মধ্যে আবেগও আছে, কিন্তু তাদের দক্ষতা এবং মস্তিষ্কের ক্ষমতায় কিছুটা অভাব আছে। এ কারণে যদিও সাধারণভাবে তাদের আমরা স্বাধীন থাকতে দেখি তবু তাদের মধ্যে একতার অভাব দেখা যায় এবং অপরের উপর শাসনেও তারা অক্ষম। অপরদিকে এশীয় জাতিসমূহের যেমন মস্তিষ্কের ক্ষমতা আছে তেমনি তাদের দক্ষতা আছে। তবে তাদের অভাব আছে সাহস এবং ইচ্ছাশক্তির এ কারণেই তারা দাস এবং শাসিত হিসেবে বিরাজ করছে। হেলেনীয় (গ্রীসীয়) জাতির অবস্থান হচ্ছে ভৌগোলিকভাবে মধ্যস্থলে। এক কারণে তাদের চরিত্রে আমরা উভয় গুণের সাক্ষাৎ পাই। সুতরাং এই জাতি তাদের স্বাধীনতা বজায় রেখেছে এবং সর্বোত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে। একটি শাসনব্যবস্থার ভিত্তিতে তারা অপরকে শাসন করারও ক্ষমতা ধারণ করে। কিন্তু গ্রীসীয়দের মধ্যেই আবার পার্থক্য দৃষ্ট হয় যখন এদের কোন এক গোষ্ঠীকে আমরা অপর গোষ্ঠীর সঙ্গে তুলনা করি। তখন দেখা যয় এদের মধ্যে কেউ আছে যাদের চরিত্র এক পেশে। আবার কারুর মধ্যে মস্তিষ্ক এবং হৃদয়—উভয় ক্ষমতারই মিলন দেখা যায়। মানুষকে আমরা যেভাবে চাচ্ছি সেজন্য এই দু প্রকার গুণেরই মিলন আবশ্যক। এমন মানুষকেই আইনদাতা সহজে প্রয়োজন মত গড়তে পারেন এবং তাদের চরিত্রে মহৎ গুণের সমাবেশ ঘটাতে পারেন। অনেকে বলেন নগরীর যারা শাসক তাদের এমন দক্ষতা থাকতে হবে যেন তারা পরিচিত জনদের দর্শনে বন্ধুসম আচরণ এবং অপরিচিতদের দর্শনে শত্রুসম ভাব প্রদর্শন করতে পারেন। একথার দুই যুক্তি যে, বন্ধুসম আচরণের জন্য হৃদয়ের আবশ্যক। কারণ সখ্যের উৎস হচ্ছে অন্তর। অন্তর থেকে আমরা সেই দক্ষতা লাভ করি যে ক্ষমতা দিয়ে আমরা মানুষকে ভালবাসি। এর প্রমাণ এ ঘটনা থেকেও দেওয়া যায় যে, আমরা যাদেরকে ভালবাসি তাদের অবেহলাতেই আমরা অধিক আহত হই। যারা আমাদের অপরিচিত তাদের আচরণে আমাদের মনে এরূপ ভাবের উদয় হয় না। এ থেকে আরকিলোকাস তাঁর সুহৃদদের ভর্ৎসনা করে নিজেকে উদ্দেশ্য করে যে বলেছিলেন : ' তোমার সুহৃদদের কারণেই আমার এই যন্ত্রণা' তার অর্থ আমরা বুঝতে পারি। আদেশদানের ক্ষমতা এবং স্বাধীনচেতা ভাবের উৎস হচ্ছে মানুষের মানসিক এই প্রবণতা। মানুষের এ প্রবণতা অদম্য। এ প্রবণতাই তাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

কিন্তু অপরিচিতদের প্রতি রূঢ় আচরণের যে পরামর্শ তিনি দিয়েছেন সেটিকে আমরা ঠিক মনে করিনে। কারুর প্রতি এরূপ ব্যবহারের প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করিনে। অন্যায়কারীর প্রতি আমি ভয়ানকভাবে রূঢ় হতে পারি। তা না হলে হিংস্রতা কোন মহৎ চরিত্রের সূচক নয়। অপরিচিতদের চাইতে বরঞ্চ বন্ধুজনদের দ্বারা যখন আমরা অন্যায়ভাবে ব্যবহৃত হয়েছি বলে মনে করি তখণ তেমন বন্ধুর দর্শনেই আমাদের মনে ঘৃণার সঞ্চার হয়। এটি অহেতুক নয়। মানুষ যখন উত্তম ব্যবহারকে তার প্রাপ্য বলে আশা করে তখন তার প্রত্যাশায় বঞ্চিত হলে সেই বঞ্চনা এবং লোকসানের কারণে তার মনে ঘৃণার সঞ্চার হয়। প্রবাদে এজন্যই বলা হয় : 'ভ্রাতৃকলহই হচ্ছে মারাত্মক কলহ' এবং 'অতিপ্রেম থেকেই অতি ঘৃণার জন্ম'।

সে যাক, রাষ্ট্রের সদস্য, তাদের প্রকৃতি, রাষ্ট্রের আকার এবং ভূখণ্ড প্রভৃতি বিষয়ে এই আলোচনাই যথেষ্ট। এর অধিক বলার দরকার নেই। কারণ কোন বিষয়ের তত্ত্বগত আলোচনায় এর অধিক বিস্তারিত বর্ণনায় যাওয়া সম্ভব নয়। বিষয়টি চাক্ষুষ দেখার ব্যাপার হলে ভিন্ন কথা হত।

অষ্টম অধ্যায়

রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদানসমূহের প্রশ্ন

প্রকৃতির কোন বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা যেমন অপরিহার্য তার কোন অংশ, যা ব্যতীত সমগ্র নিজের অস্তিত্ব তৈরি করতে পারে না, তাকে তার 'অংশ' বলে অভিহিত করিনে, তেমনি একটি নগরীর অস্তিত্বের জন্য যারা অপরিহার্য তাকে আমরা নগরীর অংশ বলব না। একথা নির্দিষ্ট চরিত্রের যে কোন সামাজিক সংস্থা সম্পর্কে সত্য। একটি যৌথ সংস্থা অংশগ্রহণের তারতম্য নির্বিশেষে তার সকল সদস্যের নিকট তাদের যৌথ সংস্থা। সংস্থাটি একটি একক সমগ্র। একটি মনুষ্য-সমাজের জন্য অবশ্যই খাদ্যসামগ্রী, বাস করার মত ভূখণ্ড এবং অন্যান্য বস্তুসমূহ প্রয়োজনীয়। কিন্তু একটা মনুষ্য সমাজের চরিত্র এই দ্রব্যাদি দ্বারা নির্ধারিত হয় না। উপায় এবং লক্ষ্যের ক্ষেত্রে সত্য হচ্ছে এই কথা যে, যখনই একে অপরের সঙ্গে লক্ষ্য এবং উপায় হিসেবে সম্পর্কিত তখন তাদের উভয়ের মধ্যে 'একের ক্রিয়া করা' এবং 'অপর দ্বারা কৃত হওয়া' ব্যতীত অপর কোন সম্পর্ক বিরাজ করতে পারে না। আমরা যে সমস্ত হাতিয়ার দিয়ে কাজ করি তার যে কোন একটিকে তার ব্যবহারকারী এবং যে কার্য তার দ্বারা সম্পাদিত হয় তাদের মধ্যকার সম্পর্কের ভিত্তিতে ধরা যাক। যেমন একটি গৃহ এবং তার নির্মাণকারী। এখানে নির্মাণকারী এবং নির্মাণের দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে নির্মাণকারীর হাতে গৃহনির্মাণের লক্ষ্যে দক্ষতা সহকারে দ্রব্যাদির ব্যবহার ব্যতীত পারস্পরিক সহযোগিতার কোন সম্পর্কের কথা চিন্তা করা যায় না। অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের সম্পদ বা সম্পত্তির প্রয়োজন। কিন্তু সম্পদ রাষ্ট্রের কোন অংশ নয়। একথা ঠিক যে এই সম্পদের কোনো কোনো অংশ জীবনসম্পন্ন হতে পারে। কিন্তু তাতে কথাটির কিছু ব্যতিক্রম ঘটে না। আমরা যখন নগর বা রাষ্ট্র সম্পর্কে কথা বলি তখন রাষ্ট্র বলতে আমরা এমন একটি একই প্রকৃতি সম্পন্ন মনুষ্য-সমাজকে বুঝি যার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বোত্তম সম্ভব জীবন প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু সর্বোত্তম কি? সর্বোত্তম হচ্ছে সুখ। এবং সুখ তৈরি হয় সকল সৎ গুণের পূর্ণতম যে ব্যবহার সম্ভব সেই ব্যবহার দ্বারা। মনুষ্য-জীবন এমন যে কেউ এর সুখের বেশ বৃহৎভাগ পেতে পারে, আবার কেউ তার সাফল্য কিংবা কোন ভাগ আদৌ নাও পেতে পারে। এখানেই আমরা বিভিন্ন প্রকার নগর বা রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন প্রকার শাসনব্যবস্থার কারণকে পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই। বিভিন্ন প্রকার মানুষ বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন পথে সুখের অন্বেষণ করে। কাজেই এমন অবস্থায় মানুষের জীবন তথা তাদের রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা যে বিভিন্ন প্রকার হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

এই প্রসঙ্গে আমাদের এটাও জানা আবশ্যক, সেই বস্তুগুলি কি যাদের ব্যতীত কোন রাষ্ট্র সম্ভব নয়। (এখানে আমরা রাষ্ট্রের অংশসমূহ বলতে যা কিছু বুঝি তাদেরও আলোচনার মধ্যে আনছি। কারণ রাষ্ট্রের জন্য এদের অস্তিত্বও অত্যাবশ্যক।) এই সকল দ্রব্য এবং কার্যাদির যদি আমরা একটি হিসাব করি তাহলে আমরা দেখব এগুলি হচ্ছে : (১) খাদ্য (২)

হস্তশিল্প এবং তার হাতিয়ারসমূহ (৩) অস্ত্রাদি। অস্ত্রকেও এই হিসেবের মধ্যে আনা হয়েছে এই কারণে যে, যেমন বিদ্রোহ দমনের জন্য আভ্যন্তরীণ শাসনে, তেমনি বাইরের শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য নাগরিকদের অস্ত্র বহন করা আবশ্যক। (৪) সম্পদেরও আবশ্যক : যুদ্ধ এবং আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন—দুইএরই জন্য। (৫) ধর্মের প্রয়োজনের কথাও চিন্তা করতে হবে। (এটিকে প্রথমেও উল্লেখ করা যেত।) (৬) তাছাড়া সবচাইতে প্রয়োজন হচ্ছে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি নির্ধারণ। এটি রাষ্ট্রের নীতির ক্ষেত্রে যেমন তেমনি এক ব্যক্তির সঙ্গে অপর ব্যক্তির দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেও কে দোষী কে নির্দোষ তা নির্ধারণের জন্যও আবশ্যক। কারণ আমাদের পুরোন কথার পুনরাবৃত্তি করে আমরা আবার বলব, রাষ্ট্র মনুষ্যকুলের কোন আকস্মিক সমাগম নয়। রাষ্ট্র হচ্ছে স্বয়ংসম্পূর্ণতার লক্ষ্য সাধনে নিরত একটি মনুষ্য সংস্থা। এবং যে সমস্ত বিষয়ের আমরা উল্লেখ করেছি তার কোন একটিকে বাদ দিয়েও এই মনুষ্য সংস্থার পরিপূর্ণভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সম্ভব হবে না। এ কারণেই একটি নগর (রাষ্ট্র) প্রতিষ্ঠার জন্য এই সকল কার্যেরই ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। তাছাড়া খাদ্য সরবরাহের জন্য বেশ সংখ্যক কৃষিকর্মীরও আবশ্যক হবে। দক্ষ কারিগর, যোদ্ধা, সম্পদবান, পুরোহিত এবং ন্যায় অন্যায় কিংবা সঠিক বেঠিকের নির্ণায়ক বিচারপতিদেরও প্রয়োজন হবে।

নবম অধ্যায়

নাগরিকদের কর্মবিভাগ

নাগরিকদের শ্রেণীসমূহের উল্লেখের পরে প্রশ্ন হচ্ছে, সকল নাগরিক কি প্রয়োজন অনুযায়ী সকল রকম কাজ করবে? অর্থাৎ কৃষক, কারিগর, পারিষদ এবং বিচারক—এদের সকলে কি সকল রকম কাজ করবে (এরূপ যে অসম্ভব, এমন নয়) কিংবা প্রত্যেক রকম কাজের জন্য আমরা নির্দিষ্ট কোন শ্রেণীর নির্ধারণ করব? আবার প্রশ্ন হচ্ছে, কিছু কিছু কাজ কিংবা পদ কি কোন বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা প্রয়োজন নয়। এবং অবশিষ্ট পদকে সকলের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া? মোটকথা সকল শাসনব্যবস্থায় একটি মাত্র নীতি খাটে না। কারণ আমরা পূর্বে বলেছি যে, সকলে যেমন সবকিছুর ভাগীদার হতে পারে তেমনি আবার কিছু লোক কিছু জিনিসের অংশীদার, এমনও হতে পারে। বিভিন্ন শাসনব্যবস্থার পার্থক্য এখানে : গণতন্ত্রে সকলেই সবকিছুর অংশীদার। ধনিতন্ত্রে (কতিপয়তন্ত্রে) ব্যাপারটি হচ্ছে এর বিপরীত।

কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনা হচ্ছে সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা নিয়ে। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে কিসের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র সবচাইতে সুখী বলে পরিগণিত হতে পারে? এক্ষেত্রে আমরা পূর্বেই বলেছি, ন্যায় বাদে সুখের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। সে কারণে বলা যায়, সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থার ভিত্তিতে যে সর্বোত্তম রাষ্ট্র গঠিত হবে—অর্থাৎ যে রাষ্ট্রে শর্তহীন—সর্বোত্তম মানুষের বাস, সে রাষ্ট্রের নাগরিক কোন ব্যবসায়গত জীবন যাপনের কথা ভাবতে পারে না। এমন জীবনকে আমরা মহৎ জীবন বলতে পারিনে। আমরা বলতে পারিনে যে, এ জীবন ন্যায়ের জন্য উপযুক্ত। এ রাষ্ট্রের নাগরিকগণ কৃষকদের জীবনও যাপন করতে পারে না। কারণ তাদের গুণের উৎকর্ষ সাধনের জন্য তাদের অবকাশের আবশ্যক হবে। নাগরিকদের কার্য সম্পাদনের জন্য অবসর প্রয়োজন হবে। রাষ্ট্রের রক্ষাব্যবস্থা এবং নীতি বা ন্যায়ের ক্ষেত্রে আলোচনা—এ দুটিই হচ্ছে রাষ্ট্রীয় জীবনের কেন্দ্র। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই কাজগুলিকে কি ভিন্ন প্রকার নগরিকদের হাতে ন্যস্ত করা সঙ্গত হবে, কিংবা এ গুলিকে একই সংস্থার হাতে ন্যস্ত করা উত্তম হবে? এর জবাব অবশ্য, অংশত উভয় রকম হতে পারে। এর একটি জবাব হচ্ছে, জীবনের উত্তম সময়ে যখন দায়িত্বগুলির সম্পাদন এক থেকে অপরে ভিন্ন হয়, অর্থাৎ যখন একটি নিষ্পন্ন করতে প্রয়োজন হয় প্রজ্ঞার, অপরটির জন্য শক্তির, তখন বিভিন্ন লোকের হাতেই এদের অর্পণ করা উচিত। কিন্তু যেহেতু যারা নিজেদের হুকুম খাটাতে শক্তিমান তারা আবার শাসিত হওয়াকে অনেক সময়ে সহ্য করতে পারে না, সে কারণে একই প্রকার লোকের হাতে এ দায়িত্বগুলি ন্যস্ত করার প্রয়োজন পড়ে। কারণ যাদের অস্ত্র আছে এবং যারা অস্ত্র ধারণ করতে পারে তারাই শাসনব্যবস্থা টিকবে কি টিকবে না—তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা রাখে। কাজেই আমাদের সিদ্ধান্তটা এরূপ দাঁড়ায় : সামরিক এবং বেসামরিক : শাসনব্যবস্থার

উভয় প্রকার কর্মকাণ্ড একই শ্রেণীর নাগরিকের হাতে ন্যস্ত করা সঙ্গত। অবশ্য উভয় কাজ একই সঙ্গে নয়। এক্ষেত্রে আমাদের প্রকৃতিকে অনুসরণ করা প্রয়োজন। যারা যুবক তাদের শক্তি থাকে, আর যারা প্রবীণ তাদের থাকে প্রজ্ঞা। এ কারণে দায়িত্ববণ্টন কাজের যোগ্যতার ভিত্তিতে করা আবশ্যক। সম্পত্তির মালিকানাও এই শ্রেণীর হাতে থাকা প্রয়োজন। নাগরিকদের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক ভিত্তির নিশ্চয়তাদান আবশ্যক। নিম্নতর শ্রেণী কিংবা যারা ন্যায়ের সৃজনকারী নয় তাদের রাষ্ট্রে কোন অংশ থাকবে না। আমাদের মূল নীতি থেকেই এ সিদ্ধান্ত স্পষ্ট হয়। সুখ যুক্ত হয় ন্যায়ের সঙ্গে। এবং কোন নগরকে সুখী ঘোষণা করার অর্থ তার কোন অংশ নয়, সকল নাগরিককেই সুখী বলে ঘোষণা করা। এটাও পরিষ্কার যে সম্পদের মালিকও এরাই হবে। অ-গ্রীক যারা দেশে বিভিন্ন স্থানে বাস করছে তারা অথবা কৃষিকর্মের শ্রমিকরাই দাস হবে।

নাগরিকদের যে শ্রেণীতালিকা আমরা এর আগে তৈরি করেছিলাম তার একটি অর্থাৎ পুরোহিতদের সম্পর্কে আলোচনা অবশিষ্ট রয়েছে। তাদের অবস্থানটি অবশ্য পরিষ্কার। কোন কৃষিকর্মী বা ব্যবসায়-শ্রমিককে পুরোহিত করা চলে না। কারণ দেবতাদের পূজা অর্চনা নগরিকদের দ্বারা সম্পাদিত হওয়াই সঙ্গত। আমরা নাগরিকদের এবং তাদের দায়িত্বকে সামরিক এবং বেসামরিক হিসেবে বিভক্ত করেছি এবং নাগরিকদের যখন দীর্ঘ কাল দায়িত্ব পালন করতে হয় তখন তারা যেন তাদের অবসরগ্রহণের পরবর্তী জীবন উপভোগ করতে পারে এবং দেবতাদের সেবা করারও সুযোগ পায়, সে ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কাজেই অবসরপ্রাপ্ত নাগরিকদেরই পুরোহিতের পদে নিযুক্ত করা উচিত।

এভাবে রাষ্ট্রের প্রয়োজনসমূহ এবং তার অংশগুলির আলোচনা শেষ করা যায়। অবশ্য একথাও বলা প্রয়োজন যে, কৃষিকর্মী এবং বেতনভুক্ মজুরেরও আবশ্যক। কিন্তু রাষ্ট্রের অংশ বলব আমরা তার সামরিক এবং আলোচনামূলক উপাদানকেই। এ দুইকে স্থায়ীভাবে কিংবা পালাক্রমেও বিভক্ত করা চলে।

দশম অধ্যায়

সামরিক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য

[দশম অধ্যায়ের প্রথম অর্ধেকের আলোচনা মূল আলোচনার ব্যতিক্রম। কোন সম্পাদকের নিজের বিন্যাসের ফলেও এটি হতে পারে। এর সিদ্ধান্ত থেকে অনুমান করা চলে যে, এটি প্রাচীন ইতিহাসের উপর গুরুত্ব আরোপের এবং মানব ইতিহাসের মধ্যে একটি চক্রাকার পরিবর্তনের তত্ত্ব পেশের একটি চেষ্টা। এ আলোচনার লক্ষ্য আদর্শ রাষ্ট্র নয়।]

নাগরিকদের যে শ্রেণী বিভক্ত করা প্রয়োজন, বিশেষ করে, সামরিক শ্রেণীকে যে কৃষক শ্রেণী থেকে পৃথক করা আবশ্যক, এটি সাম্প্রতিক কোন আবিষ্কারের ব্যাপার নয়। রাজনীতি অধ্যয়নকারীর নিকট বিষয়টি বহু কাল থেকেই পরিচিত। মিশরে অনুরূপ বিভাগের সাক্ষাৎ বর্তমানেও পাওয়া যায়। ক্রিটেও তাই। এরূপ কথা আছে যে সিসসট্রিস এই উদ্দেশ্য নিয়েই মিশরের জন্য আইন প্রণয়ন করেছিলেন। মিনস করেছিলেন ক্রিটের জন্য। যৌথ আহারের বিষয়টিও বেশ প্রাচীন। এর প্রথম প্রবর্তন ক্রিটে পাওয়া যায় মিনস এর শাসনকালে। ইটালীতে এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায় আরো পূর্বে। কারণ ঘটনা লিপিকারগণের কাছ থেকে জানা যায় যে, এখানে কোন একজন ইটালাস ছিলেন যিনি ইনোট্রিয়ার রাজা ছিলেন। তাঁর পরে অধিবাসীগণ তাদের দেশের নাম 'ইটালীতে' পরিবর্তিত করে। 'ইটালী' নামটি দেওয়া হয়েছিল ইউরোপের তীরভূমির সেই অংশটির উপর যেটি সিলেটিক থেকে ল্যাম্পেটিক উপসাগর বরবার টেনে দেওয়া লাইনের দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। আড়াআড়িভাবে এর দূরত্ব ছিল অর্ধদিনের ভ্রমণ পরিমাণ। এই ইটালাসই নাকি ইনোট্রিয়ার মানুষকে পশুপালক থেকে কৃষকে পরিবর্তিত করেছিলেন। তিনি তাদের জন্য বিভিন্ন নতুন প্রথা এবং আইনের প্রবর্তন করেছিলেন। এর মধ্যে যৌথ আহারের নিময়টিও ছিল। এ কারণেই অন্যান্য অনেক প্রথা সহ এই প্রথাটিকে তার কিছু অনুসারী এখনো অনুসরণ করে থাকে। ইতরুরিয়ার দিকে অবস্থিত ছিল অপিসি। একে প্রাচীনকালে যেমন বলা হত আধুনিক কালেও তেমনি বলা হয় আসোনিস। আয়াপিজিয়া এবং আয়োনীয় সমুদ্রের অপর পারে যে দেশ ছিল তার নাম ছিল সিরিটিস। যারা চোনিস ছিল তারা জাতিগতভাবে ছিল ইনোট্রিয়। যৌথ আহারের প্রথা তখন থেকে প্রবর্তিত হয়। তখন থেকে মিশরের শ্রেণী বিভাগেরও পত্তন ঘটে। সিসোসট্রিসের যে রাজ্য তার ইতিহাস মিনস-এর চাইতেও পুরাতন।

আমার মনে হয়, বাকি সব প্রথা কালের বুকে বিভিন্ন সময়ে যেমন আবিষ্কৃত হয়েছে, তেমনি বিস্মৃত এবং পুনরায় আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি ঘটেছে বহুবার। প্রথমত এমন কতগুলি জিনিস আছে যা ব্যতীত আমাদের চলে না। এই প্রয়োজন থেকেই এদেরকে ব্যবহারের শিক্ষা আমরা লাভ করি। দ্বিতীয়ত, একবার প্রতিষ্ঠিত হলে, প্রক্রিয়াটি অধিকতর

স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হতে থাকে। এগুলি সবই যে প্রাচীন তা আমরা মিশরের ইতিহাস থেকে জানতে পারি। মিশরবাসীগণই সব চাইতে প্রাচীন বলে প্রখ্যাত। প্রাচীন মিশরবাসীগণের সর্বদাই বিধি বিধান ছিল এবং তাদের রাজনৈতিক সংগঠনও ছিল। কাজেই একদিকে যেমন আমাদের নতুনের অন্বেষণ করা আবশ্যক, অপরদিকে তেমনি প্রাচীন যা আবিষ্কৃত হয়েছে তার পুরো ব্যবহারও প্রয়োজন।

আমরা কিছু পূর্বে বলেছি, জমির মালিক হওয়া উচিত তাদের যাদের অস্ত্র আছে এবং শাসনব্যবস্থায় যারা পুরো অংশীদার। জমি কর্ষণকারী এবং জমির মালিক যে পৃথক, তেমন হবার কারণের কথাও আমরা বলেছি এবং যে পরিমাণ এবং যে প্রকৃতির ভূখণ্ড আবশ্যক তার কথাও বলা হয়েছে। এখন আমাদের প্রথম বলা আবশ্যক কর্ষণের প্রয়োজনে জমির বিভাগের কথা। তাছাড়া জমি যারা কর্ষণ করবে, তাদের প্রকৃতি কি হবে, এ বিষয়েরও আলোচনা আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে, যাঁরা বলেন সকল জমির মালিকানা হবে এজমালী অর্থাৎ যৌথ, আমরা তাঁদের সঙ্গে একমত নই। তবে সেই সঙ্গে আমরা একথাও বলি যে, জমির উৎপাদনকে যৌথ ভোগের একটি আপোষ-ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এবং নাগরিকদের কেউ যেন জীবীকার উপায়বিহীন না থাকে তার ব্যবস্থাও করতে হবে। যৌথভাবে আহার গ্রহণের ব্যাপারে একথা বলা যায় যে, এটা সাধারণভাবে স্বীকৃত যে, একটি সুশৃংখল সমাজে এই ব্যবস্থাটি খুবই উপকারী। আমরাও কেন এরূপ মনে করি, তার বিষয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করা যাবে। মোটকথা, সম্মিলিত ভোজের প্রথাটি যেখানে চালু আছে সেখানে সকল নগরিকেরই তাতে অংশ গ্রহণ করা আবশ্যক। অবশ্য দরিদ্রের পক্ষে তাদের সংসারের খরচ বহনকরা এবং এই ভোজের নির্ধারিত অর্থ প্রদান করা সহজ নয়। আর একটা ব্যাপারে সমাজকে সামগ্রিকভাবে দায়িত্ব নিতে হবে। ব্যাপারটি হচ্ছে দেবতাদের সামাজিক আরাধনা। তাহলে দেখা যাচ্ছে জমিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা প্রয়োজন : এর একভাগ যৌথ মালিকানার ভাগ, অপর ভাগ ব্যক্তিগত মালিকানার ভাগ। এর প্রত্যেকটিকে আবার আর দুটি ভাগে বিভক্ত করা দরকার। এজমালি ভাগের এক অংশ থেকে দেবতাদের সেবাদানের কার্য সাধিত হবে, অপর ভাগ থেকে যৌথ ভোজের প্রয়োজন মেটানো যাবে। ব্যক্তিগত মালিকানার জমির এক অংশ থাকবে সীমানার সন্নিকটে, অপর অংশ থাকবে নগরীর কাছে। এর ফলে প্রত্যেক নাগরিকেরই দুটি অংশ থাকবে এবং প্রত্যেক এলাকায় এর একটির অবস্থান ঘটবে। এটা যেমন ন্যায়সঙ্গত, তেমনি সমতা ভিত্তিক। তাছাড়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধের অবস্থায় এ ব্যবস্থা নাগরিকদের মধ্যে অধিকতর ঐক্যের সৃষ্টি করবে। দ্বিবিধ এই ব্যবস্থা না থাকলে যুদ্ধের কালে কেউ যুদ্ধকে একেবারে খাটো করে দেখে; আবার কেউ তার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে। কেউ কেউ সীমান্ত ঝগড়ার বিরোধকে হাল্কা করে দেখে, আবার অনেকে তাকে ভয়ানক গুরুতর বলে মনে করে এবং একে পরিহারের জন্য নিজেদের সম্মান বিসর্জন দিতেও দ্বিধা করেনা। এজন্য অনেক রাষ্ট্রে এরূপ নিয়ম দেখা যায় যে, সীমান্ত প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধের আশংকা দেখা দিলে যুদ্ধ সংক্রান্ত আলোচনাতে সীমান্তের অধিবাসীদের যুক্ত করা হয় না। কারণ সীমান্তের অধীবাসী হিসেবে বিরোধের ব্যাপারে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকার জন্য তারা সৎপরামর্শ দানে সক্ষম হবে না। কাজেই যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে এই যে, রাষ্ট্রের জমিকে, যে সকল কারণের কথা বলা হয়েছে তার ভিত্তিতে, ভাগ করা আবশ্যক এবং যারা জমি কর্ষণ করবে, যদি সম্ভব হয়, তারা দাস হবে,—অর্থাৎ দাসরা জমি কর্ষণে নিযুক্ত থাকবে। (এমন চিন্তা করতে অসুবিধা নেই,

কারণ আমরা আমাদের ইচ্ছানুযায়ী রাষ্ট্র তৈরীর নক্সা করছি।) এবং দেখতে হবে জমি কর্ষণকারী এই দাসগণ যেন একই জাতের কিংবা তেজী ধরণের না হয়। এর ফলে দেখা যাবে যে, তারা তাদের কার্য সাধনে বেশ উত্তম এবং তাদের মধ্যে বিদ্রোহের কোন প্রবণতা নেই। দাসদের বিকল্প হিসেবে এ কাজের জন্য দেশের অভ্যন্তরে বসতি স্থাপনকারী বিদেশীদের কথা আমরা চিন্তা করতে পারি। এদের প্রকৃতিও দাসের উল্লিখিত প্রকৃতির মত হবে। এদেরও দু'ভাগ থাকবে। একভাগ, যারা ব্যক্তিগত মালিকানার জমি কর্ষণ করবে এবং অপর ভাগ যারা যৌথ মালিকানার জমিতে নিযুক্ত হবে। জমিতে দাসদের কিরূপে ব্যবহার করতে হবে সে সম্পর্কে পরবর্তীতে আমার কিছু বলার ইচ্ছা আছে এবং দাসদের সামনে তাদের কাজের পুরস্কার হিসেবে কেন মুক্তিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকা উত্তম সে সম্পর্কেও একটি আলোচনা দরকার হবে।

একাদশ অধ্যায়

রাষ্ট্রের জন্য উত্তম জল বায়ুর প্রশ্ন

আমরা আগেই বলেছি নগরীর যেমন অভ্যন্তরের সঙ্গে, তেমনি সমুদ্রের সঙ্গে একটা সহজ যোগাযোগ থাকতে হবে। এবং সম্ভবমত রাষ্ট্রের সমস্ত এলাকা নগরী থেকে গম্য হতে হবে। এবং যে জমির উপর নগরী স্থাপিত হবে সে জমি ঢালু হওয়া আবশ্যক। অবশ্য এটা একটা আদর্শ অবস্থার কথা অর্থাৎ যেটি পাওয়ার আমরা চেষ্টা করব তার কথা। তবে চারটি শর্তকে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে। সবচাইতে বড় কথা হল, জায়গাটিকে স্বাস্থ্যপ্রদ হতে হবে। যে ঢালু জমি পূর্বমুখী এবং যার গায়ে সুর্যোদয়ের দিক থেকে বাতাস এসে লাগে সেটি একটি স্বাস্থ্যপ্রদ জমি। এ জমি উত্তর পার্শ্বের জমি থেকে ভাল। অবশ্য উত্তরের অবস্থানের অবহাওয়া উত্তম থাকে। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে নগরীর অবস্থান এমন হবে যাতে তার বেসামরিক এবং সামরিক কার্যাদি উত্তমভাবে সম্পাদন করা চলে। প্রতিরক্ষার দিক থেকে, যে অবস্থান থেকে আক্রমণকারীর উপর আঘাত হানা যায় কিন্তু আক্রমণকারীদের পক্ষে অগ্রসর হওয়া এবং ঘিরে ফেলা শক্ত, সেই অবস্থানটিকেই নির্বাচিত করা উচিত। জল, বিশেষ করে ঝরণার জলের প্রাচুর্য এবং যুদ্ধের সময়ে সরাসরি নিয়ন্ত্রণে রাখার মত জল থাকা প্রয়োজন। এর বিকল্পে একটি ব্যবস্থার আবিষ্কার দেখা যায় যাতে যুদ্ধের সময়ে প্রতিরক্ষকদের জলের জন্য দূরে গমন অসম্ভব হলে প্রচুর সংখ্যক পাত্রে বৃষ্টির জল ধরে রাখা হয়।

অধিবাসীদের স্বাস্থ্যের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ এবং যদিও এটি অংশত নগরীর অবস্থান এবং অংশত সঠিক-মুখী হওয়ার উপর নির্ভর করে তবু বিশুদ্ধ জলের সরবরাহের উপরও এর একটা নির্ভরশীলতা রয়েছে বলে জলের উপরও সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। অবস্থান এবং জলের সরবরাহের উপর আমরা বিশেষ জোর দিচ্ছি এ কারণে যে, জল এবং হাওয়া এই দুটো জিনিষ আমরা সবচাইতে বেশি এবং সদাসর্বদা ব্যবহার করি এবং আমাদের শারীরিক অবস্থার উপর এদের প্রভাবই সর্বাধিক। কাজেই যে রাষ্ট্র অধিবাসীদের কল্যাণ নিয়ে চিন্তিত তাকে পানীয় জলের প্রশ্নটিকে অন্যসব ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় জল থেকে আলাদাভাবে দেখতে হবে। অবশ্য সব জলই যদি ভাল হয় এবং ঝরণার সংখ্যা বেশী থাকে এবং তার জল পান করার যোগ্য হয় তাহলে এমন বিভাগের দরকার হবে না।

আত্মরক্ষামূলক স্থানসমূহের ক্ষেত্রে আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, যেটা এক ধরণের সরকারের জন্য উত্তম সেটা ভিন্ন ধরনের সরকারের জন্য উত্তম না হতে পারে। উঁচু কোন কেন্দ্রীয় দুর্গ ধনিকতন্ত্র (কতিপয়তন্ত্র) এবং রাজতন্ত্রের জন্য যেখানে উপযোগী সেখানে সমতলের দুর্গ গণতন্ত্রের উপযুক্ত। কিন্তু অভিজাততন্ত্রের জন্য এর কোনটিই উপযুক্ত নয়। অভিজাততন্ত্রের প্রয়োজন হচ্ছে বেশ কিছু সুরক্ষিত দুর্গের সারি। বেসরকারী বাসগৃহের উপযুক্ত এলাকা নির্বাচনে আধুনিক তথা হিপপোডামীয় পদ্ধতির একটা

নিয়মসিদ্ধতার সুবিধা রয়েছে। কার্যকারীতার দিকটি বাদে এর অধিকতর আকর্ষণীয়তার একটি দিক আছে। আত্মরক্ষার দিক থেকে আবাসগৃহের পুরোণ এলোমেলো অবস্থান অধিকতর উত্তম ছিল। বিদেশী ভাড়াটে সৈন্য এবং আক্রমণকারীদের পক্ষে এর ভিতরে প্রবেশ করা এবং এ থেকে বেরিয়ে আসা কঠিন ছিল। এ কারণে বলতে হয়, দুটি পদ্ধতিই ব্যবহার করা উচিত। এবং এটা সম্ভবও বটে। আঙ্গুরলতার মত ঘরগুলো সাজানো যায়। সারিবদ্ধভাবে নয়, বরঞ্চ গুচ্ছ গুচ্ছ ভাবে। সমগ্র নগরীর গৃহকে জ্যামিতিক ছকেও ফেলা উচিত নয়। বিভিন্ন এলাকায় এদের ছড়িয়ে রাখা ভাল। এতে নিরাপত্তা এবং শোভন দৃশ্য—উভয়েরই একটা সমন্বয় ঘটবে।

প্রাচীরের প্রশ্নে যারা বলে, যে-নগরী সাহসিকতার দাবী করে তার প্রাচীরের প্রয়োজন হয় না, তাদের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারিনে। এক্ষেত্রে যেসব নগরী এরূপ অহঙ্কার দেখিয়েছিল তাদের ভাগ্যে কি ঘটেছে তার দিকে তাকানোই যথেষ্ট। এটা নিঃসন্দেহে সত্য যে, কঠিন দেয়ালের কাছে নিরাপত্তা অন্বেষণে সম্মানের কিছু নেই। অন্তত যে-শত্রু সংখ্যায় সমান কিংবা সামান্য পরিমাণে অধিক শক্তিশালী তাদের হাত থেকে নিরাপত্তার জন্য প্রাচীন নির্মাণ তেমন সম্মানজনক ব্যাপার নয়। কিন্তু এমনটি ঘটতে পারে এবং ঘটতে দেখা গেছে যে, আক্রমণকারীর অধিকতর সংখ্যার সামনে গড়—মানুষ এবং বাছাই করা অল্পসংখ্যক আত্মরক্ষাকারীদের সাহস তেমন কোন কাজ দেয় না। কাজেই আমাদের নগরকে যদি আমরা রক্ষা করতে চাই এবং নগরবাসীদের নির্মমতা এবং নির্যাতন থেকে রেহাই দিতে চাই তাহলে আমাদের স্বীকার করতে হবে, প্রাচীর নগরীর যতখানি নিরাপত্তা প্রদান করতে পারে সেই নিরাপত্তাই হচ্ছে সর্বোত্তম সামরিক নিরাপত্তার ব্যবস্থাও বটে। আধুনিককালে একটা অবরুদ্ধনগরী আক্রমণের জন্য যে সকল ক্ষেপন যোগ্য অস্ত্র এবং সাঁজোয়া শক্তি তৈরি হয়েছে তার দৃষ্টান্ত থেকেও আমাদের এই কথার সত্যতা জোরদার হয়। নগরীর চারদিকে যদি ইচ্ছা করে প্রাচীর নির্মাণ করা না হয় তার অর্থ দাঁড়াবে আক্রান্ত হওয়ার অবস্থাকে স্বাগত জানানো এবং চতুষ্পার্শ্বের উঁচু জায়গাকে উন্মুক্ত করে রাখা। ভাবটি এমন যেন আমাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার জন্য তার চারপাশে আমরা দেয়াল তুলবনা কারণ তাতে আমাদের কাপুরুষ মনে হবে! আর একটা দিকেও দৃষ্টি না রাখা উচিত হবে না। একটি নগরীর চারপাশে যারা প্রাচীর তৈরি করে তারা তাদের নগরীকে সুরক্ষিত কিংবা অরক্ষিত—উভয় প্রকারেই দেখতে পারে। কিন্তু যাদের প্রাচীর নেই তাদের এরূপ চিন্তা করার কোন সুযোগ নেই। এই কথা যদি সত্য হয় তাহলে কেবল যে দেয়াল তৈরি করা আবশ্যক, তাই নয়, নগরীর দৃশ্য এবং তাকে রক্ষার ব্যবস্থা—এই উভয় দিক থেকে এই দেয়ালকে রক্ষা করাও প্রয়োজন। কারণ দেশরক্ষার প্রয়োজন আজকাল একাধিক। একদিকে যারা আক্রমণকারী তারা যেমন আক্রমণের সুবিধাজনক উপায়ের অন্বেষণ করে, তেমনি আত্মরক্ষাকারীদেরও প্রয়োজন হচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিতে নগরী রক্ষার অধিকতর উপযুক্ত উপায়কে আবিষ্কার করা। যে আক্রমণের মোকাবেলার জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুত থাকে শত্রু তাকে এমনকি আক্রমণেরও চেষ্টা করেনা।

দ্বাদশ অধ্যায়

নগরীর অবস্থান এবং তার বাজার, সড়কব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে

[নগরীর অবস্থান সম্পর্কে আরো কিছু কথা বলা হচ্ছে। বাজার, সড়ক, গ্রাম—ইত্যাদির কর্মচারীদের দায়িত্ব সম্পর্কে যে আলোচনা করা হচ্ছে তার উল্লেখ ষষ্ঠ পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ে দেখা গেছে।]

আমাদের পূর্বের আলোচনাতে আমরা বলেছি যে, নাগরিকদের বেশির ভাগকে কতগুলি ভোজন-কেন্দ্রে ভাগ করে দেওয়া উচিত এবং নগরীর প্রাচীরের মাঝে মাঝে সৈন্যবাহিনীর দ্বারা রক্ষিত দুর্গের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ থেকে এটিও বুঝতে পারা যায় যে, দুর্গের কিছুসংখ্যক এই ভোজন-কেন্দ্রের নিকট অবস্থিত হওয়া উচিত। এর বাইরে দেবতাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত সংস্থাগুলির এবং সরকারি দপ্তরসমূহের ভোজন কেন্দ্রগুলি কেন্দ্রীয়ভাবে একই জায়গাতে অবস্থিত হওয়া উচিত। ধর্মীয় বিধান কিংবা ডেলফির এ্যাপোলোর যদি ভিন্নতর কোনো ঘোষণা থাকে তবে এগুলির অবস্থান পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। উত্তমভাবে দৃষ্ট হওয়ার যে উদ্দেশ্যের কথা আমরা বলেছি সে উদ্দেশ্য সম্মুখের দৃশ্য সম্বলিত এবং নগরীর প্রতিবেশী অংশসমূহ থেকে সহজে আত্মরক্ষার উপায়সহ একটি অবস্থান দ্বারাই সাধিত হতে পারে। ঠিক এর নিম্নদেশেই থেসালি যাকে 'অবাধ বাজার' বলে অভিহিত করেছে তেমন একটি উন্মুক্ত প্রাঙ্গন তৈরি করা যায়। এখানে কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত নিম্ন শ্রেণীর লোক কিংবা পল্লী এলাকা থেকে আগত কেউ কোনো কিছুর ক্রয় বিক্রয় করতে পারবেনা। এই এলাকাটির সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে যদি প্রবীণদের স্বাস্থ্যকেন্দ্র এখানেই অবস্থিত হয়। কারণ শরীর চর্চার ব্যাপারেও বিভিন্ন বংশের লোকদের পৃথক রাখা উচিত। অর্থাৎ তরুণদের একস্থানে এবং অধিকতর বয়স্কদের অপর স্থানে রাখা শ্রেয়। সরকারি কর্মচারীদের অবস্থান বয়স্কদের সঙ্গে হবে। তবে সরকারি কর্মকর্তাদের তরুণদের সঙ্গেও মেশা আবশ্যক। কারণ কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিদের উপস্থিতি তরুণদের মনে উচ্চতর শ্রেণীর জন্য একটা সম্মান ও মান্যতাবোধের সৃষ্টি করবে। যথার্থ বাজার যেটি, অর্থাৎ বেচাকেনার যে জায়গা, তাকে ভিন্নতর একটি সুবিধামতো জায়গাতে বসাতে হবে যাতে বন্দরের দ্রব্যসমূহের এবং দেশের অভ্যন্তরের মানুষের আগমন এখানে সহজে ঘটতে পারে।

রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষকে আমরা যদি জাগতিক এবং ধর্মীয়, এই হিসাবে বিভক্ত করি তাহলে পুরোহিতদের ভোজন কেন্দ্রগুলি মন্দিরের নিকটেই অবস্থিত হওয়া উচিত। এর বাইরে সরকারি অপর সব দপ্তর যথা চুক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত দপ্তর, আইনগত বিরোধ এবং সমন জারির সঙ্গে সম্পর্কিত কিংবা এ সব বিষয়ের নিয়ম-শৃঙ্খলা বিন্যাসকারী (বাজার তদারকী দপ্তরসহ) দপ্তরগুলি বাজার এবং সাধারণ সভাস্থলের নিকটবর্তী এলাকায় অবস্থিত হওয়া

প্রয়োজন। এ গুলি অবশ্যই দালালদের বাজার হবে, কারণ এখানেই পণ্যসমূহের বিনিময়ের ব্যবস্থা থাকবে। উর্ধতর যে এলাকার কথা আমরা বলেছি সেটি অবসর বিনোদনের জন্য নির্দিষ্ট হবে। অনুরূপ ব্যবস্থা দেশের অভ্যন্তরস্থ এলাকার জন্যও করা আবশ্যক। কারণ সেখানেও বিভিন্ন শ্রেণী—যথা বনবিভাগীয় কর্মচারী কিংবা মাঠ পরিদর্শনকারী, কিংবা ইত্যাকার যে নামেই তারা অভিহিত হোক—তাদের অবস্থান করতে হবে এবং তাদের জন্য ভোজনের কেন্দ্র এবং আত্মরক্ষার জন্য দুর্গ-ঘাটিও তৈরি করতে হবে। এবং দেবতাদের এবং বীরপুরুষদের মন্দির ও স্মৃতিসৌধ দেশব্যাপী বিস্তারিত হতে হবে।

এই সবগুলির বিস্তারিত উল্লেখের কোনো প্রয়োজন এখন নেই। কারণ কি কি বিষয়ের আবশ্যক হবে তা চিন্তা করা খুব কঠিন ব্যাপার নয়। কঠিন হচ্ছে তাদের ব্যবস্থা করা। আমাদের এই আলোচনা হচ্ছে আমাদের ইচ্ছার প্রকাশ। কিন্তু এর ফলাফল ভাগ্যের হাতে। কাজেই এগুলির কথা অধিক আর না বলে আমরা বরঞ্চ এবার পলিটিয়া সম্পর্কেই আলোচনা শুরু করব।

[এই কথা মতো এ্যারিস্টট্‌ল যাকে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন সেই পলিটিয়া (শাসনব্যবস্থা) সম্পর্কে আলোচনা এবার শুরু করছেন। এ ক্ষেত্রে আমাদের সাধারণভাবে এটি খেয়াল রাখা ভাল যে, পলিটিয়া মূলত মানুষের সম্মেলন। এদের সংখ্যা কম কিংবা বেশি যাই হোক এরা অবশ্যই 'উত্তম' মানুষ। এরা মিলিত হয়েছে শাসনতন্ত্রের বিধান মতো নির্ধারিত নৈতিক, আত্মিক, মানসিক এবং শৈল্পিক মানের স্বীকৃতির ভিত্তিতে। কাজেই এ কথা সহজেই আসছে যে, সকল নাগরিককে এই সকল গুণে শিক্ষিত হতে হবে। যে নাগরিক তাকে অবশ্যই তার নগরীর আদর্শ বা মানকে জানতে হবে। কাজেই প্লেটোর ক্ষেত্রে যেমন, এ্যারিস্টট্‌ল-এর ক্ষেত্রেও তেমনি, যে কোনো শাসনব্যবস্থার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আগামীতে যারা নাগরিক হবে তাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। প্লেটো এবং এ্যারিস্টট্‌ল-এর সার্বক্ষণিক চিন্তাই ছিল শিক্ষার চিন্তা। আদর্শ রাষ্ট্র রচনার ক্ষেত্রে সেই শিক্ষার বিষয়টি যে প্রধান হয়ে উঠবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এবং একথাও স্পষ্ট যে, আদর্শ রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থাকে হতে হবে আদর্শ। এ কারণেই 'পলিটিকস' গ্রন্থের যে আলোচনা ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে তার অবশিষ্টাংশে আমরা পাই তার মূল হচ্ছে শিক্ষা তথা শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতি।

কিন্তু এ আলোচনার শুরুতেও আবার সুখের উল্লেখ করা হচ্ছে। কারণ শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তম এবং সুখী জীবন যাপন। এ্যারিস্টট্‌ল-এর অভিযোগ হচ্ছে আলোচনার এই দিকটি প্লেটোর মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে অবজ্ঞাত হয়েছে। সুখের আলোচনা ইতিপূর্বে হয়েছে বলে এ্যারিস্টট্‌ল যে উল্লেখ করছেন তার সাক্ষাৎ তাঁর নীতিশাস্ত্রে পাওয়া যায়।]

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রাষ্ট্রের লক্ষ্য কি?

আমাদের এবার খোদ শাসনব্যবস্থা নিয়ে আলাপ করা আবশ্যক। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে একটি সুখী এবং সুশাসিত নগরী কোন্ ধরনের মানুষ দ্বারা গঠন করা সম্ভব। সকল মানুষেরই কল্যাণ নির্ভর করে দু'টো জিনিসের উপর : একটি হচ্ছে সঠিক লক্ষ্যকে নির্দিষ্ট করা। যে উদ্দেশ্য অভিমুখে সকল কর্ম পরিচালিত হবে সেই উদ্দেশ্যকে নির্বাচিত করা। অপরটি হচ্ছে তেমন সুনির্দিষ্ট কর্মসম্পাদন, যে কর্মের মাধ্যমে উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারবে। এই দুটির যেমন মিলন ঘটতে পারে, তেমনি এই দুটির মধ্যে বিরোধেরও উদ্ভব হতে পারে। যেমন দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় যে, অনেক সময়ে দেখা যায়, উদ্দেশ্য উত্তমভাবে নির্বাচিত হয়েছে, কিন্তু কার্য দ্বারা মানুষ সে উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যর্থ হচ্ছে। আবার অন্য ক্ষেত্রে দেখা যায়, কার্যপদ্ধতি ঠিক আছে কিন্তু উদ্দেশ্যের নির্বাচনটি ঠিক হয়নি। অথবা মানুষের উভয়ক্ষেত্রে ভুল এবং ব্যর্থতা হতে পারে। নিরাময় শাস্ত্রে এরূপ অনেক সময়ে ঘটে। কারণ চিকিৎসাবিদ অনেক সময়ে স্থির করতে পারেন না, রুগীর জন্য স্বাস্থ্যকর কি হবে, কিংবা উপায় ঠিক করতে পারেন না যার দ্বারা নির্ধারিত লক্ষ্যটি অর্জন করা যাবে। যেখানে ক্ষেত্রগত দক্ষতা এবং জ্ঞানের আবশ্যক সেখানে এই দু'টি দিকই আয়ত্তে থাকতে হবে। অর্থাৎ লক্ষ্য এবং লক্ষ্য সাধনের উপায়—উভয়ই সঠিক হতে হবে।

যাহোক, এটা পরিষ্কার যে সুখ এবং উত্তম জীবন সকলেরই কাম্য। কিন্তু অনেকে যেমন একে লাভ করতে পারে, তেমনি অনেকে আবার একে লাভ করতে পারেওনা। এর মূলে তার ভাগ্য কিংবা প্রকৃতিগত প্রবণতাও হতে পারে। মানুষের জীবনে এই দুইএরই একটি ভূমিকা আছে। উত্তম জীবনের জন্য উত্তম দ্রব্যাদি আবশ্যক। তবে প্রকৃতিগত প্রবণতা যদি উত্তম হয় তাহলে এদের পরিমাণ যেমন কম হলেও চলে, প্রবণতা অধম হলে এর পরিমাণ অধিকতর হওয়া আবশ্যক। এমন অনেককে দেখা যায় যে, তারা শুরু করেছিল উত্তম সব সুযোগ নিয়ে, কিন্তু তবু প্রথম থেকেই সুখ লাভে তারা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য যখন সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা গঠন করা এবং সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থার অর্থ যেখানে সুশৃঙ্খলভাবে নগরীর শাসন এবং আমরা যেখানে সেই নগরীকেই সর্বোত্তম বলে অভিহিত করি যে নগরীতে সুখের সম্ভাবনা সবচাইতে বেশি তখন এটা পরিষ্কার যে, সুখের সঠিক ধারণাটিকে সর্বদাই আমাদের মনের সামনে ধরে রাখতে হবে। সুখের একটি সংজ্ঞা আমরা নীতিশাস্ত্রে দিয়েছিলাম। সেই সংজ্ঞাটিকে এখানে আবার আমরা উল্লেখ করতে পারি। আমরা বলেছিলাম : সুখ হচ্ছে কার্য। আমাদের সকল দক্ষতা, সকল উত্তম গুণের শর্তহীন ব্যবহার দ্বারা কার্য সম্পাদনই হচ্ছে দক্ষতা, সকল উত্তম গুণের শর্তহীন ব্যবহার দ্বারা কার্য সম্পাদনই হচ্ছে সুখ। এখানে 'শর্তসাপেক্ষ' এবং 'শর্তহীন' কথা দ্বারা বুঝাতে চাচ্ছি যে 'শর্তসাপেক্ষ' কর্ম হচ্ছে বিশেষ অবস্থার ভিত্তিতে সম্পাদিত কর্ম আর

'শর্তহীন' কর্ম হচ্ছে নৈতিক বা মহৎ কারণে কৃত কর্ম। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, প্রয়োজনের ভিত্তিতে কর্ম হচ্ছে ন্যায় সাধন করা, ন্যায্য ক্ষতিপূরণ আদায় করা, ন্যায্য দাণ্ড আরোপ করা। এগুলির উৎস হচ্ছে ন্যায়বোধ। কিন্তু এগুলি প্রয়োজনের ভিত্তিতে সাধন করা হয় এবং এদের মধ্যে মহৎ বা উত্তম যা আছে তা প্রয়োজন দ্বারাই নির্দিষ্ট। (এমন অবস্থা যদি পাওয়া যায়, যেখানে রাষ্ট্র কিংবা ব্যক্তি কারুর জন্য এরূপ কর্মের আবশ্যক হবে না—তবে সেটি অবশ্যই একটি কাম্য অবস্থা হবে।) অপরপক্ষে আমরা বলবো সম্মান এবং জীবন ধারণের উচ্চমানের জন্য সম্পাদিত কর্ম শর্তহীনভাবেই সম্পাদিত উত্তম কর্ম। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে যেখানে অধম অবস্থা অপনোদনের জন্য কার্য সম্পাদিত হয়েছে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তেমনটি হয়নি। দ্বিতীয় কর্ম দ্বারা আমরা নির্দিষ্টভাবে উত্তমকেই সৃষ্টি করি।

যে উত্তম মানুষ সে রোগ, দারিদ্র্য এবং দুর্ভাগ্যকে মহত্ত্বের সঙ্গে ধারণ করে। কিন্তু সুখের জন্য প্রয়োজন এর বিপরীত। (এ সংজ্ঞাটিও আমরা আমাদের নীতিশাস্ত্রের আলোচনাতে দিয়েছিলাম। আমরা বলেছিলাম, যে মানুষের চোখে উত্তম হচ্ছে তার ন্যায়ের কারণে উত্তম, সেই মানুষের কাছেই উত্তম হচ্ছে শর্তহীনভাবে উত্তম। এবং এ কারণে যা কিছু সংঘটিত হয় তা তার কাছে শর্তহীনভাবেই মহৎ এবং উত্তম।) এ কারণেই মানুষ মনে করে সুখের কারণ আমাদের মনের মধ্যে নিহিত নয়, সুখের হেতু পার্থিব দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে নিহিত। এ প্রায় বীণার দক্ষবাদনকে বাদকের উপর আরোপ না করে বীণার তারের গুণের উপর আরোপ করার সামিল।

আমরা যা এতক্ষণ বলেছি তা থেকে এটি পরিষ্কার যে, শুরুতে কিছু জিনিসের অবশ্য আবশ্যক, কিন্তু বাকিগুলির ব্যবস্থা আইনদাতাকে করতে হবে। আমরা অবশ্যই আশা করবো ভাগ্যের যা দান করার ক্ষমতা আছে তার সকল সৌভাগ্যেই আমাদের নগরী সম্পদবান হবে। কিন্তু ভাগ্য নগরীকে উত্তম করতে পারে না। সেটি নির্ভর করে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা এবং সুচিন্তিত নীতির উপর। অপরদিকে একটি নগরীর যা কিছু উত্তম তা নির্ভর করে নাগরিকদের উপর। তারাই শাসনব্যবস্থাকে উত্তম করার ক্ষেত্রে তাতে অংশগ্রহণ করে। তাহলে প্রশ্নটা দাঁড়ায় : একজন মানুষ কেমন করে উত্তম হয়? এমন যদি হয় যে, সকল মানুষই উত্তম, কেবল ব্যক্তিগতভাবে নাগরিকরা নয়, তাহলে অবস্থাটি অধিকতর ভালো হতো। কারণ সকল বললে প্রত্যেকেই তার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। কিন্তু মানুষের উত্তমতা নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর। এগুলি হচ্ছে প্রকৃতি, স্বভাব বা শিক্ষা এবং যুক্তি। প্রথমে প্রকৃতির কথা ধরা যাক : মানুষকে উত্তম হতে হলে তাকে প্রথমে, অপর কিছু হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবে জন্মগ্রহণ করতে হবে; তার মানুষের একটি দেহ এবং মানুষের মন থাকতে হবে। তবে কোনো গুণ নিয়ে জন্মগ্রহণ করাটা বড় না হতে পারে। কারণ অভ্যাস এবং শিক্ষা মানুষকে পরিবর্তিত করে দেয়। কতকগুলি গুণ আছে যাদের দুটি সম্ভাবনা আছে : পরবর্তী অভ্যাস তাদের উত্তম কিংবা অধমে পরিবর্তিত করতে পারে। বেশির ভাগ প্রাণী প্রকৃতিগতভাবেই জীবন ধারণ করে। কিছু আছে যাদের উপর অভ্যাসেরও কিছু প্রভাব আছে। কিন্তু প্রাণীর মধ্যে একমাত্র মানুষেরই যুক্তির ক্ষমতা আছে এবং মানুষ যুক্তি সহকারেও বাঁচে। মানুষের উত্তম হওয়ার জন্য এই তিনের সমন্বিত ক্রিয়ার আবশ্যক। যুক্তি মানুষকে অনেক কিছু অভ্যাস এবং প্রকৃতির বিরুদ্ধেও করাতে পারে। যুক্তি যদি বলে যে এটাই করণীয় এবং অধিকতর উত্তম তখন মানুষ সেটা করে। পূর্বের একটি অধ্যায়ে আমরা বলেছি, মানুষ যাতে আইনদাতার অনুগত হয় তার জন্য প্রকৃতি কি অবদান রাখতে

পারে। এটি হয়ে গেলে পরবর্তী বিকাশ নির্ভর করে শিক্ষার উপর। শিক্ষার ব্যাপারে অবশ্য মানুষ অংশত শেখে শিক্ষার মাধ্যমে এবং অংশত শেখে শ্রবণের মাধ্যমে।

[ব্যক্তিক শাসনকে যদি আমরা অপরিবর্তিতভাবে গ্রহণ করি এবং তার প্রয়োজনীয় শর্তসমূহ যদি বাস্তবে থাকে তাহলে নাগরিকদের শিক্ষাদানের ব্যাপারটি যে শাসন ব্যক্তিগত নয়, যে শাসনে সকলেই পালাক্রমে দায়িত্ব গ্রহণ করে, তা থেকে বিশেষভাবেই ভিন্ন হবে। এ্যারিস্টট্‌ল তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের আলোচনাতে প্রথম ধরনের শাসনব্যবস্থা যে একেবারে নাকচ করে দিচ্ছেন, তা নয়। তৃতীয় পুস্তকে এর উল্লেখ আছে। সেখানে রাজার একচ্ছত্র শাসনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু সেই প্রকার শাসনব্যবস্থা বাস্তবে কার্যোপযোগী নয় বলে এ্যারিস্টট্‌ল তাকে অগ্রাহ্য করেছেন। কাজেই বর্তমানের প্রধান প্রশ্ন হলো : মানুষকে নাগরিকতায় কেমন করে শিক্ষিত করে তুলতে হবে, কেমন করে তাদের নৈতিক ও বুদ্ধিগত মানকে বৃদ্ধি করা যায়, যাতে তারা পালাক্রমে সকলে শাসন করতে পারে এবং যখন শাসনে থাকবেনা তখন তাদের এই ভাগ্যকে সমভাবে তারা গ্রহণ করতে পারবে। এই পদ্ধতির ভালোর দিক হচ্ছে এই যে, এতে মানুষের সাম্যের দাবির সন্তুষ্টি ঘটবে। এবং এটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আকাঙ্ক্ষাকে অতৃপ্ত রাখা বিপজ্জনক। এ ব্যবস্থায় নাগরিক ন্যায় এবং যোগ্যতা উভয় দিকে দৃষ্টিদানের সুযোগ পাবে। এ ব্যবস্থায় শাসকশ্রেণীর মধ্যে কেবল বয়সের পার্থক্য দাঁড়াবে, অপর কিছুর নয়।]

চর্তুদশ অধ্যায়

শাসক এবং শাসিতের স্থান কি অপরিবর্তনীয়?

রাষ্ট্র যখন শাসক এবং শাসিত নিয়ে তৈরি তখন প্রশ্ন দাঁড়ায় শাসক এবং শাসিত কি সমগ্র জীবনব্যাপী অপরিবর্তিত থাকবে—অথবা তাদের পরিবর্তন ঘটা আবশ্যক। কারণ এই প্রশ্নের জবাবের উপরই নির্ভর করবে কোন্ ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন হবে। এমন যদি হয় যে দেবতা এবং বীরদের আমরা যেমন সাধারণ মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করি তেমনি রাষ্ট্রের মধ্যেও একশ্রেণীর মানুষ অপর শ্রেণীর মানুষ থেকে তাদের দৈহিক এবং মানসিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ এবং পৃথক এবং সে কারণে একদলের শাসক হওয়ার দক্ষতা এবং দাবি শাসিতদের কাছে সুস্পষ্ট এবং সন্দেহাতীত, তাহলে অবশ্যই উত্তম হবে যদি শাসকরা সর্বদা শাসন করে এবং শাসিতগণ সর্বদা শাসিত হয়। কিন্তু এমন অবস্থা যখন সহজে পাওয়া যায় না এবং লেখক সাইলাকস্ ভারতবর্ষ সম্পর্কে যেমন বলেছেন তেমনি রাজারা যখন প্রজাদের চেয়ে খুব বেশি শ্রেষ্ঠ নয়, তখন একাধিক কারণেই আমাদের বলতে হয় যে, শাসনের ক্ষেত্রে সকলেরই পালাক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে।[১] কারণ সমতা বলতে নির্বিচার সমতাকে আমরা বুঝাচ্ছিনে : সমতা হচ্ছে যারা এক প্রকারের তাদের মধ্যে সমতা। এই নীতিকে আমরা ন্যায্য বলবো—এবং এর অন্যথা হলে শাসনব্যবস্থা যে অধিক দিন স্থায়ী হতে পারে না, এ কথাও সত্য। কারণ, সেক্ষেত্রে শাসিতের মধ্যে সর্বদা একটি বড় বিদ্রোহাত্মক অংশ বিরাজ করবে। এবং এমন ক্ষেত্রে কোনো শক্তিশালী সরকারের পক্ষেও একে ঠেকানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

তাছাড়া, শাসিতের চেয়ে শাসককে যে শ্রেষ্ঠ হতে হবে, এতে কোনো প্রশ্ন উঠতে পারে না। কাজেই আইনদাতাকে দেখতে হবে কিভাবে দু'এর এই পার্থক্য রক্ষা করা যায় এবং কিভাবে তাদের শাসনে অংশগ্রহণ করানো যায়। আমরা পূর্বে বলেছি যে, প্রকৃতি তার সৃষ্টির মধ্যে একটা পার্থক্যের বিধান করে রেখেছে, যথা জন্মগতভাবে যারা একই শ্রেণীর তাদের মধ্যে অধিক বয়স্ক এবং অল্পবয়স্ক হিসাবে একটা পার্থক্য আছে। এদের মধ্যে প্রথমোক্ত অর্থাৎ অধিক বয়স্করা শাসন করার জন্য অধিকতর উপযুক্ত এবং অল্পবয়স্করা শাসিত হওয়ার জন্য উপযুক্ত। বয়সের জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে আদেশদানের এই নিয়মের বিরুদ্ধে কারুর আপত্তি কিছু থাকতে পারে না কিংবা কেউ একমাত্র নিজেকেই এর উপযুক্ত বিবেচনা করতে পারেনা। কারণ প্রত্যেকেই জানে সে যখন প্রয়োজনীয় বয়সে উপনীত হবে তখন সে তার প্রতীক্ষার ফল পাবে। এ থেকে বুঝা যায় যে, 'একই ব্যক্তি যেমন শাসক, তেমনি, শাসিত' এ কথা যেমন আমরা অবশ্যই বলতে পারি, তেমনি একথাও সত্য

১. এ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের' উল্লেখ এ্যারিস্টট্লের স্বভাবগত জিজ্ঞাসা এবং জ্ঞানের বিস্তারের একটি তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত।—স. ফ. ক

যে, শাসক ও শাসিতের মধ্যে পার্থক্য আছে। কাজেই এক অর্থে তাদের শিক্ষা যেমন একই প্রকারের, তেমনি আবার তা ভিন্ন প্রকারের। কারণ এটা প্রায়ই বলা হয় যে, যে ব্যক্তি উত্তম শাসক হতে চায়, তাকে প্রথমে শাসিত হতে হবে। (শাসনের ক্ষেত্রে আমরা পূর্বে বলেছিলাম, শাসন হচ্ছে দুপ্রকারের। অর্থাৎ যে শাসন শাসকের নিজের স্বার্থে, সে শাসন হচ্ছে স্বৈরশাসন; এবং যে শাসন শাসিতের কল্যাণের জন্য, সে শাসন হচ্ছে স্বাধীন নাগরিকের উপর শাসন। একই কাজ এই দুই শাসনের যে কোনোটিতেই সম্পাদিত হতে পারে—কিন্তু তার লক্ষ্য হবে শাসন অনুযায়ী ভিন্ন। এ কারণে এমন অনেক কাজ আছে যা মনে হবে দাসোচিত, সে কাজ স্বাধীন নাগরিকও সম্মানের সঙ্গে সম্পাদন করতে পারে। তাদের মধ্যকার অল্পবয়স্করাও তা করতে পারে। কারণ কোনো কাজ মহৎ কিংবা মহৎ নয়—তা কেবলমাত্র কাজটি বিবেচনা করে নির্দিষ্ট করা যায় না—তা নির্ধারিত হবে কাজের লক্ষ্যের ভিত্তিতে এবং কাদের স্বার্থে কার্যটি সম্পাদিত হচ্ছে তা বিবেচনার উপর।) কিন্তু আমরা যখন বলেছি, নাগরিকমাত্রের গুণ হচ্ছে অভিন্ন, যখন বলেছি, শাসক এবং সর্বোত্তমের গুণও হবে একই প্রকারের এবং যে শাসক হবে তাকে প্রথমে শাসিত হতে হবে, তখন শাসনব্যবস্থার যে পরিকল্পনাকারী তাঁর দায়িত্ব হচ্ছে এমন ব্যবস্থা করা যাতে রাষ্ট্রের যারা নাগরিক তারা যেন মহৎ হয় এবং তাঁকে স্থির করতে হবে কোন্ কার্য তাদের মহৎ করতে পারে এবং সর্বোত্তম জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কি হবে।

[কাজেই শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শাসকশ্রেণীকে তৈরি করা। অথবা বলা চলে এমন একটি শ্রেণীকে তৈরি করা যে শ্রেণী প্রয়োজন অনুযায়ী শাসন করতে সক্ষম হবে। এ্যারিস্টট্‌ল তাঁর শিক্ষার আলোচনা শুরু করেছেন মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা দিয়ে। শিক্ষার মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি কি? শিক্ষার ক্ষেত্রে আত্মার যে অংশ যুক্তি দিয়ে গঠিত সেই অংশই শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। শাসকদের জন্য অবসর আবশ্যক। কিন্তু এখানে অবসর বা অবকাশ বলতে কর্মহীনতা নয়। কিংবা আনন্দ উপভোগ নয়। অবসর হচ্ছে এমন কর্মের সম্পাদন যা মহৎ এবং সম্পাদিত হয় নিজের কারণেই। অর্থাৎ যে কর্ম কোনো উপায় না। যে কর্ম নিজেই লক্ষ্য।]

আমরা আত্মাকে দু'টো ভাগে ভাগ করতে পারি। এর এক ভাগ হচ্ছে যুক্তি। অপর ভাগ যুক্তি নয়, কিন্তু যুক্তিকে অনুধাবন করার যে যোগ্যতা রাখে। আত্মার এই যুক্তির মধ্যেই সে সব গুণের অধিষ্ঠান যে গুণের ভিত্তিতে আমরা কোনো মানুষকে উত্তম বলে অভিহিত করি। আত্মার যে বিভাগের কথা আমরা বলছি সে বিভাগকে যারা স্বীকার করে তাদের পক্ষে 'উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কোন্ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত' সে প্রশ্নের জবাব কঠিন নয়। কারণ যে অধম সে উত্তমের উপায় হবে। এটা প্রকৃতির ক্ষেত্রে যেমন সত্য, মানুষ তার দক্ষতার ভিত্তিতে যে পরিকল্পনা তৈরি করে তার ক্ষেত্রেও এটা সত্য। এবং এখানে যুক্তি হচ্ছে উত্তম তথা শ্রেয়। এছাড়া আমরা স্বভাবগতভাবে ব্যবহারিক যুক্তি এবং তত্ত্বগত যুক্তির মধ্যেও পার্থক্য আছে বলে মনে করি। সে হিসাবে আত্মার যুক্তির অংশকেও আমাদের ভাগ করা আবশ্যক। কার্যের ক্ষেত্রেও এরূপ ভাগের প্রয়োজন হবে। প্রকৃতিগতভাবে যে অধিকতর উত্তম তা থেকে উৎসারিত এবং সর্বমোট তিনপ্রকারকে আমরা পাই : প্রথমত, যুক্তির দু'টি ভাগ থেকে। নির্বাচনের ক্ষেত্রে এ দু'টিকে সর্বপ্রথম বিবেচনা করতে হবে এবং তিনটি কিংবা দু'টি থেকে নির্বাচনের প্রশ্ন হলে—এই দু'টিকে নির্বাচিত করতে হবে। যে কোনো

মানুষ যখন উত্তমকে নির্বাচন করে, তখন সে তার ক্ষমতা দ্বারা অর্জনযোগ্য সর্বোত্তমকেই নির্বাচিত করবে।

তাছাড়া আমরা আমাদের সমগ্র জীবনকেও কর্ম এবং অবকাশ—যুদ্ধ এবং শান্তি, এভাবে বিভক্ত করতে পারি। এবং কর্মকে একদিকে নৈতিক মূল্য সম্পন্ন এবং অপরদিকে এমন মূল্য সম্পন্ন নয়, এরূপ ভাগে বিভক্ত করতে পারি। আত্মার বিভাগের মতো, এখানেও নির্বাচনের ক্ষেত্রে অধমকে উত্তমের উপায় হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। অন্যকথায় বলতে গেলে আমরা শান্তির জন্য যুদ্ধ এবং অবকাশের জন্য কর্মকে এবং মহতের জন্য দৈহিক শ্রমকে নির্বাচিত করি। কাজেই যে রাষ্ট্র-প্রাজ্ঞের দায়িত্ব হচ্ছে আইন রচনা করা, তাঁর এসমস্ত দিকে খেয়াল রাখতে হবে। আত্মার বিভাগের প্রতি যেমন, তেমনি সেই বিভাগ থেকে যে কর্ম উৎসারিত হয় তার দিকে তাঁর দৃষ্টি রাখতে হবে। তাঁর অধিকতর দৃষ্টি দিতে হবে অধিকতর উত্তম কর্ম এবং উত্তম লক্ষ্যের প্রতি। মানুষের জীবন তথা তার করণীয় সম্পর্কেও আইন প্রণেতাকে বিবেচনা করতে হবে। কারণ মানুষকে যেমন কার্যসম্পাদন করতে হবে, সংগ্রাম করতে হবে, তেমনি তার চেয়েও অধিক তাকে শান্তিতে এবং সংস্কৃত-অবকাশে জীবন যাপন করতে হবে যেন সে জীবনে কেবল প্রয়োজনীয় কর্ম নয়, বরঞ্চ অধিকতরভাবে আপন মূল্যে মূল্যবান কর্ম সে সম্পাদন করতে পারে। এবং বয়স্ক অবস্থাতেই শিক্ষার কথা বলি কিংবা শিশুদের শিক্ষাই বলি, এগুলি সাধন করাই হবে আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য।

[কিন্তু এই লক্ষ্যগুলিকে সর্বদা স্বীকার করা হয়না। স্পারটার শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি হচ্ছে এই যে, সে শিক্ষাতে যুদ্ধকে শান্তির চাইতে অধিক মূল্যবান মনে করা হয়। এ্যারিস্টট্‌ল স্পারটার সমরবাদকে ইতিপূর্বেও সমালোচনা করেছেন। দ্বিতীয় পুস্তক দ্রষ্টব্য। প্লেটোর 'লজ' গ্রন্থেও এর সমালোচনা করা হয়েছে। এখানে সেই সমালোচনার উল্লেখের মধ্যে জোর দেওয়া হচ্ছে এই ব্যবস্থার প্রণেতার উপর। এই ব্যবস্থার প্রণেতার উপরই সমালোচনার খড়গকে প্রয়োগ করা হচ্ছে। কিন্তু লাইকারগাস কিংবা অপর কাউকে নাম উল্লেখ করে নির্দিষ্ট করা হচ্ছে না। এর পটভূমি হিসাবে একথা বলা যায় যে, এ্যারিস্টট্‌লের সময়ের পূর্বেই স্পারটার সমরবাদের শেষ সূচিত হয়েছিল।]

কিন্তু একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে যে, প্রখ্যাত গ্রিকগণ এবং আইনবিদগণ যাঁরা বিভিন্ন শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁরা সর্বোত্তম লক্ষ্য সামনে রেখে এবং শিক্ষা ও আইনব্যবস্থাকে সকল মহৎগুণের সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পরিচালিত করে সমাজকে গঠন করেননি। বরঞ্চ স্থূলভাবে চিন্তার পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁরা লাভজনক এবং ব্যবহারিক গুণসমূহ অর্জনের দিকে তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন। এঁদের সঙ্গে সাম্প্রতিক কালের অনেক রচনাকারীকেও আমরা যুক্ত হতে দেখি। দেখা যায় যে, তাঁরা ল্যাসিডিমোনীয়দের (স্পার্টার) শাসনব্যবস্থাকে সমর্থন করছেন। তাঁদের আইন দাতাকে তাঁরা প্রশংসা করছেন। কারণ তিনি সকল কিছু পরিচালিত করেছেন যুদ্ধ এবং জাতীয় শক্তির দিকে লক্ষ্য রেখে। এই সমরবাদী নীতির যুক্তিগত খণ্ডন কোনো কঠিন ব্যাপার নয়। এবং আমাদের নিজেদের জীবনকালের ঘটনাই তাকে খণ্ডন করেছে। মানুষের অধিকসংখ্যকই অপরের উপর নিজের আধিপত্য বিস্তার করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। কারণ এই আকাঙ্ক্ষার সাফল্য পার্থিব সম্পদের প্রাচুর্য আমাদের জন্য বহন করে আনে। আর এজন্যই লেখক থিবরান পরিষ্কাররূপে ল্যাকোনিয়ার আইনবিদের একজন প্রশংসাকারী হয়ে ওঠেন। অন্যদের

ক্ষেত্রেও দেখা যায় তাঁরা স্পারটার শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, স্পারটাবাসীগণ যেহেতু বিপদকে মোকাবেলার জন্য শিক্ষিত হয়েছে, সেজন্যই তারা অপর অনেকের উপর তাদের শাসন বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু আজ যখন স্পারটার আধিপত্যের দিন আর নেই তখন এটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, তারা একটি সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী জাতি নয় এবং তাঁদের আইনদাতার চিন্তা ভুল ছিল। তারা যে তাদের উত্তম জীবনকে বজায় রাখতে ব্যর্থ হলো—যদিচ তারা তাদের শাসনব্যবস্থাকেই আকড়ে ছিল এবং তাদের নিজেদের আইন এবং প্রথার ব্যবহারে বাধা প্রদানের কেউ ছিল না—এই ঘটনার মধ্যেই হাস্যকর একটি দিক আছে বলে আমাদের মনে হয়।

তাছাড়া এ অভিমতও ঠিক নয় যে, আইনদাতা দক্ষতা অর্জনকেই তাঁর প্রকাশ্য ঘোষণার বিষয়তে পরিণত করবেন। কারণ স্বাধীন নাগরিকের উপর শাসন যেমন গুণের সংযোগেই সাধিত হয়, তেমনি তা জবরদস্তি শাসনের চেয়ে মহৎ। কোনো রাষ্ট্র যদি তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের উপর আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে শক্তি অর্জনের জন্য নিজেকে শিক্ষিত করে তুলে থাকে, তাতে সেই রাষ্ট্রকে সুখী বলার কিংবা তার আইনদাতাকে প্রশংসা করার কোনো ভিত্তি নেই। এমন যুক্তির ফল বিপজ্জনক হতে পারে। এই নীতি গ্রহণের অর্থ দাঁড়ায়, যে নাগরিকের ক্ষমতা আছে সে তার নগরীর শাসক হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে তার মনে পোষণ করতে পারে। অথচ ল্যাসিডিমনীয়গণ পসেনিয়াস তাদের রাজা হওয়া সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগই আনয়ন করেছিল। কাজেই এই তত্ত্বই বা নীতিসমূহের কোনোটিকে আমরা রাষ্ট্রজ্ঞের জন্য মূল্যবান বলে মনে করতে পারিনে। তারা উত্তম কিংবা সত্য—এর কোনোটিই নয়। পরিচালনার যে নীতি রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলকর, সে নীতি ব্যক্তির জন্যও মঙ্গলকর। এবং যিনি আইনদাতা তাঁর কর্তব্য হবে এই কথাই মানুষের মনে উপ্ত করে দেওয়া। সামরিক শিক্ষার কথা বলতে গেলে আমরা বলবো, সামরিক শিক্ষার নিয়মিত চর্চার উদ্দেশ্য যে-মানুষ পদানত হওয়ায় উপযুক্ত নয় তাদের পদানত করা নয়। সামরিক শিক্ষার তিনটি উদ্দেশ্য, যথা : ১. যেন আমরা অন্যের দাস না হই, সে অবস্থা থেকে নিজেদের রক্ষা করা, ২. অন্যকে দমন করার জন্য নয়, অপরের মঙ্গলের জন্য আমাদের নগরীর জন্য নেতৃস্থানীয় অবস্থানকে অর্জন করা, এবং ৩. যারা দাস হওয়ার যোগ্য তাদের উপর প্রভুর শাসন প্রতিষ্ঠা করা। আইনদাতার বরঞ্চ কর্তব্য হচ্ছে তাঁর সামরিক প্রস্তুতি এবং আইন প্রণয়ন—উভয় কার্য দ্বারা সাধারণভাবে শান্তি এবং সংস্কৃতি-সম্পন্ন একটা জীবনকে প্রতিষ্ঠা করা। এবং বাস্তব ঘটনাও একথার যথার্থতা বহন করে। কারণ, যারা সামরিক রাষ্ট্র তারা টিকে থাকে ততক্ষণ, যতক্ষণ তারা যুদ্ধ করে। কিন্তু যখনি তারা সাম্রাজ্য বিস্তার করে, তখনি তাদের ক্ষয় শুরু হয়। ইস্পাতের মতো কেবল শান্তিতে পড়ে থাকলে তার সূক্ষ্ম ধার বিনষ্ট হয় এবং যে আইনদাতা অবকাশের সঠিক ব্যবহারের বিষয়ে নাগরিকদের শিক্ষিত করে তুলেননা, সেই আইদাতাই এ জন্য দায়ী।

[মহত্ত্বকে আমরা কামনা করি মহত্ত্বেরই জন্য, অপর কোনো কিছুর জন্য নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত সকল গুণের বৃদ্ধি সাধন—স্পারটার ন্যায় কেবল সাহসিকতার বৃদ্ধি নয়। অধ্যায় ১৫-এর শেষের দিকে, অধ্যায় ১৩-এর শেষ পর্যায়ের উল্লেখ দেখা যায় যে পর্যায়ে এ্যারিস্টটল শিক্ষার জন্মগত, শিক্ষাগত এবং যুক্তিগত—এই তিনটি উপদানের উল্লেখ করেছিলেন।]

পঞ্চদশ অধ্যায়

নাগরিকদের শিক্ষার বিষয়ে

এটা পরিষ্কার যে ব্যক্তি হিসাবে কিংবা রাষ্ট্র হিসাবে মানুষের লক্ষ্য এক। এবং সর্বোত্তম মানুষ এবং সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থা—এ দু'এরও বৈশিষ্ট্য এক। একথা যদি সত্য হয় তাহলে এটাও পরিষ্কার যে, রাষ্ট্রের মধ্যে এমন গুণের অস্তিত্ব থাকতে হবে যাতে অবকাশের চর্চা সম্ভব হয়। কারণ একথা প্রায়ই বলা হয় যে, যুদ্ধের লক্ষ্য হচ্ছে শান্তি এবং শ্রমের লক্ষ্য বিশ্রাম। বিশ্রামের ব্যবহারের জন্য তার কিছুর চর্চা যেমন বিশ্রামে, তেমনি আর কিছু আছে যাদের চর্চা শ্রমের মধ্যেই। কারণ বিশ্রামের শ্রমকে সম্ভব করার জন্য বেশ কিছু জিনিসেরই আবশ্যক হয়। কাজেই আমরা বলবো, একটি নগরীকে অবশ্যই আত্মসংযমী, সাহসী এবং দৃঢ় হতে হবে। (এই সকল গুণ ব্যতীত মানুষ দাসের সমান। কারণ যারা সাহসের সঙ্গে বিপদের মোকাবেলা করতে অক্ষম হয় তারা আক্রমণকারীদের হাতে দাসে পরিণত হয় এবং প্রবাদের কথাতে আছে, দাসদের কোনো অবকাশ নেই।) কর্মের জন্য আমাদের যেমন সাহস এবং দৃঢ়তার আবশ্যক, তেমনি চর্চিত অবকাশ, সংযম এবং সততার জন্য সর্বদা, এবং বিশেষ করে শান্তি এবং বিরামের সময়ে বুদ্ধিগত ক্ষমতার আবশ্যক। কারণ যুদ্ধ মানুষকে অনুগত এবং সৎ হতে বাধ্য করে; অপরদিকে সমৃদ্ধি, শান্তি এবং অবসরের উপভোগ মানুষকে সহিংস এবং আত্মগর্বী করে তুলে। কাজেই সমৃদ্ধির আশীর্বাদ এবং সাফল্য যারা লাভ করেছে কিংবা কবির ভাষায়, যারা হচ্ছে সুখের দ্বীপের অধিবাসী, তাদের জীবনেই প্রয়োজন সবচেয়ে অধিক সুস্থ-নৈতিকতা এবং আত্মসংযমের। কারণ এদেরই দরকার দর্শন, মীতাচার এবং ন্যায়ের। এদের সমৃদ্ধি যত অধিক হবে, এ সমস্ত গুণের তত বেশি প্রয়োজন হবে। এ থেকে এটা পরিষ্কার যে, রাষ্ট্রকে যদি উত্তম এবং সুখী হতে হয় তাহলে রাষ্ট্রেরও বেশ পরিমাণ এ সকল গুণের আবশ্যক। অধমতার একটি চিহ্ন যদি কারুর উত্তম আচরণে অক্ষমতা হয় তাহলে এর প্রকটতা দেখা যায় বিশেষভাবে কর্মহীনতার কালে। যুদ্ধে কিংবা কর্মে আচরণ উত্তম থাকে। কিন্তু কর্মহীনতা এবং শান্তির কালে মানুষ দাসের অধিক কিছু থাকেনা।

কাজেই গুণের শিক্ষার ক্ষেত্রে ল্যাসিডিমোনীয়দের আদর্শ অনুসরণ করা উচিত নয়। এদের সঙ্গে অপর জাতিদের পার্থক্য সর্বোত্তম জিনিসের বিচারে নয়। তাদের পার্থক্য এই ধারণাতে যে, গুণের মাধ্যমে এদের সৃষ্টি করা যায়। তারা উত্তম দ্রব্যসমূহ এবং তার উপভোগকে, ন্যায়ের চেয়ে অধিক মূল্যবান মনে করে। কিন্তু আমাদের আলোচনা থেকে একথা পরিষ্কার যে, ন্যায়ের চর্চা করতে হবে ন্যায়ের কারণে। আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে : এই চর্চা কিভাবে এবং কিসের মাধ্যমে করা সম্ভব?

তিনটি মূল বিষয়ের পার্থক্য আমরা ইতিপূর্বেই নির্দিষ্ট করেছি : প্রকৃতি, প্রশিক্ষণ এবং প্রজ্ঞা। প্রথমটি সম্পর্কে আমাদের আলোচনা শেষ হয়েছে। কোন্ প্রকৃতিতে জন্মগ্রহণ

বাঞ্ছনীয়, সে কথা আমরা বলেছি। এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষা কি প্রজ্ঞার মাধ্যমে প্রদত্ত হবে অথবা অভ্যাসে তা অর্জিত হবে। তবে এ দুইএরই যে সমন্বিতভাবে ক্রিয়াশীল হওয়া অত্যাবশ্যক, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। কারণ, সর্বোত্তম নীতি সম্পর্কে বুদ্ধিগতভাবে কোনো ভুল করা যেমন সম্ভব, তেমনি অভ্যাস এবং প্রশিক্ষণে কারুর পক্ষে বিভ্রান্ত হওয়াও সম্ভব।

শুরু থেকেই একটা বিষয় পরিষ্কার : অপর কিছুর ক্ষেত্রে যেমন এখানেও তেমনি কোন প্রক্রিয়াকে কোন কিছু থেকে শুরু করতে হয় এবং এর লক্ষ্যও উদ্ভূত হয় অপর কোন কিছুর পরিণামের সূচনা থেকে। মানুষ হিসাবে প্রজ্ঞা এবং আত্মা—এই হচ্ছে আমাদের বিকাশের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যেই আমাদের অভ্যাসের শিক্ষণ এবং আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব লাভকে পরিচালিত হতে হবে। এর পরের কথা হচ্ছে, দেহ এবং আত্মা যেমন দু'টি অস্তিত্ব, তেমনি আত্মার মধ্যে দু'টি অংশের আমরা সাক্ষাৎ লাভ করি : প্রজ্ঞা তথা যুক্তি এবং অযুক্তি। এর উভয়েরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান : যুক্তির প্রবণতা যেখানে বিবেচনামূলক, অযুক্তির সেখানে প্রবৃত্তিমূলক। এবং একথাও সত্য যে, দেহ যেখানে আত্মার পূর্বে জাত হয়, তেমনি অযুক্তির আগমন যুক্তির পূর্বে ঘটে। এর দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে, শিশুদের মধ্যে যেখানে জন্ম থেকেই ক্ষুধাতৃষ্ণার অস্তিত্ব দেখা যায় সেখানে তাদের মধ্যে যুক্তি এবং বুদ্ধির উদয় ঘটে তাদের বয়স যখন অধিকতর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন। কাজেই দেহের যত্ন, মনের যত্নের পূর্বেই আমাদের শুরু করতে হবে। এরপরে আসবে যুক্তির স্বার্থে প্রবৃত্তিসমূহের প্রশিক্ষণের প্রশ্ন,—অন্যকথায় আত্মার স্বার্থে দেহের শিক্ষার প্রশ্ন।

[জীবনযাপনের জন্য কাম্য জলবায়ু, বংশ প্রভৃতির বিষয়ে বর্তমান পুস্তকের গোড়ার দিকেও আলোচনা আছে। এখন আলোচনা আসছে শুরু থেকে শিশুদের পরিচর্যার বিষয়ে। এ্যারিস্টট্ল এখানে জন্ম, বিবাহ, পিতৃত্ব এবং প্রজনন—এ সব বিষয়ে তাঁর অভিমত প্রকাশ করছেন। প্রাচীন গ্রীসের একটি প্রথা ছিল যে, শিশুর জন্মের পরে পিতা স্থির করত শিশুটিকে লালন পালন করে বড় করা হবে কিংবা উন্মুক্ত স্থানে পরিত্যাগ করে তার মৃত্যু ঘটানো হবে। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর দিকে এই প্রথার সমালোচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কারণ কেবলমাত্র লোকসংখ্যাকে নির্ধারিত সীমার মধ্যে রক্ষা করার জন্য স্বাস্থ্যবান শিশুকেও মেরে ফেলার এই পন্থাটির বিরুদ্ধে বেশ পরিমাণেই জনমত তখন গঠিত হয়েছিল।]

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

পিতামাতার বিবাহের কথাও চিন্তা করতে হবে

যিনি নগরীর আইনদাতা তাঁর কর্তব্য যখন শুরু থেকেই লক্ষ্য রাখা কেমন করে তিনি তরুণদের সর্বোত্তম দৈহিক বিকাশ সাধন করবেন তখন তাঁকে প্রথমে তরুণদের পিতামাতাদের বিবাহের কথা বিবেচনা করতে হবে। তাঁকে বিবেচনা করতে হবে কি প্রকারের দম্পতির বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া উচিত এবং তাদের বৈবাহিক দৈহিক সম্পর্ক কখন স্থাপিত হওয়া উত্তম। এই বিষয়ে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তিনি যেমন দম্পতিদের স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখবেন তেমনি তাদের জীবনকালের প্রতি নজর দিবেন। কারণ, তাঁকে দেখতে হবে যেন তারা উভয়েই একই সময়ে তাদের বয়ঃকাল প্রাপ্ত হয়। পিতার জন্মদানের ক্ষমতা এবং মাতার সন্তান ধারণের ক্ষমতা-দুইএরই সমন্বিত হওয়া আবশ্যক। বয়ঃক্রমে এমন যদি ঘটে যে একজন সন্তান প্রজননে সক্ষম কিন্তু অপর জন অক্ষম, তাহলে পারস্পরিক মনোমালিন্যের সূত্রপাত ঘটে এবং পরিণামে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ আসে। পরের প্রশ্ন হচ্ছে, দুই সন্তান জন্মাবার মধ্যকার বিরতির প্রশ্ন। পিতা এবং সন্তানদের পারস্পরিক বয়সের ক্ষেত্রে ব্যবধানটা বিরাট পরিমাণে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। বৃদ্ধ পিতাদের জন্য অল্প বয়স্ক সন্তান যেমন কোন উপকারে আসে না, বৃদ্ধ পিতারাও তেমনি তাদের কোন সাহায্য করতে পারেনা। আবার বয়সের দিক থেকেও তাদের অধিক নৈকট্যও অভিপ্রেত নয়। কারণ এতে তাদের পারস্পারিক সম্পর্কে টান ধরে। এমন অধিক বয়স্ক সন্তানরা তাদের পিতাদের উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করেনা, কেননা তাদের চোখে পিতারা প্রায় সমবয়স্ক। বয়সের এমন নৈকট্য পারিবারিক ক্ষেত্রেও তিক্ততার সৃষ্টি করে। তাছাড়া যে কথা আমরা শুরুতেই বলেছিলাম, আমাদের দেখতে হবে যেন তরুণদের দৈহিক বিকাশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতার পরিকল্পনা অনুযায়ী সাধিত হয়।

এই সমস্যাগুলির সমাধান, অন্তত এদের বেশির ভাগ সমাধান হয়ে যাবে যদি আমরা একটা বিষয়, তথা স্বামী এবং স্ত্রীর আপেক্ষিক বয়সের দিকে দৃষ্টি রাখি। এ ক্ষেত্রে যেটা স্মরণযোগ্য তা হচ্ছে এই যে, সাধারণভাবে সন্তান জন্মদানের ক্ষমতা পুরুষের ক্ষেত্রে যেখানে সত্তর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ সেখানে তাদের মিলন এমন হওয়া উচিত যেন তাদের নিজ নিজ এই ক্ষমতার সীমা উপযুক্ত বয়সেই ঘটে। একেবারে অল্পবয়স্ক দম্পতির মিলন সন্তান ধারণের জন্য উত্তম নয়। পশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একেবারে অল্পবয়সের মিলনজাত শাবকগুলি নানা ত্রুটিপূর্ণ, সাধারণত স্ত্রীজাতীয় এবং ক্ষুদ্রকায় হয়ে থাকে। কাজেই মানুষের ক্ষেত্রেও এ ব্যাপারে একই ফল সংঘটিত হবে। (এর দৃষ্টান্তও আছে। যে সমস্ত দেশে অল্প বয়সে বিবাহের নিয়ম প্রচলিত আছে সেখানকার শিশুরা ক্ষুদ্রকায় এবং ত্রুটিপূর্ণ হয়।) তাছাড়া খুব অল্পবয়সের বিবাহের বিরুদ্ধে আপত্তির কারণ হচ্ছে এই যে, খুব অল্পবয়স্ক মেয়ের পক্ষে সন্তান প্রসব কঠিনতর হয় এবং

এর ফলে মৃত্যুও ঘটে অধিকতর সংখ্যায়। (অনেকে বলেন ট্রোজেনের অধিবাসীদের জন্য 'নবীন জমি কর্ষণ না করার' যে বাণী দৈবজ্ঞের কাছ থেকে এসেছিল তার উৎস এখানে।) এবং বিবাহের বিশ্বস্ততার জন্য যা প্রয়োজন তা হচ্ছে এই যে, পিতারা যখন কন্যাদের বিবাহ দিবে তখন তাদের কন্যারা যেন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। কারণ যে সমস্ত মেয়ের যৌনমিলন অল্প বয়সে ঘটে তাদের নৈতিক শিথিলতার সম্ভাবনা অধিক। পুরুষের ক্ষেত্রেও তাদের বীজ যখন কেবল বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন যৌনমিলন তার ভবিষ্যৎ বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে। কেননা সেখানেও বয়সের একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। এই সীমার পরে বীজের আর বৃদ্ধি ঘটে না। এ কারণে আমরা বলতে পারি, বিবাহের উপযুক্ত বয়স হচ্ছে মেয়েদের জন্য আঠারো বছরের নিকটবর্তী সময় এবং পুরুষদের জন্য সাইত্রিশ বছরের এপার কিংবা ওপার। এমন হলে দম্পতির যৌন মিলন তাদের দেহের বিকশিত পর্যায়ে যেমন ঘটবে তেমনি তাদের সন্তান প্রজননও উভয়ের ক্ষেত্রে সঠিক সময়ে রুদ্ধ হয়ে যাবে। এবং গর্ভসঞ্চার প্রত্যাশিত সময়ে ঘটলে সন্তানদের জন্ম পিতার পূর্ণ বয়সে যেমন শুরু হবে তেমনি তার ক্ষমতা হ্রাসের সঙ্গে তথা পিতার প্রায় সত্তর বৎসর বয়সে তা সমাপ্ত হবে।

বিবাহের বয়স সম্পর্কে আমরা কিছুটা আলোচনা করলাম। কিন্তু বৎসরের কোন্ সময় যৌনমিলনের উপযুক্ত সময়, সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। এক্ষেত্রে শীত ঋতুকে নির্বাচনের যে সাধারণ রীতি রয়েছে, সেটি, আমরা মনে করি, সন্তোষজনক। তদুপরি যারা সন্তান জন্মদানের কথা চিন্তা করবে তাদের উচিত হবে চিকিৎসক এবং বিজ্ঞানবিদদের পরামর্শ গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে চিকিৎসক যেমন বয়সের ঋতু পর্যায় সম্পর্কে তাদের অবহিত করতে পারবেন, বিজ্ঞানী তেমনি আবহাওয়ার খবর জানাতে সক্ষম হবেন। তাঁরা দক্ষিণে হাওয়ার চেয়ে উত্তুরে হাওয়াকে এমন ক্ষেত্রে অধিকতর কাম্য বিবেচনা করেন। পিতামাতার শারীরিক কোন্ অবস্থা সবচেয়ে ভালো, এর তথ্য যাঁরা পেতে চান তাঁদের সন্তান পালনের উপর রচিত নির্দেশমালা থেকে সাহায্য গ্রহণ আবশ্যক। বর্তমানের জন্য আমরা অল্পকিছু, যা এখানে আলোচনা করছি, আশা করি, তা যথেষ্ট হবে। ক্রীড়াগত যোগ্যতা নাগরিক বা সন্তান ধারণের জন্য উপযুক্ত যোগ্যতা তৈরি করে, এমন ভাবা ঠিক নয়। আবার অতিরিক্ত দুর্বলতা কিংবা কঠিন পরিশ্রমের অক্ষমতাও বাঞ্ছনীয় অবস্থা নয়। এই দুএর মধ্যবর্তী অবস্থাটি আবশ্যক। কঠিন পরিশ্রমে অক্ষম—কিন্তু অতিরিক্ত অক্ষম নয়, ক্রীড়াবিদের ন্যায় সর্বশক্তি একলক্ষ্যে পরিচালনার বদলে বিভিন্নমুখে তাকে পরিচালিত করা—এই হচ্ছে স্বাধীন নাগরিকের জন্য সর্বোত্তম অবস্থা। তাছাড়া গর্ভকালীন সময়ে মেয়েদের প্রয়োজন হচ্ছে তাদের শরীরের যত্নগ্রহণ। এটি গুরুত্বপূর্ণ। তাদের এ সময়ে অলস হওয়া কিংবা আহার হ্রাসের নিয়ম গ্রহণ করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে আইনদাতা সহজেই এরূপ নিয়ম করে দিতে পারেন যে, এমন অবস্থায় মেয়েদের প্রতিরোজ কিছুক্ষণ হাঁটতে হবে। এর উদ্দেশ্য হবে সন্তান জন্মদানের দেবতাদের আরাধনা করা। কিন্তু শরীর চর্চার সময় মনের শ্রম সঙ্গত নয়। এ সময়ে মানসিক অবসাদ পরিহার করা উচিত। কারণ উদ্ভিদ যেমন মাটি থেকে, অ-জাত শিশু তেমনি তার গর্ভধারিণী জননী থেকে উত্তমকে প্রাপ্ত হয়।

কোন শিশুকে পরিত্যাগ করা কিংবা তাকে পালন করার বিষয়ে একটি আইন এই হওয়া উচিত যে, বিকলাঙ্গ কোনো শিশুকে লালন করা হবে না। কিন্তু কেবল জনসংখ্যা হ্রাস করার জন্য শিশুকে পরিত্যাগ করে হত্যার বিরুদ্ধে প্রথা যখন প্রচলিত আছে তখন শিশু-জন্মের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু এই সকল নিয়মকে লঙ্ঘন করে যদি যৌন মিলন ও গর্ভসঞ্চার ঘটে, তাহলে ভ্রূণে জীবন এবং সংবেদন আসার পূর্বে

গর্ভপাতের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এ কাজটি সঠিক কিংবা বেঠিক,—তা নির্দিষ্ট হবে ভ্রূণে জীবন এবং সংবেদন আসা না আসার ভিত্তিতে। পুরুষ এবং মেয়ে—উভয়ের যৌন মিলন কোন্ বয়সে শুরু হবে তা যখন আমরা নির্দিষ্ট করেছি, তখন কোন্ বয়স পর্যন্ত এ মিলন অনুমোদিত হবে, তারও উল্লেখ থাকা আবশ্যক। বৃদ্ধদের এবং অল্পবয়স্ক দম্পতির সন্তান দেহ এবং মনে ত্রুটিপূর্ণ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। বৃদ্ধের সন্তান দুর্বল হয়। কাজেই এখানে আমরা পরিচালিত হবো সর্বাধিক মানসিক বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে। এবং এর উত্তম বয়স কবিদের বলা, 'সাত বছরে সাতটি ঋতু'তে প্রকাশিত হয়েছে, একথা বলা যায়। এর অর্থ হচ্ছে পুরুষের পঞ্চাশ বছরের বয়স হচ্ছে এই উত্তম সময়। কাজেই এই বয়সসীমা অতিক্রম করে যারা আরো চার কিংবা পাঁচ বছর বয়স লাভ করেছে তাদের আর জন্মদান এবং প্রকাশ্যভাবে সন্তান লাভ করা উচিত নয়। তবে স্বাস্থ্য কিংবা অপর কোনো সঙ্গত কারণে গোপনীয়তা ব্যতিরেকে যৌন মিলন অব্যাহত থাকতে পারে। বিবাহের বাইরে পুরুষ কিংবা স্ত্রী কারু যৌন সম্পর্ক থাকা উত্তম নয়। এবং স্বামীকে যখন স্ত্রী স্বামী হিসাবে সম্বোধন করছে তখন এরূপ সম্পর্ক কখনো স্থাপন করা কিংবা তাকে স্বীকার করা উচিত নয়। কোনো পুরুষ যদি এরূপ অনিয়মকার্যে দৃষ্ট হয় তাহলে তার এরূপ অনাচারের উপযুক্ত লাঞ্ছনা দ্বারা তাকে দণ্ডিত করা আবশ্যক।

সপ্তদশ অধ্যায়

শিশুর লালন ও শিক্ষা

জন্মের পরবর্তী সময় হচ্ছে শিশুর জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে তার লালনের জন্য য ব্যবস্থা করা হয় তার দেহের বৃদ্ধির উপর তারই প্রভাব পড়ে সবচেয়ে বেশি। অন্য পশুদের যেমন তেমনি অপর যে সব জাতি তাদের শিশুদের যোদ্ধা হিসাবে তৈরি করতে চায় তাদের দৃষ্টান্ত থেকে এটা পরিষ্কার যে দুগ্ধ-খাদ্যের সুপ্রচুর সরবরাহ শিশুদের কোমল দেহের জন্য খুবই উপযুক্ত। কিন্তু শিশুদের খাদ্যে যদি সুরার মিশ্রণ থাকে তবে তাদের শরীর অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। তাছাড়া এই বয়সে শিশুরা যতখানি দৈহিক ছুটাছুটি করতে পারে ততখানি দৈহিক-দৌড়াদৌড়ি তাদের করা প্রয়োজন। তাদের কোমল দেহের কোন অঙ্গ যেন বক্র না হয়ে পড়ে সেজন্য অনেকে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাদের সোজা রাখারও চেষ্টা করে। এবং শিশু বয়স থেকেই ছোটদের ঠাণ্ডাতে অভ্যস্ত করানো আবশ্যক। শিশু বয়সে এরূপ অভ্যস্ত হওয়া তাদের ভবিষ্যৎ স্বাস্থ্যের জন্য এবং যুদ্ধ-মূলক কার্যাদি সম্পাদনের জন্য বিশেষ উপকারী হয়। এ কারণে অ-গ্রীসীয় অনেক জাতির মধ্যে এরূপ নিয়ম দেখা যায় যে, তারা শিশুকে নদীর ঠাণ্ডা পানিতে ডুবিয়ে উঠায়। কেল্‌ট-বাসীদের দেখা যায়, তারা শিশুর দেহ নামমাত্র পরিচ্ছদে আচ্ছাদিত রাখে। এভাবে শিশু বয়সেই যে যে অভ্যাসে তাদের অভ্যস্ত করা সম্ভব সেই অভ্যাসে শিশুদের অভ্যস্ত করে তোলা আবশ্যক। অবশ্য প্রক্রিয়াটিকে ক্রম-পর্যায়ের হতে হবে। তবে শিশুদের শরীরের নিজস্ব তাপ তাকে ঠাণ্ডা সহ্য করার একটা ক্ষমতা দিয়ে থাকে। এভাবে ছোটদের একেবারে শিশু বয়স থেকে শিক্ষাদান আবশ্যক।

এর পরের পর্যায়কে আমরা পাঁচ বৎসর পর্যন্ত বিস্তারিত বলতে পারি। বয়সের এই স্তরে শিশুদের দ্বারা সবকিছু করানো কিংবা যে কাজে তাদের বিকাশ ব্যাহত হতে পারে তাদের দ্বারা তা করানো উচিত নয়। আবার তারা যে নিষ্ক্রিয় বা অলস থাকবে, তাও সঙ্গত নয়। তারা বিভিন্নভাবে তাদের দেহের অনুশীলন করবে—তবে প্রধানত খেলাধুলার মাধ্যমেই এটা তাদের করা উত্তম। অন্যক্ষেত্রে যেমন, তাদের ক্রীড়াদিকেও তেমনি স্বাধীন নাগরিকের উপযুক্ত হতে হবে—অর্থাৎ এগুলি যেমন অত্যন্ত পরিশ্রমসাধ্য হবে না, তেমনি বিশৃঙ্খলও হবে না। শিশুদের মঙ্গলামঙ্গল তদারককারী পরিদর্শকগণ স্থির করে দিবেন, এই বয়সের শিশুরা কোন্ প্রকারের সাহিত্য এবং গল্প শ্রবণ করতে পারে। কারণ এই বয়সে শিশুরা যা শ্রবণ করে তাই তাদেরকে পরবর্তী পর্যায়ের শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করে। এ কারণে যেরূপ ক্রীড়া তারা পরবর্তীকালে চর্চা করবে তার প্রাথমিক মহড়া তাদের এই বয়সে হওয়া আবশ্যক। শিশুদের কান্না থেকে বিরত রাখা উচিত নয়। 'লজ' (আইন) গ্রন্থে শিশুদের ক্রন্দনের ব্যাপারে যে প্রস্তাব করা হয়েছে তা ঠিক নয়। শিশুদের ক্রন্দন নিষিদ্ধ করা বা তাদের কান্না থেকে বিরত রাখা উচিত নয়। কারণ কান্নার মধ্য দিয়ে শিশুর ফুসফুস যন্ত্রের

সঞ্চালন ঘটে। এই সঞ্চালন শিশুর দেহের বৃদ্ধির জন্য উপকারী। শিশুদের পরিদর্শকগণ শরীর চর্চা, ক্রীড়া এবং বিশ্রামে শিশুদের ব্যয়িত সময়কে নিয়ন্ত্রিত করার দায়িত্ব যেমন পালন করবে, তেমনি তাদের দৃষ্টি রাখতে হবে যেন শিশুরা দাসদের সঙ্গে অধিক সময় যাপন না করে। এই বয়সের এবং সাত বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের অবশ্যই তাদের গৃহে অবস্থান করতে হবে। তরুণদের ক্ষেত্রেও এরূপ হওয়া আবশ্যক। কারণ, অল্প বয়সে তরুণরা দর্শন এবং শ্রবণের মাধ্যমে নানা অভদ্রজনোচিত আচরণ রপ্ত করতে পারে।

[প্লেটোর ন্যায় এ্যারিস্টট্‌লও এবার তরুণদের দৃষ্টি থেকে অশোভন দৃশ্যকে আড়ালে রাখার কথা বলছেন। কারণ প্রথম দৃশ্যই মানুষকে প্রভাবিত করে সবচাইতে বেশি। এবং এই প্রসঙ্গেই থিওডোরাস-এর কাহিনীটি হচ্ছে।]

সাধারণভাবে আইনদাতাকে রাষ্ট্র থেকে অন্যান্য পাপকে বিদূরিত করার মতো অশালীন আলাপকেও নিষিদ্ধ করতে হবে। অশোভন উক্তি হালকাভাবে উচ্চারিত হলেও তা অশোভন আচরণের জন্মের কারণ হয়। কাজেই এমন উক্তিকে বিশেষ করে অল্প বয়স্কদের নিকট থেকে দূরে রাখতে হবে। তরুণরা যেন এমন দৃশ্য কিংবা আলাপকে দর্শন ও শ্রবণ করতে না পারে, তার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এবং এমন কাউকে যদি এরূপ কোন নিষিদ্ধ আচরণ বা উক্তি করতে দেখা যায় যে ভদ্রঘরের সন্তান তাহলে, তার বয়স এখনো গণভোজে যোগদানের বয়স না হয়ে থাকলে, তাকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করতে হবে। অপরাধীর বয়স যদি এরচেয়ে অধিক হয়, তাহলে স্বাধীন নাগরিকের অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করতে হবে। এ দণ্ড তার প্রাপ্য, কারণ সে দাসোচিত আচরণে রত হয়েছে। অশালীন উক্তিকে যখন আমরা নিষিদ্ধ করেছি তখন অশোভন চিত্র বা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিও নিষিদ্ধ করতে হবে। কাজেই শাসকের কর্তব্য হবে এই নিয়ম স্থির করে দেওয়া যে, অশোভন কোনো ক্রিয়ার প্রতিবিম্ব হিসাবে কোনো মূর্তি কিংবা চিত্র থাকা চলবে না। কেবল দেবতার মন্দিরের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে। কারণ দেবতাদের ক্ষেত্রে অশোভন বলে কোনো কথা নেই। আইনে এ নিয়মও থাকতে পারে যে পুরুষেরা একটা বয়স উত্তীর্ণ হলে তাদের স্ত্রীদের এবং সন্তানদের পক্ষ থেকে এবং দেবতাদের প্রতি নিজের সম্মান প্রদর্শনের জন্য মন্দিরে আগমণ করতে পারে। কিন্তু অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদের অর্থাৎ দরবারে যোগদান এবং পানোৎসবে অংশগ্রহণের বয়স যাদের না হয়েছে তাদের জন্য আনন্দাত্মক নাটক এবং অশ্লীল কাব্য নিষিদ্ধ থাকবে। এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাদের চরিত্র এসব দৃশ্যে দূষিত হওয়ার আশঙ্কা থেকে মুক্ত হওয়ার দৃঢ়তা অর্জন করবে। আমাদের এ সকল কথা অবশ্য কেবলমাত্র প্রসঙ্গক্রমে বলা কথা। পরবর্তীতে এসব প্রশ্নে বিস্তারিত আলাপের প্রয়োজন হবে। তখন আমরা নির্দিষ্ট করবো এসমস্ত অনুষ্ঠানে তারা যোগদান করবে কিনা। যদি করে তবে তার শর্তসমূহ কি হবে। বর্তমানের জন্য যা প্রয়োজন তারই এখানে উল্লেখ করা হলো। এখানে বিষাদাত্মক নায়ক থিওডোরাসের কথা বলা যায়। তিনি তার নিজের আগমনের পূর্বে মঞ্চে কোন অভিনেতা, এমনকি হীনতর কোন অভিনেতাকেও উপস্থিত হতে না দেওয়ার কারণ হিসাবে একটি উত্তম কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, দর্শকবৃন্দ সবার আগে যাকে গ্রহণ করে তাকেই অধিক সমাদরের সঙ্গে স্মরণে রাখে। আমি মনে করি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এবং মানুষ যা দেখে ও শোনে তার ক্ষেত্রেও একথা সত্য। এ থেকে প্রথম দর্শনে প্রেমের কথাটি এসেছে। প্রথম দর্শনেই আমরা প্রেমে পড়ি। কাজেই তরুণদের নিকট থেকে নিকৃষ্ট জিনিসকে, বিশেষ করে হীন প্রকারের

পাপসমূহকে আমাদের অবশ্যই দূরে রাখতে হবে। শিশুরা যখন তাদের পঞ্চম জন্মদিবস অতিক্রম করবে, তখন তার পরবর্তী দুই বছরের জন্য তারা যেন কেবল দর্শন করার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তার পরবর্তীতে শিক্ষাকে দুই ভাগে ভাগ করা যাবে : সপ্তম বৎসর থেকে দেহে বয়ঃপ্রাপ্তির অবস্থা পর্যন্ত একটি স্তর। এবং বয়ঃপ্রাপ্তি থেকে একুশ বৎসর পর্যন্ত অপর স্তর। কাজেই যারা জীবনকে সাত বছরের পর্যায়ের ভিত্তিতে বিভক্ত করেন, তারা কিছু ভুল করেননা। এটা প্রকৃতিরই বিভাগ এবং আমাদের এ বিভাগ অনুসরণ করা উচিত। কারণ সকল রকম শিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রকৃতি যা অপূর্ণ রাখে তাকে পূর্ণ করা। এ কারণে আমাদের স্থির করা প্রয়োজন শিশুদের শিক্ষার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা আমরা স্থির করবো কিনা এবং সে ব্যবস্থা সরকারি নিয়ন্ত্রণে রাখা হবে কিনা—অথবা শিক্ষার এ ব্যবস্থাকে আমরা নগরীসমূহের প্রচলিত রীতিতে বেসরকারি হাতে ন্যস্ত রাখবো। তাছাড়া শিক্ষাব্যবস্থা কিরূপ হবে, সে বিষয়েও আমাদের আলোচনা আবশ্যক।

অষ্টম পুস্তক

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষার বিষয়ে দৃষ্টিদানের অভাব সংকটের উৎস

[সপ্তম পুস্তকের শেষে তিনটি প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এর প্রথমটির কোন জবাব আবশ্যক হয় না। দ্বিতীয় প্রশ্নে আলোচনা এবং তীব্র মত পার্থক্যের অবকাশ থাকলেও এ প্রশ্নটির আলোচনাও অচিরে শেষ করা হচ্ছে। নাগরিকদের শিশুদের লালন পালন এবং শিক্ষাদান রাষ্ট্রের দায়িত্ব। কারণ তারা হচ্ছে ভবিষ্যতের নাগরিক, ভবিষ্যতের শাসকশ্রেণী। একজন কারিগরকে যেমন তার দক্ষতা অর্জন করতে হয়, অনুরূপভাবে একজন নাগরিকেরও নাগরিক হওয়ার জন্য শিক্ষার আবশ্যক। কিন্তু ভবিষ্যতের নাগরিককে কেমন করে শিক্ষা দান করা হবে। এবং কি শিক্ষা তাকে দান করা হবে, তা নির্ভর করে রাষ্ট্রের প্রকারের উপর। বুদ্ধিগত, শিক্ষাগত, সংস্কৃত তথা অবসরের কোন্ জীবন রাষ্ট্র তৈরী করতে চায় তার উপর নির্ভর করে এ প্রশ্নের জবাব। এ কারণেই দেখা যায় অষ্টম পুস্তকের অধিকাংশই ব্যয়িত হচ্ছে সুর এবং সঙ্গীতের উপর। অবশ্য এ পুস্তকের কতখানি বিনষ্ট হয়েছে তা আমাদের জানা নেই। অন্ততঃ এ পুস্তক যে স্বাভাবিকভাবে সমাপ্ত হয়নি এ কথা ত্রয়োদশ শতক থেকেই অনুবাদকগণ বলে এসেছেন।]

তরুণদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা যে আইনদাতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব—এসম্পর্কে কেউ দ্বিমত পোষণ করবেনা। এবং এ সম্পর্কেও কোন সন্দেহ নেই যে, যেখানে এই দায়িত্বটি পালন করা হয়না সেখানে সব সময়ই শাসনব্যবস্থায় নানা দুর্ভোগের সৃষ্টি হয়। তবে শাসনব্যবস্থার সঙ্গে শিক্ষার যোগ। কারণ শাসনব্যবস্থার চরিত্রই নির্দিষ্টভাবে শিক্ষার চরিত্র নির্ধারণ করে দেয়। শাসনব্যবস্থার চরিত্র অনুযায়ী তার যাত্রা শুরু হয় এবং চরিত্র অনুযায়ী তার যাত্রা চলতে থাকে। যে শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক সে গণতান্ত্রিক চরিত্র বজায় রাখে। যে শাসনব্যবস্থা ধনিক বা কতিপয়ের তন্ত্র সে কতিপয়তন্ত্র হিসেবে বজায় থাকে। এবং সর্বোত্তম চরিত্র থেকেই সর্বোত্তম শাসনব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে। তাছাড়া প্রারম্ভিক দক্ষতা, কার্যাবলী এবং বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত হওয়ার অভ্যাসসমূহেরও প্রস্তুতিমূলক প্রশিক্ষণ আবশ্যক। কাজেই ন্যায় ধর্মের জন্যও যে প্রশিক্ষণ আবশ্যক, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আবার এটাও নিশ্চিত যে রাষ্ট্রের লক্ষ্য যখন একটি, তখন শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন একটিই হবে, তেমনি সকলের জন্য তাকে এক প্রকারেরই হতে হবে। শিক্ষার তদারক রাষ্ট্রীয় হতে হবে। এটা বর্তমানের ন্যায় ব্যক্তিগত হাতে ছেড়ে রাখা যায় না। প্রত্যেক নাগরিক তার সন্তানকে লালন করবে এবং সে যা প্রয়োজনবোধ করবে তাতে সে তার সন্তানকে শিক্ষিত করবে—এমন হতে পারেনা। যা কিছু সমগ্র সমাজের সঙ্গে জড়িত তার শিক্ষার ব্যাপারও সমগ্র সমাজের চিন্তার বিষয়। এবং কোন নাগরিক মনে করবে যে সে কেবল নিজেতেই সীমাবদ্ধ, এমনটিও ঠিক নয়। প্রত্যেক

নাগরিকই রাষ্ট্রের নাগরিক। প্রত্যেকেই রাষ্ট্রের একটি অংশ। এবং এ কারণে একটি অংশের প্রতি যে যত্ন প্রদান করা হয় সে যত্ন সমগ্র রাষ্ট্রের প্রতি প্রদত্ত যত্ন বলেই বিবেচিত হয়। এ ক্ষেত্রে আমরা ল্যাসিডিমনীয়দের সমর্থন করি। স্পারটার তরুণদের প্রতি নজর দেওয়া হয় সবচেয়ে অধিক। এবং সবকিছুই করা হয় রাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় বিষয় হিসাবে গণ্য করতে হবে

এটা তাহলে পরিষ্কার যে শিক্ষার ব্যাপারে আইন থাকতে হবে এবং শিক্ষাকে রাষ্ট্রীয় একটি বিষয় হিসেব বিবেচনা করতে হবে। কিন্তু সে সঙ্গে এই শিক্ষার প্রকৃতি কি হবে, সেটি বিস্মৃত হলে চলবে না। শিক্ষাব্যবস্থাকে কেমন করে কার্যকর করতে হবে, সেটিও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। কারণ আধুনিক কালে শিক্ষার ব্যাপারে নানামতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ন্যায় বা উত্তম জীবন সম্পর্কে তরুণরা কি শিক্ষা লাভ করবে, এ সম্পর্কে সাধারণ মতৈক্য আমরা দেখিনে। তাছাড়া শিক্ষার লক্ষ্য কি বুদ্ধির বিকাশ সাধন, না চরিত্রের উন্নতি সাধন—এ বিষয়েও আমরা পরিষ্কার নই। আমরা বাস্তবে যা দেখছি তাতে সমস্যাটি আরো জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমরা নিশ্চিত নই, শিক্ষা কি জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদিতে নিবদ্ধ হবে, না সে ন্যায়ধর্ম সৃষ্টিতে সহায়ক হবে কিংবা অনাবশ্যক বিষয়তে ব্যাপৃত থাকবে। (এগুলির কথা আমরা পূর্বে বলেছি।) তাছাড়া কিসে ন্যায়ের বৃদ্ধি ঘটে তাতেও কোন ঐক্যমত নেই। মানুষ সকলে যে একইপ্রকার ন্যায়কে মূল্যবান মনে করে তাও নয়। এবং এ কারণে ন্যায়ের জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও তাদের মতপার্থক্য বিরাজ করছে।

তারপর আমরা যদি প্রয়োজনীয় বিষয়ের কথাও বলি, অর্থাৎ যে প্রয়োজনগুলি সম্পর্কে তরুণদের অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, তাহলেও আমরা দেখব যে তাদের সবগুলিকেই যে তাদের শিখতে হবে, এমন নয়। কারণ কতগুলি আছে স্বাধীন নাগরিকের উপযোগী, কিন্তু অপর কতকগুলি আছে তার উপযোগী নয়। নাগরিক কেবল সেই সমস্ত কর্মেই নিযুক্ত হবে যে কর্ম তার চরিত্রের হানি ঘটাবেনা। এরূপ হানিকর কর্ম বলতে আমরা সেই সমস্ত কর্মকে বুঝব যেগুলি ন্যায়ের দায়িত্ব পালনে স্বাধীন নাগরিকের দেহ, মন এবং বুদ্ধিকে অক্ষম করে তুলে। কাজেই হানিকর কাজ হচ্ছে সেই কাজ যা দেহের উপর ক্ষতিকর প্রভাব তৈরী করে এবং যে কর্ম টাকার বিনিময়ে সম্পাদিত হয়। কারণ এগুলি মনকে নিবিষ্ট রাখে। এবং তার কারণে দৈহিক শ্রমের উর্ধে আরোহণ করতে অক্ষম করে তুলে। উদারনীতিক কর্মের ক্ষেত্রেও একটা সীমা আছে যেটিকে অতিক্রম করলে তার চর্চা উদারনীতির বিরুদ্ধ হয়ে দাঁড়ায়। এদের উপর অতিমাত্রায় দৃষ্টিদান কিংবা এদের বিস্তারিত বিষয় আয়ত্ত করার চেষ্টা, এসবের ফলেই আমরা যে অবনতির কথা বলেছি, আত্মার সেই অবনতি ঘটে। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে কর্ম বা চর্চার লক্ষ্য নির্দিষ্ট করা। স্বাধীন নাগরিকের পক্ষে নিজের জন্য, কিংবা তার বন্ধুদের জন্য কিংবা কর্মের নিজের মূল্যের কারণেই কিছু কাজ করা সঙ্গত। কিন্তু যে এই কাজটিকেই অপরের কারণে সম্পাদন করে, সে তাকে লাভের বিনিময়ে বা দাসোচিতভাবে সম্পাদন করেছে, অনেক সময়ে এরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

তৃতীয় অধ্যায়

অবসরের আবশ্যকতা

[ভদ্রলোক তথা নাগরিকের শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, সে যেন ন্যায় তথা অবসরের জীবন যাপন করার জন্য তার বুদ্ধিগত এবং শিল্পগত সকল দক্ষতার পূর্ণতম ব্যবহার করতে পারে, তার ব্যবস্থা করা। এই অধ্যায়তে 'অবসর' বলতে এ্যারিস্টট্ল কি ধারণা পোষণ করেন তার একটি উত্তম আভাস পাওয়া যায়। তিনি অবশ্য এর বিস্তারিত আলোচনারও প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। কিন্তু এ প্রতিশ্রুতি পালিত হয়েছিল কিনা, তা জানা যায় না। অধ্যায়ের শেষ অংশটি কিছুটা বিভ্রান্তি-সূচক। গণিতের যে কোন উল্লেখ নেই, এটিও পাঠকের মনে বিস্ময় উদ্রেক করে।]

আজকাল যে সব বিষয়ের অধ্যয়ন হয় তাতে ন্যায় এবং উপকার—দুটো উদ্দেশ্যই সাধিত হয়। এ কথা আমরা পূর্বে বলেছি। এ সমস্ত বিষয়ের মধ্যে (১) পড়া এবং লেখা (২) শরীর চর্চা, (৩) সঙ্গীত এবং (৪) অংকন (সব সময়ে না হলেও)—এই চারটি শিশুদের শিক্ষা দেওয়া হয়। পড়া, লেখা এবং অংকন প্রতিদিনের জীবনে বিভিন্ন প্রকারেই উপকারী। শরীর চর্চাও উপকারী, কারণ এর ফলে মানুষ শক্ত ও সাহসী হয়। কিন্তু সঙ্গীতের ব্যাপারে বেশ একটি প্রশ্ন আছে। বেশীর ভাগ লোকই আজকাল সঙ্গীতে অংশ নেয় আনন্দ উপভোগের জন্য। কিন্তু অনেকে বলেন সঙ্গীত, শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক বিষয়। কারণ, একথা প্রায়ই বলা হয় যে, প্রকৃতির নিজেরই লক্ষ্য হচ্ছে মানুষকে কেবল কাজের জন্য দক্ষ করে তোলা নয়, বরঞ্চ তাকে একটি সংস্কৃত অবসর জীবনের উপযোগী করে তোলা। এবং আমরাও বলেছি এটিই সমস্ত বিষয়টির মূল ভিত্তি। কিন্তু আমরা যদি কাজকেই লক্ষ্য বিবেচনা না করি, তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে অবসরের উপযুক্ত কর্ম কি?

ক্রীড়াকে আমরা অবশ্যই এরূপ কর্ম বলতে পারিনে। কারণ তার অর্থ হবে ক্রীড়াকে জীবনযাপনের তথা জীবনের লক্ষ্য হিসেব স্থির করা। কিন্তু ক্রীড়াকে আমরা অবসরের অন্তর্গত না বলে কর্মের অন্তর্গত বলব। কারণ যারা কঠিন পরিশ্রম করে তাদের অবসর আবশ্যক। ক্রীড়া হচ্ছে এক প্রকার অবসর। কিন্তু যেটা কর্ম, তার সঙ্গে চিন্তা, উদ্বেগ অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত থাকে। কাজেই নিরাময়ের কারণেও আমাদের ক্রীড়ার প্রয়োজন স্বীকার করতে হয়। অবশ্য ক্রীড়ার উপযুক্ত সময় আছে এবং সে সময়ে ক্রীড়া করা সঙ্গত। ক্রীড়ার উপযুক্ত ব্যবহারও আছে। এ নিয়মে ক্রিড়ায় অংশ নিলে তা যেমন মনকে উদ্বেগমুক্ত করে, তেমনি ক্রীড়ার আনন্দের কারণে ক্রীড়া একটি অবসর ভোগও বটে। কিন্তু আমরা এখানে অবসর সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে কথা বলছি। আমরা বলছি, অবসর হচ্ছে নিজ গুণেই একটি আনন্দজনক অবস্থা। এবং আমাদের কর্মময় এবং বিষয়ী জীবন একে বাদ দিয়ে চলতে পারে না। কারণ আমরা যখন কোন কর্ম করি তখন এ যাবৎ অনর্জিত একটি লক্ষ্যকে অর্জন করার জন্যই কর্ম করি। এবং সুখ হচ্ছে একটি লক্ষ্য। সুখকে শ্রমের

সামার্থক মনে করার বদলে সুখকে সার্বজনীনভাবে উপভোগের সমার্থক মনে করা হয়। অবশ্য এই উপভোগটা যে কি সে সম্পর্কে মানুষের মধ্যে যে মতৈক্য রয়েছে, এমন নয়। মানুষের মধ্যে যার যেমন বৈশিষ্ট্য এবং বুঝ, সে তাকে তেমনভাবে বুঝে। যার মহত্তম চরিত্র সে উচ্চতম স্তরের সর্বোত্তম আনন্দকে নির্বাচন করে। এ থেকে একথা পরিষ্কার যে, অবসর কাটানোর জন্যও বেশ পরিমাণ চিন্তা এবং শিক্ষার আবশ্যক। শিক্ষার প্রক্রিয়াসমূহ এবং অধ্যয়নের বিষয় সমূহের নিজস্ব গুণ অবশ্যই থাকতে হবে। অর্থাৎ দক্ষতাগত বিষয়সমূহ, যাকে আমরা অধ্যায়ন করি অপর কোন লক্ষ্যের জন্য তার চেয়ে বিষয়সমূহের এই গুণকে ভিন্ন হতে হবে। এ কারণে অতীতে মানুষ সঙ্গীতকে পাঠ্যতালিকায় অঙ্গীভূত করত। সেটা প্রয়োজনীয় বিষয় হিসাবে নয়। কারণ প্রয়োজনীয় বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত সে নয়। কিংবা লেখা এবং পড়া, বিষয় পরিচালনা বা শাসনের জন্য যেমন প্রয়োজন, তেমন প্রয়োজন হিসাবেও নয়। কিংবা অংকনের জ্ঞান যেমন শিল্পীর চিত্র বুঝার জন্য আবশ্যক, তেমন হিসাবেও নয়। অথবা শরীর চর্চা যেমন স্বাস্থ্য এবং শক্তির জন্য উপকারী, তেমন উপকারী বিষয় হিসেবেও নয়। কারণ সুর বা সঙ্গীতের চর্চায় আমাদের এরূপ কোন লাভ হয় না। এগুলো বাদে শুধু একটি উদ্দেশ্যই অবশিষ্ট থাকে এবং তা হচ্ছে অবসরের একটি কর্ম যোগান। এবং স্পষ্টতঃ এ কারণেই প্রাচীনরা সঙ্গীতকে স্বাধীন নাগরিকের কর্ম হিসাবে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। হোমার তাই লিখেছিলেনঃ 'ভোজনেউৎসবে কেবলমাত্র তারই আমন্ত্রণ ঘটবে', এবং তারপর যে সব চরিত্রের কথা বলেছেন তারা কবিকে তার সঙ্গীত দ্বারা সকলকে আমোদিত করার জন্য আমন্ত্রণ করেছিল। আর একটি স্থানে কবি অডিসিয়াস সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, সার্বিক অবসরযাপন ঘটে তখন, সঙ্গীরা ভোজের মিলনালয়ে সারিবদ্ধভাবে উপবিষ্ট হয় এবং গায়কের সঙ্গীতকে শ্রবণ করে।

কাজেই এটা পরিষ্কার যে, আমাদের সন্তানদের জন্য এমন একটা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে যে শিক্ষা আবশ্যক কোন প্রয়োজনের কারণে নয়, যে শিক্ষা তাকে ভদ্র এবং উন্নত করে তুলবে। সঙ্গীতের এই শিক্ষা এক প্রকার, কিংবা বহু প্রকার, এর মধ্যে কি কি বিষয় অন্তর্ভুক্ত হবে এবং কিভাবে এদের শিক্ষাদান করা হবে, এ সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব। কিন্তু এ সম্পর্কে বর্তমানে কিছুটা যে আলোচনা করা না হয়েছে, এমন বলা চলে না। আমরা এদিকে কিছুটা অগ্রসর হয়েছি। একথা অন্ততঃ স্থির হয়েছে, সঙ্গীতকে শিক্ষার অন্তর্গত করতে হবে। প্রাচীনগণ যে সব বিষয় নির্দিষ্ট করেছিলেন তার মধ্যেই আমরা এর দৃষ্টান্ত পাই।

সঙ্গীতের বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে। কিন্তু কেবল সঙ্গীত নয়। অন্যান্য বিষয়ও তরুণদের শিখতে হবে। যেমন সাহিত্য। সাহিত্যকেও শিখতে হবে, কেবল এজন্য নয় যে এর শিক্ষা উপকারী। এ কারণেও বটে যে, এর মাধ্যমে আমরা অপর বিষয়ও শিখতে পারি। অংকন এবং নক্সার জ্ঞানও আবশ্যক কেবল এজন্য নয় যে এর ফলে ব্যক্তিগতভাবে ক্রয়কালে আমাদের ভুল হয় না। বরঞ্চ এজন্যও যে, এরফলে গৃহ-সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় কালে আমরা ঠকিনে। তাছাড়া এ কারণেও বটে যে এর শিক্ষা কোন বস্তুর মধ্যে সৌন্দর্য দর্শনে আমাদের সাহায্য করে। যাই হোক যারা উচ্চমনের অধিকারী এবং জন্ম যাদের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে, তাদের পক্ষে কোন জিনিষ সম্পর্কে কেবল উপকারের প্রশ্ন তোলা শোভন ব্যাপার নয়।

আর অভ্যাসের ভিত্তিতে শিক্ষাগ্রহণ যখন যুক্তিগত উপদেশের ভিত্তিতে শিক্ষাগ্রহণের পূর্বে আসে, দেহ যেমন মনের পূর্বে আসে, তখন এটা পরিষ্কার যে আমাদের সন্তানদের শরীরচর্চা, মল্লক্রীড়া এবং লড়াইতে রপ্ত করে তুলতে হবে, কারণ প্রথমটি দ্বারা দেহের অবস্থা এবং অপরটি দ্বারা দেহের কর্ম তৈরী হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

তরুণদের প্রশিক্ষণের মূল্য

আমাদের নিজেদের কালেও আমরা দেখছি যে, যে সমস্ত নগরী তরুণদের শিক্ষাদানের ব্যাপারে বিশেষভাবে বিখ্যাত, তারা হয় তরুণদের শোভনতার এবং দেহের বৃদ্ধির বিনিময়ে পর্যন্ত তাদের মধ্যে ক্রীড়াবিদদের অবস্থা সৃষ্টি করে কিংবা স্পারটানগণ যেখানে এই ভুলকে পরিহার করেছে সেখানে তাদের মত তরুণদের নির্মমভাবে পশুর মত গঠন করার চেষ্টা করে। কারণ তারা মনে করে, এর ফলে তরুণদের মনে সাহস তৈরী হয়। কিন্তু একথা আমরা একাধিকবার উল্লেখ করেছি যে, তরুণদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য কোন একটি বিশেষ গুণকে এবং অপর সকল গুণের বিনিময়ে তাকে তৈরী করা নয়। আর এমন শিক্ষার লক্ষ্য যদি সাহস হয় তবে এর দ্বারা সাহসও আসলে তৈরী হয় না। কারণ পশুই বলি কিংবা কম সভ্য কোন মানুষই বলি, তাদের মধ্যে সবচেয়ে ভয়ঙ্করের চরিত্রে সাহস কোন গুণ নয়। সাহস বরঞ্চ পশুদের মধ্যে যেগুলি অধিকতর শান্ত এবং মার্জার জাতীয়, সেগুলিরই বৈশিষ্ট্য। মানুষের মধ্যে বিশেষ করে পন্টাস একিয়ান এবং হেনিয়চির মধ্যে এমন গোত্রের মানুষ পাওয়া যায় যারা জবাই করা এবং এর খাদ্য ভক্ষণ করাতে বিশেষ আনন্দ লাভ করে। মূল ভূখণ্ডেও এরূপ মানুষ পাওয়া যায়। কেউ বেশী, কেউ কম। তারা দস্যু বটে। কিন্তু তাদের সাহস আছে, একথা বলা যায় না। ল্যাসিডিমনীয়দের সম্পর্কেও আমরা জানি যে, তারা যতদিন কঠিন প্রশিক্ষণে নিবদ্ধ ছিল ততদিন তারা অপরের চেয়ে উৎকৃষ্ট ছিল। কিন্তু বর্তমানে কি ক্রীড়া, কি যুদ্ধ—উভয়ক্ষেত্রে তারা পশ্চাতের সারিতে অবস্থান করছে। কারণ তাদের পূর্বকার শ্রেষ্ঠত্ব কোন বিশেষ প্রকারের প্রশিক্ষণের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তা প্রতিষ্ঠিত ছিল কেবল মাত্র এই সত্যের উপরে যে, তারা যেখানে তরুণদের প্রশিক্ষিত করে তুলত, অপরে সেখানে তাদের তরুণদের প্রশিক্ষণ দিতনা। কাজেই প্রশিক্ষণের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত পাশবিক কোন গুণ নয়, লক্ষ্য হওয়া উচিত চরিত্রের মহত্ত্ব। আমরা এমন কথা মনে করতে পারিনে যে, নেকড়ে বা অপর কোন পশু যখন মারাত্মকভাবে লাড়াই করে তখন তারা তাদের এই লড়াই-এর ন্যায্যতাবোধ থেকে লড়াই করে। কিন্তু যাকে আমরা সাহসী মানুষ বলি সে ন্যায্যতার বোধ থেকেই তার সাহস প্রদর্শন করবে। যারা তাদের তরুণদের প্রয়োজনীয় অপর সকল বিষয় শিক্ষাদান অবহেলা করেও মাত্রাধিকভাবে সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলে তারা আসলে তাদেরকে স্থূল এবং অশিক্ষিত মানুষে পর্যবসিত করে। এর দ্বারা তারা নাগরিকের জীবনের একটি ক্ষেত্রের জন্যই তাদেরকে উপযোগী করে। এবং আমরা দেখেছি, এক্ষেত্রেও তারা অপরের চেয়ে কম উপযোগী হয়ে তৈরী হয়। স্পারটানদের আমরা বিচার করব, কি তারা করত তার দ্বারা নয়, কি তারা বর্তমানে করে তার দ্বারাই। শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এমন অবস্থা পূর্বে ছিলনা।

শিক্ষায় শরীরচর্চার অবশ্যই একটি স্থান থাকতে হবে। সেই স্থানটি কি হবে, সেটি সম্পর্কেও সাধারণভাবে আমরা একমত। তরুণদের বয়ঃপ্রাপ্তি পর্যন্ত তাদের ব্যায়াম হাল্কা এবং সহজ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এ সময়ে এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে দেহের বৃদ্ধি ব্যহত হয়। খাদ্য যেমন ভারী হওয়া উচিত নয়, তেমনি জবরদস্তি কঠিন পরিশ্রমও ঠিক নয়। কারণ এর ফলে অবাঞ্ছিত খারাপ ফলেরই সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে অলিম্পিক ক্রীড়ার কথা বলা যায়। অলিম্পিকে এমন দৃষ্টান্ত খুব কম পাওয়া যায় যেখানে বয়স্ক ব্যক্তি এবং তরুণ বিজয়ী হতে পেরেছে। শরীরচর্চায় তাদের অত্যধিক জোর তাদের শক্তিকে বিনষ্ট করে। কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্তির পরবর্তী তিন বছর যখন তারা অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষালাভে ব্যয় করে তখন তার পরের সময়টাকে উত্তমভাবে শরীর চর্চায় ব্যয় করা চলে এবং তখন বাধ্যতামূলক ভারী খাদ্যের ব্যবস্থাও করা যায়। শরীর এবং মনের তীব্র চর্চা একই সঙ্গে কোনক্রমে করা ঠিক নয়। কারণ এদের দুটিই পরস্পর-বিপরীত মুখে কার্যকর হয়। শারীরিক শ্রম মনের ক্রিয়াকে এবং মনের ক্রিয়া দেহের ক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করে।

[দেহের প্রয়োজন বুঝা যায়। কিন্তু মনের প্রয়োজন স্পষ্ট নয়। এ কারণে এ্যারিস্টট্‌ল সঙ্গীতের প্রসঙ্গটি আবার তুলেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছিল যে, সঙ্গীত শিক্ষা লেখাপড়া শেখার মত অত্যাবশ্যকীয় নয়। এবং সঙ্গীত হচ্ছে একটি সনাতন উদারনীতিক শিক্ষা। কিন্তু শিশু বয়সে সঙ্গীত ও সুরের প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন এক কথা, আর পূর্ণ বয়সে তাকে জানা, তার চর্চা এবং তার প্রয়োগ ভিন্ন কথা। সঙ্গীত কেবল আনন্দের ব্যাপার নয়। তথাপি এর একটি অন্যতম প্রধান গুণ হচ্ছে এর আনন্দদানের ক্ষমতা। কিন্তু এই আনন্দের জন্যও আবশ্যক পূর্ব-শিক্ষা। খাদ্যের আনন্দের চাইতে এটি ভিন্ন। খাদ্যের আনন্দের জন্য পূর্ব-শিক্ষার কোন প্রয়োজন হয় না। এখানে একথা উল্লেখ করা যায় যে, একজন গ্রীক অর্থাৎ গ্রীসীয়র চরিত্রের গুণ হিসেবে সঙ্গীত, পরিচ্ছদ কিংবা অপর যে কোন দিকে তার রুচিকে মূল্যবান মনে করা হত।]

পঞ্চম অধ্যায়

সঙ্গীত সম্পর্কে আলাপ

সঙ্গীত সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের জবাব আমরা ইতিপূর্বে দিয়েছি। তবে বিষয়টি সম্পর্কে আরো একটু আলাপ প্রয়োজন। কারণ এ সম্পর্কে আমার যা বক্তব্য রয়েছে তাতে, আমার মনে হয় সঙ্গীত বিষয়ে ভবিষ্যতের আলোচনার সুবিধা হবে। বর্তমান আলোচনার শুরুতে আমাদের বলতে হয়, সঙ্গীতের প্রভাব কি এবং সঙ্গীত শিক্ষার লক্ষ্য আমাদের কি—এটি সংজ্ঞা দিয়ে বলা সহজ নয়। এটা কি দিবানিদ্রা, এক পাত্র সুরাপান করার ন্যায় কোন আনন্দ বা আরাম ভোগের ব্যাপার? এরূপ আমার মনে হয়না। কারণ এ গুলির নিজস্ব কোন গুরুত্ব নেই। অবশ্য এগুলি আনন্দকর এবং আমাদের মনের ভার লাঘবে এরা আমাদের সাহায্য করে। ইউরিপিডিস এরূপ কথাই বলেছিলেন। (এ কারণে অনেকে নিদ্রা, পান এবং সঙ্গীত-এ তিনটিকে এক পর্যায়ের বলে বিবেচনা করেন। এবং এগুলিকে একই ব্যবহারে নিয়োগ করেন। এর সঙ্গে অনেক সময়ে নৃত্যকেও যুক্ত করা হয়।) এর চেয়ে বরঞ্চ আমাদের কি সঙ্গীতকে চরিত্রের উপর প্রভাব বহনকারী উত্তমের উদ্দীপক মনে করা সঙ্গত নয়? ব্যায়াম যেমন একটি নির্দিষ্ট ধরনের দেহ তৈরী করে এবং সুবিবেচনা সম্পন্ন মানুষকে গঠন করে, সঙ্গীতের গুণও তাই। তৃতীয়ত, সঙ্গীতের নিশ্চয়ই বুদ্ধি এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন অবসর বিনোদনও একটি অবদান আছে।

কাজেই এটা পরিষ্কার যে, তরুণদের আমরা আনন্দ উপভোগের জন্য শিক্ষিত করব না। শিক্ষাগ্রহণ অবশ্যই একটি কঠিন ব্যাপার। শিশুরা যখন শিক্ষাগ্রহণ করে তখন তারা ক্রীড়াতে রত থাকেনা। অবশ্য শিশুরা সঙ্গীতকে একটি পেশা হিসেবে গ্রহণ করে বুদ্ধির চর্চা করার মত বয়স এখনো লাভ করেনি। কারণ পূর্ণাঙ্গ জীবন অসম্পূর্ণ দেহে বিরাজ করতে পারেনা। অবশ্য একথা কেউ বলতে পারে যে, শিশু বয়সে গুরুতর পাঠের লক্ষ্য পূর্ণাঙ্গ এবং বয়ঃপ্রাপ্ত মানুষের আনন্দ উপভোগ হতে পারে। কিন্তু এমন যদি হয়, তাহলে তাদের নিজেদের সঙ্গীত শিক্ষার প্রয়োজন কি? এর চেয়ে পারস্য এবং মেডিস-এর রাজাদের ন্যায় অপরের সঙ্গীত শ্রবণ করতে পারে এবং তা থেকে আনন্দ ভোগ করতে পারে। কারণ যারা সঙ্গীতকে একনিষ্ঠ চর্চার মাধ্যমে আয়ত্ত করেছে তারা অবশ্যই যারা কেবল সঙ্গীতকে বুঝার জন্য শিক্ষাগ্রহণ করেছে তাদের চেয়ে দক্ষতা দেখাতে পারবে। এযুক্তি যদি আমরা নাকচ করি, এবং বলি যে আমাদের নিজেদেরই শ্রমসহকারে সুর সৃষ্টি করতে হবে তার অর্থ কি এই দাঁড়াবে যে উত্তম খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়াও আমাদের শিখতে হবে? নিশ্চয়ই আমরা এমন কথা বলব না।

চরিত্রকে উন্নত করার ক্ষমতা সঙ্গীতের আছে কিনা—এ প্রশ্নেও একই কথা উঠবে। প্রশ্ন হবে : সঙ্গীত নিজে শেখার প্রয়োজন কি? তার চেয়ে ল্যাসিডিমনীয়গণ যেরূপ অন্যের

সঙ্গীত শ্রবণ করে সুরুচি এবং সুবিচারের ক্ষমতা আয়ত্ত্ব করে, তেমন করাতে অন্যায় কি? কেননা, তাদের দাবী যে, তারা সঙ্গীত না শিখেও উত্তম সঙ্গীতকে অধম সঙ্গীত থেকে সঠিকভাবে পৃথক করার ক্ষমতা রাখে। এই যুক্তি আবার আমরা যখন প্রশ্ন করি যে, ভদ্র জনের আনন্দকর এবং রুচিপূর্ণ অবসর বিনোদনের জন্য সঙ্গীত ব্যবহারে আপত্তি কোথায়, তখনো প্রয়োগ করা চলে। অপরের শিক্ষার ফল সহজে ভোগ করার বদলে তারা নিজেরা কেন সঙ্গীত সৃষ্টির চেষ্টা করবে? এ প্রসঙ্গে দেবতাদের সম্পর্কে আমাদের ধারণার কথা উল্লেখ করতে পারি। কবিরা জিউস দেবকে এমনভাবে দেখাননা যে, তিনি নিজে ক্রীড়াতে মত্ত হচ্ছেন কিংবা গান গাইছেন। মোটকথা পেশা হিসেবে যারা সঙ্গীতকে ব্যবহার করে আমরা তাদের নিম্নতর শ্রেণীর লোক বলে বিবেচনা করি। তবে কোন মানুষ যে নিজের আনন্দের জন্য কিংবা কোন জলসায় বেশ পরিমাণ সুরা পানের পরে একটু সঙ্গীত চর্চা করতে পারে না, এমন নয়।

যাই হোক প্রশ্নটির আলোচনা আপাতত স্থগিত রাখা যেতে পারে। বর্তমানে আমাদের প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে : আমরা সঙ্গীতকে শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করব কিনা এবং সঙ্গীত কি উদ্দেশ্য সাধান করতে সক্ষম? সঙ্গীত কি একটি শিক্ষা, অথবা উপভোগ কিংবা একটি ক্রিড়াবিশেষ? এর যুক্তিসঙ্গত একটা জবাব এই যে, এ তিনের সে সঙ্গী এবং তিনটির দিকেই সঙ্গীতকে পরিচালিত করা হয়। আনন্দ হচ্ছে বিশ্রামের জন্য এবং বিশ্রামকে অবশ্যই আনন্দজনক হতে হবে। কারণ কঠিন পরিশ্রমে যে সকল উপসর্গ তৈরী হয় বিশ্রাম তার এক প্রকার নিরাময়। সংস্কৃতিসম্পূর্ণ জীবনের ক্রীড়ার ক্ষেত্রে বলতে হয় এবং এ কথাটি সর্বজন স্বীকৃত যে, এর মধ্যে যেমন একটি আনন্দের দিক আছে তেমনি একটি মহত্তের দিকও আছে। কারণ এমন জীবনের যা সুখ তা এই দিয়েই তৈরী। আমরা সকলেই স্বীকার করি যে, সঙ্গীত হচ্ছে সবচেয়ে আনন্দদায়ক এবং সুন্দর বিষয়ের অন্তর্গত। একথা যন্ত্রসঙ্গীত বা কণ্ঠসঙ্গীত উভয়ের ক্ষেত্রে সত্য। এবং এ থেকেও বলা যায় যে, তরুণদের এটি শেখানো আবশ্যক। (কবি মুসায়ুস বলেছেন, সঙ্গীত হচ্ছে মানুষের সর্বাধিক আনন্দের ব্যাপার। কাজেই সঙ্গীত যখন মানুষকে সুখী করে তখন সঙ্গীতকে সঙ্গতভাবেই আনন্দ বিনোদন এবং সামাজিক ক্রিয়া-কর্মের অন্তর্গত করা আবশ্যক।) কারণ, যে জিনিষ আনন্দকর এবং নির্দোষ সে জিনিস কেবল যে লক্ষ্যের অংশ, তাই নয়। সে বিশ্রামের উপায়েরও অংশ। তবে মানুষ কদাচিতই তার লক্ষ্যকে অর্জন এবং রক্ষা করতে পারে। মানুষ বরঞ্চ প্রায়শঃই বিশ্রামের চর্চা করে এবং উপভোগ করে আনন্দ ব্যতীত অপর কোন লক্ষ্য নিয়ে নয়। একারণে সঙ্গীত থেকে প্রাপ্ত আনন্দের অবশ্যই একটা উপযোগী উদ্দেশ্য রয়েছে।

আবার মানুষ আনন্দকে লক্ষ্য হিসেবেও গ্রহণ করেছে, এমনও দেখা যায়। কারুর নিজের নির্বাচিত লক্ষ্যে একটা আনন্দ অবশ্যই থাকে। কিন্তু সে আনন্দ একটি বিশেষ ধরনের আনন্দ। এবং মানুষ আনন্দের অন্বেষণে একটিকে অপরটি বলে ভুল করে। কারণ, এদের মধ্যে একটা সাদৃশ্য যথার্থই রয়েছে। লক্ষ্যকে অর্জন করার চেষ্টা করা হয় ভবিষ্যৎ কোন ফলের জন্য নয়—লক্ষ্যকে অর্জন করার চেষ্টা করা হয় লক্ষ্যেরই জন্য। তেমনি আমাদের আলোচ্য বিশ্রাম-বিনোদনও ভবিষ্যতের জন্য নয়, এর প্রয়োজন বর্তমানের সুবিধার জন্য। এদের আনন্দ আসে শ্রম এবং কষ্ট যখন সমাপ্ত হয়েছে তখন। মানুষ কেন আনন্দের মাধ্যমে সুখের অন্বেষণ করে, তার একটা যক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা এরূপ হতে পারে। কিন্তু কেবল এ কারণেই যে মানুষ সঙ্গীতকে ভালবাসে এমন কথা ঠিক নয়। আমার মনে হয়, সঙ্গীত মানুষকে বিশ্রাম দেয়, এটি হয়ত এর আসল কারণ।

তবু আমাদের প্রশ্ন থাকে যে, এটি যদি সাধারণভাবে সত্য হয়, তথাপি অবসর বিনোদনের অধিক কি সঙ্গীতের কোন মূল্য নেই? সঙ্গীতের নিজস্ব আনন্দগত ব্যাপার অবশ্য একটি আছে। বয়স নির্বিশেষে সকলে এ থেকে আনন্দ উপভোগ করে। কিন্তু সাধারণভাবে যে আনন্দ মানুষ সঙ্গীত থেকে লাভ করে তাতে অংশগ্রহণের অধিক আমাদের কিছু করণীয় আছে। আমাদের বিবেচনা করতে হবে, মানুষের মন এবং চরিত্রের উপর সঙ্গীতের কোন প্রভাব আছে কিনা। এ প্রশ্নের জবাবটি সোজা হ'ত যদি আমরা বলতে পারতাম যে, সঙ্গীতের মাধ্যমেই আমরা এই বিশেষ কিংবা ঐ বিশেষ চারিত্রিক প্রবণতা লাভ করি। অবশ্য এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে যার ভিত্তিতে বলা চলে সঙ্গীতের যথার্থ এরূপ প্রভাব রয়েছে। অলিমপাস-রচিত সুরের ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য। এগুলিতে যে ব্যক্তিত্ব প্রভাবিত হয়, মানুষ যে মানসিক এবং নৈতিকভাবে বিশেষ রকমে উত্তেজিত হয়ে ওঠে, একথা পরিচিত। তাছাড়া নাটকের একটি অভিজ্ঞতা এই যে, নাটকীয় অনুষ্ঠান শ্রোতাদের নাটক অনুযায়ী প্রভাবিত করে। সুর এবং ছন্দ যা ব্যবহৃত হয় তা ব্যতীতই এই প্রভাবের কাজটি সংঘটিত হয়। যাহোক, সঙ্গীত যখন আনন্দকর বিয়েরই অন্তর্গত এবং সঠিকভাবে আনন্দ উপভোগ করা, সঠিকভাবে ভালমন্দ বিবেচনা করা যখন চারিত্রিক গুণের বিষয়, তখন নীতি এবং কর্মের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভ্যাস আয়ত্ত করার অধিক গুরুত্বপূর্ণ আর কি হতে পারে?

ছন্দ এবং সুরের ক্ষেত্রে বাস্তবের একটি ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য দেখা যায়। এ বাস্তব হচ্ছে অদ্রতা এবং অভদ্রতা, সাহস এবং সংযম; এসকল গুণের বিপরীত-তথা সকল নৈতিকগুণের বাস্তবতা। এবং সঙ্গীতের শ্রবণ যে যথার্থই আমাদের মধ্যে একটা আবেগমূলক পরিবর্তন সংঘটিত করে—এটি তারই আভাস বিশেষ। কোন কিছুতে আনন্দ কিংবা বেদনা বোধ করার অর্থ, বাস্তবের প্রতি আমাদের এরূপ একটি প্রবণতা আছে। আমার কথার অর্থ হচ্ছে, ধরা যাক কেউ একটি মূর্তিকে দর্শন করছে এবং সে মূর্তিটির চোখের চাহনিকে বিশেষ পছন্দ করছে এবং সে অপর কোন কারণে নয়, কেবল এ কারণেই যে সে মূর্তিটি দেখতে আনন্দ পাচ্ছে, তাহলে আমাদের বলতে হবে, এই মূর্তিটি যে বাস্তবে সাদৃশ্যবহন করছে সেই বাস্তবকে দেখেও তার আনন্দ হবে। একথা ঠিক যে, কোন বস্তুকে যখন আমরা কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ করি কিংবা তার কোন স্বাদ গ্রহণ করি তখন তাতে নৈতিক গুণের সঙ্গে কোন সাদৃশ্য তৈরী হয়না। কিন্তু সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিষয়টি ভিন্ন। সঙ্গীত যে সুরের সৃষ্টি করে তার মধ্যেই নৈতিক গুণ নিহিত থাকে।[১] এটা পরিষ্কার। কারণ প্রথমেই আমরা দেখি যে, শ্রোতাদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী বিভিন্ন সুরের মধ্যে পার্থক্য আছে। শ্রোতারা সকলে একই প্রকারে আলোড়িত হয় না। যেমন মানুষ যখন মিকসো-লীডীয় সুর শ্রবণ করে তখন তারা বিষণ্ন বা আলোড়িত বোধ করে। আবার এর চেয়ে শিথিল-বন্ধ সুর শ্রবণে তারা অধিক পরিমাণে আয়েশ বোধ করে। কেবল

১. হয়ত বস্তুর দর্শনেও এগুণ থাকে। কারণ দৃশ্যের একটা প্রভাব আছে। তবে তা সামান্য। আবার সকল মানুষের মধ্যে দর্শন থেকে এরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। তাছাড়া বস্তর গঠন এবং বর্ণ, যা আমাদের দৃষ্টিগ্রাহ্য সেগুলি চরিত্রের প্রতিনিধি নয়, বরঞ্চ তার আভাস মাত্র। এবং শক্তিশালী আবেগের ক্ষেত্রেই আমাদের দেহের উপর এর আভাস প্রকাশিত হয়। অবশ্য কোন্ বস্তুকে আমরা দেখছি তার উপরে অনেকখানি নির্ভর করে। যারা তরুণ তাদের পসন-এর চিত্রকে কল্পনা করা উচিত নয়। তার চেয়ে তাদের উচিত পলিগ্‌নোটাস এবং অপর সেই সকল চিত্রকর এবং ভাস্করদের সৃষ্টির চিন্তা করা যারা যথার্থই নীতিবান।

ডোরীয় সুরে, আমার মনে হয়, এ দু'এর মধ্যপ্রকারের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। অপরদিকে ফ্রিজীয় সুর মানুষকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করে। শিক্ষার এই দিকটির উপর যে সব উত্তম কার্য সম্পাদিত হয়েছে, এগুলি হচ্ছে তারই ফল। গবেষণকগণ এ ক্ষেত্রে বাস্তব পরীক্ষা সম্পন্ন করেছেন এবং তার ভিত্তিতে তাঁরা তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। বিভিন্ন প্রকার ছন্দ সম্পর্কেও একই কথা। এর কিছুর যেমন স্থিরতা সৃষ্টির প্রভাব আছে, তেমনি অপর কতকগুলি প্রভাব হচ্ছে অস্থিরতা সৃষ্টি করা। এবং শেষোক্তগুলি নানা স্থুল অঙ্গ সঞ্চালনের জন্মদান করে। কতকগুলি অবশ্য অধিকতর ভদ্র প্রভাব তৈরী করে।

এ আলোচনা থেকে এটা বলা চলে যে, সঙ্গীতের যথার্থই মনের মধ্যে নানা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে। এবং তা যদি সঙ্গীত করতে পারে তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে একে আমাদের অবশ্যই প্রয়োগ করতে হবে এবং তরুণদের সঙ্গীতে এবং সঙ্গীত দ্বারা শিক্ষিত করেত হবে। কারণ তরুণরা আনন্দজনক না হলে কোন কিছুকে স্বেচ্ছায় গ্রহন করতে চায় না। এবং সেদিক থেকে সঙ্গীত হচ্ছে তার নিজস্ব প্রকৃতিতেই আনন্দদায়ক। তাছাড়া মানুষ এবং সঙ্গীতের মধ্যে সুর এবং ছন্দের বিষয়ে একটা ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক আছে। এ কারণে অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন যে, আত্মা হচ্ছে সঙ্গীতের সঙ্গতি। অপর অনেকে বলেন, আত্মার সঙ্গতি আছে।

[বিষয়টির আলোচনা আবার ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। সপ্তম অধ্যায়ে এর আলোচনা পুনরায় দেখা যাবে। বর্তমানে আলোচ্য প্রশ্ন হচ্ছে, একজন ভদ্র নাগরিকের শিক্ষায় সঙ্গীতের কোন্ যন্ত্র-বাদনকে কতখানি অনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। কারণ যন্ত্র বাজানো হচ্ছে একটি দৈহিক শ্রমের কাজ, মানসিক শ্রমের নয়। এর পরে গ্রীসীয়দের প্রধান হাওয়া বাদন বা বাঁশী বাজানো নিয়ে একটি ভিন্নতর আলোচনা উত্থাপন করা হয়েছে।]

ষষ্ঠ অধ্যায়

সঙ্গীতের শিক্ষা যেন যান্ত্রিক না হয়

যে প্রশ্নটি আমরা পূর্বে তুলেছিলাম সেটিতে আবার ফিরে যাওয়া যাক। তরুণরা কি নিজেরাই গান করতে শিখবে এবং তারা নিজেদের হাতে কি বাদ্যযন্ত্র বাজাবে? কারণ, কি ধরণের ব্যক্তিত্ব তৈরী হবে তা স্পষ্টতই নির্ভর করবে গান বাজনাতে বাস্তব অংশ গ্রহণের উপর। একথা ঠিক যে, যারা কোনদিন গান বাজনাতে নিজেরা অংশ গ্রহণ করেনি তারা সঙ্গীতের উত্তম বিচারককে পরিণত হতে পারেনা। (এবং বাজনা বাজানোর শিক্ষা যে একই সঙ্গে শিশুদের মনকে নিবিষ্ট করে রাখার উপায় হিসাবে কাজ করবে এটা অস্বীকার করা যায় না। এক্ষেত্রে আরকিটাস আবিস্কৃত 'ঝুনঝুনি' বাদ্য শিশুদের ব্যস্ত রাখার ক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী হয়েছিল। কোন যন্ত্র বাদে শিশুরা শান্ত থাকবে, এটি আশা করা যায় না। বরঞ্চ শিশুদের হাতে খেলনা দিলে তারা গৃহের দ্রব্যাদি ভেঙ্গে ফেলবেনা। অবশ্য একেবারে ছোটদের ক্ষেত্রেই এর উপযোগিতা। অধিকতর বয়স্ক তরুণদের জন্য শিক্ষাটাই হচ্ছে তাদের 'ঝুনঝুনিবাদ্য'।) আমরা যে আলোচনা করেছি তাতে এটি পরিষ্কার যে, সঙ্গীত শিক্ষা বলতে সঙ্গীতের বাস্তব চর্চাকেও বুঝাবে। কোন্ বয়সের জন্য কোন্‌টি উপযুক্ত, তা নির্ধারণ করা কঠিন নয়। কিংবা যারা মনে করেন গান বাজনার চর্চা করা স্থূল এবং চরিত্রের হানিকর, তাদের জবাবদানও কঠিন নয়। প্রথমত আমরা পূর্বেই বলেছি উত্তম সমঝদার হওয়ার জন্য গান-বাজনার চর্চা আবশ্যক। কাজেই শিক্ষার্থীরা যখন অল্প বয়স্ক থাকবে তখন তাদের বেশ পরিমাণে গান বাজনার চর্চা করতে দেয়া হবে। তাদের বয়স অধিক হলে এটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। তখন তাদের পূর্বের শিক্ষার কারণে তারা সঙ্গীতের উত্তম সমঝদার হতে পারবে এবং সঙ্গীত থেকে আনন্দও লাভ করতে পারবে। এবং যারা এরূপ আপত্তি তোলেন যে, গান-বাজনা ভদ্রজনের চরিত্রের হানি ঘটায় তাঁদের জবাব তরুণরা রাষ্ট্রের উচ্চতম দায়িত্ব পালন শিক্ষার ক্ষেত্রে গান বাজনার চর্চা করছে এবং কোন্ বিশেষ সুর ও ছন্দ তাদের দেওয়া হচ্ছে—এবং কোন্ বাদ্য যন্ত্র বাজাতে তারা শিখছে—এ বিবেচনা দ্বারা দেওয়া যাবে। কারণ এগুলির উপরই ব্যাপারটা নির্ভর করে। এই সব প্রশ্নের জবাবের মধ্যেই মূল আপত্তির জবাবও লাভ করা যাবে। এবং জবাব পাওয়া যে আবশ্যক, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ কোন কোন সংগীতের অবশ্যই বিরূপ প্রভাব রয়েছে।

কাজেই এটা পরিষ্কার সে সঙ্গীতের শিক্ষা এমন হবে না যাতে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যত জীবনের বার্যক্রমের উপর কোন বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে। সঙ্গীতের কারণে দেহ যেন 'বানউসিক' তথা যান্ত্রিক না হয় এবং নাগরিক অথবা সৈন্য হিসেবে শিক্ষাপ্রাপ্তির অনুপযুক্ত হয়ে না পড়ে, তার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। একথা তরণদের অল্পবয়সের চর্চা এবং পরবর্তী বয়সের তত্ত্বশিক্ষা-উভয় ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেটা প্রয়োজন সে হচ্ছে এই যে, তরুণরা পেশাগত প্রতিযোগিতার জন্য সঙ্গীতের দক্ষতা অর্জন করার চেষ্টা করবে না। কিংবা

সম্প্রতি যেসব চটুল উত্তেজনাকর সঙ্গীত প্রতিযোগিতার মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে, সেগুলিও তারা শিখবে না। এগুলি শিক্ষাব্যবস্থাকে পর্যন্ত প্রভাবিত করেছে। এ ধরণের বাইরের যে সংগীত তার চর্চাও তরুণরা সেই পর্যায় পর্যন্ত করবে যে পর্যায়ে তারা উত্তম সুর ও ছন্দকে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে। তারা দাস, সাধারণ শিশু, এমনকি পশুদের পর্যন্ত যে সংগীত আনন্দ দান করে সে সংগীত শিখবে না। এ থেকে এটাও বুঝা যাবে, কোন্ ধরনের সংগীত যন্ত্র ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আমরা বাঁশী বা হাওয়া-যন্ত্রের প্রবর্তনের অনুমতি অবশ্যই দিব না। কিংবা 'সিথারা' বা অনুরূপ এমন কোন যন্ত্র যার জন্য পেশাগত দক্ষতা আবশ্যক, তারও অনুমতি দেওয়া উচিত হবে না। কেবলমাত্র সেগুলিরই অনুমতি দেওয়া হবে যেগুলি সংগীতের উত্তম শ্রবণ এবং সাধারণভাবে সংগীত শিক্ষার জন্য আবশ্যক। তাছাড়া সানাই জাতীয় যন্ত্র উত্তম নীতির জন্য উপকারী নয়। এগুলির উত্তেজক প্রভাব রয়েছে। সে কারণে এ গুলির ব্যবহার সেই সব উপলক্ষ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে যে সব আয়োজনের লক্ষ্য বুদ্ধির বৃদ্ধি নয়, যার লক্ষ্য আবেগের প্রকাশ মাত্র। তাছাড়া এর শিক্ষাগত আপত্তি এই যে, বাঁশী বা সানাই বাজানো ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতাকে ব্যহত করে। এ কারণে আমাদের পূর্বপুরুষগণ এ সব হাওয়াই-যন্ত্র উচ্চতর শ্রেণীর তরুণদের জন্য নিষিদ্ধ করে ঠিক কাজই করেছিলেন। অবশ্য এরও আগের যুগে এদের ব্যবহারের অনুমতি ছিল। তখন ব্যাপারটা যেরূপ ঘটেছিল সে হচ্ছে এই : মানুষের সমৃদ্ধি ঘটতে লাগল। মানুষের যেমন অবসর জুটল, তেমনি তারা তাদের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক মান অধিকতর উন্নত করতে চাইল। পারস্যবাসীর[১] সঙ্গে যখন যুদ্ধ ঘটল তার কিছু পূর্বে এবং বিশেষ করে তার পরবর্তীকালে যখন যুদ্ধের জয় তাদের আত্মবিশ্বাসকে বৃদ্ধি করে দিয়েছিল তখন তারা ভালমন্দ নির্বিচারে সকল প্রকার দক্ষতা অর্জনে আগ্রহী হয়ে উঠল। শিক্ষায় সানাই প্রবর্তিত হল এবং স্পারটাতে দেখা গেল সংগীতদলের নেতা নিজেই সানাই বাজিয়ে দলের সকলকে তার তালে নাচাতে লাগল এবং এথেন্সে এর ব্যবহার এত ব্যাপক হল যে, ভদ্রশ্রেণীর অধিকাংশই বোধ হয় এটা আয়ত্ত করে ফেলল। একফ্যনসিটিডিস-এর সংগীত শিক্ষক হিসেবে থ্রাসিপাস যখন নিযুক্ত ছিলেন তখন তিনি একটি চিত্রকে এ উপলক্ষে উৎসর্গ করেছিলেন। এ ঘটনাতে এর ব্যাপকতা বুঝা যায়। কিন্তু পরবর্তীকালে বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে সানাই-এর ব্যবহার তার জনপ্রিয়তা হারাল। মানুষ ক্রমান্বয়ে বুঝতে সক্ষম হল, উচ্চমানের উত্তম কিসের দ্বারা সাধিত হয় এবং কিসের দ্বারা সাধিত হয় না। পুরাতন আরো কিছু বাদ্যযন্ত্রের সংগীত শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুরূপ অপকারিতা দেখা গেল। এগুলির মধ্যে বাছুরী, বারবিটোজ এবং আর যেগুলি কেবল বর্ণকে আলোড়িত করে সেগুলি ছিল—যেমন সপ্তভুজ, ত্রিভুজ, সাম্বুকা এবং যেগুলির জন্য দৈহিক দক্ষতা আবশ্যক। সানাই ব্যবহারের ক্ষেত্রে প্রাচীনগণ যে কাহিনীর উল্লেখ করতেন তাতেও তাঁদের জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। গল্প আছে যে, এথেনাই এগুলি আবিষ্কার করে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। গল্পের বর্ণনায় আছে যে, এ যন্ত্রের বাদক মুখের পেশীর যে বিকৃতি সাধন করে তার জন্য এথেনা অপছন্দ করেছিলেন। এর চেয়ে যুক্তিপূর্ণ কারণ হচ্ছে, সানাই বাজানোতে মনের

১. গ্রীস ও পারস্যের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধ : খ্রীষ্টপূর্ব ৪৯০ এবং ৪৮০ সনে পরপর দু'বার পারস্য সাম্রাজ্যের সম্রাট দারায়ুস এবং জারাকসিস গ্রীক নগর রাষ্ট্রগুলিকে বিরাট বাহনী সহ আক্রমণ করেন। কিন্তু উভয় আক্রমণকেই এথেন্স ও স্পারটার নেতৃত্বে গ্রীক নগর রাষ্ট্রগুলি প্রতিহত করে নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করে।

শিক্ষার কোন উন্নতি ঘটে না। এবং এথেনা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমতী ছিলেন, কেবল তাঁর অংগুলী সঞ্চালনে দক্ষ নন।

কাজেই যে প্রশিক্ষণ পেশাদারী এবং প্রতিযোগিতামূলক, সে প্রশিক্ষণকে আমরা শিক্ষাব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করতে পারিনে। এরূপ অনুশীলনে যে অংশগ্রহণ করে সে নিজের চরিত্রের উন্নতি বিধানের জন্য করে না। তার উদ্দেশ্য থাকে শ্রোতাদের আনন্দ বিধান করা। এবং সে আনন্দ স্থূল আনন্দ। ভদ্রজনের জন্য এরূপ কর্ম উপযুক্ত বলে আমরা মনে করিনে। এ কাজ মানায় বেতনভূক কর্মচারীকে। অনিবার্যভাবে এর ফল চরিত্রের জন্য হানিকর। কারণ সস্তা আনন্দ দান, যেটি এর লক্ষ্য সেটি উচ্চমানের কোন জিনিষ নয়। এর শ্রোতা হচ্ছে সাধারণ মানুষ এবং সে অনুযায়ী সঙ্গীত প্রভাবিত হয়। যার জন্য এই সঙ্গীত গীত হয়, তার দ্বারাই গায়ক নিজে প্রভাবিত হয়। জনতা যে সঙ্গীত তার নিকট থেকে প্রত্যাশা করে এবং যে অংগভঙ্গী দ্বারা সেই সংগীত তাকে সৃষ্টি করতে হয় তাতে গায়কের দেহ এবং মন উভয়ই ক্ষতিকরভাবে প্রভাবিত হয়।

সপ্তম অধ্যায়

সুর এবং ছন্দের বিষয়ে

সুর এবং ছন্দ এবং শিক্ষার সঙ্গে এর সম্পর্কের বিষয়ে আমাদের কিছু আলোচনা করা আবশ্যক। সমস্ত রকম সুর এবং ছন্দকেই কি আমরা ব্যবহার করব, না এ সম্পর্কে শ্রেণীভেদের আমরা বিচার করব? তাছাড়া এ শ্রেণীভেদের বিচারের ভিত্তি কি শিক্ষার ক্ষেত্রেও এক হবে—অথবা এজন্য তৃতীয় কোন নীতি আমরা নির্দিষ্ট করব? সঙ্গীত যে, সুর এবং ছন্দ তৈরীর জন্য দুই ভাগে বিভক্ত হয় তা আমরা জানি। এবং শিক্ষার উপর এর উভয়ের কি প্রভাব, তা স্থির করার বিষয়টি আমাদের উপেক্ষা করা উচিত নয়। কোন্ শ্রেণীর সংগীতকে আমরা উচ্চতর মনে করব?—সুন্দর সুরের সংগীত কিংবা উত্তম ছন্দের সংগীত? আমার বিশ্বাস এ বিষয়গুলি অনেক আধুনিক সংগীতের এবং যাদের দৃষ্টিভঙ্গী দার্শনিক কিন্তু যারা সংগীত সৃষ্টিতে নিজেরা পারদর্শী তাঁরা উত্তমরূপেই আলোচনা করে থাকেন। যাঁরা এর বিভিন্ন প্রশ্নের বিস্তারিত আলোচনা চান তাঁদেরকে আমি বরঞ্চ এই সব মহলের শরনাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দিব। বর্তমানে আমি এ সম্পর্কে একটি সাধারণ বিবরণ দেব এবং প্রচলিত শ্রেণীগুলির উল্লেখ করব।

অনেক শিক্ষাবিদ সুরের যে শ্রেণীভেদ করেন—যথা নীতিমূলক, ক্রিয়ামূলক এবং আবেগমূলক—এবং রাগ-রাগিনীকে যারা উপযুক্তভাবে একটি কিংবা অপরটির সঙ্গে যুক্ত করেন আমরা তাঁদের সেই শ্রেণীবিভাগটিকে গ্রহণ করি। কিন্তু আমাদের কথা হচ্ছে, সংগীতের উপকার কেবল একটি নয়, সংগীতের উপকার অনেক। যথা, শিক্ষার জন্য যেমন এর উপকার রয়েছে, তেমনি বিমোক্ষণের জন্যও রয়েছে। বুদ্ধিগত চর্চা হিসেবে এর উপকার আছে, আবার উদ্বেগ এবং গুরুভার লাঘবের ক্ষেত্রেও এর উপকার আছে। (এখানে কোন ব্যাখ্যা ব্যাতীতই আমি 'বিমোক্ষণ' কথাটিকে ব্যবহার করছি। এ বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা আমি আমার 'কাব্যকলায়' করার আশা রাখি।) কাজেই সকল সুরের ব্যবহার হলেও একই প্রকারে সকলের ব্যবহার উচিত নয়। আমাদের উচিত শিক্ষার জন্য সে গুলিকে ব্যবহার করা যেগুলি চরিত্রের উন্নতির জন্য কার্যকর। অপরের সংগীত শ্রবণের ক্ষেত্রে ক্রিয়ামূলক এবং আবেগমূলক বা আনন্দমূলক সুরের ব্যবহার শ্রেয়। একের মধ্যে যে আবেগের সঞ্চার হয় সে আবেগ, যেমন করুণা বা ভীতি এবং 'আনন্দ', অপর সকলের মধ্যেও কম-বেশী পরিমাণে বিরাজ করে। তবে এই উত্তেজনা কাউকে বিশেষভাবে আলোড়িত করে। এটা ধর্মীয় সংগীত থেকে উদ্ভূত হতে পারে। এবং এটিও লক্ষণীয় যে শ্রোতারা যখন উত্তেজক সুর শ্রবণ করে তখন তারা উত্তেজনায় উপবিষ্ট অবস্থা থেকে তাদের পায়ের উপর দণ্ডায়মান হয়ে যায়। দেখে মনে হয় যেন তারা কোন নিরাময় বা শোধনকারী ব্যবস্থা ভোগ করেছে। এবং যারা করুণা, ভয় কিংবা অন্য আবেগে আচ্ছন্ন হয় তারাও সকলে যার যার আবেগের পরিমাণের ভিত্তিতে আবিষ্ট হয়। এদের সকলের মধ্যেই

শোধিত হওয়ার একটা আনন্দ এবং আরাম-বোধের সৃষ্টি হয়। একইভাবে বিমোক্ষণী সংগীতও মানুষের মধ্যে এমন একটা উৎসাহ-বোধের সৃষ্টি করে যা মোটেই ক্ষতিকর নয়। কাজেই সুর এবং ছন্দের ক্ষেত্রে এগুলিকে রংগালয়ের প্রতিযোগিতামূলক সংগীত থেকে পৃথক করা আবশ্যক।

রংগশালায় দুধরনের শ্রোতা দেখা যায়। এদের এক দল হচ্ছে সুশিক্ষিত ভদ্রজন। অপর দল হচ্ছে দৈহিক শ্রমে নিযুক্ত, বেতনভুক কিংবা অনুরূপ কর্মের সাধারণ মানুষ। শেষোক্ত এই দলের শ্রোতাদের বিরাম এবং আনন্দদানের জন্য অবশ্য প্রতিযোগিতা এবং দৃশ্যের অনুষ্ঠান করতে হবে। কিন্তু তাদের মন যেহেতু প্রকৃতির অবস্থা থেকে দূরে সরে গেছে এবং বিকৃত হয়েছে সে কারণে আদর্শ সুর থেকে ব্যতিক্রম স্বাভাবিক। এটি দৃষ্ট হয় সুরের অস্বাভাবিক উচ্চগ্রাম এবং কণ্ঠের আলোড়নে। এই শ্রেণীর শ্রেতাদের মনোরঞ্জনমূলক সংগীত যখন নাট্যশালায় সংগীতকারগণ তৈরী করেন তখন সংগীতকারদের স্বার্থে এই দিকটিকে আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে।

কিন্তু আমরা পূর্বেই বলেছি, শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা সুরকে ব্যবহার করব তার নীতিমূলক মূল্যের কারণে। সংগীতের ক্ষেত্রেও আমাদের বিবেচনা এরূপ হবে। আমরা পূর্বে বলেছি, এই শ্রেণীর অন্তর্গত হচ্ছে ডোরীয় ধারা। কিন্তু যে সমস্ত শিক্ষক দর্শন এবং সংগীত শিক্ষার সমন্বয় বিধান করেছেন তাঁরা যদি উপযক্ত মনে করেন, তবে অন্য ধরণগুলিকেও আমরা ব্যবহার করতে পারি। এটি অবশ্য দুঃখের বিষয় যে, সক্রেটিস 'রিপাবলিক'-এর মধ্যে শুধুমাত্র ফ্রিজীয় ধরনকে ডোরীয় ধরনের সংগে যুক্ত করতে বলেছেন এবং বাঁশীর ব্যবহার একেবারে নিষিদ্ধ করেছেন অথচ যন্ত্রের মধ্যে যেমন বাঁশী বা সানাই তেমনি সুরের মধ্যে ফ্রিজীয় হচ্ছে একই প্রকার ক্ষতিকর। উভয়ই হচ্ছে উত্তেজক এবং আবেগমূলক। কাব্যিক রচনার মধ্যে এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। সংগীতের যন্ত্রের মধ্যে সানাই জাতীয় যন্ত্র যে আবেগের সৃষ্টি করে সেরূপ আবেগের সৃষ্টি হয় ডায়োনীসিয় এবং অনুরূপ অপর কাব্যকলায়। এবং এ সব কবিতারই উপযুক্ত প্রকাশ ঘটে ফ্রিজীয় ধরণের সুরে। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় ডিথাইরাম বা ক্ষুদাকার উচ্ছল গীতি কাব্যকে ফ্রিজীয় বলে বিবেচনা করা হয়। যাঁরা এর বিশেষজ্ঞ তাঁরা এর অনেক উদাহরণ দিয়ে থাকেন। বিশেষ করে ফিলোকজেনাস যিনি ডোরীয় পদ্ধতিতে তাঁর উপাখ্যানগুলিকে ডিথাইরামের জন্য তৈরী করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন তাঁর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়। তিনি যে সকল বিষয় নিয়ে তাঁর কাব্য তৈরী করার চেষ্টা কচ্ছিলেন তার নিজস্ব চরিত্রই তঁকে উত্তম পদ্ধতি ফ্রিজীয়তে প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করে। তবে ডোরীয় পদ্ধতির এ গুণের বিষয়ে সকলে একমত যে, এটি সবচেয়ে স্থায়ী এবং অপর গুণ হচ্ছে এই যে, এটি পুরুষোচিত। তাছাড়া আমরা যখন দুই চরমের মধ্যবর্তীকেই উত্তম মনে করি এবং বলি যে এটিকেই লক্ষ্য হিসেবে নির্দিষ্ট করা উচিত এবং অন্য সুরের তুলনায় ডোরীয় সুরের যখন এই গুণটি রয়েছে তখন আমরা বলব, তরুণদের শিক্ষাদানের জন্য অপর সুরের চেয়ে ডোরীয় সুরই অধিক উপযুক্ত।

দুটি বিষয় আমাদের সর্বদাই খেয়াল রাখতে হবে : কি সাধন করা যায় এবং কি সাধন করা উচিত। সমস্ত প্রকার মানুষেরই কর্তব্য হচ্ছে সম্ভব এবং উচিতকে অর্জন করার চেষ্টা করা। কিন্তু বয়সের ভিন্নতায় এর ভিন্নতা ঘটে। যারা বয়সের কারণে শ্রান্ত হয়েছে এবং উচ্চগ্রামে সুর তৈরী যাদের পক্ষে সহজ নয়, তাদের জন্য প্রকৃতি নিম্নগ্রামের সুরের ব্যবস্থা রেখেছে। এবং এ কারণে কোন কোন সংগীতজ্ঞ সক্রেটিসের বিরুদ্ধে এই সংগত

অভিযোগটি উত্থাপন করেন যে, তিনি শিক্ষার ক্ষেত্রে বিরামমূলক সব সুরকে নাকচ করে দিয়েছেন। তিনি তাদের সবগুলিকে সুরাপানের তুল্য মনে করেছেন, উত্তেজক নয় বটে, কিন্তু নিদ্রা সঞ্চারী এদের প্রভাবের কারণে। (উত্তেজক নেশায় বরঞ্চ একটা স্ফূর্তির ভাব তৈরী হয়।) কাজেই আমাদের পরবর্তীকালের বয়সের কথা অর্থাৎ জীবনের যে পর্যায় আমাদের অনিবার্যভাবে আসবে, তার কথা স্মরণ করে আমাদের এই সকল সুরেই আবদ্ধ থাকা আবশ্যক। তাছাড়া এরকম একটা সুর যদি আমাদের থাকে যে সুর শিক্ষা এবং শৃঙ্খলাকে যুক্ত করার ক্ষেত্রে তার ক্ষমতার কারণে শিশু বয়সের উপযোগী (লীডিয়দের দৃষ্টান্তটি ধরা যায়।) তাহলে এটা পরিষ্কার যে, শিক্ষার ক্ষেত্রে কাম্য মধ্যম, সাধ্য এবং উপযোগী-এই তিনটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

পরিশিষ্ট

‘পলিটিকস’-এর বিষয়-সংক্ষেপ

[প্রথমে পুস্তকসংখ্যা, পরে অধ্যায়সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।]

১ : ১ রাষ্ট্র হচ্ছে সর্বোচ্চ সংস্থা। রাষ্ট্রের লক্ষ্য সর্বোত্তম মঙ্গল। রাষ্ট্রের উপাদানের বিশ্লেষণে অপর সংস্থার সঙ্গে এর পার্থক্য প্রকাশিত হবে।

১ : ২ রাষ্ট্রের উপাদান গ্রাম। গ্রামের উপাদান পরিবার। পরিবার স্থাপিত হয় দুটো সম্পর্কের ভিত্তিতে : স্বামী এবং স্ত্রীর সম্পর্ক, প্রভু এবং দাসের সম্পর্ক। রাষ্ট্রের উদ্ভব মানুষের প্রতিদিনের চাহিদা পূরণের জন্য। গ্রাম পরিবারের চাইতে অধিকতর বিস্তারিত সংস্থার চাহিদা পূরণ করে। রাষ্ট্রের লক্ষ্য মানুষের সকল চাহিদা পূরণ করা। ন্যূনতম চাহিদা পূরণের জন্য রাষ্ট্রের সৃষ্টি। কিন্তু রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য উত্তম জীবনযাপন। রাষ্ট্র যে প্রাকৃতিক, তার প্রমাণ মানুষের ভাষা ব্যবহারের দক্ষতায়। প্রকৃতির ধারাক্রমে রাষ্ট্র পরিবার এবং ব্যক্তির পূর্বগামী। রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা মানুষের স্বভাবগত প্রবণতার উপর। মানুষের প্রকৃতিগত প্রবণতা হচ্ছে রাষ্ট্র গঠনের প্রবণতা।

১ : ৩ পরিবারের আলোচনা আসে প্রথমে। কারণ রাষ্ট্র পরিবার নিয়েই গঠিত।

১ : ৪ পরিবারের মধ্যেও প্রথমে আলোচনা আসে দাসের। দাস হচ্ছে একপ্রকার সজীব যন্ত্র।

১ : ৫ দাসত্ব প্রাকৃতিক। প্রকৃতির সর্বত্রই শাসক এবং শাসিতের সম্পর্ক বিদ্যমান। মানুষের মধ্যে এমন মানুষ আছে যাদের যুক্তির বোধ নাই, কিন্তু যুক্তি অনুধাবনের ক্ষমতা আছে। এরা হচ্ছে প্রাকৃতিক দাস।

১ : ৬ কিন্তু দাসের মধ্যে এমন লোকও পাওয়া যায় যারা প্রাকৃতিক দাস নয়। এ কারণে অনেকে দাসব্যবস্থার সমালোচনা করেন। কিন্তু এমন সমালোচনা ভ্রান্ত। যারা প্রকৃতিগতভাবে দাস তারাও তাদের প্রভুর অধীনতা দ্বারা উপকৃত হয়।

১ : ৭ দাসকে শাসন করা নাগরিককে শাসন করা থেকে পৃথক। তবে এজন্য শিক্ষার প্রয়োজন পড়ে না। যারা প্রকৃতিগতভাবে প্রভু তারা সহজেই এ দক্ষতা আয়ত্ত করতে সক্ষম।

১ : ৮ সম্পদের প্রকৃতি এবং তা সংগ্রহের উপায়ের প্রশ্ন : প্রশ্নটির আলোচনা আবশ্যক। কারণ, সম্পদ জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন।

১ : ৯ কিন্তু যে সম্পদের লক্ষ্য কেবল অর্থ উপার্জন তা স্বাভাবিক সম্পদ নয়। এ সম্পদ কৃত্রিম। এর উদ্ভব ঘটেছে মুদ্রার আবিষ্কার থেকে। এর স্বভাব হচ্ছে বিনিময়ের মাধ্যমে টাকার সঞ্চয় করণ। স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক সম্পদকে অনেক সময়ে অভিন্ন মনে করা হয়। এরূপ মনে করা ঠিক নয়। এদের একের লক্ষ্য অপর থেকে ভিন্ন।

১ : ১০ সম্পদের প্রকৃতির ক্ষেত্রেও এরা ভিন্নতর। প্রাকৃতিক সম্পদ প্রকৃতির দেওয়া ফলমূল, শস্য এবং পশুতেই নিহিত।

১ : ১১ যে সম্পদ স্বাভাবিক তথা প্রাকৃতিক, পরিবারের জন্য তার প্রয়োজন আছে। গৃহীকে তাই তার গৃহপালিত পশু, কৃষি-কার্য এবং জমির ফলফসল, কাষ্ঠ এবং খনিজদ্রব্য প্রভৃতির বিনিময়ে অর্থসংগ্রহের জ্ঞানেও জ্ঞানী হতে হবে। অর্থনীতির উপর বিভিন্ন আলোচনা আছে। রাষ্ট্রনৈতিকদের তার মধ্য থেকে বিষয়টির বিশেষ জ্ঞান সংগ্রহ করতে হবে।

১ : ১২ সর্বশেষে স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যকার, পিতা এবং পুত্রের সম্পর্কের বিশিষ্টতার বিষয়টি আলোচনা করতে হবে।

১ : ১৩ পরিবারের ব্যবস্থাপনায় দ্রব্যের চেয়ে মানুষ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের মধ্যেও অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দাসদের চাইতে স্বাধীন নাগরিক। দাসগণ কেবল নিম্নতর গুণকেই অর্জন করতে পারে। গুণের প্রকারভেদ ঘটতে পারে না, সক্রেটিসের এমন বক্তব্য ঠিক নয়। দাসদের ক্ষমতা অধিক না হলেও তাদের গুণ অর্জনে শিক্ষিত করা আবশ্যক। স্বাধীন নাগরিকের শিক্ষার বিষয়টি পরবর্তীতে আলোচিত হবে।

২ : ১ আদর্শ রাষ্ট্রের প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য আমাদের প্রয়োজন ইতিহাসের সর্বোত্তম রাষ্ট্র এবং চিন্তাবিদদের কল্পিত সর্বোত্তম রাষ্ট্রের ধারণার আলোচনা। অন্যথায় যে সমস্যার আলোচনা সম্পাদিত হয়েছে তার উপর আমাদের বৃথা কালক্ষেপণ ঘটতে পারে। চিন্তাবিদদের মধ্যে প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক'-এ সবচাইতে মৌলিক প্রশ্নসমূহকে উত্থাপন করেছেন। তাঁর একটি প্রস্তাব হচ্ছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং ব্যক্তিগত পরিবার বিলোপ করতে হবে।

২ : ২ কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁর লক্ষ্য সঠিক নয়। প্লেটো সকল নাগরিককে একেবারেই অভিন্ন করতে চান। কিন্তু মানুষের প্রকৃতিগত ভিন্নতা প্রকৃতিরই বিধান। রাষ্ট্রের জন্য অধিক মাত্রার ঐক্য মঙ্গলজনক নয়।

২ : ৩ তাছাড়া যে উপায়ে প্লেটো এই ঐক্য সাধন করার কথা বলেছেন তাও সঠিক নয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ রাষ্ট্রে বিরোধের বৃদ্ধি ঘটাবে, বিরোধকে বিলুপ্ত করবে না। স্ত্রী এবং সন্তানদের যৌথ মালিকানায় স্থাপন করলে মানুষের স্বাভাবিক স্নেহ-সৌহার্দের বিলোপ ঘটবে।

২ : ৪ এ ছাড়া ভিন্নতর সমালোচনাও রয়েছে। কিন্তু এই সমালোচনাটিই হচ্ছে প্রধান সমালোচনা।

২ : ৫ বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা দেখব যে, সাম্যবাদের প্রস্তাব থেকে যে উপকারের আমরা চিন্তা করছি, সে উপকার আমরা সম্পত্তির অধিকতর উদার ব্যবহার দ্বারা অপরের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের মাধ্যমে লাভ করতে পারি। ব্যক্তিগত সম্পত্তি মানুষের সুখ বিধান করে এবং মানুষকে উদার-হৃদয় করে। 'রিপাবলিক' রাষ্ট্রের ঐক্যকে নাগরিকদের অভিন্নতা বলে বিবেচনা করেছে। কিন্তু এ বিবেচনা ঠিক নয়। তাছাড়া মানুষের মহৎ বিবেচনাও প্লেটোর প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচারণ করে, তাকে সমর্থন করে না। এ ক্ষেত্রে বাস্তব অভিজ্ঞতাও প্রমাণ করবে যে, প্রস্তাবটি বাস্তব জীবনে প্রয়োগের অযোগ্য।

২ : ৬ প্লেটো তাঁর 'লজ' বা 'বিধান-গ্রন্থে ভিন্নতর আদর্শ–রাষ্ট্রের প্রস্তাব করেছেন। এ রাষ্ট্র 'রিপাবলিক'-এর চাইতে অধিক বাস্তব। 'বিধান' গ্রন্থে প্লেটো সাম্যবাদের প্রস্তাবটিকে বর্জন করেছেন। কিন্তু অপরাপর ক্ষেত্রে তিনি 'রিপাবলিক'-এর ধারণাকে বজায় রেখেছেন। তবে 'বিধান'-এর রাষ্ট্র কেবল বৃহত্তর নয়, আমরা বলবো, অত্যধিকভাবে সে বৃহৎ। কিন্তু প্লেটো বৈদেশিক সম্পর্কের বিষয়টি উল্লেখ করেন নি। এবং ব্যক্তিগত সম্পদের কোন পরিমাণও নির্দিষ্ট করেন নি। তাছাড়া জনসংখ্যার বৃদ্ধি যে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন এবং শাসক ও শাসিতের মধ্যকার পার্থক্য যে স্থির করা আবশ্যক, সে কথাও প্লেটো বলেন নি। যে শাসনব্যবস্থার তিনি প্রস্তাব করেছেন সে শাসনব্যবস্থাকে অধম ছাড়া উত্তম বলা চলে না।

২ : ৭ চ্যালচেডনের ফ্যালিস সম্পদের সমবন্টনকে তাঁর প্রস্তাবের মূল বৈশিষ্ট্য হিসাবে নির্দিষ্ট করেছিলেন। কিন্তু একেও বাস্তবে কার্যকর করা কঠিন। তাছাড়া যে অপকার দূর করার জন্য তিনি এ প্রস্তাব করেছেন সে সকল অপকার এর দ্বারা দূরীভূত হবে না। মানুষের মধ্যে বিরোধের উৎস সম্পদের অসাম্যের চাইতেও গভীর। ফ্যালিস-এর রাষ্ট্র বৈদেশিক শক্তির মোকাবেলা করতে সক্ষম হবে না। তাঁর সংস্কারের প্রস্তাব সম্পদবানদের রোষের কারণ হবে, কিন্তু দরিদ্রের সন্তুষ্টি বিধানে সে সক্ষম হবে না।

২ : ৮ হিপপোডামাস কোন বাস্তববাদী রাজনীতিক ছিলেন না। তাঁর লক্ষ্যও একটি সঙ্গতির লক্ষ্য। তাঁর প্রস্তাবিত রাষ্ট্রে শ্রেণী হবে তিনটি, সম্পত্তি হবে তিন প্রকারের এবং বিধানের প্রকারও হবে তিনটি। তিনি একটি আপীল আদালত গঠনের কথাও বলেছিলেন। জুরীগণ তাঁদের রায়কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন, এ প্রস্তাবও তিনি করেছেন এবং জনসাধারণের জন্য মঙ্গলকর কিছু আবিষ্কার যারা করবেন তাদের পুরস্কৃত করার কথাও তিনি বলেছেন। তাঁর এই সম্পত্তির ভেদ এবং শ্রেণী পার্থক্যের ব্যাপারটি মোটেই সুষ্ঠু হয়নি। ব্যাখ্যাকৃত রায়দানও অবাস্তব। কারণ, জুরীগণ যে যৌথভাবে আলোচনা করবেন, তার নিশ্চয়তা কোথায়? আবিষ্কার বা উদ্ভাবনের প্রস্তাবটি সংবিধানের পরিবর্তন সাধনের প্রবণতাকে উৎসাহিত করতে পারে। অবশ্য যে বিধান অপ্রচলিত এবং অসঙ্গত হয়ে দাঁড়িয়েছে তার পরিবর্তন করা উচিত। কিন্তু অপ্রয়োজনে সংবিধানের পরিবর্তন সংবিধানের প্রতি মানুষের সম্মান বোধকে হ্রাস করে।

২ : ৯ যে সকল বর্তমান রাষ্ট্রকে উত্তম বলা হয় তার মধ্যে স্পারটা, ক্রিট এবং কার্থেজের কথা উল্লেখ করা যায়। কিন্তু স্পারটার শাসকরা তাদের দাসদের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের মেয়েদের কর্তৃত্ব অধিক এবং তারা অধিক পরিমাণেই বিলাসী। তাদের সম্পত্তি ব্যবস্থা এমন যে এর ফলে কতিপয়ের হাতে সকল সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়েছে। তাদের ইফরব্যবস্থা, সিনেট, যৌথরাজ, যৌথ আহার, নৌবাহিনী প্রভৃতিও আলোচনার উর্ধে নয়। একজন স্পারটীয় এবং তার রাষ্ট্র হচ্ছে সামরিক চরিত্রের এবং কেবল যুদ্ধের উপযুক্ত। কিন্তু যুদ্ধের ক্ষেত্রেও তাদের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কোন সহায়ক শক্তির কাজ করেনা। রাষ্ট্রের স্বার্থের সে প্রতিকূল শক্তি হয়ে দাঁড়ায়।

২ : ১০ স্পারটার শাসনব্যবস্থার সঙ্গে ক্রিটের সংবিধানের মিল আছে। তবে ক্রিটের ব্যবস্থা অধিকতর আদিম। তাদের যৌথ আহার ব্যবস্থা অধিকতর সুষ্ঠুভাবে সাধিত হয়। তবে তাদের 'কসময়', 'ইফর' ব্যবস্থার চেয়েও খারাপ। ক্রিটের শাসনব্যবস্থা একটি সঙ্কীর্ণ এবং বিবদমান কতিপয়ী শাসনব্যবস্থা। তার শহরগুলি যে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে, সে কেবল তাদের দুর্গমতার কারণে।

২ : ১১ কার্থেজীয় শাসনব্যবস্থার বেশ সুখ্যাতি শোনা যায়। এর অবশ্য কারণ আছে। স্পারটার সঙ্গেও এর তুলনা চলে। কিছু গণতন্ত্রী বৈশিষ্ট্যসহ ব্যবস্থাটি হচ্ছে কতিপয়ী ব্যবস্থা ('অলিগারকী')। এর জোর হচ্ছে সম্পদের উপর। কার্থেজের সকল পদেরই ক্রয়-বিক্রয় ঘটে। আবার এক ব্যক্তি একাধিক পদেরও অধিকারী হতে পারে। এগুলি কোনো গুণের লক্ষণ নয়। তবে সাধারণ মানুষের অসন্তোষ নিরসনের জন্য তারা লোক বহির্গমনের এক ব্যবস্থা রেখেছে।

২ : ১২ বিধান দাতাদের বিষয়ে বলতে গেলে আমরা বলবো, এঁদের মধ্যে সলোন হচ্ছেন সর্বোত্তম। একদিকে তিনি রক্ষণশীল ছিলেন। আবার অপরদিকে তিনি একজন নমনীয় গণতন্ত্রী ছিলেন। এ ছাড়া ফিলোলাস, চারোন্দাজ, ফ্যালিস, ড্রাকো, পিটাকাস এবং এ্যানড্রোমাস—এঁদের সম্পর্কে তেমন কোনো বক্তব্য আমাদের নাই।

৩ : ১ নাগরিকতার প্রশ্ন। নাগরিকের সংজ্ঞা কি হবে? নাগরিক অবশ্যই নাগরিকেতর (ডেনিজেন) থেকে অধিক। ব্যক্তিগত অধিকার নাগরিকতার ভিত্তি নয়। নাগরিক হচ্ছে সে যার রাজনৈতিক ক্ষমতা আছে। নাগরিক জুরীর দায়িত্ব পালন করে এবং সভামণ্ডলীতে আসন লাভ করে। কিন্তু 'নাগরিক' বলতে প্রচলিত অর্থে যাদের বুঝানো হয় তাদের সকলের উপর প্রযোজ্য কোন সংজ্ঞা তৈরি করা কঠিন কাজ। নাগরিক সে, যে নাগরিক–পিতা-মাতার সন্তান, এমন কথা বলাও নিরর্থক।

৩ : ২ কারুর এরূপ অভিমত যে, নাগরিকের অধিকারের একটা ন্যায়সঙ্গত ভিত্তি থাকতে হবে। কিন্তু একথাও ঠিক নয়। রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের উপায় যাই হোক, রাজনৈতিক অধিকার যার আছে, সে নাগরিক।

৩ : ৩ অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের সংজ্ঞাকে রাজনৈতিক ক্ষমতার বন্টনের সঙ্গে যুক্ত করে রচনা করা হয়। ক্ষমতাবন্টনের পদ্ধতি পরিবর্তিত হলে নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে, এরূপও বলা হয়।

৩ : ৪ উত্তম নাগরিক এবং ব্যক্তি : এরা কি অভিন্ন? একজন উত্তম নাগরিক উত্তম ব্যক্তি নাও হতে পারে। উত্তম নাগরিক হচ্ছে সে যে রাষ্ট্রের উত্তম সেবায় নিয়োজিত। কিন্তু রাষ্ট্রটি অধমনীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হতে পারে। আইনের ভিত্তিতে যে রাষ্ট্র পরিচালিত হয় তার নাগরিক জানে কিভাবে শাসন করতে হয় এবং কিভাবেই বা শাসনকে মান্য করতে হয়। উত্তম ব্যক্তি শাসন করার উপযুক্ত বটে। কিন্তু আইনগত যে রাষ্ট্র তার নাগরিক শাসনকে মান্য করেই শাসন করার দক্ষতা অর্জন করে। এমন রাষ্ট্রে নাগরিকতার ভিত্তি হচ্ছে নৈতিক শিক্ষা।

৩ : ৫ যারা কারিগর অর্থাৎ শ্রমিক, একটি উত্তম রাষ্ট্রে তারা নাগরিক বলে গণ্য হতে পারেনা। চরম গণতন্ত্র এবং কোন কোন কতিপয়তন্ত্র এই নীতিটিকে উপেক্ষা করে। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা ভিন্নতর শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করে।

৩ : ৬ শাসন ব্যবস্থা তথা সংবিধানের শ্রেণীকরণের প্রশ্ন : গণতন্ত্র, কতিপয়তন্ত্র এবং রাজতন্ত্র। রাষ্ট্রের লক্ষ্য দুটি : ১. মানুষের সামাজিক জীবনযাপনের প্রবণতাকে তৃপ্ত করা; ২. মানুষকে উত্তম জীবনের উপযুক্ত করে তোলা। রাজনৈতিক শাসন দাসের উপর প্রভুর শাসন থেকে এ কারণে পৃথক যে, রাজনৈতিক শাসনের লক্ষ্য হচ্ছে শাসিতের মঙ্গল সাধন।

৩ : ৭ শাসনব্যবস্থা উত্তম কিংবা অধম বলে বিবেচিত হবে তার লক্ষ্য সকলের মঙ্গল সাধন কিংবা মঙ্গল সাধন নয়, তার ভিত্তিতে। উত্তম শাসন তিন প্রকারের : রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র এবং পলিটি। অধমের প্রকারও তিনটি : স্বৈরতন্ত্র, কতিপয়তন্ত্র এবং চরম গণতন্ত্র। এখানে অধমেরা উত্তমের বিকৃত রূপ।

৩ : ৮ গণতন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্রের নির্ধারক কেবল শাসিতের সংখ্যার অনুপাতে শাসকদের সংখ্যার আধিক্য বা অল্পতা নয়। গণতন্ত্র হচ্ছে দরিদ্রদের শাসন। কতিপয়তন্ত্র তথা অলিগারকী হচ্ছে ধনবানদের শাসন।

৩ : ৯ গণতন্ত্রীদের মুখ্য নীতি হচ্ছে সাম্যের নীতি। কতিপয়তন্ত্রীগণ মনে করেন যে, রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে সমতা সঙ্গত নয় এবং রাজনৈতিক অধিকার সম্পদের অনুপাতের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট হবে। কিন্তু এদের উভয়ই তাদের যুক্তিতে রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্যকে বিস্মৃত হন। রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ন্যায়। এই ন্যায় সাধনে যাদের অবদান হবে সর্বাধিক, রাজনৈতিক ক্ষমতার সর্বাধিক পরিমাণ অংশ তাদেরই প্রাপ্য।

৩ : ১০ এই নীতিতেই আমরা বলবো, ন্যায় সংখ্যাধিক বা অধিকতর সম্পদবানের ইচ্ছার ব্যাপার নয়। ন্যায় হচ্ছে রাষ্ট্রের নৈতিক লক্ষ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মধারা।

৩ : ১১ কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, উত্তম শাসক কে? অধিক কিংবা কতিপয়? অধিকের হাতে উচ্চতম পদগুলিকে ন্যস্ত করা যুক্তিসঙ্গত হবেনা। কিন্তু অধিকের সমালোচনার ক্ষমতা আছে। সে কারণে আলোচনা এবং বিচারমূলক পদের তারা যোগ্য। উত্তম সমালোচককে যে একজন বিশেষজ্ঞ হতে হবে, এমন কোনো কথা নাই। যারা বিশেষজ্ঞ তারা অনেক সময়ে বিচারের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। তাছাড়া নগরীর স্বার্থের সঙ্গে অল্পের চাইতে অধিকের স্বার্থই অধিক জড়িত। কিন্তু শাসক অধিক কিংবা অল্প, যাই হোক, তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে আইনের।

৩ : ১২ কোন্ নীতির ভিত্তিতে রাজনৈতিক ক্ষমতার বন্টন হবে? মনে করা যাক, সমানদের সমান অধিকার থাকবে। কিন্তু তাতেও প্রশ্ন থাকে, এই সমান কারা? এর জবাব হচ্ছে, যারা সমভাবে রাষ্ট্রের সেবা করতে সক্ষম, তারা সমান।

৩ : ১৩ কাজেই সম্পদবান, স্বাধীনতায় জাত, অভিজাত এবং বিশেষ গুণবান–এদের প্রত্যেকের দাবিরই একটা বিবেচনা আবশ্যক। কিন্তু একথা ঠিক যে, এদের কারুর হাতেই অপর সকলের উপর শাসন করার ক্ষমতা প্রদান করা উচিত নয়। রাষ্ট্রের নাগরিকদের সকলের মোটামুটি সমপরিমাণ সম্পদ থাকা আবশ্যক। জন্ম, নৈতিকতা এবং উত্তমতার ক্ষেত্রেও তাদের সমান হওয়া সঙ্গত। এ কারণে 'রাষ্ট্রচ্যুতি' বা রাষ্ট্র থেকে নির্বাসনের নীতিটি বোধগম্য। কিন্তু আদর্শ রাষ্ট্রে এমন ব্যক্তি যদি পাওয়া যায় যার গুণ সর্বাধিক, তাহলে তাকে অবশ্যই রাজা তথা শাসক করা আবশ্যক।

৩ : ১৪ রাজতন্ত্রের প্রকারভেদ : রাজতন্ত্রের প্রকার পাঁচটি : ১. স্পারটীয়; ২. বর্বরীয়; ৩. নির্বাচনমূলক একনায়কত্ব; ৪. যোদ্ধামূলক; ৫. নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র।

৩ : ১৫ সর্বশেষ প্রকারটিকে অনেকে সর্বোত্তম রাষ্ট্র বলে বিবেচনা করেন। তার অর্থ, রাজা যদি আইনের প্রতীক হিসাবে শাসন করেন তাহলে রাজতন্ত্র সর্বোত্তম। কারণ, সেক্ষেত্রে রাজা আইনের ভিত্তিতেই আইনকে প্রয়োগ করবেন। কিন্তু এমন নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অপব্যবহারের আশঙ্কা কম হবে যদি আইনগত শাসন অধিকের শাসন হয়। রাজতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল আদিম সমাজের প্রয়োজন থেকে। রাজতন্ত্র এখন অচল। কেবল তাই নয়, একাধিক কারণে রাজতন্ত্র এখন সমর্থনের অযোগ্য।

৩ : ১৬ রাজতন্ত্রের প্রবণতা হচ্ছে বংশগত হয়ে ওঠার। সমানের উপর এ হচ্ছে সমানের শাসন। ব্যক্তি হিসাবে রাজা তার আবেগ দ্বারা ভ্রান্তপথে পরিচালিত হতে পারে। তাছাড়া কোনো এক ব্যক্তি শাসনের সর্বপ্রকার কর্মের তত্ত্বাবধানে সক্ষম হতে পারে না।

৩ : ১৭ অবশ্য এমন একটি মাত্র ক্ষেত্রকে কল্পনা করা চলে যেখানে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রকে ন্যায্য বলা যেতে পারে।

৩ : ১৮ উত্তম রাষ্ট্রের উদ্ভবের কথাটি বিবেচনা করা যাক। নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রকে সর্বোত্তম ব্যবস্থা হিসাবে আমরা গ্রহণ করতে পারিনে। উত্তম রাষ্ট্রের ব্যাপারটির তাই বিবেচনা আবশ্যক।

৪ : ১ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য হচ্ছে : ১. আদর্শ রাষ্ট্র; ২. বিশেষ অবস্থার ভিত্তিতে সর্বোত্তম রাষ্ট্র; ৩. যে রাষ্ট্রগুলি মূলত অধম। রাষ্ট্রনৈতিকদের অনেক সময়ে অধম শাসনব্যবস্থার উত্তম ব্যবহারে সচেষ্ট হতে হয়।

৪ : ২ ছয়টি প্রধান শাসনব্যবস্থার মধ্যে রাজতন্ত্র এবং অভিজাততন্ত্রের আলোচনা সম্পন্ন হয়েছে। (৩য় পুস্তক, অধ্যায় ১৪) এখন আমাদের অবশিষ্ট চারটি এবং তাদের অন্তর্গত উপ-প্রকারের আলোচনা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে এদের কোন্টিকে কখন বাঞ্ছিত বলা হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

৪ : ৩ প্রথমে ধরা যাক গণতন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্রকে। সাধারণত এ দুটিকে শাসনব্যবস্থার প্রধান প্রকার বলে মনে করা হয়। কিন্তু এ ধারণা ভুল। তাছাড়া এ দুটির পার্থক্য কেবল সংখ্যার মধ্যে নিহিত, এ ধারণাও সঠিক নয়। গণতন্ত্রে যারা সংখ্যায় অধিক তারা কেবল সংখ্যাতে অধিক নয়, তারা দরিদ্রও। অপরদিকে কতিপয়তন্ত্রে কতিপয়ই হচ্ছে ধনবান। প্রত্যেক রাষ্ট্রের ধনীদরিদ্রের এই পার্থক্যই প্রধান শ্রেণীগত পার্থক্য। কতিপয়তন্ত্র এবং গণতন্ত্র যে গুরুত্বপূর্ণ শাসনব্যবস্থা তাতে সন্দেহ নেই। এদের মধ্যকার যে বিভিন্নতা তারও উৎস এ ব্যবস্থার যারা শাসক, ধনী বা দরিদ্র হিসাবে তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

৪ : ৪ গণতন্ত্রের প্রকার হচ্ছে চারটি। এদের মধ্যে সবচাইতে অধম হচ্ছে চরম গণতন্ত্র, যেখানে সকলের জন্যই সকল পদ উন্মুক্ত থাকে। এ ব্যবস্থায় জনতার ইচ্ছা সকল আইনকে অতিক্রম করে।

৪ : ৫ কতিপয়তন্ত্রেও প্রকার হচ্ছে চারটি। এর মধ্যে সবচাইতে খারাপ হচ্ছে সেই ব্যবস্থা যেখানে পদগুলি বংশগত এবং শাসকরা আইন দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত।

৪ : ৬ কোন্ অবস্থায় এই প্রকার ভেদগুলির উৎপত্তি ঘটে।

৪ : ৭ সঠিক অর্থে অভিজাততন্ত্র হচ্ছে সেই ব্যবস্থা যেখানে সর্বোত্তমই মাত্র শাসন করে।

৪ : ৮ পলিটি হচ্ছে গণতন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্রের মধ্যে একটি আপোষব্যবস্থা। তবে এর ঝোঁক গণতন্ত্রের দিকে অধিক। অনেক অভিজাততন্ত্র আসলে পলিটিতন্ত্র।

৪ : ৯ পলিটির জন্য যে আপোষব্যবস্থা আবশ্যক তা বিভিন্নভাবে সাধন করা যায়। ল্যাকোনিয়ার শাসনব্যবস্থা এর একটি সার্থক দৃষ্টান্ত।

৪ : ১০ স্বৈরশাসন তিন প্রকারের : ১. বর্বরদের স্বৈরশাসন; ২. নির্বাচিত স্বৈরশাসন। এর আলোচনা নিষ্পন্ন হয়েছে। এর উভয়তেই শাসিতগণ স্বেচ্ছায় শাসিত হয়। কিন্তু তৃতীয় প্রকারের স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠিত হয় অনিচ্ছুক শাসিতের উপর এক ব্যক্তির আইনহীন শাসন।

৪ : ১১ আদর্শ রাষ্ট্রের প্রশ্ন : সাধারণ অবস্থা এবং বিশেষ অবস্থার প্রেক্ষিতে আদর্শ রাষ্ট্র। সাধারণ নগর রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ধনী এবং দরিদ্রের শাসনের মধ্যবর্তী শাসনই সর্বোত্তম। এ ব্যবস্থায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রধান শক্তি। মধ্যবিত্তশ্রেণী প্রধান শক্তি না হলে কোনো রাষ্ট্রই উত্তমরূপে শাসিত হতে পারেনা। ক্ষুদ্ররাষ্ট্রের চাইতে বৃহৎ রাষ্ট্রেই মধ্যবিত্তশ্রেণী অধিকতর শক্তিশালী হয়। এ কারণে গ্রীসে কোথাও এদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দেখা যায় না। তাছাড়া গণতন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্রের সাহায্যকারী রাষ্ট্র পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাহায্যকারী কোনো রাষ্ট্র দৃষ্ট হয় না।

৪ : ১২ রাষ্ট্রের মধ্যে যে শ্রেণীর শক্তি অধিক, কোনো ব্যবস্থাতেই তাদের উপেক্ষা করা চলে না। এ কারণে কোন কোন রাষ্ট্রে গণতন্ত্র অথবা কতিপয়তন্ত্রই হচ্ছে একমাত্র সম্ভব শাসনব্যবস্থা। কিন্তু এরূপ শাসনব্যবস্থাতে বিধানদাতার আবশ্যক হচ্ছে মধ্যবিত্তশ্রেণীর পথ মুক্ত করা।

৪ : ১৩ শাসনব্যবস্থা যাই হোক, তাকে রক্ষা করার অনুকূল শক্তির সন্ধান রাখতে হবে।

৪ : ১৪ সংবিধান তৈরির পদ্ধতি কি হবে। বিধানদাতাকে তিনটি বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিতে হবে : ১. আলোচনাকারী তথা আইনপ্রণয়নকারী সম্মেলন। প্রত্যেক প্রকারের শাসনব্যবস্থাতে এর প্রকৃতি ভিন্ন।

৪ : ১৫ ২. নির্বাহী বিভাগ : এক্ষেত্রে বিধানদাতাকে জানতে হবে কোন পদগুলি অপরিহার্য এবং

কোন্‌গুলিকে একজন কর্মচারীর হাতেও সার্থকভাবে ন্যস্ত করা যায়। তাছাড়া এটিও জানতে হবে, প্রত্যেক রাষ্ট্রের সার্বভৌম পদ কি অভিন্ন? এবং কর্মচারী নিয়োগের পদ্ধতি কত রকম হতে পারে?

৪ : ১৬ ৩. বিচারালয় : বিধানদাতাকে এক্ষেত্রে বিচারালয়ের প্রকার, তাদের কর্মের এক্তিয়ার এবং তাদের কার্যক্রমের পদ্ধতি বিবেচনা করতে হবে।

৫ : ১ **বিপ্লব প্রসঙ্গ : বিপ্লবের সাধারণ কারণ।**

ন্যায় সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার উপরই সাধারণ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘটে। এর ফলেই অসন্তোষ এবং বিপ্লবের সূচনা ঘটে। অনেক বিপ্লব সংঘটিত হয় নতুন সংবিধান বা শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য। অনেকগুলি আবার সংঘটিত হয় পুরাতনকে সংশোধনের জন্য কিংবা শাসনব্যবস্থাকে নতুন পরিচালকদের হাতে ন্যস্ত করার জন্য। গণতন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্র—উভয় ব্যবস্থার মধ্যে এমন চরিত্রগত ত্রুটি বিদ্যমান যা থেকে বিপ্লবের উদ্ভব ঘটে। তবে এ দুইএর মধ্যে গণতন্ত্র অধিকতর স্থিতিশীল।

৫ : ২ বিপ্লবের মনোভাব এবং বিপ্লবের লক্ষ্য–এ দুইএর মধ্যে পার্থক্য নির্দিষ্ট করা আবশ্যক। বিপ্লবের উদ্যোগী কারণগুলিও চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

৫ : ৩ শেষোক্ত কারণের বিশেষ আলোচনা আবশ্যক।

৫ : ৪ সামান্য উপলক্ষ্য থেকে বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে। কিন্তু সেটা মূল কারণ নয়। একটি সাধারণ কারণ হচ্ছে শ্রেণী বিশেষের হিংসাত্মক আচরণ। ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিপ্লবের আর একটি কারণ। দ্বন্দ্বমান শ্রেণীগুলি সমশক্তির হলে এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী না থাকলেই এমনটি ঘটে। বিপ্লব হিংসাত্মক কিংবা প্রতারণামূলক ভাবেও সংঘটিত হতে পারে।

৫ : ৫ বিশেষ ক্ষেত্রে বিপ্লব : বিপ্লব প্রতিরোধের উপায় :

ক. গণতন্ত্রে ধনীকদের উপর নির্যাতন থেকে বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে। বক্তৃতাবাগীশ ব্যক্তি সামরিক নেতা হলেও বিপ্লব হতে পারে। রাজনীতিকরা যখন জনতার মনস্তুষ্টির জন্য প্রতিযোগিতা শুরু করে তখনো বিপ্লব ঘটতে পারে।

৫ : ৬ খ. কতিপয়তন্ত্রে জনতা অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে। উচ্চাকাঙ্খী কতিপয়ী শাসকেরা ষড়যন্ত্র করতে পারে। তারা জনতাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করতে পারে। তারা স্বৈরাচারী কোনো শাসককে শাসনে বসাতে পারে। কতিপয়তন্ত্রের শাসকরা নিজেরা দ্বন্দ্বে রত না হলে কতিপয়তন্ত্রের পতন খুব কম ঘটে। তারা অনেক সময়ে ভাড়াটে সেনানায়ক নিযুক্ত করে এবং এই ব্যক্তি স্বৈরশাসক হয়ে দাঁড়ায়।

৫ : ৭ গ. অভিজাততন্ত্র এবং পলিটির শাসকদের অন্যায়ের ফলে বিপ্লবের উৎপত্তি ঘটে। পলিটির ক্ষেত্রে এ আশঙ্কা কিছুটা কম। সুবিধা-বঞ্চিত শ্রেণী থেকে অভিজাততন্ত্রের উপর আঘাত আসতে পারে। উচ্চাকাঙ্খী ক্ষমতাবান ব্যক্তিও আঘাত করতে পারে। অভিজাততন্ত্রের প্রবণতা হচ্ছে কতিপয়তন্ত্রে পরিণত হওয়া। অভিজাততন্ত্র ক্রমান্বয়ে ভেঙ্গে পড়তে পারে। পলিটির ক্ষেত্রেও এরূপ বিধান ঘটতে পারে।

৫ : ৮ বিপ্লব প্রতিরোধের প্রধান উপায় হচ্ছে : বঞ্চিতদের উপর অন্যায় এবং প্রতারণা করা থেকে বিরত হওয়া; শাসক এবং শাসিতের মধ্যে সুসম্পর্ক বজার রাখা; ধ্বংসাত্মক শক্তিগুলির উপর দৃষ্টি বজায় রাখা; সম্পত্তির বিধানকে মাঝে মাঝে পরিবর্তন করা; কোনো ব্যক্তি বা শ্রেণীকে অধিক পরিমাণে ক্ষমতাশালী হতে না দেওয়া; দায়িত্ব পালনের পদগুলিকে লাভের উৎসে পরিণত না করা এবং শ্রেণী অত্যাচার সম্পর্কে সতর্ক থাকা।

৫ : ৯ পদে নিযুক্তির ক্ষেত্রে আনুগত্য, যোগ্যতা এবং ন্যায় বোধের উপর গুরুত্ব আরোপ করা আবশ্যক। সংবিধানের নীতিকে চরমে নিয়ে যাওয়া সঙ্গত নয়। নাগরিকদের সংবিধানের মূল নীতিতে শিক্ষিত করা আবশ্যক।

৫ : ১০ ঘ. রাজতন্ত্রের ধ্বংসের কারণ এবং তাকে রক্ষা করার উপায়গুলির ভিন্ন আলোচনা আবশ্যক। রাজতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র-এ দুইএর পার্থক্য স্থির করা প্রয়োজন। স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে গণতন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্রের দোষগুলির সম্মিলন ঘটে। অভিজাততন্ত্রের দোষ রাজতন্ত্রেও ঘটতে পারে। কিন্তু রাজতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র, উভয় ব্যবস্থা বিপন্ন হতে পারে তাদের নিজেদের শাসকদের চরিত্র দ্বারা। এমন শাসক যদি জনসাধারণের মনে ত্রাস এবং ঘৃণার সৃষ্টি করে তবে এরূপ ব্যবস্থার বিপদ আসন্ন হয়ে ওঠে। স্বৈরতন্ত্র, অভ্যন্তরীন এবং বহিরাগত–উভয় প্রকার শত্রুর মোকাবেলায় দুর্বল। বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে রাজতন্ত্র শক্তিশালী, কিন্তু অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ক্ষেত্রে সে দুর্বল।

৫ : ১১ রাজতন্ত্রকে রক্ষার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে নমনীয়তা। স্বৈরতন্ত্র নির্ভর করে চিরাচরিতভাবে জনসাধারণকে ভীত এবং বিভক্ত করার উপর। স্বৈরতন্ত্রের উচিত রাজতন্ত্রের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে মিতব্যয়ী হওয়ার চেষ্টা করা এবং সামাজিক আচরণে সৌজন্য এবং সংযম প্রদর্শন করা। স্বৈরশাসকগণ উপযুক্ত পারিষদ নিযুক্ত করতে পারে এবং ধনী ও দরিদ্রদের একটি ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করতে পারে।

৫ : ১২ ইতিহাসে দেখা যায়, স্বৈরশাসকদের জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। 'রিপাবলিক'-এ বিপ্লব সম্পর্কে প্লেটোর আলোচনা যথেষ্ট নয়। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ফলাফল সম্পর্কে তিনি কিছু বলেন নি। তত্ত্বগতভাবে এটি তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। কতিপয়ী শাসনব্যবস্থার বিপ্লবের কারণ সম্পর্কে প্লেটোর অভিমত ঠিক নয়। গণতন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্রের মধ্যে যে বিভিন্ন প্রকার ভিন্নতা আছে, সে সম্পর্কে প্লেটো কিছু বলেননি।

৬ : ১ গণতন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্রের সংগঠন বিষয়ে।

ক, গণতন্ত্রের পার্থক্য ঘটে : ১. নাগরিকদের চরিত্রের কারণে এবং ২. গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলিকে সম্মিলিত করার উপায়ের ভিত্তিতে।

৬ : ২ গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে স্বাধীনতা। স্বাধীনতার ফলশ্রুতি হচ্ছে সংখ্যাধিকের সর্বাধিক ক্ষমতা। এ ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি আপন ইচ্ছামতো জীবন ধারণ করে। এই বৈশিষ্ট্য থেকে অপর বৈশিষ্ট্যগুলিকে অনুমান করা চলে।

৬ : ৩ কতিপয়তন্ত্রে সংখ্যাধিকের বদলে অধিকতর ধনবানগণই অধিকতর ক্ষমতাধারী। সার্বভৌমত্ব আইন এবং সবকিছুর উর্ধে হলে এই উভয় নীতিই গ্রহণের অযোগ্য। সংখ্যা এবং সম্পদ–উভয়েরই প্রভাব থাকা আবশ্যক। কিন্তু রাজনৈতিক ন্যায়ের যথার্থ নীতি স্থির করা দুরূহ ব্যাপার। ন্যায়ের ভিত্তিতে মানুষ কার্য সাধন করবে, এমন অবস্থা সৃষ্টি করা অধিকতর দুরূহ।

৬ : ৪ গণতন্ত্রের প্রকার চারটি (৪র্থ পুস্তক দ্রষ্টব্য) : ১. কৃষিজীবী গণতন্ত্র, যে ব্যবস্থায় কর্মচারীগণ নির্বাচিত হয় এবং নাগরিকদের নিকট জবাবদিহীতে বাধ্য থাকে এবং প্রত্যেক পদের উপযুক্ত সম্পদের শর্তও নির্দিষ্ট থাকে। এই ব্যবস্থার পক্ষে আইন দ্বারা কৃষিকে উৎসাহিত করা আবশ্যক। দ্বিতীয় উত্তম গণতন্ত্র হচ্ছে ২. পশুচারণ গণতন্ত্র। তারপরে আসে ৩. ব্যবসায়ী গণতন্ত্র। সবচাইতে নিকৃষ্ট হচ্ছে ৪. চরম গণতন্ত্র যেখানে প্রাপ্তবয়স্ক মাত্রই ভোটদানের অধিকারী।

৬ : ৫ গণতন্ত্র স্থাপন করা যত শক্ত, তাকে রক্ষা করা তার চাইতেও শক্ত। গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হলে দেখতে হবে, দরিদ্রগণ যেনো ধনবানদের সম্পদ লুণ্ঠন না করে। রাজস্বের অর্থ কর্মচারীদের বেতনদানে নিঃশেষ করা উচিত নয়। নিঃস্বদের বৃদ্ধিকেও রোধ করা আবশ্যক।

৬ : ৬ খ. কতিপয়ী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তেমন কিছু বলার নেই। এ ব্যবস্থা রক্ষার মূলশর্ত হচ্ছে সতর্ক ব্যবস্থাপনা।

৬ : ৭ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সামরিক ব্যবস্থাপনা। কতিপয়ী শাসকদের দেখতে হবে যেন সেনাবাহিনীতে জনসাধারণের অংশ অধিক শক্তিশালী হয়ে না ওঠে। শাসকশ্রেণীতে স্থান লাভের শর্ত সহজ হওয়া আবশ্যক। দায়িত্বের পদ, লাভের উৎস না হয়ে বহনের বোঝা বলে বোধ হওয়া আবশ্যক।

৬ : ৮ গণতন্ত্র এবং কতিপয়তন্ত্র, উভয় ব্যবস্থাতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দায়িত্ব দানের ব্যবস্থা। প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই দায়িত্বপূর্ণ কিছু পদের প্রয়োজন আছে। এছাড়া কতকগুলি আছে যা কোনো বিশেষ ব্যবস্থার চাহিদা, অপরের জন্য নয়।

৭ : ১ ব্যক্তি এবং রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে চরম লক্ষ্যের প্রশ্ন।
আদর্শ রাষ্ট্র তৈরি করার পূর্বে আমাদের জানা আবশ্যক, রাষ্ট্র এবং ব্যক্তির জীবনে চরম লক্ষ্য কি? যথার্থ সুখের উৎস হচ্ছে জ্ঞান এবং ন্যায় বোধ, অর্থ কিংবা সম্পদ নয়। কিন্তু উত্তম জীবনের জন্য দ্রব্য-সামগ্রীরও আবশ্যক। এগুলি হচ্ছে উত্তম জীবনের উপায়। এ কথা উত্তম রাষ্ট্র এবং উত্তম জীবন–উভয়ের ক্ষেত্রে সত্য।

৭ : ২ কিন্তু সর্বোত্তম ন্যায়ের কি অর্থ? সর্বোত্তম ন্যায় কি ধ্যানে কিংবা কর্মে নিহিত? ইতিহাসে দেখা যায়, রাষ্ট্রের জীবন যুদ্ধ এবং জয়ের দ্বারা আবিষ্ট রয়েছে। কিন্তু যুদ্ধকে রাষ্ট্রের উত্তম লক্ষ্য বলে গণ্য করা চলেনা।

৭ : ৩ ন্যায়বান জীবন অবশ্য কর্মের জীবন। কিন্তু কর্ম দুরকমের হতে পারে : ধ্যান এবং বাস্তব কর্ম। যাঁরা বাস্তব জীবনে ব্যস্ত-রাজনীতিকের জীবনকে অধম বলে গণ্য করেন, তাঁরা ভুল করেন। কিন্তু অপর দিকে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে পরম আরাধ্য বলে যাঁরা গণ্য করেন তাঁরাও ভুল করেন।

৭ : ৪ একটি আদর্শ রাষ্ট্রের রূপ কল্প :
জনসংখ্যা এবং ভূখণ্ড দিয়েই আমাদের শুরু করা কর্তব্য। জনসংখ্যার কথা বললে, স্বাধীনতা এবং নৈতিক জীবনযাপনের ক্ষমতাকে বিনষ্ট না করে জনসংখ্যাকে যত কম রাখা যায়, তত মঙ্গল, একথা আমাদের বলতে হয়। লোকসংখ্যা যতো কম হবে, তাদের সুশাসন ততো সম্ভব হবে।

৭ : ৫ ভূখণ্ডের ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে, ভূখণ্ড এমন হবে যেনো জনসাধারণের পক্ষে অবকাশ, সংযম এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপন সম্ভব হয়। নগরীর অবস্থানটা হওয়া আবশ্যক কেন্দ্রীয় কোন স্থানে।

৭ : ৬ অর্থনৈতিক এবং সামরিক বিবেচনায় নগরীর জন্য সামুদ্রিক যোগাযোগ আবশ্যক। কিন্তু সামুদ্রিক বাণিজ্যের যে নৈতিক জীবনের উপর একটি কুপ্রভাব আছে, সেটি ভুললে চলবেনা। নগরীর যদি নৌযানের বহর থাকে তবে নৌপোতের অবস্থান নগর থেকে কিছু পরিমাণ দূরত্বে থাকা বাঞ্ছনীয়।

৭ : ৭ নাগরিক চরিত্র উত্তর অঞ্চলের অধিবাসীদের চরিত্র এবং এশিয়াবাসীর চরিত্রের মধ্যবর্তী হওয়া শ্রেয়। কোন কোন গ্রীক জাতির চরিত্রে যে সমন্বয় দেখা যায়, তেমনভাবে বুদ্ধি এবং বিক্রমের সুসমন্বয় নাগরিকদের চরিত্রে সংঘটিত হওয়া আবশ্যক।

৭ : ৮ রাষ্ট্রের সভ্য এবং দাস হিসাবে রাষ্ট্রে যাদের প্রয়োজন, এই দুইএর মধ্যে পার্থক্য রক্ষা করা প্রয়োজন। দাসগণ রাষ্ট্রের কোনো অংশ নয়। রাষ্ট্রে যে সমস্ত লোকের আবশ্যক তাদের মধ্যে থাকবে খাদ্য উৎপাদনকারী, শিল্প-কর্মে দক্ষ কারিগর, অস্ত্রধারী সৈনিক, দ্রব্যের বিনিময় সাধনের জন্য ক্রয়-বিক্রয়কারী, রাষ্ট্রের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি তত্ত্বাবধানকারী এবং রাজনৈতিক ও বিচারকার্য সাধনকারী নাগরিক।

৭ : ৯ এই সকল শ্রেণীর মধ্যে : ১. কারিগর ২. ব্যবসায়ী এবং ৩. গৃহচর্যাকারীদের (দাস) নাগরিক বলে গণ্য করা যাবেনা। যোদ্ধাগণ, শাসকগণ এবং পুরোহিতগণ নাগরিক হওয়ার যোগ্য। এই সকল কর্ম এক লোক দ্বারাই সম্পাদিত হতে পারে। কিন্তু উহা সম্পাদনের সময় বিভিন্ন হবে। জমির মালিকানা এই সকল শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

৭ : ১০ কর্মের ভিত্তিতে শাসক এবং শাসিতের মধ্যে এই পার্থক্য অভিনব নয়। মিশর দেশে এ পার্থক্য এখনো বিদ্যমান। ক্রিট এবং ইটালিতে যৌথ আহারের যে ব্যবস্থা আছে তা থেকে বঝা যায়, এ সমস্ত স্থানেও, এ পার্থক্য এ কালে ছিল। রাষ্ট্রনীতির গুরুত্বপূর্ণ সূত্রসমূহের সাক্ষাৎ ইতিহাসের বুকে পুণঃপুণঃই পাওয়া গেছে। রাষ্ট্রের জমির প্রশ্নে রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিগত জমির মধ্যে পার্থক্য রাখা আবশ্যক। এই উভয় প্রকার জমি কর্ষিত হবে দাস অথবা দাস্যচরিত্রের বর্বরদের দ্বারা।

৭ : ১১ রাষ্ট্রের অবস্থান নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখার বিষয় হবে : ১. জনস্বাস্থ্য ২. রাজনৈতিক সুযোগ, ৩. সামরিক প্রয়োজন। নগরীর ভূমির নকশার মধ্যে সৌন্দর্যের দিকটির প্রতি লক্ষ্য দিতে হবে। অবশ্য আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের যেন সে প্রতিকূল না হয়, সেদিকটির প্রতি সতর্ক থাকতে হবে। নগরীর জন্য প্রাকার তৈরি বাস্তব প্রয়োজনের দিক থেকেই আবশ্যক হবে।

৭ : ১২ নগরীর ভবনসমূহের পরিকল্পনা সতর্কতার সঙ্গে তৈরি করতে হবে।

৭ : ১৩ আদর্শ রাষ্ট্রের শিক্ষার প্রশ্ন : শিক্ষার লক্ষ্য এবং তার ভিত্তি। নাগরিকদের চরিত্র নির্দিষ্ট হবে তাদের জীবনের আরাধ্য সুখের চরিত্র দ্বারা। 'নীতিশাস্ত্রে' আমরা সুখের সংজ্ঞা দান করে বলেছি : সুখ হচ্ছে ন্যায়ের উত্তম পরিচর্যা। উত্তম পরিচর্যা বলতে আমরা শর্তহীন উত্তম পরিচর্যাকে বুঝিয়েছি। এমন ন্যায়কে মানুষ তার প্রকৃতি, অভ্যাস এবং যুক্তি দ্বারাই মাত্র অর্জন করতে পারে। অভ্যাস এবং যুক্তি হচ্ছে শিক্ষার ফল। শিক্ষা নিয়ে তাই আলোচনা আবশ্যক।

৭ : ১৪ নাগরিকরা বয়সে যখন তরুণ থাকবে তখন তাদের শিক্ষা দিতে হবে; বয়সে যখন তারা পরিপক্ক হবে, তখন তারা শাসন করবে। শাসন হচ্ছে নাগরিকদের কর্মের মধ্যে উচ্চতম কর্ম। উত্তম শাসক এবং উত্তম ব্যক্তি হবে অভিন্ন। এ কারণে শিক্ষার লক্ষ্য হবে, উত্তম ব্যক্তিকে তৈরি করা। শিক্ষা দ্বারা মানুষের সকল দক্ষতাকে বিকশিত করতে হবে এবং তাকে জীবনের সকল কর্মের উপযুক্ত করে তুলতে হবে। চরম ক্ষমতা এবং চরম কর্মেরও লক্ষ্য হবে শিক্ষার চরম পরিপোষণ। ল্যাকোনিয়ার শিক্ষাব্যবস্থার মতো যে শিক্ষাব্যবস্থা মূলত সামরিক, তার মধ্যে আমাদের এই নীতির উপেক্ষা দেখা যায়।

৭ : ১৫ শান্তির উপাদান হচ্ছে বুদ্ধির চর্চা, সংযম এবং ন্যায়। রাষ্ট্র এবং ব্যক্তি, উভয়ের জন্য এই গুণসমূহ হচ্ছে সর্বাধিক আবশ্যকীয় গুণ। যুদ্ধ হচ্ছে শান্তিরক্ষারই উপায়। কিন্তু শিক্ষাকে মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতাকে মান্য করতে হবে। দেহের যত্ন থেকে শুরু

হবে। প্রবৃত্তিগত চাহিদার আলোচনা হবে দ্বিতীয় পর্যায়ে। সর্বশেষে আসবে বুদ্ধির পরিচর্যা।

৭ : ১৬ স্বাস্থ্যময় দেহের জন্য বিবাহের বয়সকে আইন দ্বারা নির্দিষ্ট করতে হবে। পিতামাতার স্বাস্থ্যের মানও আইন দ্বারা নির্দিষ্ট হবে। বৈবাহিক জীবনের মেয়াদও নির্ধারিত থাকবে।

৭ : ১৭ বিধানদাতাকে শিশু এবং কিশোরদের শিক্ষাদানের জন্য নির্দেশ দিতে হবে। শিশুদের নৈতিক জীবনের জন্য তাদেরকে তত্ত্বাবধায়কের হাতে ন্যস্ত করতে হবে। তত্ত্বাবধায়কগণ শিশুদের শোনাবার জন্য উপযোগী কাহিনী নির্বাচন করবে। তাদের সহকারীগণ শিশুদের দর্শনের জন্য চিত্র, ক্রীড়া, মূর্তি প্রভৃতি দ্রব্যকে নির্বাচিত করবে। পাঁচ থেকে সাত বছরের বয়স নির্দিষ্ট হবে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের জন্য।

৮ : ১ শিক্ষা হবে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত। সকল নাগরিকদের জন্য একই প্রকার ব্যবস্থা থাকবে।

৮ : ২ শিক্ষার ক্রমে অন্তর্ভুক্ত হবে মানুষের দক্ষতার জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়। কিন্তু মন এবং দেহের উপর ক্ষতিকর কোনো বিষয় শিক্ষার ক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

৮ : ৩ পঠন, লিখন এবং অঙ্কন—এ তিনটির প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সাহস সৃষ্টির জন্য শরীরচর্চাও আবশ্যক। সঙ্গীত কেবল অবসর বিনোদনের বিষয় নয়। এ অধিকতর উত্তম উদ্দেশ্য সাধন করে। অবকাশের মহৎ ব্যবহারই হবে নাগরিকদের চরম লক্ষ্য। এবং এ লক্ষ্য সাধনে সঙ্গীত সহায়কের ভূমিকা পালন করে। অঙ্কন এবং অপরাপর বিষয়েরও একই গুরুত্ব।

৮ : ৪ শরীরচর্চা শিক্ষার প্রথম স্তর। কিন্তু স্পারটার ন্যায় মনের বিকাশের বিনিময়ে শিশুদের দেহের বিকাশ আমরা সমর্থন করিনে। বয়ঃসন্ধিক্ষণ এবং তার কিছু পরবর্তী সময় পর্যন্ত শরীরচর্চা হালকা ধরনের হওয়া আবশ্যক।

৮ : ৫ সঙ্গীত যদি কেবল আনন্দের ব্যাপার হয়, তাহলে শিশুদের সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া উচিত নয়। শিশু বয়সে তেমন ক্ষেত্রে তাদের উচিত হবে সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গীত শ্রবণ করা। কিন্তু সঙ্গীত কেবল আনন্দের বিষয় নয়। সঙ্গীত একটি নৈতিক শিক্ষা এবং বুদ্ধিগত উপভোগের বিষয়।

৮ : ৬ সঙ্গীত শিক্ষা শিশুদের পর্যালোচনার দৃষ্টিকে মুক্ত করে এবং এর মাধ্যমে তারা বিভিন্ন কর্মের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। বয়স অধিকতর বৃদ্ধি পেলে সঙ্গীতকে পরিহার করা সঙ্গত। বিশেষজ্ঞের দক্ষতা শিশুদের জন্য অনাবশ্যক। শিশুদের জটিল বাদ্যযন্ত্রের শিক্ষাদানও অনুচিত।

৮ : ৭ সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা আবশ্যক। সঙ্গীতের কোন সুর ন্যায়বোধকে, কোন সুর বিক্রমকে এবং কোন সুর উচ্ছলতাকে উৎসাহিত করে। যে সুর নীতিবোধকে জাগ্রত করে শিশুদের সেই সুরের শিক্ষা দিতে হবে। অপর সুরগুলি সঙ্গীতজ্ঞদের চর্চার বিষয় হবে। শিক্ষার জন্য ডোরীয় সুর সর্বোত্তম। ফ্রিজীয় সুর হচ্ছে নিকৃষ্ট সুর। তবে লিডীয় সুরকে শিশুদের জন্য উপকারী বলা চলে।[১]

১. 'পলিটিকস'-এর বর্তমান আলোচনা-সংক্ষেপ ডব্লিউ. ডি. রস (W. D. Ross)-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত এ্যারিস্টটল-এর রচনাবলীর বেনজামিন জোয়েটকৃত ইংরেজি অনুবাদের আলোচনা সংক্ষেপের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। (দ্র ঃ Great Books of the Western World : Aristotle : 11, Published by Encyclopaedia Britannica, Inc., 1952)